MAHABHARATER KATHA
AMALESH BHATTACHARYA
First Edition...October 1985

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ২৬ আশ্বিন ১৩৯২
১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৫

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

*

প্রাপ্তিস্থান
শৃণ্বন্তু : ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ফোন : ৩৪-১৩৫১
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ সেক্সপীয়র সরণী, কলি-৭১, ফোন : ৪৪-৮৬৪৬
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

*

আর্যভারতী, রাণী কুঠি, সি. ব্লক, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, ঘোলা—সোদপুর, চব্বিশ পরগণা, শ্রীবৈকুণ্ঠকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মডার্ন প্রিন্টার্স, ১২ উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড, কলিকাতা-৬৭, শ্রীসুরেশ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

আমরা যেখানে আছি এই সেই ভারতবর্ষ, এখানে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা কত পুণ্য সাধন করে গেছেন। সেসব এখন শুনছেন।

(ভীষ্মপর্ব, ১২/৫১)

*

যদি সম্পূর্ণ ধনরত্নভরা পৃথিবী এক দিকে আর অন্য দিকে থাকে এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহলে যে ধর্মজ্ঞ সে এই সর্বোত্তম জ্ঞানকেই গ্রহণ করবে, শ্রবণ করবে।

(অনুশাসনপর্ব, ১৩৪/১৬)

*

বৃক্ষ থেকে যেমন পুষ্প ও ফল হয়, আবার সেই ফল থেকে নতুন করে বৃক্ষ জন্মে, তেমনি মহর্ষি বেদব্যাসের এই বাণী পরবর্তীকালের বক্তাগণের দ্বারা আলোচিত হলে মহর্ষির মাহাত্ম্যই বেড়ে যায়।

(হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব, ৬/৭)

কথামুখ

'মহাভারতের কথা অমৃতসমান' হলেও এ-যুগে তার যথার্থ আস্বাদন ভারতবাসীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। তার কারণ এর 'মহত্ত্ব' ও 'ভারবত্ত্ব', এর বৈপুল্য ও বৈচিত্র্য। আধুনিক মানুষের জীবন এত চঞ্চল ও দ্রুতগতিশীল হয়ে উঠেছে যে তার মধ্যে শান্ত সুস্থির হয়ে পর্বের পর পর্ব বিশাল কলেবর মহাভারত পড়া বা শোনা আজ প্রায় অসাধ্য। প্রাচীন কালে ঠাকুমা-দিদিমার কোলে বসেও অনেকে রামায়ণ-মহাভারতের কথা মাতৃদুগ্ধের মতই আত্মসাৎ করত। চণ্ডীমণ্ডপে বসে কথক ঠাকুরের মুখ থেকেও তা সঞ্চারিত হত অন্তরের অন্তঃস্থলে এবং তার দ্বারা তুষ্টি, পুষ্টি, জীবনের পথে চলার শক্তি সবই লাভ করত। মহাভারত তাই আমাদের পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-দায়িনী জননী, সেই মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত হলে বা তা থেকে বঞ্চিত হলে ভারতবাসী তার ভারতীয়ত্বই হারিয়ে বসে এবং আমরা সেই সমূহ সর্বনাশের দিকেই ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি হয়তো সম্পূর্ণ আমাদের অগোচরে বা অজ্ঞানে। রবীন্দ্রনাথ তাই যথার্থই বলেছেন: 'রামায়ণ-মহাভারতকে, মনে হয়, জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।' মহাভারতকে না জানলে ভারতকেই জানা হয় না।

শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য তাই একটি মহৎ জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন তাঁর এই 'মহাভারতের কথা' প্রকাশ করে এবং সে-জন্য তাঁর এই অভিনব প্রয়াস সকলের অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও অভিনন্দন লাভ করবে, সন্দেহ নেই। এক হিসাবে, তিনি এক অসাধ্য সাধন করেছেন বলা চলে, অসীম অনন্ত অতলান্ত সমুদ্রকে মানস-সরোবরের নির্মল নীল নিবিড় ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে, সীমার সুষম তটের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন। আপন অনুভূতির দ্রাবকে জারিত ক'রে তিনি এই মহাকাব্যের রস সকলের জন্য পরিবেশন করেছেন।

সে-মানসসরোবরে কত কিছুই না প্রতিফলিত হয়েছে—মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মহত্ত্ব-ক্ষুদ্রতা, সত্যনিষ্ঠা-মিথ্যাচার, পরোপকার-প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা-প্রণয়, মান-অভিমান। মহাভারত তাই একান্তভাবেই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন-মহাকাব্য। এত দীর্ঘ যুগের ব্যবধান সত্ত্বেও আজও তার দুর্বার আকর্ষণ সেই কারণেই। মহাভারতের শ্লোকাংশকে শিরোনাম করে সেই কাহিনীর পটভূমিকাতে রচিত, আধুনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এক অভিনব নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ' আজও সমানভাবে মানুষের মনকে টানছে। মহাভারতের এই

কালজয়ী চিরস্থায়িত্বের মূলে আছে এর জীবন-সম্পৃক্ততা। সেই কারণেই কালে কালে বহু জীবন থেকে তুলে আনা কাহিনী এর সঙ্গে যুক্ত বা এতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে এর মহাকলেবর। গ্রন্থকার যথার্থই বলেছেন : 'বেদের সত্যকে এখানে জীবনের নিকষে যাচাই হচ্ছে।' বেদ হল বিশুদ্ধ জ্ঞান কিন্তু সে-জ্ঞান আমাদের হারিয়ে যায়, ঢেকে যায়, কলুষিত হয় যখন আমরা কর্ম-মুখর জীবনের নানা সংঘাতময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। দার্শনিকরা একেই বলেন অবিদ্যা বা অজ্ঞান এবং তার কারণ অনুসন্ধানে ও তার অপনোদনে তাঁদের কতই না প্রাণপণ প্রয়াস। কিন্তু কবি দেখাচ্ছেন জীবনের ছবি, 'কোলাহলের বেগে, (যেখানে) ঘূর্ণি ওঠে জেগে', যেখানে 'বেসুর বাজে নিত্য' সেই জীবনের রণক্ষেত্রে সুরটিকে অকম্পিত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন একজন 'যুধি স্থিরঃ' হয়ে, এই মহাকাব্যের যিনি নায়ক সেই যুধিষ্ঠির। রাজশেখর বসু যুধিষ্ঠিরকেই তাই মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষরূপে চিহ্নিত করেছেন, বুদ্ধদেব বসুও তাতে সম্পূর্ণ সায় দিয়েছেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠির এক মহাবৃক্ষ, যার নানা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে এবং তার এক প্রতিস্পর্ধী মহাবৃক্ষও দাঁড়িয়ে আছে তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে যে হল দুর্যোধন। এ যেন দুই বংশবৃক্ষের family treeর বিচিত্র সংঘাতের কাহিনী। সংঘাতের কারণ হল একটি 'ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ', আর একটি 'মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ' এবং একের মূলে আছেন 'কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ' আর অপরটির মূলে 'রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী'। মন্যু মানে দৈন্য বা ক্রোধ, সেই দৈন্য বা ক্ষুদ্রাশয়তা ও তজ্জনিত ক্রোধের প্রতিমূর্তি হলেন দুর্যোধন, যার মূল বিধৃত তাঁর অন্ধ অমনীষী অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীন পিতা, যিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁর রাষ্ট্রকে দুর্বৃত্ত পুত্রের জন্য, সেই ধৃতরাষ্ট্রে। মহাভারতের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর নামকরণের পিছনেও কি কোন রূপকের আড়াল আছে, যার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলে বেরিয়ে আসে প্রত্যেক মানুষের মৌল স্বরূপ? আমরা সবাই প্রাণপণ স্বার্থপরতায় সংসারকে আঁকড়ে থাকতে চাই, অন্যকে বঞ্চিত করতে চাই, নিজের ভাই হলেও তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাই, বিপন্ন করতে চাই, অন্যের হাজারও সদুপদেশে কর্ণপাত করি না, এরই কি প্রতিমূর্তি ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সন্তানেরা? আবার সংখ্যায় অল্প হলেও এমন মানুষকেও দেখি যে প্রবঞ্চিত হয়েও প্রত্যাঘাত করে না, নানাভাবে নিপীড়িত হয়েও বিচলিত হয় না একটুও, উদারতায়, মহত্ত্বে সব কিছুকেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। এদের প্রতিনিধিই কি যুধিষ্ঠির?

জগতের মূলেই এই দ্বন্দ্ব বা সংঘাত। উপনিষদের ঋষি সৃষ্টির প্রসঙ্গে

তাই গোড়াতেই এই 'দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ, দেবাশ্চ অসুরাশ্চ' বলে একই প্রজাপতির দুই সন্তান দেব ও অসুরের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গেই জানিয়েছেন 'জ্যায়াংসো অসুরাঃ কনীয়াংসো দেবাঃ', জগতে অসুররাই দলে ভারী, দেবতারা চিরদিনই দুর্বল, সংখ্যালঘিষ্ঠ। এখানেও মহাভারতে কি তারই প্রতিচ্ছবি? একদিকে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র, আর অন্য দিকে মাত্র পাঁচটি পাণ্ডব ও তাঁদের অসহায়া বিধবা জননী। এই অসম সংগ্রামে unequal fightএ ভারসাম্য আনলেন যিনি, তিনি চিরদিন সংগ্রামের ঊর্ধ্বে, সংগ্রামে যিনি কোনদিন অংশগ্রহণ করেন না, শুধু সারথ্য করেন অর্জুনের, সেই শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই তাই ধর্মময় মহাবৃক্ষের মূল এবং এই চিরন্তন সংগ্রামে 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ', 'যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ'। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও ভীষ্ম-দ্রোণাদি যদিও অধর্মের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করে গিয়েছেন তবু বারংবার ধর্মের কাছে মাথা নোয়াতে, পাণ্ডবদের প্রাপ্য অংশ স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু বিদুর প্রভৃতি সকলের সদুপদেশের যুক্তিযুক্ততা মেনে নিয়েও এবং নিজের ও পুত্রগণের আসন্ন সমূহ সর্বনাশ জেনেও ধৃতরাষ্ট্র ধর্মের পথে ফিরতে পারেননি। এর কারণ কি? কারণ একটিই: 'কালো হি দুরতিক্রমঃ'। এক অনিবার্য দুর্বার গতি সবাইকে টেনে নিয়ে চলেছে এক অবশ্যম্ভাবী নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে। গ্রন্থকার বড় সুন্দর করে বলেছেন এবং অভ্রান্তভাবে চিনেছেন জীবন-নাট্যের আসল অলক্ষ্য সূত্রধরকে: 'ঘটনার সূত্রগুলি যেন এক অদৃশ্য হস্ত যেন অতি দ্রুত আকর্ষণ ক'রে চলেছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের সকল পুরুষপ্রধান বুঝে নিয়েছেন কি ঘটতে চলেছে; কি তার পরিণাম। তবু নিবারণ করবার সাধ্য কারো নেই। কালের এই অনিবার্য করাল গতির মধ্যেই রয়েছে মহাভারতের ট্র্যাজেডির মূল। মহাভারতের নায়ক কেউ নেই, নায়ক-শক্তি মহাকাল।'

অনেকে মনে করেন এই অনন্য নিয়তিবাদ ভারতবর্ষে দৃঢ় হয়ে বসেছে বলেই তার সমস্ত প্রাণশক্তি অবলুপ্ত, সব উন্নতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু আমরা ভুলে যাই মানুষের নিজের চেষ্টা বা পুরুষকারের সব আয়োজন একদিন স্তব্ধ হয়ে যায়, সব প্রয়াস নিষ্ফল হয়, যখন [illegible] এক অদৃশ্য শক্তির নির্মম নির্দেশ হয়। কাঠের পুতুলের মত আমরা সবাই কালের পুতুল, সে যেমন চায় তেমনি নাচায় আমাদের, কখনো বা কাঁদায় [illegible], হাসি-গান। মানুষ নিজের উদ্ধত অহমিকায় নিয়তিকে এই অদৃশ্য [illegible] শক্তিকে অস্বীকার করে এবং নিজের আয়োজনে [illegible] প্রতিদিন।

নিজে কর্তা না সেজে অদৃশ্য এই শক্তির কাছে নিজের সব চেষ্টা সমর্পণ করতে পারলেই এবং তার দ্বারা চালিত হয়ে যখন যেখানে যে-কর্ম করতে সে বলে বা প্রেরণা দেয়, ধর্মবোধে অটল থেকে পরম উৎসাহে সেই কর্ম সুসম্পন্ন করার মধ্যেই মানুষের পরম শান্তি, চরম সান্ত্বনা। নিয়তিবাদ তাই নিশ্চেষ্টতার উদ্‌গাতা নয়, নিরুদ্বেগ প্রশান্তির অতল সমুদ্রে সমস্ত চেষ্টার তরঙ্গকে, কর্ম-স্রোতকে তলিয়ে দেওয়ার অপরূপ সংকেতবাহী।

এই নিয়তিবাদই আমাদের শিখিয়েছে দুঃখের তাপকে নির্বিচারে মাথায় পেতে নিতে। গ্রন্থকারের ভাষায় তখন আমাদের এই উপলব্ধি জাগে : 'দুঃখ যে পায়নি সে সুখের অধিকারী হতে পারে না।' আমরা ধর্ম আচরণ করি সুখের আশায়, পুণ্য অনুষ্ঠান করি স্বর্গসুখ সম্ভোগের লালসায়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই 'ধর্ম নহে সম্ভোগের হেতু,

নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,

ধর্মেই ধর্মের শেষ।'

ধর্মের পথে চলতে যাঁর সর্বদা ভয় ও সংশয়, সেই ধৃতরাষ্ট্রের আকুল প্রশ্ন সহধর্মিণী গান্ধারীর কাছে : 'কি দিবে তোমারে ধর্ম ?' বড় নির্মম উত্তর গান্ধারীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনুপম আখ্যানে : 'দুঃখ নব নব'।

এইভাবে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' করে 'সংসারের সুখে-দুখে চলিয়া যেও হাসিমুখে', নিয়তিবাদ এই নিশ্চিন্ত নির্লিপ্তির শিক্ষাই মানুষকে দেয়। মহাভারতের মহানাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্যে, পর্বের পর পর্বে এরই উপস্থাপন। কোথাও অস্ত্রের ঝনঝনানি, কোথাও-বা নিস্তব্ধ বনানী, কোথাও-বা রাজসূয় যজ্ঞের চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্য, কোথাও-বা শ্যামল বনাঞ্চলে বা পর্বতশিখরে অনাড়ম্বর পর্ণকুটীর। আজ রাজা কাল ভিখারী। আজ রাজ-দুহিতা, রাজমহিষী কাল দাসী, পদে পদে লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা, এমনি করে সব অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন-পরিক্রমা করিয়েছেন পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের সহধর্মিণীকে এই অলঙ্ঘ্য নিয়তি। জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় না হলে মানুষ নিটোল, নিখাদ, পরিপূর্ণ মানুষ হয় না। কিন্তু সমস্ত সঙ্কটের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী, সহযাত্রী, সনাতন সখা সেই ধর্ম, যে মহাপ্রস্থানের পথেও সারমেয়রূপে পিছু নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের।

কিন্তু সেই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ কি ? তা চিরদিনই যেন আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'। সেই গুহা হল হৃদয়। 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ' অন্তরের সায়ই জানিয়ে দেয় কোন্‌টি আমার ধর্ম। অমলেশবাবুও বড় সুন্দর বলেছেন : "ধর্মের স্থান হৃদয়ে। ধর্মের চলার পথ হৃদয় থেকে হৃদয়ে। তাই ধর্ম হৃদয়বান্ চিরপথিক যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করেই ভ্রমণ করেছেন, আবার ছদ্মবেশ ধরে পায়ে-পায়ে অনুসরণও করেছেন তাঁকে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত।" কিন্তু হৃদয়ের অতলে ডুব দিয়ে তাকে যথাযথ ধরতে পারা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ ধর্ম মূলত ধরবার জিনিস, মানুষের অদ্বিতীয় অবলম্বন, আপন অস্তিত্বের একমাত্র ভিত্তিভূমি। সেই হিসাবে প্রাচীনকালে আপন-আপন বর্ণ ও আশ্রমের স্বরূপ ও স্বভাব অনুযায়ী ধর্মকে নির্দেশ করে দেওয়ার প্রয়াস ঘটেছিল, যাতে মানুষ ও তার সমাজ সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাকে অবলম্বন করে। মহাভারতেও আমরা ধর্মের দশটি শরীর, পাঁচটি প্রবেশ পথ, ছয়টি পাদ, চারটি মূর্তির কথা শুনি, যা অমলেশবাবুও বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। তবুও মনে হয় সব কিছু ছাপিয়ে ধর্মের একটিই অভ্রান্ত অদ্বিতীয় রূপ, তা হল সত্য। 'সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্'। সেইজন্যই প্রাচীন উপনিষদেও দেখি প্রায় এক নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়েছে : 'সত্যং বদ, ধর্মং চর' এবং উদ্‌ঘোষিত হয়েছে 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', 'সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'। এই সত্যের নিকষেই সব কিছুর শেষ যাচাই এবং তার থেকে বিচ্যুত হলে, বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন, 'হোন্ তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তবু দণ্ডভোগ থেকে তাঁর নিস্তার নেই এবং তিনি ঈশ্বর বলেই তাঁকে হতে হবে নিজেই নিজের দণ্ডদাতা।' এই অলঙ্ঘ্য ধর্মকেই উপনিষদে বলা হয়েছে 'সেতু', বিধৃতি', যা সবাইকে জুড়ে ও ধরে রেখেছে, নীতিশাস্ত্রে আবার তাকেই বলা হয়েছে 'দণ্ড', যে 'সুপ্তেষু জাগর্তি', সবাই ঘুমালেও যে অতন্দ্র জাগরূক মাথার উপর সব সময় 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' রূপে। এই ধর্মেরই যেন প্রোজ্জ্বল রূপ ফুটে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য বাণীতে তাঁর 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের এই কয়টি ছত্রে :

> An incognito of the Imperishable
> A spirit that is a flame of God abides,
> A fiery portion of the Wonderful
> Artist of his own beauty and delight
> Immortal in our mortal poverty,

'Incognito' বলেই তার যথার্থ রূপ কোনদিন ধরা যায় না, বোঝা যায় না। এই ধর্মেরই কি মূর্ত রূপ, 'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' শ্রীকৃষ্ণ ? তিনিও সেইজন্য এক প্রহেলিকা, চরিত্র তাঁর বিচিত্র, 'গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ', কখনও ছলী, চক্রী আবার সরল সখা সারথি! বঙ্কিমচন্দ্র তন্ন তন্ন করে কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ ও পরিমাপ করেও উপসংহারে বলেছেন : 'তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ'। অর্জুনের মত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সখাকেও বলতে শুনি : 'ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্', তাঁর প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াকলাপ কিছুই বোঝা যায় না, যেমন বোঝা যায় না ধর্মের সূক্ষ্ম গতি বা কালের অলঙ্ঘ্য বিধান।

গ্রন্থকার অমলেশবাবু 'কোন্ পথে ধর্ম' তার যেমন অন্বেষণ করেছেন, তেমনি আমাদের পরিক্রমা করিয়েছেন পাণ্ডবদের সঙ্গে বড় নিপুণ-পথপ্রদর্শক, guide রূপে। দেখিয়েছেন যেতে-যেতে কত-না ছবি, gallery of portraits—ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অর্জুন, কুন্তী, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম, কৃষ্ণ। এখানেই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিতে মহাভারত 'এক অন্তহীন অরণ্য'। সেই অরণ্যে অনেকে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন কিন্তু অমলেশবাবুর 'প্রস্তাবনা' থেকে আরম্ভ ক'রে 'যুগান্ত ভ্রমান—মহাপ্রস্থান' এই শেষ পরিচ্ছেদের পথ-সংকেতগুলি অবলম্বন করে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশ করলে আমরা তার প্রায় পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই লাভ করতে পারব। এখানে সব রসেরই সমাবেশ ঘটেছে, যদিও মূল অঙ্গী রস হল শান্ত, তেমনি সব পুরুষার্থ অর্থাৎ মানুষের চাহিদা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবগুলিই এখানে বর্ণিত, যদিও মূল পুরুষার্থ হল মোক্ষ বা মুক্তি। আনন্দবর্ধন তাই যথার্থ বলেছেন : 'শান্তো রসো রসান্তরৈর্মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ পুরুষার্থান্তরৈঃ...বিবক্ষাবিষয়ঃ।' এ যেমন প্রাচীনতর আলঙ্কারিকের অভিমত, তেমনি আধুনিকতম আর এক সাহিত্যিকের সদ্য প্রকাশিত মহাভারতের ইংরাজি আলোচনা-গ্রন্থেও প্রায় একই মন্তব্য উদ্গীত :

'This epic is a unique work which tried to discover, through art, what philosophical thinking and related modalities had tried to find out : how man can realise the greatest meaning, the possible maximum value, in his living, in the conditions of incarnate existence'. (Krishna Chaitanya : *The Mahabharata, A Literary Study*, p. 23)

জীবনের যথার্থ তাৎপর্যের উপলব্ধি, তার পরিপূর্ণ মূল্যায়নের জন্য তাই আজও আমাদের বারবার মহাভারতের দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ 'যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ', 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে' অন্যত্র কুত্রাপি। অমলেশবাবু আমাদের সঙ্গে আবার মহাভারতের নাড়ীর যোগ ঘটিয়ে দিলেন, তার হৃৎ-স্পন্দনে ভারতের জনমানসকে স্পন্দিত করলেন, তাই তাঁকে জানাই অজস্র কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভাশংসন।

—শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

কথার কথা

মহাভারত ভারতসভ্যতার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস। ইহার বৈশিষ্ট্য অনন্য-সাধারণ। ইহাতে বৈদিক ধর্ম ও দর্শনের মূল পরিত্যক্ত হয় নাই অথচ কালোপযোগী নানা নূতন আদর্শ যুক্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহাভারত 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' এই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কামনা-বাসনাময় সংসারে অনাসক্তিযোগ, বহুদেববাদকে পরিত্যাগ না করিয়াও একদেববাদ এবং বিশ্বাসের সিংহাসনে যুক্তিবাদকে অভিষিক্ত করিয়াছে এবং মানবচরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার উজ্জ্বল দিককে উদ্ভাসিত করিয়াছে। হাজার হাজার বছর ধরিয়া মহাভারত ভারতের জাতীয় চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিন্তু ইহার আবেদন কেবল জাতীয়তার পরিসরে আবদ্ধ না হইয়া নিখিল বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত।

আমাদের পুরাণশাস্ত্র মহাভারতের পরিশিষ্টস্বরূপ, ধর্মশাস্ত্র মহাভারত দ্বারা অনুপ্রাণিত, সাহিত্য মহাভারত প্রভাবিত এবং সারা জীবনে মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। ভারতীয় জীবনচর্যায়, ক্রিয়াকাণ্ডে, গল্পে, কথায় ইহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অপরিচয়, নানা আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত, গ্রন্থের বিশালতা এবং স্থানে স্থানে নানা কুসংস্কার মহাভারতকে ভারতীয় জনজীবন হইতে কিছুটা দূরে সরাইয়া লইয়াছিল। ভারতীয় নানা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ থাকিলেও তাহা সর্বত্র যথেষ্ট মূলানুগ হয় নাই। পুরাণ পাঠকেরা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনতার সঙ্গে মহাভারত ও পুরাণ শাস্ত্রের যোগ সাধনের সূত্র ছিলেন। তাঁহারাও ক্রমশঃ বিলীয়মান। অপরদিকে ভিন্ন আদর্শে উদ্বোধিত অথবা আদর্শরহিত ভারতীয় ও অভারতীয় সমালোচকবর্গের প্রচারও কম অনিষ্ট করে নাই।

আনন্দের বিষয় এই প্রতিকূল পরিবেশে অনেক মহাত্মা একক বা সামূহিক চেষ্টায় মহাভারতের মূলানুগ ভাষানুবাদ, ভাবপ্রকাশ, মূল গ্রন্থের বিশুদ্ধি বিধান ও তাহার নানা দিক নানা ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গদেশীয় স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সিংহ, বর্ধমান মহারাজ, প্রতাপচন্দ্র রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, মম. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, রাজশেখর বসু, অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু এবং পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রি মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর আগে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাবিশারদেরা নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে মহাভারতের নানা দিকের মূল্যাঙ্কন করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারত ও মহাভারত প্রেমিক পাঠকের মর্মাহত হইবার সঙ্গত কারণ ছিল। ফলে মহাভারতের প্রতি জনতার আগ্রহ বাড়িয়াছে। পূর্ব প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ এবং সমাজে তাহার সমাদর আনন্দ ও আশার কথা।

মহাভারত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণের পৃষ্ঠভূমিতে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা গ্রন্থের আবশ্যকতা ছিল। পরম আনন্দের কথা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমলেশ ভট্টাচার্যের 'মহাভারতের কথা' সেই উদ্দেশ্যে একটি উৎকৃষ্ট পদক্ষেপ। আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহাকে স্বাগত জানাই। দীর্ঘকাল মহাভারতের সশ্রদ্ধ অনুশীলন করিয়া গ্রন্থকার ইহার মর্মকথা উপলব্ধি করিয়াছেন। পূর্বসূরীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর উত্তরাধিকার তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ পাঠককে উদ্দীপিত করে। তাঁহার বাক্‌সংযম ও যুক্তিনিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। মূল মহাভারত ছাড়াও আনুষঙ্গিক হরিবংশাদি পুরাণ গ্রন্থ, আর্ষ রামায়ণ এবং বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে মহাভারতীয় বিষয়গুলির তুলনামূলক আলোচনা প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করিয়াছে। অথচ আলোচনা ক্লিষ্ট বা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। আজকাল ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা সাধারণতঃ সন্দেহ-কণ্টকিত। প্রক্ষিপ্তবাদ, পরানুকরণ প্রভৃতির কথা প্রায়শই উঠে এবং উহা মূল গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যকে ছাপাইয়া উঠিয়া বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে। বর্তমান গ্রন্থখানি সেদিক দিয়া সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক। নানা চরিত্র বিশ্লেষণ অনিবার্যক্রমে এখানে আসিয়াছে। কিন্তু নীচতা বা হীনতাকে ছোট করিয়া সর্বত্র উচিত মহত্ত্বের গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে। মানবিক ন্যূনতা সহানুভূতির স্পর্শে স্নিগ্ধতা লাভ করিয়াছে। মুখ্য চরিত্র চিত্রণে অনেক ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্বের বা নূতন ব্যাখ্যার অবতারণা কৌতূহল উৎপাদন করে। গ্রন্থের আকার আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে গিয়া গ্রন্থকার ইহার সংক্ষেপবিধান আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এখানে অল্প কয়েকটি নিপুণ বাক্যে বিধৃত। বিদুরনীতি বিশেষ স্থান পায় নাই। তবে যে সমদৃষ্টি ও ধর্মব্যবহার বিদুরের জীবন ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির মূলকথা, তাহা এখানে আদর্শ হিসাবে বিধৃত। যক্ষপ্রশ্নের ব্যাখ্যাটি মনোরম এবং অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে মহাভারতের মৌলিক সম্বন্ধের প্রতি গ্রন্থকার পাঠকের দৃষ্টি সঙ্গতভাবেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। 'উদ্যোগপর্ব মহাভারতের সার' এই প্রাচীন বচনটি অস্বীকার না করিয়াও বনপর্বকে পাণ্ডবদের জীবন ও যুদ্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অধিক মহত্ত্ব দিয়াছেন। চতুর্বর্গ তথা মহাভারতীয় ধর্মের নাতিদীর্ঘ অথচ তলস্পর্শী বিবরণ পাঠককে আকৃষ্ট করে।

স্বয়ং গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিবৃদ্ধি লাভ করিয়া, উহার নিরুদ্ধ গতিকে বেগযুক্ত করিয়া এবং সর্বতোভাবে উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শেষ দিকে রাজতন্ত্রের আনুকূল্য কেন করিলেন, ইহার কারণটি বর্তমান গ্রন্থে ইঙ্গিতমাত্রে দেখান হইয়াছে। ভারতযুদ্ধে সারা দেশের রাজন্যবর্গের যোগ দান যে কেবল ধর্মযুদ্ধে মরণের ফলে মোক্ষলাভমাত্র নহে, পুরুষানুক্রমিক দ্বন্দ্ব ও জটিল সামাজিক পরিস্থিতিও যে ইহাতে বিশেষ ইন্ধন যোগাইয়াছে, একথা গ্রন্থকার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

মহাভারত এক সংহিতা বা সঙ্কলন গ্রন্থ। ইহার কোন মৌলিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত আছে কিনা এ সম্পর্কে আধুনিক বিশেষজ্ঞেরা সন্দিগ্ধ। বর্তমান গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি অর্থবহ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তগুলিকে এই মহাগ্রন্থের মূল দর্শন বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাভারত এক যুগসন্ধির ইতিহাস। ইহাতে ভারতসভ্যতার মূল বক্তব্য অবিকৃত থাকিলেও অনেক জীর্ণপত্র ইহা হইতে ঝরিয়া গিয়াছে আবার অনেক নূতন পত্রের উদ্গমও হইয়াছে। দার্শনিক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ, গ্রহণ ও বর্জনের চিত্র সংক্ষিপ্তরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে মহাভারতে উপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ পূর্বযুগের জাতিব্রাহ্মণ্যবাদের স্থানে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার সংক্ষিপ্ত গুণব্রাহ্মণ্যবাদ আজগরপর্বে তথা যক্ষপ্রশ্ন প্রকরণে বিস্তারলাভ করিয়াছে। নিষ্কাম কর্মবাদ মহাভারতের নানা অংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রে গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের উদাহরণ প্রত্যক্ষ হয়। এই ইঙ্গিত অনুসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিলে বহুব্যাখ্যাবিভ্রান্ত-পাঠক উহার মূল বক্তব্যের সন্ধান পাইবেন। বহুদর্শী মহাভারত ব্যাখ্যাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ গীতায়াম্। প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মহাভারত হইতে গীতা শাস্ত্রকে উৎপাটিত করিয়া দিলেও বাকী মহাভারত হইতেই উহার পুনঃ সঙ্কলন করা সম্ভবপর। আশা করি, বিষয়টি সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

মহাভারতের চরিত্র চিত্রশালায় বিধৃত নানা চরিত্রের অনালোচিতপূর্ব অনেক দিগন্ত বর্তমান গ্রন্থে পরিস্ফুট। মহাত্মা বিদুরের সাংসারিকী প্রজ্ঞা

তাঁহার আসিধার ব্রতোদ্যাপনের অবলম্বন। কুন্তীর ধৈর্য তাঁহাকে পিতা ও মাতার কর্তব্য পালনে অবিচলিত রাখিয়াছে, দুর্গত পাণ্ডবদের কর্মে উৎসাহিত করিয়াছে, আবার সুদিন ফিরিয়া আসিলে বানপ্রস্থেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই ধৈর্যই তাঁহার সামান্য বালচাপল্যের জীবনব্যাপী সুকঠোর প্রায়শ্চিত্ত স্বীকারের একক অবলম্বন। তপস্বিনী গান্ধারীর ধর্মশীলতা ধর্মবিচ্যুত স্বামী ও পুত্রকে কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছে। রাজগৃহের ঐশ্বর্যে তিনি বীতস্পৃহ রহিয়াছেন। আবার স্ত্রীবিলাপপর্বে স্বপক্ষ বিপক্ষের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা এবং কঠোর তপস্যায় তাঁহার ক্রোধজয়ের ছবি সহানুভূতি আকর্ষণ করে। যুধিষ্ঠির চরিত্র গ্রন্থকারের বিশেষ মনোযোগের বস্তু। তাঁহার প্রগাঢ় প্রজ্ঞা এবং নিরবচ্ছিন্ন আত্মোন্নতির প্রচেষ্টার চিত্রটি মনোরম। কুরুকুলদ্রোহী পাঞ্চাল ও মৎস্য কুলের সঙ্গে তাঁহার অতর্কিত সম্বন্ধ স্থাপন কুলক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ভগ্নোরু দুর্যোধনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ তাঁহার মত সদাশয় ব্যক্তির পক্ষে শোভন হয় নাই। মানবিক দৃষ্টিতে উপযুক্ত রক্ষিনিয়োগ করিলে সৌপ্তিকের ভয়ানক ঘটনা নাও ঘটিতে পারিত। এরূপ অনবধানতা যুধিষ্ঠিরের জীবনে অন্যত্র কদাচিৎ ঘটিয়াছে। আপদ্ধর্মের বিধান অনুসারে তিনি মহাযুদ্ধে যে কয়টি ধর্মব্যতিক্রম অনুমোদন করিয়াছিলেন, চিরকাল অনুশোচনা এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ধর্মের দৃষ্টিতে তিনি সব কয়টি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ। দুর্যোধন সংযমশিক্ষার সুযোগ পান নাই। পিতা অন্ধ, মাতা বদ্ধনেত্রা। গুরু স্বার্থপরায়ণ। বয়ঃপ্রাপ্তির পর পরাজিত ধন এবং পরশক্তির দম্ভে তিনি অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু তাঁহার শাসননৈপুণ্য দুর্জয় সাহস প্রভৃতি ক্ষত্রগুণ অসাধারণ। বীজের গুণ তাঁহার কম ছিল, পরিবেশের দোষ ছিল বেশি। তাই উপবনের মন্দারবৃক্ষ না হইয়া তিনি অরণ্যের কণ্টকবৃক্ষ হইয়া রহিলেন। তদুপযুক্ত অনমনীয়তা ও দৃঢ়তাই তাঁহার শেষ পরিচয় রহিয়া গেল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মেরুদণ্ডহীন, পরাশ্রয়ী, অন্ধ, ক্ষত্রিয়সন্তান। একদিকে দেবচরিত্র বিদুর, আর অপরদিকে স্বার্থমগ্ন ক্ষুদ্রাত্মা দুর্যোধন তাঁহাকে হাতছানি দিয়াছেন। বিদুরের নীতিপূর্ণ উপদেশ ও নিঃস্বার্থ সেবাকে উপেক্ষা করিয়া কণ্টকাকীর্ণ রুক্ষপথে পুত্রের অনুসরণ করা তিনি পছন্দ করিলেন, অথচ ইহার কুফল তাহার জানা ছিল না এমন নহে। মহাযুদ্ধান্তে জীবনের শেষভাগে তিনি যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে কঠোর তপস্যার দ্বারা আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া বানপ্রস্থের পূর্ণতর জীবনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। এই শোকার্ত বৃদ্ধের বিলম্বিত, মানবিক গুণের উন্মেষ সকলেরই

সহানুভূতি উৎপন্ন করে। ভীষ্মদেব কুলমঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কুলের স্বার্থে, কুলশ্রেষ্ঠের আদেশে তিনি নির্দ্বিধায় অন্যায় করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। পাণ্ডবেরা তাঁহার প্রাণপ্রিয়, ধর্মপথের পথিক। কিন্তু তাঁহারা কুলমর্যাদায় বিশ্বাসী নহেন। তাই ভীষ্মদেব অন্যায় পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণবিসর্জন দেন, কিন্তু সত্যাশ্রয়ী পাণ্ডবের জয় কামনা করিলেও কুরুবিরোধী পাঞ্চাল ও মৎস্যপ্রধান পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন নাই। ভারতবর্ষ তাঁহার অকৃপণ ত্যাগ ও মহত্ত্বের মর্যাদা দিয়াছে এবং দিয়া চলিয়াছে। এই কর্তব্য-কঠোর মহাযোদ্ধা অন্যায়কারী গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেও দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংস্পর্শে তাঁহার মনের নিঃসীম মাধুর্যের সন্ধান মিলে। ভাগ্যবিড়ম্বিত কিন্তু হৃদয়বান্ নানা গুণে মহীয়ান্ মহাবীর কর্ণ সমাজে কোন সদ্বিবেচনাই পান নাই। সারা ভারতবর্ষে তাঁহার আহত পৌরুষের মূল্য দিয়াছেন কেবল পাপী দুর্যোধন। তাই কর্ণ তাঁহার পাপের সঙ্গী। ক্ষত্রিয়োচিত সামর্থ্য তিনি অর্জন করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়োচিত ত্যাগেও তিনি উদ্বুদ্ধ। কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার বা মর্যাদা না পাইয়া তাঁহার আত্মবলিদান করিতে হইল। এই বিশাল সম্ভাবনাময় জীবনের করুণ পরিণতিটি মর্মান্তিক।

প্রায় সবকয়টি চরিত্রেরই ক্রমোত্তরণের পর্যায়গুলি গ্রন্থকার সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারতের পাঠকের কাছে চতুর্বর্গ, বিশেষত ধর্ম বিচার একটি দুর্বোধ্য বিষয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উৎকর্ষাপকর্ষ এখানে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। বর্ণধর্ম, আশ্রম ধর্ম, দেশধর্ম, কুলধর্ম, আপদ্ধর্ম, প্রভৃতির পারস্পরিক সংঘর্ষে প্রকৃত মানবধর্মের স্বরূপটি বুঝিয়া উঠাও সাধারণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। গ্রন্থকার বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে উহার বিশ্লেষণ, স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং পর্যায় নির্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারতের অতিবিস্তৃতির মধ্যে নানা উপাখ্যান ও তত্ত্বকথার প্রাচুর্যে ইহার আখ্যানভাগ আচ্ছন্ন। স্বল্প পরিসরে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির সঙ্গে উহার একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বিশেষ অপেক্ষিত ছিল। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার তাহা পূরণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশাকরি, তিনি তাঁহার শাস্ত্রচর্চা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন।

—শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

সূচীপত্র

[এক]

প্রস্তাবনা

নৈমিষারণ্যের সন্ধ্যা। নিস্তব্ধ বনস্থলী। শান্তরসাস্পদ ঋষি শৌনকের আশ্রম। পুষ্পিত লতাবিতানে তরুপল্লবে জ্যোৎস্নার কিরণলেখা। কানন-সরোবরের বিকচপদ্মদলগুলি এখন মুদ্রিত আঁখি তাপসকুমারের মত ধ্যান-নিলীন। পুষ্পরেণুমাখা সুখস্পর্শ সুশীতল সুদাক্ষিণ বাতাস বয়ে চলেছে।

এমন সময় অনেকদিন পরে অনেক দেশ ঘুরে আশ্রমে এলেন উগ্রশ্রবা ঋষি সৌতি। পরস্পর তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করে আসন গ্রহণ করলেন তিনি। সমবেত ঋষিগণ তাঁকে ঘিরে বসেছেন। অদূরে তাপসকুমারগণ কৌতূহলী আগ্রহে তাঁকে দেখছে। কর্পূর-ধূপের গন্ধে আমোদিত অঙ্গন। ঘৃতপ্রদীপশিখা জ্বলছে নিষ্কম্প ঋষিদৃষ্টির মত। ছায়া কাঁপছে আলিম্পনচর্চিত মাটির দেওয়ালে। এই তো উপযুক্ত পরিবেশ! সৌতি এবার তাঁর আশ্চর্য গল্প বলবেন। বেদমন্ত্র পাঠ নয়, উপনিষদ প্রবচন নয়, তিনি বলবেন কাহিনী এক, জীবনের গল্প। উৎসুক ঋষিদের মত আমরাও নড়ে-চড়ে বসি। মানুষের অন্তরে রয়েছে চিরন্তন এক গল্পের পিপাসা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বুঝি এক মুগ্ধবোধ শিশু প্রায়ান্ধকার প্রদীপের আলোয় ছায়া-কাঁপা সন্ধ্যার স্নেহচ্ছায়ায় বিস্মিত অপলক দৃষ্টি নিয়ে কেবল বলে, তারপর? তারপর?

সৌতি তাঁর উপাখ্যান বলছেন। কিন্তু একি? শুরু হতে-না-হতেই তো গল্প শেষ হয়ে গেল মাত্র দেড়শ' শ্লোকে। এই না বললেন, বেদব্যাস এটি রচনা করেছেন নরলোকের জন্য এক লক্ষ শ্লোকে। শুরু হতে-না-হতেই শেষ? এর পরে তাহলে কি? এ যেন হোমশিখার একটি চকিত আবর্ত। সেই ক্ষণিক আবর্তনের মধ্যে সমগ্র যজ্ঞের তেজ যেন পুঞ্জীভূত। এমন অসাধারণ বিপুল যে মহাভারত, গভীরতায় ও বিস্তারে যা সপ্ত-সিন্ধু ছাড়িয়ে যায়, তা ধরে দেওয়া হয়েছে চুম্বকে এই কয়টি শ্লোকের মধ্যে। অথচ কেবল সূত্রাকারেও নয়। মহাভারতের সঙ্কুল আবর্ত-সংঘাতের সবখানি তীব্রতা সেখানে উপস্থিত। আমরা বলে থাকি, মহাভারত বড় পৃথুলবদ্ধ—অতি-বিস্তারবাহুল্য অতিকথনে তা ভারাক্রান্ত। কিন্তু তাই কি? সচেতন পাঠক তো বারবার চমকে উঠবেন, যখন দেখবেন বর্ণনা যেন বায়ুবেগে আকাশ পান

করে চলেছে, পার হয়ে চলেছে জগতের পর জগৎ। সঙ্কেতে দ্যোতনায় ব্যঞ্জনায় এক একটি শ্লোকের মধ্যে মেঘচ্ছুরিত সূর্যালোকের মত ঝল্‌কে উঠছে সমস্ত আকাশ। কিন্তু সেকথা এখন থাক, সে আলোচনায় আমরা আসব প্রসঙ্গক্রমে।

মহাভারতের মধ্যে যেন একটা হোমকুণ্ড জ্বলছে। সেখানে রয়েছে শক্তির তেজের অনন্ত অগ্নিময় আবর্ত। প্রতিটি চরিত্র সেই অগ্নি-আবর্তে চালিত। আর বেদব্যাসের সমগ্র হৃদয়খানি আকাশ হয়ে তাকে ধারণ করে রয়েছে। এর সবকিছুই বিপুল, বৃহৎ, বিশাল, প্রসারিত, অনন্ত। সেখানে কোন কিছুই ক্ষুদ্র নেই। এমনকি যা-কিছু নীচ, হেয়, তুচ্ছ, কপট, কুটিল, তাও সেই মহাসাগর বক্ষে ভাসমান। তাদের মধ্যেও যেন রয়েছে এক বৈপুল্যের স্পর্শ। কূট শকুনি, ঈর্ষী দুর্যোধন, দুর্মতি কর্ণ, এদের ভিতরে বা চরিত্রের অন্তরালে রয়েছে কি অপরূপ মহত্ত্ব বীরত্ব তেজ ত্যাগবীর্য। বারেবারেই তা আভাস দিয়ে যায়। সকল নীচতা সংকীর্ণতা যেখানে সেখানেই দেখি, কিংবা তারই তলায় তারই ভিতরে রয়েছে কি বিরাট ঔদার্য, ব্যাপ্তি, বীরত্ব, মহত্ত্ব। প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে বড় মাপের।

দ্বাপর ও কলির সন্ধিযুগে অনেক নিষ্ঠুর ঘটনার সাক্ষী হয়ে, ঐশ্বর্যের বিপুলতা আর দারিদ্র্যের নিঃস্বতা নিয়ে, অরণ্য-কান্তর পেরিয়ে, অনেক দুঃস্বপ্ন তমিস্রা আতঙ্ক ষড়যন্ত্র কাটিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের এক করাল মুহূর্তে আমরা এসে দাঁড়াই। আকাশে সাতটি গ্রহের সমাবেশ। চন্দ্র তখন মঘানক্ষত্রে। এক অশুভ দুর্লক্ষণ মাথার উপরে কালো ছায়া বিস্তার করেছে। চতুর্দিকে কাকের চিৎকার। উল্কা বৃষ্টি। বিনামেঘে আকাশ থেকে বজ্রপাত হচ্ছে। উদয়কালে সূর্যকে যেন কে দ্বিখণ্ডিত করেছে। আকাশ থেকে কারা যেন আলো চুরি করে নিয়ে গেছে। দিবাভাগে রাত্রির অন্ধকার। রণদুর্মদ দুই পক্ষ মুখোমুখি—একটা চাপা আতঙ্ক ত্রাস নিয়ে থম্‌থম্ করছে। এই বুঝি বেজে ওঠে তুরী ভেরী দুন্দুভি, অশ্বক্ষুরে রথচক্রে অস্ত্রের ঝঞ্চনায় একটা প্রলয় যেন এসে পড়ল বলে। কিন্তু না, স্তব্ধ হয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। সেই রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের মধ্যেই, ঝড় ওঠার আগের নিস্তব্ধ দিগন্তের মত রণক্ষেত্র থমকে রইল।

আমরা এসে দাঁড়ালাম কপীধ্বজ রথের সামনে। দুটি মাত্র চরিত্রের কয়েকটি জরুরী সংলাপ আমাদের শুনতে হবে। ঘূর্ণমান চক্রের নাভিকেন্দ্র যেমন স্থির তেমনি আমরা এক স্থির অটল মুহূর্তে এসে দাঁড়ালাম। আমরা যেন একটা আতস কাচের তলায় এসে দাঁড়িয়েছি—একদিকে আকাশের

সূর্যালোক আর তার নিয়ে তারই সংহত তেজ। কয়েকটি কথা যেন জ্বলে উঠল তাতে। যখন বীরের হস্ত হতে খসে পড়ল গাণ্ডীব। হতাশায় বলে উঠল, "এতান্ হন্তুম ন ইচ্ছামি।" তা শুনে যেন গর্জে উঠল কম্বুকণ্ঠ। বহুযুগের এপার থেকে আজও আমাদের হৃদয়ে জাগে তার প্রতিধ্বনি—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" আসন্ন যুদ্ধের আগে এ যেন আর এক যুদ্ধ। আর এক প্রস্তুতি।

তারপর? কি ঘটবে আমরা তো জানি। বেদব্যাস তো কিছু গোপন রাখেননি। আমাদের সমস্ত শিরা-টান-করা কৌতূহলকে তো তিনি দুঃসহ অনিশ্চয়তায় দুলিয়ে রাখেননি। এই নাটকীয় সংগ্রামের আগেই এক গর্ভাঙ্কে স্বয়ং ব্যাস মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে। একজন অন্ধ, আর একজন ত্রিকালদর্শী। পিতা বলছেন তাঁর হতবুদ্ধি পুত্রকে, তারই সর্বনাশের কথা, কিন্তু কণ্ঠ তাঁর নিস্পৃহ নিরাসক্ত অথচ করুণাসিক্ত। এই অবস্থা কি নাটকীয়তার চরম নয়? ব্যাস বলছেন, "পুত্র, তোমার সকল সন্তানের আর সমবেত পার্থিবগণের মৃত্যু আসন্ন। তুমি দুঃখ ক'রো না। কেবল কালের গতি লক্ষ্য কর।" (ভীষ্মপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)

তারপর কালের চাকা ঘুরল অনিবার্য গতিতে। যেমন ঘোরে সুদর্শন চক্র। ইতিহাসের এক নৃশংস ও নিষ্ঠুরতম অধ্যায় চলল আঠার দিন ধরে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, ভাই হানল ভাইয়ের বুকে অস্ত্র। পুত্র হানল পিতামহকে। শিষ্য বধ করল গুরুকে। তাও অস্ত্র দিয়ে আঘাত করবার আগে তার চেয়েও ভয়াবহ ও অকল্পনীয় এক উপায়ে। আজন্ম সত্যাশ্রয়ী ধর্মরাজ যিনি, তিনিই তাঁর নিষ্পাপ অঙ্গে মেখে নিলেন মিথ্যার কালিমা। উচ্চারণ করলেন সেই সাংঘাতিক মিথ্যা সত্যের আভাস দিয়ে, তাই তা হল আরো মর্মঘাতী। যাঁর রথ চলত সত্যবলে মাটির উপর দিয়ে শূন্যে—সহসা তা নেমে এল মাটির বুকে। জানি, যুধিষ্ঠিরের অন্তর হাহাকার করে উঠেছিল। আমাদের অন্তরও কি করে না?

ঘটনার গতি আবর্তিত হতে লাগল। আমাদের বিস্মিত ব্যথিত অন্তরে জেগে ওঠে সেই কথা যা আমরা প্রথমেই শুনেছি—"অনাদিনিধনং লোকে চক্রং সংপরিবর্ততে" (আদিপর্ব)—এই সংসার চক্র জগতে চিরকালই এইভাবে ঘুরে আসছে। গল্প শুনতে বসেছিলাম আমরা। বুঝতেই পারিনি কখন যেন এর মধ্যে জড়িয়ে গেছি। নিজেদের দিকে তাকাতে সাহস হয় না আর। হয়তে দেখে আঁতকে উঠব, এই আঠার দিনের সমস্ত অস্ত্রের আঘাত লেগেছে আমাদেরই মর্মে, আমাদেরই অঙ্গে। দুই হাতে আমাদের রক্ত।

হেঁটে চলেছি রক্তকর্দম দলিত করে। সমস্ত জীবন যেন রক্তমাখা হয়ে গেছে—ভোগান রুধিরপ্রদিগ্ধান।

তারপরে অনেক শোক, অনেক শান্তিবাক্য, অনেক প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞধূমে আমরা পবিত্র হতে চেয়েছি। কিন্তু থাকল না কিছুই। সন্ধ্যার এক ধূসর বৈরাগ্য যেন ছেয়ে এসেছে অন্তরের আকাশ। আমরা জগতের এক বেদনাদায়ক রহস্যের মধ্যে এসে পড়েছি, দম বন্ধ হয়ে আসে। একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দ্বারকা—শূন্য হয়ে গেল যদুবংশ। কিন্তু আমরা এখন সব শুনবার জন্যই প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি কেবল পাণ্ডবদেরই আশ্রয় নয়,—সমস্ত মহাভারতের মূল আশ্রয়—"মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ" (আদিপর্ব) —তিনিও আর নেই। আমরা যেন সত্যিই এবার আশ্রয়হীন, ছিন্নমূল।

ঘটনা চলেছে দ্রুত গতিতে। পরবর্তী পর্বগুলি সব সংক্ষিপ্ত। অল্প পরিসরে ঘটনার এতখানি ঠাসবুনানী দেখে বিস্মিত হতে হয় বেদব্যাসের রচনা চাতুর্যে। এক সর্বকুশলী নাট্যকারের চূড়ান্ত কৃতি আমাদের আবিষ্ট করে দেয়। বেশি কথা নেই, বিস্তার নেই। তাড়াতাড়ি সব চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথায় ? তাও কেউ জানে না তখন। যুদ্ধের পরে কৃষ্ণ বলেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাঙ্কেতিক ভাষায়, "কাজ শেষ হয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চল, এবার আমরা গৃহে ফিরে যাই।" সবাই ভেবেছিল, বোধহয় কৃষ্ণ শিবিরে ফিরতে বলছেন। কিন্তু কৃষ্ণের উদাস কণ্ঠ নিঃসীম দৃষ্টি দেখে মনে হয় তিনি যেন অন্য কিছু গভীর কিছু বলছেন। যুদ্ধ জয় হওয়ার মুহূর্তেই সেই বিহ্বল সন্ধ্যায় কৃষ্ণ এমন হয়ে গেলেন কেন ? তখন পাণ্ডবেরা বুঝতে পারেননি।

কিন্তু এখন যেন আর কারো মনে কোন প্রশ্ন নেই। কথা নেই। এক অমোঘ ভবিতব্যকে সবাই মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন সর্বাগ্রে যুধিষ্ঠির, তাঁর চার ভাই, এমনকি অগ্নিসম্ভবা তেজস্বী দ্রৌপদীও। বিনা বাক্যে নিঃশব্দে সবাই যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করে চলেছেন। একবার জানতেও চাইলেন না তাঁরা, কোথায় চলেছেন ? সব সংশয় বাক্‌বিতণ্ডা তর্কযুক্তির যেন অবসান হয়ে গেছে।

পরিক্রমা করলেন সমগ্র ভারত। শেষে উত্তরাভিমুখী হয়ে চললেন মহাপ্রস্থানের পথে। পথে কেউ এল না তাঁদের সংবর্ধনা করতে। সসাগরা ভারতের অধিশ্বর ছিলেন তাঁরা ; কিন্তু এল না কোন প্রজা বা রাজ-অমাত্য পুষ্পমাল্য নিয়ে অভ্যর্থনা করতে। তাঁদের মহাযাত্রা থমকে দাঁড়াল না কোন বিজয়-তোরণের সামনে। এমন বৈরাগ্য-ধূসর নিঃসঙ্গ পদযাত্রা—নীরব

রহস্যময়—সকল বেদনা-ছাপানো সকল শোক পার-হওয়া সকল ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ-করা এক দুর্গম পথের অভিযাত্রী।

পথে একে একে স্খলিত হয়ে পড়লেন দ্রৌপদী ও চার ভাই। যুধিষ্ঠির একা নিঃসঙ্গ। ঠিক একা নয়, সঙ্গে একটি প্রাণী, পথের কুকুর, কিসের টানে কিসের আকর্ষণে সে তাদের অনুসরণ করে চলেছে···। যুধিষ্ঠির মৌন, শান্ত তাঁর দৃষ্টি। জলমগ্ন দ্বারকাপুরী দেখেও তাঁর মুখে কোন আক্ষেপ বা বিলাপ আমরা শুনিনি। তেমনি শুনলাম না তাঁর প্রাণপ্রতিম ভার্যার, আত্মতুল্য ভাইদের পরপর মৃত্যুতে। এ কোন্ যুধিষ্ঠির? এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ, এমন শান্ত, এমন যোগস্থ পুরুষ! এঁকে তো আগে আমরা দেখেছি প্রতি-পদে ভাইদের মুখাপেক্ষী, কৃষ্ণের, বিদুরের উপদেশ পরামর্শে নির্ভরশীল, সংশয়পীড়িত অন্তর্দাহে জর্জরিত মৃদু লজ্জাশীল যুধিষ্ঠির।

কিন্তু এখন? অদূরে ঐ সুমেরু শিখর, সপ্তর্ষিদের বাসভূমি, বেদব্যাসের তপস্যার আসন, গঙ্গা যেখানে রুদ্রের বীর্য নিক্ষেপ করেছিলেন—সেই স্বর্গের দুয়ার—তারই উপকণ্ঠে ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ মৌন যুধিষ্ঠির দাঁড়িয়ে। পর্বতশিখরে হু-হু হাওয়ায় তাঁর ছিন্ন মলিন কাষায়বসনপ্রান্ত কাঁপছে। তিনি চেয়ে আছেন নিম্নভূমির দিকে—ভারতবর্ষের দিকে। পশ্চাতে সেই পথের বন্ধু—নিরীহ কুকুরটি। কি ভাবছেন তিনি? ঝরাপাতার নিঃস্বনের মত আমাদের দীর্ঘশ্বাস তার কোন উত্তর পায় না।

কেবল আমাদের মনে বিদ্যুৎ-চমকের মত বারবার নানা বিচিত্র ছবি ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। মনে পড়ে ইন্দ্রপ্রস্থের ক্ষণিক সুখস্মৃতি। ময়দানবের স্ফটিক-নির্মিত হর্মাবলী। বন্দীদের স্তুতিপূর্ণ মঙ্গলসঙ্গীতের সুর বুঝি এখনও শ্রবণে ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসে। মনে পড়ে সেই সর্বনাশা সভাকক্ষ? যেমন জুয়াড়ির হাতে পাশা, তেমনি বরুণের হাতে জগৎ—"অক্ষানিব শ্বঘ্নী বিচিনোতি কালে" (অথর্ববেদ)—সেই সর্বনাশা পাশা যা জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসে আছে, স্পর্শ করতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে। দিব্যা অঙ্গারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি॥ (ঋগ্বেদ—১০, ৩৪, ৯)। শকুনির সেই বারংবার অট্টহাসি আর উল্লাস, "জিতমিত্যেব" "জিতমিত্যেব"। এখনও তার আতঙ্ক আমাদের বুকের রক্ত শীতল করে দেয়। চোখের উপর ভেসে ওঠে একবস্ত্রা রজস্বলা পাঞ্চালী বিস্রস্তকুন্তলা চলেছেন বনের পথে রোদন করতে করতে। তাঁর উপরে নির্লজ্জ সেই অপমান—"স্রবনেত্রজলাবিলা শোণিতাক্তৈকবসনা মুক্তকেশী বিনির্যযৌ" (সভাপর্ব)—আর সেই সমস্ত লাঞ্ছনা ধিক্কার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে দগ্ধ করছে।

তিনি সেই সব তরল বিষের মত পান করছেন—"বিষস্যেব রসং হি পীত্বা" (বনপর্ব, ৩৫ অধ্যায়)

কিন্তু এখন তাঁর চোখে কি একবিন্দু শোকাশ্রু আমরা দেখব না, যখন তিনি মনে করবেন তাঁর দুখিনী মাতা কুন্তী অরণ্যের মধ্যে দাবানলে দগ্ধ হচ্ছেন ? বোধ হয় না। কেননা, আমাদের চোখেও তো কোন জলের রেখা নেই। শুধু উত্তপ্ত নিশ্বাস নিয়ে আমরা বাকরুদ্ধ।

কি নাম দেব একে ? মহাকাব্য ? স্বয়ং বেদব্যাস বলেছেন এটা কাব্য। ব্রহ্মা তাঁর সাক্ষাৎ করে এই আখ্যা সমর্থন করলেন। পরে আবার একে বলা হল "পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র" যা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে "শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না"। কিন্তু কোন অভিধা দিয়েই মহাভারতকে ধরা যায় না। আমাদের মুখের সকল সংজ্ঞা সকল বর্ণনা যখন শেষ হয় তখন দেখি এই আশ্চর্য রচনাটি তার সমস্ত সীমাগণ্ডি অতিক্রম করে গেছে। কোন কিছু দিয়েই যথার্থ ধরা যাচ্ছে না। মহাকাব্য বা Epic যে অর্থে আমরা বুঝি মহাভারতকে ঠিক তাই বলা যায় না। তাহলে মহাকাব্য কথাটার অর্থ এতদূর বিস্তৃত করে ধরতে হয় যে, তা আর সেরূপ থাকে না। যদিও এটা কাব্য, উৎকৃষ্ট কাব্য, একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তি নিয়েই এর মধ্যে আছে; তবে তাই সব নয়। আবার কাব্যও নয়,—বহু ক্ষেত্রে সাদামাটা পদাদিক গদ্য চলেছে দ্রুতপদে সাংবাদিকের বর্ণনার মত। রসাত্মক বাক্য রচনার তখন চেষ্টা মাত্র নেই। আদিপর্বের তৃতীয় অধ্যায় তো নিতান্ত গদ্য, শুধু কতকগুলি তথ্যজ্ঞাপন করা ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য যেন নেই। শান্তিপর্বেও এই রীতি চোখে পড়ে অনেক জায়গায়। আলঙ্কারিকরা মহাভারতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বেশ মুশকিলেই পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে অর্থে 'রামায়ণ'কে মহাকাব্য বলা যায় সেই অর্থে মহাভারত ঠিক মহাকাব্য নয়। বলা যেতে পারে একটা "galaxy"।

একে বলা হয়েছে "পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র"। তাহলে পুরাণ কি ? আমাদের প্রাচীন ঋষিদের এক আশ্চর্য দৃষ্টি দিয়ে দেখা এই "পুরাণ" শব্দটি। ইংরাজীতে যার একটা অক্ষম অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অনুবাদ করি আমরা "myth" বলে। যার মধ্যে আখ্যান এবং প্রতীক এক হয়ে মিশে যুগের পর যুগ নতুন নতুন ভাবের আভা বিকিরণ করে। যেমন, রাম-লক্ষ্মণ আমাদের নিত্যকার সুখ-দুঃখ সংসারের সকল কর্মের পশ্চাতে এসে দাঁড়ান। যেমন তাঁরা legend তেমনি আবার symbol। বস্তুত 'পুরাণ' শব্দটি বড় শক্তিমান্। যে অর্থে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বলেছেন "পুরাণ পুরুষ",—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো" (গীতা ২/২০) পল-কাটা হীরার মত যত ঘুরানো যায় ততই তার

দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের মত অনন্ত তার আবর্ত, অনন্ত বিচ্ছুরিত তার শক্তি তেজ ছটা। মহাভারতের ঘটনাগুলিও কেবল একবার ঘটছে না। বারেবারে পর্বে-পর্বে এসে তা আমাদের স্পর্শ করে আঘাত করে জাগিয়ে দিয়ে যায় নূতন অর্থে নূতন ব্যাপ্তি নিয়ে—"পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী"। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন, "ভাবগত ইতিহাস"…"জাতীয় সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতি"…"যেখানে তথ্য খুঁজিলে হয়তো ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে" ('রবীন্দ্ররচনাবলী', পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩ খণ্ড, ১৫৯ পৃ.)। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "an epic history of nations"… "memory of the race" (*Essays on the Gita*, 1937, pp. 16, 22)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মহাভারত "ইতিহাসের উপর নির্মিত কাব্য।" ('বঙ্কিম রচনাবলী', পৃ. ৬৫৪, মৌসুমী, ১৩৮৯) মহাভারতের মধ্যে আমরা একটা চমৎকার কবিত্বময় আখ্যা পাই, বলা হয়েছে "শ্রুতিজ্যোৎস্না"—বৈদিক জ্ঞান-সিদ্ধির সত্যানুভবের এক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আভা এই মহাভারত। তাই একে "পঞ্চম বেদ"-ও বলা হয়।

চত্বার একতো বেদা ভারতঞ্চৈকমেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্বৈ সমেত্য তুলয়াধৃতম্ ॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে ॥

(আদিপর্ব, প্রথম অধ্যায়)

সমস্ত দেবতারা সমবেত হয়ে মহাভারতের গভীরতা নিরূপণের জন্য তুলাদণ্ডের একদিকে চারি বেদ আর অন্যদিকে একখানি মহাভারত দিয়ে দেখলেন মহাভারতের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্ব চতুর্বেদ ও উপনিষদ থেকে অধিক। বলা বাহুল্য, এটা একটা উপমা। এর থেকে অর্থসঙ্কেতটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কেননা বেদের শুদ্ধ জ্ঞান ও অতলশায়ী অনুভূতির অধিকারী সকলে হয় না। শুধু জ্ঞানে এবং মেধায় বেদের অনুভব লাভ সম্ভব নয়। অল্পজ্ঞানীর তো কথাই নেই। তাই বেদব্যাস বেদের সারটুকু নিয়ে বিচিত্র ঘটনা পুরাণের ভিতর দিয়ে তার চন্দ্রজ্যোৎস্নাটুকু কেবল অল্পশ্রুতাদ্ সাধারণের জন্য বিতরণ করলেন।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥

(আদিপর্ব, প্রথম অধ্যায়)

এথেকে বোঝা যায়, ইতিহাস-পুরাণকে বেদেরই পরিপূরকরূপে লোকোপযোগী প্রকরণরূপে গণ্য করা হয়েছে এবং সেই অর্থেই একে "পঞ্চম বেদ" বলে গ্রহণ করতে হবে।

ব্যাস বেদম্ সনাতনম্। ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং... (আদিপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)। সনাতন বেদশাস্ত্রকে বিভক্ত করে এই পুণ্য ইতিহাস বেদব্যাস রচনা করেছেন। বলা হয়েছে সর্বশাস্ত্রের মধ্যে এই ইতিহাসই শ্রেষ্ঠ— "ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বাগমেষ্বয়ম্"। ইতিহাস ও শ্রুতির নানা ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, মহাভারতের ইহাই গ্রন্থলক্ষণ—"ইতিহাসঃ সহব্যাখ্যা বিবিধা শ্রুতয়োঽপি চ...ইহ গ্রন্থস্য লক্ষণম্।"

আমরা আবার ফিরে যাই সেই ঋষি শৌনকের আশ্রমে। নৈমিষারণ্যের সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায়। যেখানে সৌতিকে ঘিরে প্রদীপালোকে বসে আছেন ঋষিগণ। তাঁরা সৌতিকে গল্প বলতে বলছেন। কি গল্প শুনতে চান তারা? ঋষিগণ বলছেন, আমরা শুনব মহর্ষি বেদব্যাস প্রাচীন ঘটনা অবলম্বন করে যা রচনা করেছেন, যা শুনে দেবগণ ও মহর্ষিগণ সবিশেষ প্রশংসা করেছেন, সেই মহাভারত নামক ইতিহাস, সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে যা প্রধান—ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্" (আদিপর্ব, প্রথম অধ্যায়) —যার পদগুলি আশ্চর্য সুন্দর, পর্বগুলিও আশ্চর্য, যার মধ্যে সূক্ষ্ম তত্ত্বসব নিরূপিত হয়েছে, তার যুক্তি তার বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় সুসংলগ্ন অলঙ্কৃত, পবিত্র সেই বাক্‌বিভূতি আমরা শুনতে চাই।

সমগ্র মহাভারত কথন শেষ করে সৌতি আবার বলছেন, "ইহার তুল্য পবিত্র ইতিহাস আর নাই" (স্বর্গারোহণপর্ব, পঞ্চম অধ্যায়)। বারবার মহাভারতকে ইতিহাস বলেই বলা হয়েছে। তবে আমরা বর্তমান যুগে ইতিহাস বলতে যে history বুঝি, যা শুধু একটা দেশ ও কালের তথ্যের ঘটনার বিবরণ, মহাভারত ঠিক তেমন ইতিহাস নয়।

কেবল জীবনের উপরভাগের ছোটবড় ঘটনার তরঙ্গগুলির পরিচয় লওয়া নয়। দেখতে হবে সেই প্রবাহের গভীরে কোন্ আবর্ত ঘূর্ণ্যমান, কোন্ অনুকূল প্রতিকূল শক্তিস্রোতের সঞ্চরণ। একটি গভীর ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে জীবনের অন্তরালের গতিকে লক্ষ্য করা—তথ্যের অন্তরালে সত্যকে অনুধাবন করা—সেই হিসাবে মহাভারত বাস্তবিকই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস।—এই সেই ইতিহাস যা ঘটনার আড়ালে ছদ্মবেশে কাজ করে চলে, history advances in disguise। মহাভারতের মধ্যে আমরা পাই ভারতের কারণ-শক্তির লীলা।

ভারতের প্রাচীন ঋষিদের মতে ইতিহাস হল "ভূতভব্য-ভবিষ্যৎকথন"—অর্থাৎ অতীতে কি কি ঘটেছে শুধু তাই দেখা নয়, বর্তমানে তার কি রূপ নিয়েছে, অতীত কি ভাবে বর্তমানে রূপ নিয়েছে তা লক্ষ্য করা এবং সেই দেখাও সার্থক হবে না, সত্য হবে না, যদি না আমাদের থাকে একটা সত্যদৃষ্টি যা দেখতে পায় ভবিষ্যতের কোন্ অমোঘ চাপে বর্তমানের ও অতীতের ঘটনা সব সঞ্চালিত হয়ে উঠেছে। বেদে বলা হয়েছে "ভবিষ্যৎ স্মৃতি"। ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাই যেন আমাদের মধ্যে একটা স্মৃতি হয়ে কাজ করে, আমাদের পরিচালিত করে। ইতিহাসকে অনেকে বলেছেন সমাজ-মানসের স্মৃতি। মানুষের সকল ভালমন্দ সুখদুঃখ ঘাত প্রতিঘাতের কম্পন নির্মম ঔদাসীন্যে সে ধরে রাখে। প্রকৃত ইতিহাসও তাই। কিন্তু এই স্মৃতি কেবল অতীত বা বর্তমানের নয়—তা হল ভবিষ্যতের স্মৃতি।

সমগ্র মহাভারতের মধ্যে বেদব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ যেন এই ভবিষ্যৎ স্মৃতির সচল বিগ্রহ। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর সেই আশ্চর্য উক্তি, যেন ইতিহাস কথা বলছে, "পুত্র, তোমার সন্তানেরা আর পার্থিবগণ সকলের মৃত্যু আসন্ন। দুঃখ ক'রো না। কেবল কালের গতি লক্ষ্য কর।" (ভীষ্মপর্ব)

আর একজন হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিও বলছেন অর্জুনকে, "আমার এবং তোমারও বহুজন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেসব জানি কিন্তু তুমি জান না—তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।" তাই আমরা দেখি এই দুইজন পুরুষই কেবল মহাভারতের সকল আবর্তের মধ্যে স্থির এবং সমস্ত কিছুর কারণের কারণ। মহাভারতে যা নেই তা কোথাও নেই। লোকে যে বলে, "যা নেই ভারতে তা নেই ভূভারতে" তার ইঙ্গিত পাই ব্যাসদেবেরই কণ্ঠের একটি শ্লোকে—"যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ"। (আদিপর্ব, ২/৩৯০)

ভারতের জীবনের সকল তপস্যা, ধ্যান, ধারণা, ধর্ম, নীতি একটা গভীর ভাবের মধ্যে হোমাগ্নির মত ধক্ধক্ করে জ্বলছে। এক পরম শিবচেতনা—যাঁর ধ্যানের মধ্যে ভুবন ধরা। শিবকেও তাই মহাভারতে বলেছে "ইতিহাস কল্প"।

বেদব্যাসের কোন পক্ষপাত নেই। সমান মমতা স্নেহ ভালবাসা নিয়ে তিনি যেমন এঁকেছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তেমনি একই মমতা নিয়ে এঁকেছেন কর্ণকে দুর্যোধনকে। বরং কর্ণের দুর্যোধনের জীবনের শেষ দৃশ্য এমন করে ফুটিয়ে তুলেছেন যেন এক মহান্ সূর্যাস্তের গরিমা পেয়েছে তারা। দুর্যোধনের মৃত্যুর সেই অন্তিম মুহূর্তে একটা করুণ বেহাগের সুরে যেন জগৎ কেঁদে উঠল। শুধু আমাদের বুকই নয়, কেঁপে উঠল পৃথিবীও। কুরুক্ষেত্রে

অবসানে একটা অসীম বৈরাগ্য ও নির্বেদ, ক্ষমা প্রসন্নতা ও মহিমা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল যেন। এ আকাশ বেদব্যাসের শান্তিগুণে ধন্য। তাই সব যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর, সব কান্না থেমে যাওয়ার পর, সকল আশ্রয় ভেঙে যাওয়ার পর, যা থাকে, যা কেউ দান করে না, আমরা নিঃসঙ্গ জীবনের নিভৃত চিত্তে নিজের অন্তরে যা লাভ করি, তাই হল যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথে হৃদয়ের সম্পদ—সকল শোক দুঃখ মৃত্যুর অতীত সেই অমৃত। সেই অর্থেই আমরা বলি, 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'।

[দুই]

আলো-অন্ধকার দুই অটে

মহাভারত ভারতীয় জীবনধর্মের একটি আলোক-রেখার যাত্রাপথ। একটা অন্বেষণের পথরেখা। স্থূলের ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্র সংঘাতের আবর্তের ভিতর দিয়ে অন্তরাত্মার একটা সন্ধান। জীবনকে "ঊর্জিত" করে গড়ে তোলাই তার প্রয়াস।

ভারতের সমস্ত জীবন-প্রতিভার আকৃতি ও প্রকৃতি, অন্তরাত্মার তপশ্চর্যার গম্ভীর উদাত্ত শক্তির সবখানি ধরা আছে মহাভারতে। মহাভারত ভারত-শক্তি। এককথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এর সরল অনুষ্টুপ্-ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়ে আসছে।"..."ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস..." [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬৬২(৬)]

এই মহাভারত-শক্তির মূলে রয়েছে নিভৃতসঞ্চারী বেদের মাতৃশক্তি। কিন্তু বেদ হল আরণ্যক সাধকমণ্ডলীর একান্ত নিভৃত জ্ঞান। সেই জ্ঞানেরই শক্তি সমাজ-জীবনে যখন সাক্ষাৎভাবে উৎসারিত, তখনই পাই আমরা রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ।

'বেদ হইতেছে ভারতের আদি মূল মাতৃশক্তি—এইখানেই ভারতের অন্তরাত্মা। অন্য সীমায় স্মৃতি হইতেছে দৈহিক আয়তনের বিধান, বাহিরের স্থূল কর্মক্ষেত্রের, ব্যবহারিক জীবনযাত্রার ব্যবস্থা। এই দুইএর, আত্মা ও দেহের মাঝে, অন্তঃকরণের পৃথক পৃথক ভূমিকা গড়িয়া তুলিয়াছে রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ।...

'রামায়ণ ভারতের চিত্তবৃত্তিকে, প্রাণের ধারাকে স্পর্শ করিয়াছে, গড়িয়া তুলিয়াছে হৃদয়ের অবদানে, সরল সুকুমার অথচ সমর্থ ভাবশীলতার কল্যাণে। মহাভারত সেই প্রাণকে বাঁধিয়া ধরিয়াছে একটা স্থিরবুদ্ধিপ্রতিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তির সুদৃঢ় মানসিক বলের চাপে। রামায়ণের মূল মন্ত্র বলিতে পারা যায় হইতেছে "সত্য" আর মহাভারতের হইতেছে "ধর্ম"।' (—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, 'রচনাবলী' ৫ম খণ্ড, 'শুভস্তু', পৃ. ৮৫-৮৬)

শ্রীনলিনীকান্তের বক্তব্য সংক্ষেপে হল এই : রামায়ণে পাই আমরা হৃদয়ের সারল্য আর মহাভারতে বুদ্ধির প্রাখর্য। রামায়ণ কোমল, মহাভারত কঠোর। রামায়ণ যদি হয় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, মহাভারত তবে দিনের খর আলো।

মহাভারত উত্তুঙ্গ শৈলশিখর, রামায়ণ বিশাল জলধি। রামায়ণে ভারত-হৃদয়ের সরল আর্জব গুণ, মহাভারতে বুদ্ধির মস্তিষ্কের রুক্ষ কঠোর তপঃশক্তি।

রামায়ণের সীতা আর মহাভারতের দ্রৌপদী—এই দুই মহীয়সী নারীর জীবনেই তা প্রতিফলিত। সীতার সকল দুঃখ লাঞ্ছনার ভিতরে আমরা দেখি কেমন একটা সহজ সরল হৃদয়ের গতি। আর দ্রৌপদীর সকল দুঃখক্লেশের মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা সমর্থ পরিণত আত্মপ্রতিষ্ঠ মনোবল ইচ্ছাশক্তি। রামায়ণ ও মহাভারতের কাব্যগুণেও লেগেছে এই দুই বিশিষ্ট শক্তির স্পর্শ। সীতার জন্ম কোমল মৃত্তিকা থেকে, তাই মাটিরই মত সীতা স্নিগ্ধ কোমল "সর্বংসহা"। দ্রৌপদীর জন্ম যজ্ঞের অগ্নি থেকে তাই অগ্নিসম্ভবা যাজ্ঞসেনী দৃপ্তময়ী "ধর্মার্থকুশলা"। দুই গ্রন্থে আমরা পাই দুই যুগের অবতারবরিষ্ঠকে—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ—একজন শ্রীমান্ আর একজন ধীমান্।

মহাভারতের যে শক্তি তার সবখানি তোড় আছড়ে পড়ছে দুটি চরিত্রের দুই বুকের তটে। যার এক তটে অন্ধকার আর এক তটে আলো। একটি হল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তাপিত বক্ষ, আর একটি হল বিবেকবান্ ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের ব্যথিত হৃদয়। প্রবল শক্তিস্রোতের ধাক্কায় দুই তীরের যে সর্বনাশা ভাঙাগড়া তাই নিয়েই মহাভারতের ঘটনা-প্রবাহ। ভারত-শক্তির বিপুল চাপকে ধারণ করতে পারে যা তা হল ধর্ম, ধর্ম অর্থই যা ধারণ করে, আর এই ধর্মের সমকক্ষ তার বিপরীত অন্ধকার দিক যেটি তা হল অধর্ম, তার মূর্তি ধৃতরাষ্ট্র। তিনি যে অন্ধ, তার চোখে যে কেবল অন্ধকার, সেটা তাঁর জীবনেরই symbolic দিক। নিরেট অন্ধকারের মধ্যেও যেমন থাকে গভীর আলোর এক সুপ্তি, তেমনি আমরা দেখি ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের গভীরে ধর্ম-বোধের একটা অলক্ষ্য চাপ। তারই বলে তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনি বারবার সকরুণ বিলাপ। ধর্ম তাঁকে ছেড়ে দেয়নি, একদণ্ডও অব্যাহতি দেয়নি, তাই তাঁরই জীবনসঙ্গিনী গান্ধারী, ধর্মের এক সাধ্বী শিখা তিনি। তবে স্বেচ্ছায় তিনি চক্ষু আবৃত করে রেখেছেন। এও আর-এক symbol।

আর যুধিষ্ঠির, যিনি ধর্মের পুত্র, একটা পিঁপড়ের দুঃখেও যাঁর হৃদয় কাঁদে, চিরকাতর অথচ নিরুপায়, যিনি তীব্র অনুভূতিপ্রবণ অন্তরের জন্য বারংবার কেবল পেয়েছেন ধিক্কার আর গঞ্জনা, তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর কাছে, আত্মতুল্য ভাইদের কাছে, এমনকি তাঁর মায়ের কাছ থেকেও। তাঁর বুকের ভিতরের এই ভাঙনের দিকটা আমরা তো উপেক্ষা করতে পারি না।

মহাভারতে তো অসংখ্য চরিত্র। একটা সমগ্র জাতিই যেন উপস্থিত এর মধ্যে। কিন্তু কেউ কি এই দুই জনের মত এমন করে মহাভারতের

সবখানি তোড়কে বুক দিয়ে ধরেছেন? তাঁরা সব আছেন যেন ভাসমান তরীর মত। ঢেউএর আঘাতে তাঁদের জীবন টালমাটাল হচ্ছে, কর্ম দিয়ে প্রয়াস দিয়ে গতির বাঁক ঘুরিয়ে ধরতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মনে হয় তাঁরা সবাই নিমিত্তমাত্র। একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া পঞ্চপাণ্ডবের আর সকলের হৃদয় যেন বোবা। ধার্তরাষ্ট্রের সকল বীরগণও যেন নিয়তি চালিত "যথা দারুময়ী যোষা নরনারী সমাহিতা। ঈরয়ত্যঙ্গমঙ্গানি তথা রাজনিমা প্রজাঃ।" (বনপর্ব) নর্তকচালিত কাঠের পুতুল যেমন অঙ্গ সঞ্চালন করে তেমনি যেন জগতের সকল প্রাণী ভগবানের শক্তিচালিত হয়ে অঙ্গ সঞ্চালন করছে।

এঁরা জীবনের মধ্যে আছেন বটে কিন্তু জীবনকে বুক দিয়ে গ্রহণ করেননি—যেমন নদীর দুই তট নদীর স্রোতকে ধারণ করে। কেবল ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরের বক্ষ, কূল ভাঙার মত তাঁদের বুকের পাঁজড় ভেঙে যাচ্ছে—আর এই দুইয়ের অভিঘাতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে—সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য সকলের হৃদয়ে—তাঁরা তাতে দোলায়িত ঘূর্ণিত হচ্ছেন স্রোতের বুকে তৃণখণ্ডের মত।

কেবল দুই মহান্ পুরুষ এই সংক্ষোভের ধর্ম-অধর্মের সকল আবর্তের ঊর্ধ্বে। এক হলেন ব্যাসদেব। তাঁর কথা আলাদা। আর একজন হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যুদ্ধ করবেন না,—অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকেতঃ—(উদ্যোগপর্ব); তিনি সংঘর্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নেই, অথচ রথের রাস তাঁরই হাতে। সবই তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। এই রহস্যের মধ্যেই রয়েছে মহাভারতের গূঢ় তত্ত্ব। সে আলোচনা আমরা পরে একটু বিস্তৃতভাবেই করব। কৌরবপক্ষ ভাবছে তারা তাদের নিজের পথে চলছে, পাণ্ডবপক্ষও ভাবছে, তারাও চলছে নিজের পথে। কিন্তু আসলে উভয় পক্ষই চলেছে মুরারীর "তৃতীয় পন্থায়"।

আর একজন বিদুর। তাঁকে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র না ভাবলেও চলে। তিনি তো ছদ্মবেশী ধর্ম, মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন "ক্ষত্তা" বিদুর। তিনি তো যুধিষ্ঠিরেরই পিতা, যুধিষ্ঠিরেরই আশা স্বপ্ন আদর্শের একটা উজ্জ্বল প্রতিরূপ। আর শেষে দেখি বিদুর ছায়ার মতই মিলিয়ে গেলেন, মিশে গেলেন যুধিষ্ঠিরের শরীরে।

তাই বলছিলাম, মহাভারতের যে কোথায় ব্যথা তা বুঝতে পারা যায় কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের বুকে হাত দিয়ে। একজন সেটা প্রকাশ করেন করুণ বিলাপে, যাঁকে সঞ্জয় বারবার কশাঘাত করে বলেছেন, "মহারাজ, এই বিলাপ আপনার বিষমিশ্রিত মধুর মত।" আর একজন প্রকাশ করেন কেবল চাপা দীর্ঘশ্বাসে। আত্মদহনের নিঃশব্দ তপে। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চাপা।

তবু একবার তাঁর মনের ভার ব্যক্ত করে ফেলেন, অত্যন্ত নিভৃতে বনবাসের নির্জন জীবনে ঋষি বৃহদশ্বের কাছে। কথাগুলি হীরের ধারের মত আমাদের অন্তরে কেটে কেটে দাগ বসে যায়। যুধিষ্ঠির বলছেন ঋষি বৃহদশ্বকে, "ভগবান, উপহাসকারী ধূর্তরা যারা অত্যন্ত চতুর আর অক্ষকোবিদ, আমাকে ছল করে ডেকে নিল পাশা খেলায়। আমার রাজ্য ও ঐশ্বর্য সব হরণ করে নিল। পাশা খেলায় আমার কোন দক্ষতা নেই, সেই সুযোগ নিয়ে আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্যাকে তারা সভায় টেনে এনে লাঞ্ছনা করল। আমাকে এই নিদারুণ বনবাসে পাঠিয়ে দিল। প্রতিদিন রাত্রে এইসব দুঃখ দুঃস্বপ্নের মত এসে আমার নির্জন হৃদয়ে হানা দিয়ে যায়। পৃথিবীতে আমার চেয়ে দুঃখী আর কে আছে?" (বনপর্ব, ৫২ অধ্যায়) নিজের কৃতকর্মের জন্য দুর্ভাগ্যের জন্য এমন করে দুঃখ প্রকাশ যুধিষ্ঠির আর করেননি। বৃহদশ্ব এসেছিলেন বনবাসী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাণ্ডবদের স্বর্গত-পিতা পাণ্ডুর অনুরোধে। আমরা অনুমান করতে পারি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরের এই নিদারুণ মর্মবেদনা তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বনবাসী-পুত্রের দুঃখ স্বর্গবাসী পিতার হৃদয়ে কি কোন আলোড়ন তোলেনি?

ভাইয়েরা যখন অধৈর্য হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করছে, এমনকি সেই চরম লাঞ্ছনার মুহূর্তে দ্যূতক্রীড়ার আসরে অধৈর্য ক্রোধনস্বভাব ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের হাত দুখানি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে—"বাহু তে সম্প্রধক্ষ্যামি"—তখনও যুধিষ্ঠির নীরব। কোন বিলাপ তাঁর মুখে শুনিনি। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী যখন কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে কোপকটাক্ষ হেনে তাঁকে দগ্ধ করছিলেন—"ত্রপাকোপসমীরিতেন কৃষ্ণাকটাক্ষেণ"—তখনও তিনি মৌন। বনবাসকালেও তাঁকে বারবার এই ধিক্কার শুনতে হয়েছে। ভীম তো যুধিষ্ঠিরকে বলেই ফেললেন তিনি "ক্লীবজীবিকাম্"। কিন্তু এসবের প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠির কেমন এক আত্মসমাহিত দূরাগত কণ্ঠে বলছেন, আমার ব্যবহারেই তোমাদের এমন বিপদ এসেছে,—"মমানয়াদ্ধি ব্যসনং ব আগাৎ" (বনপর্ব, ৩৪/২)। কিন্তু এই শীতল সমাহিত কণ্ঠ তো আক্ষেপের বিলাপের নয়। এ যেন কোন্ আত্মমগ্ন সাধকের স্বগত তপের কণ্ঠ। বেশ বুঝতে পারা যায় ভিতরে একটা খাণ্ডব দহন জ্বলছে তাঁর। সচেতন যুধিষ্ঠিরের অন্তরদহনের মধ্যে আছে একটা তপস্বীর অনুসন্ধান, নিজের মধ্যে জানতে চাইছেন কেন এমন হল? ধর্ম তাঁকে দিয়ে কি সিদ্ধ করতে চান? এসবের অর্থ কি? বার্তা কি? এই জিজ্ঞাসার অনুসন্ধানই তাঁর জীবনের সবচেয়ে জরুরী কাজ। রাজ্য লাভের চেষ্টার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্রত। আমরা তাই দেখি যুধিষ্ঠির বরাবরই সিংহাসন

লাভে তেমন উৎসুক নন। কেবল পাঁচখানি গ্রাম পেলেই পাঁচ ভাইয়ে সুখে থাকতে পারেন। আর কিছু চান না। বলা যেতে পারে তাঁকে প্রায় জোর করেই রাজা করা হয়েছে। রাজা হবার পরেও বারবার তিনি প্রব্রজ্যা নিতে সন্ন্যাস নিতে চেয়েছেন।

তাই দ্বিতীয়বার যখন আবার পাশা খেলার চক্রান্ত হল। তখন আমরা চমকে উঠি। সে কি? আবার সেই সর্বনাশা পাশা? সর্বস্ব হারিয়ে এত লাঞ্ছনার পর দ্রৌপদীর অপমানের পর যখন সব ভালয়-ভালয় মিটে গেল, পাণ্ডবেরা ফিরে যাচ্ছেন ইন্দ্রপ্রস্থের পথে, তখন আবার এল ডাক। আমরা ভাবলাম, এবার হয়তো যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করবেন। শত্রুর মরণ-ফাঁদে তিনি আর পা দেবেন না। কিন্তু না, যুধিষ্ঠির ফিরে এলেন আবার সেই সর্বনাশের পথে, সজ্ঞানে সব জেনে শুনে। যুধিষ্ঠির যেন কালের ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন এর মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্রের এই আহ্বান এ যেন কালেরই আহ্বান, "ধৃতরাষ্ট্রেণ চাহুতঃ কালস্য সময়েন চ" (সভাপর্ব, ৫৫ অধ্যায়)। যুধিষ্ঠিরের জীবনের সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় দিক এটাই। তিনি লাভ-অলাভ সুখ-দুঃখের হিসাবী পথ ধরে চলেন না, তিনি চলেন কালের ইঙ্গিত ধরে। অন্তত তাঁর অন্তরাত্মার মূল প্রবর্তনা সেই দিকেই। যুধিষ্ঠিরের এই ব্যথার দিকটা না বুঝলে আমরা তাঁকে ভুল বুঝব। যেমন ভুল বুঝেছিলেন দ্রৌপদী। তিনি কিছুটা অনুযোগ ও অভিমান নিয়ে তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি এত সরল, এত কোমল, আপনি দাতা, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ; তবে কেন আপনার মত ব্যক্তির দ্যূতব্যসনে বুদ্ধি হল? "ঋজোর্মৃদোর্বদান্যস্য হ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ কথমক্ষ্যব্যসনাজা বুদ্ধিরাপতিতা তব ॥" (বনপর্ব, ৩০ অধ্যায়)।

কিন্তু এর যে উত্তর যুধিষ্ঠির দিলেন তা আশ্চর্য। আমাদের ভাবিয়ে তোলে। তবে কি যুধিষ্ঠিরের এই দ্যূতব্যসন তার চরিত্রের কোন দুর্বলতা, কোন "tragic flaw" নয়। জীবনের কোন একটা সামান্য ছিদ্র দিয়ে ট্রাজেডি প্রবেশ করে লখিন্দরের বাসরঘরের কালসর্পের মত। আমরা দ্রৌপদীর মতই ভেবেছিলাম, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রেও দ্যূতব্যসন হয়তো তেমনি একটি রন্ধ্র।

কিন্তু যুধিষ্ঠির এ কি বলছেন? "যাজ্ঞসেনি, তুমি আশ্চর্য সুন্দর কোমল কথাই বলছ, আমিও তা শুনেছি, কিন্তু তুমি নাস্তিকের মত কথা বলছ—নাস্তিক্যন্তু প্রভাষসে।" (বনপর্ব)

যুধিষ্ঠিরের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই আমরা যেন তাঁর অন্তর্হৃদয়ের তাঁর জীবনদৃষ্টির নিরিখটি বিদ্যুৎচমকে ক্ষণিকের জন্য দেখে নিতে পারি।

জীবনে যা-কিছু ঘটছে তা আমারই কর্তৃত্বে, আমারই ইচ্ছায়, আমিই সে

সকলের কর্তা, নিয়ন্তা, এটা নিতান্ত অহংবুদ্ধির কথা। আমি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই, আর কোন কারণ নেই, এ বুদ্ধি অসুরের, নাস্তিকের।

ফলত তো দেখি, আমরা যা ভাবি, যা করব বলে মনে করি, কার্যত তা করতে পারি না। আমাদের সকল ভাবনা সঙ্কল্প প্রয়াসকে অগ্রাহ্য করে, বানচাল করে, ওলটপালট করে ঘটে যায় আর-এক রকমের। কোন এক নিয়ন্তা শক্তি তার নিজের পথে আমাদের নিয়ে চলেছে। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সমস্ত কর্ম অকর্ম এমনকি বিকর্মকে পর্যন্ত সেই শক্তি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে কাজে লাগায়। যুধিষ্ঠির তাঁর সকল দুঃখময় জীবনের মধ্যে এই সত্যটি দেখতে পেয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন, যা ঘটছে তা তিনি না চাইলেও ঘটত, না করলেও হ'ত। আর একজনের তপঃদৃষ্টি মানুষের সকল গণনা সকল প্রয়াস, কোথাও এতটুকু-বা আশ্রয় করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিধ্বস্ত করে, আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে চালিত করছে। কিন্তু সেই নিয়ন্তা পুরুষকে তিনি এখনও সঠিক চিনে উঠতে পারছেন না, তবে আভাস পাচ্ছেন, লোকে বলছে, তিনিও মাঝে মাঝে বলছেন, তিনি তাঁদেরই সখা বাসুদেব। কিন্তু এই উপলব্ধি এখনও স্থির হয়ে তাঁর বা পঞ্চপাণ্ডবের অন্তরে এখনও প্রবেশ করেনি। এখনও সেই উপলব্ধি তাঁর অন্তরে আগুনের রঙে দাগ কেটে যায়নি। এইখানেই যুধিষ্ঠিরের অন্তর্জীবনের আলো-আঁধারি।

ঠিক একই উপলব্ধি একই অনুভূতি আমরা লক্ষ্য করি যুধিষ্ঠিরের বিপ্রতীপ চরিত্র অধর্মচিত্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যেও। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, "যখন নারদের মুখে শুনিলাম কৃষ্ণার্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণাবতার তিনি ব্রহ্মলোকে ইঁহাদের নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম বাসুদেব লোকের হিত সাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরিতার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম কর্ণ ও দুর্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনার বিবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে অশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।"...(আদিপর্ব, অনুক্রমণিকা, অনুবাদ : কালীপ্রসন্ন সিংহ)

দেখলাম একই ঢেউ উঠেছে দুই কূলে। কিন্তু দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জন্য তার ঘাত-প্রতিঘাত হল বিপরীতমুখী। দেখা যাক, এই উন্মত্ত স্রোত কোথায় নিয়ে যায়?

[তিন]

অগ্নিঢালা সুধা

মহাভারতের অমৃত আর গরল একসাথে মিশে উন্মত্ত মন্থন হল এই দ্বিতীয় পর্বে—সভাপর্বে। দুহাজার পাঁচশ এগারটি শ্লোক যেন অগ্নিঢালা সুধা। এই পর্বে এসে আমরা কাহিনীর মর্মস্থানটি, মহাভারতের হৃদয়ের ক্ষতটি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতিটি চরিত্র তার ভিতরের যত দোষত্রুটি-দুর্বলতা, তার ধর্ম-মর্ম-মহত্ত্ব-বীরত্ব সব ব্যক্ত করে ধরেছে। প্রত্যেকে যেন তাদের হাতের সবগুলি রঙের তাস উত্তান করে মেলে ধরেছে। দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে বস্ত্রহরণ করতে চেয়েছিল দুঃশাসন ; তখন ধর্ম তাঁর শ্রী ও লজ্জাকে রক্ষা করেছিলেন ; কিন্তু নগ্ন হয়ে পড়ল আর সকলের চরিত্র। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম প্রত্যেকের গুণাগুণ শক্তি সামর্থ্য—তাদের আকার এবং বিকার। কি যে ঘটবে তাও বজ্রঅগ্নিলেখায় ফুটে উঠেছে প্রত্যেকের ললাটে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অন্ধকার আকাশে উল্কার আলোকে পাঠ করে নিলেন কুরুবংশের অমোঘ পরিণাম। সমগ্র কাহিনীর গূঢ় গ্রন্থিমোচন হল এই পর্বে। ঘটনা তার সবখানি নাটকীয়তা নিয়ে ঘনঘোর হয়ে এল। আর এই প্রথম আমরা প্রত্যক্ষ করলাম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সক্রিয় ভূমিকায়।

অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল এই পর্বে। মহাভারতের সমস্ত প্লটখানি বাঁধা হয়ে গেল। তারই পরিণাম এবার আবর্তিত হয়ে চলবে শেষ পর্যন্ত। আবার সচেতন পাঠক এখান থেকে অনুমান করে নিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের একটা নিজস্ব পরিকল্পনা আছে। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। যদিও এখনও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। কিন্তু তিনি সেই লক্ষ্যের দিকেই ঘটনাবলীকে চালিত করতে লাগলেন—যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া। ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্রতর সব মাথায় যদিও তা অনেক সময় বজ্রাঘাতের মত। এই পর্বে এসেই দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "অধর্মের ঘর্ষণে ধর্মের অসিতে শাণ পড়েছে"।

বস্তুত যদি এই সভাপর্বটি ভাল করে পড়া যায় তারপর সমগ্র মহাভারতকে দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে একটা নিখুঁত পরিকল্পনা, স্থানে স্থানে তা হয়তো কখনো বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও তার ছেদ পড়েনি। সতর্ক পাঠকের কাছে এর কোন অংশই তখন নিতান্ত বাহুল্য বা প্রক্ষিপ্ত

বলে মনে হবে না। অন্তত মূল পরিকল্পনার রসের দিক থেকে নয়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পরে আজকের দিনে অল্পায়ু অবসরবিহীন অন্নগতপ্রাণ অস্থির অভিনিবেশহীন মনের কাছে যতই তা অতিকথন পুনরুক্তি অতিবিস্তার দোষে চিহ্নিত হোক।

অর্জুন লক্ষ্যবেধ করে স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। পঞ্চপাণ্ডব বিবাহ করে ফিরে এলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব নির্মিত সুদৃশ্য রাজধানী নির্মাণ করে তাঁরা রাজা হয়ে বসলেন। রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। দিগ্বিজয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করে রাজচক্রবর্তী হলেন। শিশুপাল জরাসন্ধ বধ হল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এখন ভারতের অসপত্ন সম্রাট। কিন্তু।

একটা মারাত্মক 'কিন্তু' রয়েছে প্রত্যেকের জীবনের গভীরে। তাই জীবন ঠিক দুয়ে-দুয়ে-চার হয়ে চলে না। ভাগ্যের পাশায় সব ভেঙে গেল। তাসের ঘরের মত এক ফুৎকারে উড়ে গেল সব। একটা ক্ষণিক সুখস্বপ্নের মত মুহূর্তে মিলিয়ে গেল পাণ্ডবের রাজরাজত্ব বিত্ত বৈভব। তাঁরা হলেন বনবাসী।

শ্রীকৃষ্ণ জানতেন এমন হবে। তাই রাজসূয় যজ্ঞের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে যাবার সময় যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন, আপনি কিন্তু সর্বদা সাবধানে থাকবেন।—"অপ্রমত্তঃ স্থিতো নিত্যং প্রজা পাহি বিশাংপতেঃ"। (নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় বলছেন, "ত্বং নিত্যমেব অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ স্থিতঃ সন্") শ্রীকৃষ্ণের এই সাবধান বাণী অত্যন্ত নাটকীয়। কিন্তু যুধিষ্ঠির তা বুঝতে পারেননি। কেননা স্বভাবের মূলে রয়েছে কি এক নিদারুণ অশুদ্ধি, অপূর্ণতা। তার শোধন উদ্বোধন না হওয়া পর্যন্ত কিছুই থাকবে না।

যুধিষ্ঠির যদিও ধর্মপ্রাণ সরল, তাঁকে "অগাধ বুদ্ধি" বলা হয় বটে, কিন্তু সে ধর্মবুদ্ধি সকল বাস্তবতা বর্জিত, পরিপূর্ণ সামর্থ্যে তখনও তা ঊর্জিত হয়ে ওঠেনি। সেই দুর্বল ভিত্তির উপরে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য স্থাপন করলে তা বারবার এমনি করে তাসের ঘরের মত ভেঙে তো পড়বেই।

রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তাব যখন হল তখন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের মত ছাড়া রাজী হতে চাইলেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে আনার জন্য দ্বারকায় দূত পাঠান হল। শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পেয়ে অবিলম্বে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

যুধিষ্ঠির তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কৃষ্ণ, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারি কি ?"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করার সকল গুণই আপনার আছে, তথাপি কিছু বলছি শুনুন। সমস্ত পৃথিবী যাঁর বশে তিনিই সম্রাট পদ

লাভ করেন। পৃথিবীতে এখন যে-সকল রাজা ও ক্ষত্রিয় আছেন সকলেই পুরূরবা বা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। যযাতি থেকে উৎপন্ন ভোজবংশীয়গণ চতুর্দিকে রাজত্ব করছেন। কিন্তু তাঁদের সকলকে বশীভূত করে জরাসন্ধ এখন সম্রাট। জরাসন্ধকে পরাজিত না করলে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারেন না।"

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির যে প্রশ্ন করলেন তাতে আমরা হতবাক্। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, "হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধ কে? তার বীর্য ও পরাক্রম কি প্রকার? যে দুরাত্মা তোমার অনিষ্টাচরণ করেও প্রজ্বলিত হুতাশনস্পর্শে পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়নি?" (সভাপর্ব, ১৬ অধ্যায়)

যুধিষ্ঠিরের একি জিজ্ঞাসা? সমগ্র উত্তর-ভারতের যিনি প্রায় অপ্রতিহত সম্রাট। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই পক্ষের মোট সৈন্যসংখ্যা যেখানে ছিল আঠার অক্ষৌহিণী, সেখানে একা জরাসন্ধেরই সৈন্যবল ছিল বিশ অক্ষৌহিণী। (হরিবংশ)। এমন প্রতাপশালী জরাসন্ধের নাম পর্যন্ত শোনেননি যুধিষ্ঠির? আশ্চর্য! এতখানি রাজনৈতিক অজ্ঞতা নিয়ে তিনি সম্রাট হতে চান?

যুধিষ্ঠিরের এই পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা সর্বজ্ঞ সর্বকৃৎ শ্রীকৃষ্ণের বুঝতে না-পারার কথা নয়। তিনি এও বুঝতে পারলেন, যুধিষ্ঠিরের ধর্মবুদ্ধিকে তপে তাপে ক্লেশে শুদ্ধ তেজময় না-হওয়া পর্যন্ত এ সাম্রাজ্য থাকবে না।

তবু প্রথমে তিনি চিরাচরিত প্রথায় তাঁর পরিকল্পনা মত কাজ করতে লাগলেন। কেননা শ্রীকৃষ্ণ অপ্রয়োজনে দেশের মধ্যে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজ-বিপ্লব আনতে চাননি। তাই প্রথমে তিনি সামে দণ্ডে প্রবর্তিত করলেন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবকে। কিন্তু তাঁর সেই প্রয়াস সভাপর্বে ব্যর্থ হয়ে গেল। পাণ্ডবেরা চলে গেলেন দীর্ঘ বনবাসে। তাঁদের তেজ বীর্য শক্তি আহরণের জন্য। কঠিনতম সে প্রয়াস, দীর্ঘতম সে তপস্যা। সেই জন্যই মহাভারতের মধ্যে একমাত্র শান্তিপর্ব (১৪৭৩২ শ্লোক) ছাড়া সর্ববৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে বনপর্ব (১১৬৬৪ শ্লোক)। আকারে সমগ্র মহাভারতের প্রায় এক-অষ্টমাংশেরও বেশি। পরে উদ্যোগপর্বে দেখি, যখন সামে দণ্ডে কাজ হল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার সমস্ত উদ্যোগের সঙ্গে যোগ করলেন আর এক পন্থা—সাম, দণ্ড এবং ভেদ।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর এমন প্রখর ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। আমাদের চোখের উপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাটা। এবং শ্রীকৃষ্ণ যে কি চান, কি তাঁর লক্ষ্য তারও একটু আভাস যেন আমরা পাই।

ভারতবর্ষে তৎকালে কয়েকটি ক্ষত্রিয় কুল প্রধান হয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতেন এবং পারস্পরিক সংগ্রামে একে অপরের রাজত্ব কেড়ে নিয়ে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করতেন। তাদের মধ্যে প্রধান হল, কুরু, পাঞ্চাল, কোশল এবং মগধ। মগধরাজ জরাসন্ধের প্রভাব ও প্রতাপ তখন অধিকতর। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিলেন, সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়ে তার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছে চেদিরাজ উগ্রতেজা শিশুপাল। কাশীরাজও জরাসন্ধের অনুবর্তী। এদিকে আবার বাংলা দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ তৎকালীন পৌণ্ড্র, তার রাজা পৌণ্ড্রবাসুদেব, তিনিও জরাসন্ধের মিত্র। এই পৌণ্ড্রবাসুদেব নিজেকে পুরুষোত্তম বলে মনে করে এবং শ্রীকৃষ্ণের চিহ্ন শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করে নিজেকে প্রকৃত বাসুদেব বলে প্রচার করে। শ্রীকৃষ্ণকে সে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। শিশুপালও অত্যন্ত কৃষ্ণবিদ্বেষী। শ্রীকৃষ্ণের এই পিসতুতো ভাইটি দমঘোষের পুত্র শিশুপাল, রুক্মিণীর প্রণয়প্রার্থী হয়েছিল। তাঁকে বিয়েও করতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহের দিনে হরণ করে নিয়ে এসে নিজে বিবাহ করেন। ফলে পূর্ববৈরী শিশুপাল আরো তীব্রভাবে ঈর্ষায় ও প্রতিহিংসায় জ্বলছে। তাদের সঙ্গে আবার রয়েছে উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম-ভারত জুড়ে, বিশাল ভারতবর্ষের প্রায় একচতুর্থাংশের অধিশ্বর, রুক্মিণীর পিতা, ভোজবংশীয় বিদর্ভরাজ ভীষ্মক। শৌর্যে ও বিক্রমে যিনি পরশুরামের তুল্য।

এখানেই শেষ নয়। শত্রুর শক্তি ও প্রতিপত্তি আরো বিস্তৃত। দন্তবক্র করূষ ও করভ রাজ্যের রাজা মেঘবাহন কূটযোদ্ধা সে। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত, যিনি শিরে দিব্যমণি ধারণ করেন, তিনিও জরাসন্ধের অনুবর্তী। যুধিষ্ঠিরের মাতুল শত্রুনিসূদন পুরুজিৎ জরাসন্ধের বন্ধু। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামে দুই বীর তাদের অনুগত। মধ্যভারতের খণ্ডরাজা কালযবন, সে একবার মথুরা অবরোধ করেছিল। এই সকল রাজাদের মিলিত শত্রুতার সামনে যুধিষ্ঠিরকে দাঁড়াতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, জরাসন্ধের প্রতাপে ভীত হয়ে সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শাল্বায়ন প্রমুখ দেশীয়রাজারা উত্তর-ভারত থেকে পালিয়ে দক্ষিণ-ভারতে চলে গেছে। পাঞ্চাল দেশীয় অনেক রাজাও রাজত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। উত্তর-ভারত থেকে আঠারটি ভোজবংশীয় রাজা শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, প্রভৃতি প্রাণভয়ে পলাতক।

ভারতের ছিয়াশি জন রাজাকে জরাসন্ধ নিজ রাজ্যে বন্দী করে রেখেছে। আরো চোদ্দজন রাজাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে মোট একশত নৃপতিকে সে

তার দেবতার মন্দিরে বলি দেবে। সুতরাং জরাসন্ধকে পরাজিত বা নিহত না করলে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করা নিষ্ফল।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে যুধিষ্ঠির রীতিমত ভীত হলেন। তিনি বললেন, "তাহলে কাজ নেই রাজসূয় যজ্ঞে। রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করলেও আমি তা শেষ করতে পারব না। তার চেয়ে আমি শান্তিকেই ভাল মনে করি। শান্তি থেকেই আমার মঙ্গল লাভ হবে—শমমেব পরং মন্যে শমাৎ ক্ষেমং ভবেন্মম।" (সভাপর্ব, ১৫ অধ্যায়)

যুধিষ্ঠিরের এই শান্তিবাক্য দুর্বলের অক্ষমের উক্তি। তিনি সম্রাট হতে চান, তাঁর ভ্রাতারাও তাই চান, স্বয়ং নারদ এবং ধৌম্য ঋষিও অনুমোদন করেছেন; কিন্তু যেহেতু কাজটি অতিশয় দুরূহ, নিজ সামর্থ্যে আস্থাহীন যুধিষ্ঠির তাই অগত্যা শান্তি চান। যদিও যুধিষ্ঠির ধর্মগুণে গুণবান্, বংশানুক্রমে ন্যায্য অধিকারে এবং দেশের পূর্বপ্রচলিত নিয়মে সম্রাট হবার অধিকারী। কিন্তু তাঁর ছিল তেজ ও প্রতিভার অভাব, সামর্থ্যের অভাব। তিনি ধর্মপুত্র, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্মা, দয়াবান্, ন্যায়পরায়ণ, এসকল গুণে তিনি বিভূষিত। কিন্তু তাঁর ছিল না, অন্তত তখনও আয়ত্তে আসেনি যে বস্তু তা হল, শক্তি তেজ প্রতিভা অমোঘ সামর্থ্য। বরং তেজস্বীতায় প্রতিভায় তখন অনেক রাজাই ছিল তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চান সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যে সংহত শক্তিতে পরিণত করতে। সে রাজ্য হবে ধর্মরাজ্য, ধর্ম ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর সকল দুর্বলতা অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর কাজে একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে নির্বাচিত করলেন।

কুরুজাতি ভারতে অনেক দিন থেকেই নেতৃস্থানীয়। কিন্তু সে গর্বিত, উদ্ধত, অধার্মিক। তাই কুরুকুল যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন ধর্মসংস্থাপন সম্ভব নয়। সুতরাং কুরুকুল ধ্বংস তাঁকে করতে হবে।

তবু তিনি প্রথমে তৎকালীন প্রথাসিদ্ধ পথেই পা বাড়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ভার নিলেন। জরাসন্ধ বধের দায়িত্বও তিনি নিলেন। কিন্তু পুরাতন প্রথা পুরাতন বিধানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নবধর্ম নবশক্তির তেজ সঞ্চার করলে সে আধার সে আয়তন ভগ্ন চূর্ণ হয়ে যাবে একথাও তিনি জানতেন। রাষ্ট্র ও সমাজে এর ফলে বিপ্লব আসবে। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালীন সমাজে একজন প্রধান বিপ্লবী। তাই ভূরিশ্রবা তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, ভূরিশ্রবার সেই তিরস্কার তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের মিলিত প্রতিক্রিয়া বলেই আমরা ধরব, ভূরিশ্রবার অভিযোগ, শ্রীকৃষ্ণ

প্রচলিত সমাজ-বিধান ন্যায়-নীতি লঙ্ঘনকারী। শ্রীকৃষ্ণকে তাই দেখি পদে পদে প্রধানদের কাছে নিন্দিত হতে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল যে কৃষ্ণনিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল, তা শুধু তার একার মত ছিল না, ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য এতখানি প্রকাশ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের সামনে শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করতে সে সাহস পেত না। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী বিরাট এক রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধি মুখপাত্র বলতে পারি। শেষপর্যন্ত তো দেখি সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে শিশুপালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র মন্ত্রণায় সঙ্ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। যে ছিয়াশিজন রাজাকে জরাসন্ধের ঘাতকের হাত থেকে প্রাণে রক্ষা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তারাও যজ্ঞে উপস্থিত ছিল, কই তারাও তো শিশুপালের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল না ?

তাই অগত্যা বাধ্য হয়েই শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলেন। এই প্রথম আমরা প্রত্যক্ষ করলাম শ্রীকৃষ্ণের হাতে একটি নরহত্যা। অবশ্য এর আগেই জরাসন্ধ বধ হয়েছে, কিন্তু সে ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষক এবং পরিচালক মাত্র। বধ করেছিলেন ভীম। আমরা এরই ভিতরে কথায় কথায় শুনে নিয়েছি শ্রীকৃষ্ণের কংস ও নরকাসুর বধের কথা। কিন্তু সেসব ঘটেছে আমাদের চোখের আড়ালে। আমরা তা জেনেছি অনেকটা আধুনিক নাটকের ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মত করে। যারা নিহত হল তারা সবাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মীয়। শিশুপাল তাঁর পিসতুতো ভাই, কংস তাঁর মাতুল, আবার সে জরাসন্ধের জামাতা। তখনকার দিনে আত্মীয়তা ও কুলের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। যে-অবস্থার মুখোমুখী হয়ে অর্জুন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে তাই ঘটে চলেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রতিপদে তাঁকে এই অগ্নি উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।

পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়ের ভিতর দিয়েও আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান, তাদের শৌর্যবীর্য, সেনাবল, অর্থবল, বাণিজ্যিক বিভাগ ও সমাজ বিন্যাসেরও একটা চিত্র পাই। সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। দেখলাম বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে শত বিরোধ সত্ত্বেও একটা অখণ্ড ঐক্যের ভাবনা তাদের অন্তরে ছিল। নইলে শিশুপাল বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের কর দিতে এবং রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হতে সম্মত হ'ত না। মহারাজ ভীষ্মক এবং ভগদত্তও কোন যুদ্ধ করেননি। কিন্তু তাদের এই শুভ সত্ত্ব-বুদ্ধি উগ্র অশুদ্ধ রজঃ-র প্রভাবে পরিণামে কার্যকরী হতে পারল না। তাই ভারতের সেই চণ্ড রাজসিক বৃত্তিকে সত্ত্বে বিধৃত করে অখণ্ড ভারতের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য।

পঞ্চপাণ্ডবের স্বভাবেরও একটা পরিচয় পেলাম। দেখলাম যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ, অর্জুন যুদ্ধজ্ঞ, ভীম ক্রোধনস্বভাব শত্রুহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রাহী আর সহদেব নিয়মপালক।

কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে উঠল।

ক্ষত্রিয়জীবঘাতী এক মহদ্ভয় উপস্থিত হল।

একদিকে কৌরবের ঈর্ষানল, আর একদিকে ভাগ্যের কালানল। বিদুর সেটা দেখতে পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "বৈশ্বানরং প্রজ্বালিতং সুঘোরং মা যাস্যধ্বং মন্দমনুপ্রপন্নাঃ (সভাপর্ব, ৫৫ অধ্যায়)—মহারাজ, আগুন জ্বলে উঠেছে, মূর্খের অনুসরণ করে তার ভিতরে গিয়ে পড়বেন না। এই দ্যূতক্রীড়া নরকের দ্বারস্বরূপ—দ্বারং সুঘোরং নরকস্য জিহ্মং (সভাপর্ব, ৬৩ অধ্যায়)। এর ভিতরে কোন দৈব নেই—নৈতদস্তীতি।"

কিন্তু বিনাশকালে তো বিপরীত বুদ্ধি হয়। বিদুরের হিতবাক্য ধৃতরাষ্ট্র শুনলেন না। তাঁর অন্তরে তখন পাপের কালসর্পের গূঢ়ফণা বিস্তার করেছে। কিন্তু মুখে তখনও ধর্মকথা। এ আচরণ তাঁর সম্পূর্ণ ভণ্ডামীও নয়। ধৃতরাষ্ট্রের সত্তার মধ্যে যে নিদারুণ দ্বন্দ্ব—তারই প্রকাশ এই ধর্ম ও অধর্মে দোলাচলচিত্ততা। ধার্মিক নীতিজ্ঞ বিদুরকে তিনি বারবার ডাকেন সুপরামর্শের জন্য। তাঁর বাক্যের সত্যতা অবিশ্বাসও করেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদুরের কোন উপদেশ তিনি মানতে পারেন না। অন্যায় হচ্ছে জেনেও পারেন না। পাপীর মন আর তার বিবেকের মধ্যে যে সম্পর্ক, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের মধ্যেও সেই সম্পর্ক।

বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "না, সুহৃদ্দ্যূতে কোন দোষ নেই।"

সুতরাং পাশাখেলার আয়োজন হল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতীক এই পাশাখেলা। যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ পরিণামে ঘটবে এ যেন তারই একটা নাটকীয় প্রতীক তির্যক্ আভাস। বিষ রক্তের ভিতরে শিরায়-শিরায় চারিয়ে গেল। বস্তুত সেকথা শকুনি স্পষ্ট বলেই দিল দুর্যোধনকে, "পাশাই আমার ধনু, পাশাই আমার বাণ, পাশার হৃদয়ই ধনুকের জ্যা, এবং আসনই আমার রথ।"

> গ্লহান্ ধনূংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ।
> অক্ষানাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাসনম্॥
>
> (সভাপর্ব, ৫৪ অধ্যায়)

চার যুগের নিয়তি একত্রিত হয়ে তৈরী হয়েছে এই পাশা। পাশার এক একটি চাল এক এক যুগ সূচনা করে। পাশার যেটা উৎকৃষ্ট চাল তাকে বলে "কৃৎ" অর্থাৎ সত্যযুগ। আর নিকৃষ্ট দানকে বলে "কলি"। আর মাঝের দুটি মধ্যম দানকে বলে "ত্রেতা" ও "দ্বাপর"।

আমরা ঋষি বৃহদশ্বর কাছে জেনেছি, কেমন করে দ্বাপর ও কলি ষড়যন্ত্র করে নিষাদরাজ নলের শরীরে এবং তাঁর পাশার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। পাশার মধ্যেই চার যুগের শক্তি। পাশার তেপান্নটি পীত ও লোহিত গুটিকা সেই শক্তিতেই ছকের বুকে একবার উপরে একবার নীচেয় উঠছে আর নামছে—"ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীড়তি ব্রাত এষাং"... "নীচা বর্তন্ত উপরি স্ফুরন্ত"... (ঋগ্বেদ, ১০, ৩৪, ৮-৯)। নলদময়ন্তীর উপাখ্যান শুনিয়ে শেষে ঋষি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে নিখিল-অক্ষবিদ্যা দান করেছিলেন। (বনপর্ব, ৭৯ অধ্যায়) নিষাদরাজ নলও তাঁর চরম দুঃখের ভিতরে রাজা ঋতুপর্ণার কাছ থেকে "অশ্বহৃদয়" অর্থাৎ অক্ষক্রীড়ার গূঢ়বিদ্যা লাভ করেন। (বনপর্ব, ৭৭ অধ্যায়) যুধিষ্ঠির ও নলের ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে কূট পাশা, সেই অক্ষক্রীড়ার গূঢ়বিদ্যা দুজনেরই জানা ছিল না।

বলেছি প্রত্যেকের অন্তরের মর্মস্থলটি এখানে একে একে উদঘাটিত হয়ে যাচ্ছে যেন নিয়তিরূপ এই পাশারই যাদুস্পর্শে।

দেখলাম দুর্যোধনকে—

যার সম্মুখে অন্তরাল, পশ্চাতে ভয়, অন্তরে ঈর্ষার আগুন। একটা মহাবৃক্ষ যেন আগুন লেগে দাউ-দাউ করে জ্বলছে—"মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ"। সে নিজেও বলছে, "আমি এক নিদারুণ সন্তাপ বহন করে চলেছি। আমি ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছি—দাহ্যমানেন চেতসা। এক দণ্ডও শান্তি পাচ্ছি না।" (সভাপর্ব, ৪৫ অধ্যায়)

যদিও শুরুতে দুর্যোধনের মতলব মাত্র একটাই ছিল। যে কোন ছলে হোক কেবল পাণ্ডবদের রাজ্য আত্মসাৎ করে নেওয়া। আর কারো কোন অনিষ্ট হোক তা সে চায়নি। তাই মন্ত্রণা করবার সময় শকুনিকে সে বলছে, "দেখ মামা, আমাদের কোন অসাবধানতায় আমাদের বন্ধু আত্মীয়দের যেন অন্য কোন বিপদ না হয়। অথচ আমরা যাতে পাণ্ডবদের সর্বস্ব জিতে নিতে পারি তারই ব্যবস্থা কর।" (সভাপর্ব, ৪৫ অধ্যায়)

কিন্তু এমন সহজে যখন মতলব হাসিল হল তখন দুর্যোধন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তবু তার ব্যবহার মোটামুটিভাবে ভদ্রই ছিল, কেবল "ক্ষত্তা" বিদুরকে প্রাণভরে গালিগালাজ করে গায়ের ঝাল মেটানো ছাড়া।

কিন্তু হঠাৎ এ কি? আমরা চমকে উঠলাম। যখন সে সামান্যতম শালীনতাটুকু ভুলে হঠাৎ তার পরনের বসন সরিয়ে সর্বলক্ষণযুক্ত হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুডৌল বজ্রতুল্য সুন্দর—"গজহস্তপ্রতীকাশং বজ্রপ্রতীমগৌরবম্"—তার বাম ঊরু দ্রৌপদীকে দেখিয়ে কুৎসিতভাবে হাসল। এতক্ষণ সে ছিল লোভী, ঈর্ষান্ধ, দাম্ভিক, তাকে তবু সহ্য করা যায়, একটু সহানুভূতি নিয়ে হয়তো তার দিকে তাকানও যায়, কিন্তু তার এই আকস্মিক আচরণে সে নেমে গেল অনেক নীচেয়। ঘৃণায় আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এর তুলনায় কুরুক্ষেত্রে তার মৃত্যু তো শারীরিক মৃত্যু মাত্র।

দেখলাম কর্ণকে—

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরা সভায় তাকে দেখে আমরা তো ভালবেসেই ফেলেছিলাম। আমাদের সবখানি ভালবাসা আর সমবেদনা সে জয় করে নিয়েছিল। ধনু উত্তোলন করতেই আমরা বুঝেছিলাম, এ-ই সক্ষম বীর। এ-ই পারবে লক্ষ্যবেধ করতে। কিন্তু তার সমস্ত বীরত্ব তেজস্বীতা সত্ত্বেও হীন কুলোদ্ভব সূতপুত্র রাধার নন্দন বলে প্রত্যাখ্যাত হল পাঞ্চালীর কাছে। কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সে চলে গেল সভা ত্যাগ করে আমাদের হৃদয় কেড়ে নিয়ে। আর অনুমান করতে পারি, ঠিক সেই সময়ে পাঞ্চালের গ্রামে গরীব এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিয়ে আছেন যে ভিখারিণী পঞ্চপুত্রের ভিক্ষার প্রতীক্ষায়, কর্ণের প্রত্যাখ্যানের সংবাদ শুনে তাঁর মাতৃহৃদয়ের গোপন দীর্ঘশ্বাস—লজ্জা আর গর্বে ভরা তাঁর অস্থির বুকের স্পন্দন।

সেই অপমানের প্রতিহিংসায় কর্ণ এবার বিষ উদ্গীরণ করতে লাগল দ্রৌপদীর উপর। যা-কিছু কটুবাক্য সবই বলেছে কর্ণ। বলেছে, "যাজ্ঞসেনি, তুমি একবস্ত্রাই হও আর বিবস্ত্রাই হও, যার পঞ্চ স্বামী সে তো বেশ্যা।"

আমরা বুঝতে পারি এসব অশ্লীল ভাষণ কর্ণের আহত-পৌরুষের বিকৃত প্রকাশ। অন্তরে তার ছিল পাঞ্চালীর প্রতি ভালবাসা-মিশ্রিত এক শ্রদ্ধা। তাই কর্ণ আবার শেষে দ্রৌপদীর প্রশংসা করে উঠল আন্তরিক ভাষায়, বলল,

যা নঃ শ্রুতা মনুষ্যেষু স্ত্রিয়ো রূপেণ সম্মতাঃ।
তাসামেতাদৃশং কর্ম ন কস্যাশ্চন শুশ্রুম॥

(সভাপর্ব, ৭০ অধ্যায়)

(আমরা মনুষ্যলোকে যত সুন্দরী নারীর কথা শুনেছি তাদের মধ্যে কোন রমণীই এমন প্রিয়কর্ম করেছে বলে শুনিনি।)

দেখলাম ধৃতরাষ্ট্রকে—

তাঁর জীবনে মধুও বিষ হয়ে কাজ করে। রাজা পৃথুর সময়ে পৃথিবী-মন্থন কালে ধৃতরাষ্ট্র মন্থন করে তুলেছিলেন বিষ। (হরিবংশ, ১/৬/২৭) সেই বিষেরই জ্বালা আর দহন শুধু তাঁর ভিতরেই নয়, সমগ্র কুরুবংশে। তবু এতখানি নীচেয় তিনি আর কখনো নামেননি।

পাশা খেলা চলছে…

যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন…

এবার শেষ পণ—দ্রৌপদী।

দ্রৌপদীর নামে পণ রাখা হলে সভাস্থ সকল রাজা একসঙ্গে "ধিক্ ধিক্" বলে অসম্মতি জানালেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ লজ্জায় নতশির ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন। বিদুর মস্তক ধারণ করে প্রাণহীনের মত পড়ে রইলেন।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ?

তিনি আর নিজের স্বরূপটি কিছুতেই গোপন রাখতে পারলেন না—"হৃষ্যকারং নাভ্যরক্ষত"। নির্লজ্জ লোভে আর আনন্দে বারবার তিনি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "কিং জিতং কি জিতমিতি ?"

এতখানি নগ্ন নীচতা ধৃতরাষ্ট্র আগে কখনও প্রকাশ করেননি।

তাই দ্রৌপদীর ধিক্কার ওই অভিশপ্ত দ্যূতসভার মর্মে যেন শেল বিদ্ধ করল, "ধিক্, ভারতবর্ষের ধর্ম লোপ পেয়েছে। ক্ষত্রিয় ধর্মজ্ঞদের চরিত্রও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এই সভার কুরুবৃদ্ধগণ ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন হতে দেখেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন। রাজাদের ধর্ম কোথায় গেল—ক্ব নু ধর্মো মহীক্ষিতাম্ ?" (সভাপর্ব, ৬৪ অধ্যায়)

সাধ্বী ধর্মতেজা গান্ধারী অন্তঃপুর থেকে ছুটে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, "মহারাজ, এখনও সময় আছে। এই অধর্ম বন্ধ করুন। দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। তার পাপে কুরুকুল ধ্বংস হতে বসেছে।"

দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে অকস্মাৎ দৈববাণীর মত বললেন, "আজ থেকে চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে দুর্যোধনের অপরাধে কুরুকুল ধ্বংস হবে।" এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

এতক্ষণ পরে দ্রোণও তার মৌন ভঙ্গ করে বললেন, "দুর্যোধন, তোমার এই সুখ হেমন্তকালে তালচ্ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। আজ থেকে চতুর্দশ বৎসরে তোমাদের বিনাশ।"

কিন্তু নিজ ভাগ্যের হাতে অসহায় অক্ষম ধৃতরাষ্ট্র শেষে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "এই বংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তবুও আমি তা নিবারণ করতে

পারছি না। অন্তঃ কামং কুলস্যান্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্।" (সভাপর্ব, ৭২ অধ্যায়)

আর এদিকে যুধিষ্ঠিরও জানতেন এই সর্বনাশা পরিণাম। এ নিয়তি, এ অবশ্যম্ভাবী। "দারুণ অগ্নিতেজে যেমন দৃষ্টিশক্তি হরণ করে তেমনি দৈব মানুষের বুদ্ধি হরণ করে। আমি জানি এই পাশা খেলায় কুরুকুল বিনাশ হবে। তবু ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ডেকেছেন—আমি সব জেনেও তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারব না।"

অক্ষদ্যূতে সমাহ্বানং নিয়োগাৎ স্থবিরস্য চ।
জানন্নপি ক্ষয়করং নাতিক্রমিতুমুৎসহে॥ ৪
(সভাপর্ব, ৭৩ অধ্যায়)
জানন্নপি মহাবুদ্ধি পুনর্দ্যূতম্ বর্তয়ৎ।
অপায়ং নো বিনাশঃ স্যাৎ কুরুণামিতি চিন্তায়ন্॥ ১৮
(সভাপর্ব, ৭৩ অধ্যায়)

(বিপদের কথা জেনেও এবং এই কারণেই কুরুবংশের বিনাশ হবে এইরূপ চিন্তা করতে করতে যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেলা আরম্ভ করলেন।)

দুইটি বৃক্ষ, একটি "মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ" আর একটি "ধর্মোময় মহাদ্রুমঃ" —দুইটি বৃক্ষের মর্মবাণী যেন ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের মুখের ওই দুইটি শ্লোক।

[চার]

দুঃখ যখন দীক্ষা

অতএব যা হবার তা হল।

অপরাহ্নবেলার ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল হস্তিনাপুরের প্রাসাদভবনে। পাণ্ডবেরা বুঝি এবার দুঃখকেই দগ্ধ করবেন দুঃখের দহনে।

কিছুক্ষণ আগেও তাঁরা ছিলেন রাজা। কিন্তু এখন ভিক্ষুক। পঞ্চপাণ্ডব খুলে ফেলেছেন মাথার মুকুট, অঙ্গের কনকভূষণ, রাজপরিচ্ছদ। তাঁরা এখন নিরাভরণ, নগ্নগাত্র, নগ্নপদ, পরিধানে একখণ্ড চীরবাস মাত্র। তাঁদের চারিদিকে হীনচেতা ক্ষুদ্রদের উপহাস আর বিদ্রূপ। সেসবের মধ্যে অগ্নি-নিক্ষিপ্ত কাঞ্চনের মত পঞ্চপাণ্ডব দীপ্যমান।

একে একে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করলেন অর্জুন ভীম নকুল ও সহদেব। কৌরব-প্রাসাদ কেঁপে উঠল তাঁদের প্রতিজ্ঞায়।

কিন্তু যুধিষ্ঠির নীরব।

তাঁর দৃষ্টি উদাস…

কোন উপহাস কোন কোলাহল তাঁর শ্রবণে যেন পৌঁছাচ্ছে না। তিনি করজোড়ে বিনম্র দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। পশ্চাতে তাঁর চার ভাই ক্রোধে আক্রোশে প্রতিহিংসায় জ্বলছেন। কিন্তু কি এক অলক্ষ্য সংযম তাঁদের ধরে রেখেছে, নইলে হয়তো সেই দিনই হস্তিনাপুরের প্রাসাদ, কৌরবদের সকল দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে যেত। সেই সংযম, সেই ধৃতি, সেই অটল সহিষ্ণুতার বীর্য যুধিষ্ঠিরের। যুধিষ্ঠিরের এই ভাগবত-গুণান্বিত নম্রতা শত্রুতাপন ভীমের বাহুবলের সব্যসাচী অর্জুনের যুদ্ধবলের চেয়েও অনেক বড়। পাণ্ডবদের সর্বজয়ী শক্তির বীরত্বের মূল প্রতিষ্ঠা এই ভাগবদ্ নম্রতা—Divine humility। শুদ্ধসত্ত্ব বিনয়নম্র পবিত্রতা। আর তা তাঁরা লাভ করেছেন, হয়তো নিজেরাও জানেন না, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে। সভাপর্বে আমরা দেখেছি শ্রেষ্ঠত্বের অর্ঘ্যে বরণীয় শ্রীকৃষ্ণ, বেছে নিয়েছেন সমাগত ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেবার মত অতি বিনীত কর্মটি। সারা মহাভারত জুড়ে সর্বত্রই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখি বিনীত, শান্ত, জ্যেষ্ঠদের প্রতি, ব্রাহ্মণ তপস্বীদের প্রতি প্রণত। যদিও তিনি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ভাস্কর, তেজ বল ও পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবেরা তাঁর প্রসাদে এই গুণটি লাভ করেছেন। বিশেষ করে

যুধিষ্ঠির। তাঁদের এই স্বভাবলক্ষণটি শত্রুদের মনেও গোপন শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়েছে। যেখানেই যে-অবস্থায়ই কোন অত্যুৎকৃষ্ট নম্রতা ও বিনয় কর্ম তারা লক্ষ্য করেছে সেখানেই তারা অনুমান করে নিয়েছে পাণ্ডবদের উপস্থিতি। বিরাট রাজার গোধন অপহরণের সময় যে যুদ্ধ বেধে উঠল তাতে কৌরবেরা বিস্মিত হয়ে দেখল, রাজকুমার উত্তরের রথে এক নপুংসকের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত শর সহসা এসে দ্রোণের চরণসমীপে নত হয়ে ভূমি বিদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল, এ অর্জুন। অর্জুন ছাড়া আর কেউ নয়। যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রথমেই সে গুরু দ্রোণাচার্যকে শরনিক্ষেপ করে প্রণাম জানাচ্ছে। অর্জুনকে চিনবার জন্য আর কোন প্রমাণের দরকার হল না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগের সময়ও দেখি দাম্ভিক আত্মম্ভরি দুর্যোধন বসেছে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের শিয়রের কাছে, আর 'তেন প্রপন্ন' অর্জুন বসেছেন তাঁর চরণপ্রান্তে। যুদ্ধের পরিণাম যে কি হবে তা তো স্থির হয়ে গেল তখনই। জয়-পরাজয়ের ইঙ্গিত দুজনের এই উপবেশনের স্থান ও ভঙ্গি।

ঠিক তেমনি আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভে সহসা যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে পড়লেন। নিজের বর্ম ও অস্ত্র ত্যাগ করে শত্রুব্যূহ ভেদ করে ছুটে চললেন। সকলে স্তম্ভিত। কি করছেন যুধিষ্ঠির? তিনি কি ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করছেন? তিনি এলেন পিতামহ ভীষ্মের কাছে, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে, তাঁদের চরণে প্রণাম করে যুদ্ধের অনুমতি নিতে। এই হলেন যুধিষ্ঠির।

শুধু বীরত্বে বংশগৌরবে এমনকি তপস্যাতেও এই নম্রতা লাভ হয় না। এ এক ভগবদ আশীর্বাদ—Divine Grace—অন্তরাত্মার এক বিশেষ আভিজাত্য। অন্তরের দিক থেকে চরিত্রের দিক থেকে খুব বড় যাঁরা তাঁরাই পারেন এমনি নত হতে। পাণ্ডবদের, বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের আছে এই দিব্য সম্পদ।

অবশ্য এর একটা নকল কৃত্রিম রূপ আমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যা দুর্বলতা তামসিক অহঙ্কারের একটা রঙীন আবরণ মাত্র। যার চাকচিক্য গিল্‌টি-করা গহনার মত। তবে সহজেই তার মিথ্যাটা ধরা পড়ে যায়। যেমন ধরা পড়ে গিয়েছিল পাণ্ডবদের প্রতি ছদ্ম ব্রাহ্মণবেশী জটাসুরের কপট বিনয় ও আনুগত্য।

যুধিষ্ঠির করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে।

তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "ভরতবংশের সকলকে আমাদের প্রণাম।

আশীর্বাদ করুন, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা বিদায় গ্রহণ করি। ত্রয়োদশ বর্ষ পরে ফিরে এসে আবার আপনাদের দর্শন লাভ করব।"

তাঁরা একে একে প্রণাম ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করলেন পিতামহ ভীষ্মকে কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রকে, রাজা সোমদত্তকে, বাহ্লীক, দ্রোণ, অশ্বত্থমা এবং সর্বশেষ বিদুরকে।

সবাই নতমুখে নীরব হয়ে রইলেন।

হয়তো তাঁরা মনে-মনে তাঁদের শুভানুধ্যান করতে লাগলেন।

বিদুর বললেন, "আর্যা কুন্তী বৃদ্ধা সুকুমারী, তাঁর বন গমনের প্রয়োজন নেই। তিনি সসম্ভ্রমে আমার গৃহেই বাস করবেন। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনি পিতৃব্য, আমাদের পিতার সমান, আপনি যা আজ্ঞা করবেন আমরা তাই পালন করব। আমরা তাহলে আসি?"

বিদুর তখন যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি কথা বললেন। বিদুরের এই উপদেশ জাগ্রত দেবতার বরাভয়ের মত পাণ্ডবদের দীর্ঘ বনবাসের একমাত্র পাথের হয়ে রইল।

বস্তুত এই বনবাস যে দৈবনির্দিষ্ট, এক পরম মঙ্গল ও সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন তারই ইঙ্গিত যেন বিদুরের এই শেষ উপদেশ।

ভাবতে অবাক লাগে, এত বড় ভাগ্যবিপর্যয় হয়ে গেল পাণ্ডবদের, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অনুপস্থিত। তিনি ইচ্ছা করলেই নিবারণ করতে পারতেন, তিনি তো অন্তর্যামী, পাণ্ডবদের মিত্র, সখা, দিশারি। তাঁর এই রহস্যজনক অনুপস্থিতি আরো প্রমাণ করে যে, এর প্রয়োজন ছিল। পাণ্ডবেরা সরল, শুদ্ধ, ধার্মিক, কিন্তু অর্বাচীন। তাঁদের সকল বীরত্ব জ্ঞানে তপস্যায় ওজস্বীতায় তখনও সিদ্ধ হয়ে ওঠেনি।

তাই বিদুর বললেন,

সোমাদাহ্লাদকত্বং ত্বমদ্ভ্যশ্চৈবোপজীবনম্।
ভূমেঃ ক্ষমাঞ্চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্বলাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদঃ ॥ ১৬
(সভাপর্ব, ৫৭ অধ্যায়)

(তুমি চন্দ্র থেকে আনন্দ, জল থেকে জীবন, পৃথিবী থেকে ক্ষমা, সূর্যমণ্ডল থেকে তেজ, বায়ু থেকে বল, এবং সর্বভূত হতে যাবতীয় গুণ লাভ কর।)

-বনবাসের প্রাক্কালে এই হল যুধিষ্ঠিরের দীক্ষা।

বিদুর এই কথাগুলি কিন্তু বলছেন একা যুধিষ্ঠিরকেই লক্ষ্য করে। আমরাও দেখি, এই বনপর্বের নায়ক যুধিষ্ঠির। এই পর্বে বেদব্যাস কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলছেন যুধিষ্ঠিরের উপরে। এক স্থির আলোকসম্পাতে ভাস্বর হয়ে উঠছেন যুধিষ্ঠির। তার অন্তরের দ্বন্দ্ব জিজ্ঞাসা অনুসন্ধান তপস্যা প্রেম প্রীতি ক্ষমা সব নিয়ে, যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে বলিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। এই বনবাস তাঁর কাছে রাজ্যলাভের চেয়েও বহুগুণে শ্রেয়স্কর এক আশীর্বাদ।

পাণ্ডবদের এই বিদায় দৃশ্যটি অতি মন্থর অতি বিলম্বিত। নির্জন, বিরল, অসীম, উদাসীন এক সুর এসে আমাদের হৃদয়কে টান দেয়। জীবনের সকল দুঃখক্লেশ তাতে আভাময় হয়ে ওঠে। বেদব্যাসের বর্ণনা এখানে বড় কাতর কিন্তু বড় সুন্দর।

এর তুলনা একমাত্র রামায়ণে শ্রীরামের বনবাস যাত্রার দৃশ্যে। সেদিনও অযোধ্যার রাজঅন্তঃপুরে মহা আর্ত রব উঠেছিল—

আর্তশব্দো মহান্ জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে।

প্রজামণ্ডলীর মধ্যে গভীর পরিতাপ আর হাহাকার। বৃদ্ধ রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যা নগ্নপদে ধূলিলুণ্ঠিত বসনে দুহাত প্রসারিত করে রামের রথের পিছনে পিছনে ছুটেছেন। রাজাধিরাজ দশরথের ও রাজমহিষীর এই আকুল অবস্থা দেখে এবং প্রজাদের হাহাকার শুনে রামচন্দ্র বললেন, "সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ চালাও। আমি আর এ-দৃশ্য দেখতে পারছি না।"

পথের দুপাশে প্রজারা সুমন্ত্রকে মিনতি করে বলছে, "হে সারথি, তুমি অশ্বের বল্গা সংযত করে একটু ধীরে ধীরে রথ চালাও, আমরা শ্রীরামচন্দ্রের মুখখানি একবার দেখে নিই। আবার কবে দেখতে পাব।"

সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যামো রামস্য দুর্দর্শনো ভবিষ্যতি ॥

(রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড)

তবু রামায়ণে ও মহাভারতে এই দুই মর্মন্তুদ ঘটনার সাদৃশ্য থাকলেও ভাবের ও রসের পার্থক্য অনেক। রামায়ণে যেখানে হৃদয়ের মর্ম-ছেঁড়া কারুণ্য, মহাভারতে সেখানে নিষ্করুণ কঠোর বৈরাগ্য। রামায়ণে যেখানে অশ্রু, মহাভারতে সেখানে দীর্ঘশ্বাস। বেদব্যাস তাই মাতা কুন্তীকে শোকার্ত জনতার মধ্যে রাজপথে কৌশল্যার মত এনে দাঁড় করাননি। বাল্মীকি যেখানে মহাকবি, বেদব্যাস সেখানে মহাতপস্বী।

দ্রৌপদী বিদায় নিলেন কুন্তী ও কৌরব পুরনারীদের কাছে। কৌরবের অন্তপুরে দুর্যোধনাদির পত্নীরা দ্রৌপদীর অপমানের বিবরণ শুনে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। দেখে আনন্দ হয়, কৌরবের অন্তপুরে এখনো ধর্ম ক্ষয় হয়ে যায়নি। কেননা সে অন্তঃপুরের রাজ্ঞী যে গান্ধারী! ওইসব রোদনবিধুরা পত্নীদের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কেমন করে মুখ দেখিয়েছিল? পত্নীদের ধিক্কার-দৃষ্টির সামনে তারা সঙ্কুচিত হয়ে মূঢ়ের মত দাঁড়িয়েছিল নাকি?

এদিকে রাজপথে প্রজাদের অসন্তোষ, কোলাহল, ধিক্কার। প্রজারা প্রকাশ্যে ধিক্কার জানাচ্ছে এই শঠতার এই প্রবঞ্চনার এই মিথ্যার বিরুদ্ধে। হস্তিনাপুরের ঘরে ঘরে সেদিন প্রদীপ জ্বলেনি। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্র করেননি। এক শোকাতুর জনতা রাজপথে পাণ্ডবদের অনুসরণ করে চলেছে।

রাজ্য হারিয়ে পাণ্ডবরা বুঝলেন তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত রাজা। তাঁদের রাজসিংহাসন পাতা প্রজাদের অন্তরে। সকল দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই তাঁদের বড় সান্ত্বনা।

এদিকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নির্জন গৃহকোণে বসে জনতার উন্মত্ত চিৎকার শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠছেন। প্রজারা কি তাহলে বিদ্রোহ করল?

তিনি ডেকে পাঠালেন বিদুরকে।

কিন্তু বিদুর এসে তাঁকে কি বলবেন? বললেও সেকথা শুনবার মত মঙ্গলবুদ্ধি কি তাঁর আছে? তার চেয়ে বরং ধৃতরাষ্ট্রের উচিত ছিল তাঁর অপর মন্ত্রী কোণিককে ডাকা। কোণিকের বুদ্ধি অত্যন্ত কূট। রাজনৈতিক মন্ত্রণায় সে পারঙ্গম। তারই মন্ত্রণায় তো ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের পাঠিয়েছিলেন বারণাবতে। জতুগৃহদাহের পরিকল্পনা করে দুর্যোধনের রাজ্যলাভের পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়ার নিষ্ঠুর মন্ত্রণা যার সেই কোণিককেই তো ধৃতরাষ্ট্রের এখন বেশি প্রয়োজন। বিদুরকে কেন?

ধৃতরাষ্ট্র সাগ্রহে বিদুরের অপেক্ষা করছেন। বাইরে হঠাৎ বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দেবমন্দিরের উপর বসে একদল শকুন চিৎকার করছে। হস্তিনাপুরের প্রাসাদ কাঁপছে কেন? ভূমিকম্প? এমন অসময়ে ভূমিকম্প? নগরমধ্যে বজ্র উল্কাপাত হচ্ছে কেন?

—"বিদুর, বিদুর, ধীমান বিদুর, তুমি কোথায়?"

—"মহারাজ, আমায় ডেকেছেন?"

—"হাঁ বিদুর, এসব কিসের দুর্লক্ষণ?"

—"মহারাজ, অকালে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। উল্কাপাত হচ্ছে।"

—"ক্ষত্তা, ওরা চলে গেছে ?"

—"কারা মহারাজ ? পাণ্ডুপুত্রেরা ?"

—"হাঁ ! তুমি বল বিদুর, ওরা কেমন করে গেল ?"

—"মহারাজ, যুধিষ্ঠির বস্ত্রে চক্ষু আবৃত করে চলেছেন। ভীমসেন তার লৌহদৃঢ় বাহু প্রসারিত করে চলেছেন।"

—"আর অর্জুন ? সব্যসাচী অর্জুন ?"

—"অর্জুন দুই হাতে বালুকা ছিটিয়ে যুধিষ্ঠিরের পিছনে চলেছেন। সহদেব আবৃত আননে আর নকুল ধুলিধূসরিত কলেবরে তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে।"

—"আর পাণ্ডবমহিষী, আয়তলোচনা সুকুমারী দ্রুপদ-কুমারী ? সেই কুললক্ষ্মীর অগ্নিদৃষ্টিতে আমার কৌরব বংশ ধ্বংস হবে না তো ?"

—"হাঁ, মহারাজ। তিনি রজস্বলা শোণিতার্দ্রবসনা আলুলায়িত কেশে রোদন করতে করতে চলেছেন। তাঁদের সবার আগে আগে কুশ হস্তে পুরোহিত ধৌম্য চলেছেন বেদমন্ত্র পাঠ করতে করতে।"

পাণ্ডবদের গমনকালের এই প্রতিটি ভঙ্গি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকীয় প্রতীক লক্ষণে চিহ্নিত। সূক্ষ্মবুদ্ধি বিদুর তার অর্থ বলে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি যাতে ক্রুদ্ধ হয়ে না ওঠে, সেই দৃষ্টিতে কৌরবেরা যাতে দগ্ধ হয়ে না যায়, তাই দয়ালু যুধিষ্ঠির চক্ষু আবৃত করে চলেছেন। শত্রুদের উপরে আপন বাহুবল প্রয়োগ করবেন এই কথা জানাবার জন্যই ভীম তাঁর বাহুদ্বয় প্রসারিত করে চলেছেন। অযুত বাণবর্ষণের পূর্বাভাসরূপে অর্জুন বালুকা বর্ষণ করে চলেছেন…

আমরা যেন চোখের উপরে একটা নাট্যদৃশ্য দেখছি। মঞ্চ নির্দেশনায় বেদব্যাসের এই বর্ণনা আধুনিক নাট্যশিল্পকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি শুধু একজন মহাকবি নন, তিনি একজন কুশলী নাট্যকারও।

অনুসরণকারী শোকার্ত জনতাকে অনুনয় করে ফিরিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠির। "হা-রাজা" বলতে বলতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সব ফিরে গেল। তখন পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের সীমা ছাড়িয়ে এসে পৌঁছালেন গঙ্গার তীরে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গঙ্গার কূলে এক প্রবীণ বটবৃক্ষ। সেই প্রমাণবটের তলায় দিনান্তে তাঁরা আশ্রয় নিলেন।

সকলেই ক্ষুধার্ত। কিন্তু আহার্য সংগ্রহের অবকাশও নেই ইচ্ছাও নেই কারো। সে রাত্রে তারা গঙ্গার জল পান করেই রইলেন।

এক ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁদের সঙ্গে রয়ে গেছেন। তাঁরা কিছুতেই পাণ্ডবদের

ত্যাগ করে যেতে রাজী হলেন না। গঙ্গার তীরে সেই প্রমাণবটের তলায়, সেই আঁধার সন্ধ্যায়, তাঁরা হোমাগ্নি জ্বেলে বেদমন্ত্রপাঠে সামগানে শাস্ত্র আলোচনায় যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে দুঃস্বপ্নের সেই প্রথম রাত্রি যাপন করতে লাগলেন।

মনে পড়ে, অযোধ্যা ছেড়ে বনবাসের পথে রামচন্দ্র ঠিক এমনি করেই সন্ধ্যায় গঙ্গার কূলে ইঙ্গুদীবৃক্ষের ছায়ায় ক্লান্ত দেহে বিষণ্ণ মনে কেবল গঙ্গার জল পান করে দুর্ভাগ্যের সেই প্রথম রাত্রি যাপন করেছিলেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মত এমন প্রসন্ন এমন দেবোপম শান্ত বৈরাগ্য নিয়ে নয়। রামচন্দ্র সেই রাত্রি কাটিয়েছিলেন সাশ্রুনেত্রে ক্ষুব্ধ চিত্তে মৌনভাবে সারা রাত উপবিষ্ট হয়ে।

"অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ।"

(রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড)

কিন্তু যুধিষ্ঠির ?

ব্রাহ্মণবেষ্টিত বেদধ্বনিমুখরিত সেই সন্ধ্যার বটমূলে তাঁকে দেখে মনে হয়, তাঁর যেন কোন দুঃখ নেই। এই নিবিষ্ট শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন থাকতে দেখে আমাদের এমন বিশ্বাস হয় যে, রাজ্য হারিয়ে যুধিষ্ঠির বোধহয় স্বস্তি পেয়েছেন। তিনি যেন নিজের আদর্শ পরিবেশকে এতদিনে ফিরে পেয়েছেন। এই বৃক্ষমূল, এই বেদমন্ত্রপাঠ, এই হোমাগ্নি শিখা, এই শাস্ত্রালোচনা, এই যেন যুধিষ্ঠিরের স্বভাবের উপযুক্ত স্থান। তিনি যেন ক্ষত্রিয় নন, তার স্বভাব মূলত ব্রাহ্মণের। তিনি নিজেই বলেছেন সেকথা, "এবমেতন্ন সন্দেহো রমেঽহং সততং দ্বিজৈঃ।" (বনপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়) —এতে কোন সন্দেহই নেই যে আমি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গলাভে আনন্দ অনুভব করি।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে, ঘোর যুদ্ধ সময়ে পরাজিত হতোদ্যম যুধিষ্ঠিরের ঘাড় ধরে কর্ণ ব্যঙ্গ করে বলছে, "বেদ পড়া বামুন, যুদ্ধ করতে এসেছ কেন? যাগযজ্ঞ করগে যাও। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ তোমার কর্ম নয়।" (কর্ণপর্ব, ৫০ অধ্যায়) গালাগালি দিয়ে বললেও কর্ণ তার এই ছোট ভাইটির স্বভাবটি ঠিকই বুঝেছিল। তাই বধ না করে কর্ণ সহজে ছেড়ে দিয়েছিল যুধিষ্ঠিরকে, তার মনে ছিল কুন্তীর কথা, নিজের বধ কথা, যুধিষ্ঠির যে তার ভাই! নইলে সামান্য ক্ষত্রিয় কথায় বিচলিত হবার পাত্র কর্ণ নন।

কিন্তু এখন এই সন্ধ্যায় যুধিষ্ঠিরের চার ভাই আর দ্রৌপদীর মনে কি

প্রতিক্রিয়া ? তাঁরা এখন কি ভাবছেন ? ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের এই তত্ত্বালোচনা কালে তাঁদের মনে কি হচ্ছে ? মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই একমাত্র যুধিষ্ঠিরের কৃতকর্মের ফলে তাঁরা এখন পথে বসেছেন। সেজন্য যুধিষ্ঠিরের কোন অনুতাপ নেই ? দুঃখ নেই ? ভাইদের প্রতি তাঁর কোন কৈফিয়ত নেই ? তিনি দিব্যি বসে তত্ত্বালোচনা করছেন ? যেন কিছুই হয়নি। কোন কালেও তাঁরা রাজা ছিলেন না। এমনি করেই বনে বনে পথে পথে ভিক্ষুকের মত তারা যেন চিরকাল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বেদব্যাস এই মুহূর্তে সে-সবের কিছু বলছেন না। কিন্তু তিনি প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ কবি। মানুষের মনের মধ্যে তাঁর অবাধ গতি। আমাদের এই সব প্রশ্নের কৌতূহলের জবাব তিনি দেবেন পরে। স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত করে দেখাবেন পঞ্চপাণ্ডবের মনের বিভিন্ন আলোছায়ার দিকগুলি। কিন্তু আপাতত তিনি মঞ্চের আলো সম্পূর্ণভাবে ফেলেছেন যুধিষ্ঠিরের মুখে। আমরা দেখছি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের সৌম মুখচ্ছবিতে রয়েছে প্রজ্ঞার দ্যুতি। এক নির্লিপ্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তিনি ব্রাহ্মণ শৌনককে প্রশ্ন করে চলেছেন। যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রে বিশারদ শৌনক মাত্র আটাত্তরটি শ্লোকে আলোচনা করলেন একটা সংক্ষিপ্ত গীতাই। মূল কথা প্রায় গীতার সঙ্গে একই। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিক থেকে শৌনক-সমাচার আর গীতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শৌনকের উদ্দেশ্য যুধিষ্ঠিরকে নিবৃত্তির সন্ন্যাসের ত্যাগের বৈরাগ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করা ; আর গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন স্বভাবধর্মে কর্মে সংগ্রামে।

শৌনক বলছেন, "তৃষাং তাজতঃ সুখম্।" "কুরু কর্ম তাজেতি চ"। (বনপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়) আর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে, "স্বভাব নিয়তং কর্ম"..."যোগস্থ কুরু কর্মাণি"। শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শৌনকের উক্তির অনেক ধাপ উপরের কথা।

কিন্তু আমাদের ভাবতে ইচ্ছা হয়, অর্জুন না-হয়ে যদি হতেন যুধিষ্ঠির ? তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁকে বলতেন স্বভাব নিয়তং কর্ম ? দুজনের স্বভাব তো এক নয়। অর্জুন যথার্থ ক্ষত্রিয় আর যুধিষ্ঠির মূলত ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যমুখী। তাই শৌনক তাকে বলছেন, "সম্যক্ চাধ্যয়নাগমাৎ—সম্যক্ কর্মোপসন্ন্যাসাৎ সম্যক্ চিত্তনিরোধনাৎ"। (বনপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়) এই উপদেশ যথার্থই যুধিষ্ঠিরের স্বভাবের উপযুক্ত।

ঠিক তেমনি অবস্থা যখন এল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে, ভীষ্মের প্রয়াণের পরে, বিষাদক্লিষ্ট যুধিষ্ঠির যখন সন্ন্যাস নিতে চাইছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে

গীতার বাণী শোনালেন না। কঠোর ভর্ৎসনার কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন গীতা নয়, অনুগীতাও নয়, তিনি বললেন যুধিষ্ঠিরের স্বভাবের মনস্তত্ত্বের গূঢ়েষণার কথা, মানবমনের মূল বিকারের কথা, তাঁর বিখ্যাত কামগীতায়।

থাক সে-কথা।

এদিকে হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে চলছে মন্ত্রণা আর ষড়যন্ত্র। একদিকে অরণ্যের সরলতা, তার সৌন্দর্য ও ব্রাহ্মীশ্রী, অপরদিকে নগরজীবনের কুটিল হিংসা আর লালসা—এই দুই গতি সমান্তরালভাবে চলবে সমগ্র বনপর্বে।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে বললেন, "তোমার বুদ্ধি নির্মল। ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব তুমি জান। কুরুবংশীয়গণকে তুমি সমদৃষ্টিতে দেখ, যাতে কুরুপাণ্ডবের হিত হয় এমন উপায় বল।" (বনপর্ব, চতুর্থ অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু সরল মন নিয়ে বিদুরকে এই প্রশ্ন করছেন না। পাণ্ডবদের মঙ্গল তাঁর অভিপ্রেত বলেও মনে হচ্ছে না। আসলে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন প্রজাদের বিক্ষোভে অসন্তোষে। তিনি একজন চতুর রাজনীতিজ্ঞ। তিনি রাজ্যে আসন্ন বিদ্রোহের আশঙ্কা করছেন। তাই বিদুরকে বলছেন, "দেখ, যা হবার তা তো হয়েছে। এখন কি কর্তব্য তাই বল। প্রজারা যাতে আমাদের বশবর্তী থাকে, যাতে আমরা সমূলে বিনষ্ট না হই তারই উপায় বল।" (বনপর্ব, চতুর্থ অধ্যায়)

বিদুর বললেন, "মহারাজ, ধর্মই ত্রিবর্গের মূল। ধর্মকে লঙ্ঘন করে শকুনি কপটদ্যূতে পাণ্ডবদের রাজ্য ঐশ্বর্য হরণ করেছে। আপনি পাণ্ডবদের সকল ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিন। শকুনিকে প্রকাশ্যে অবমাননা করে পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করুন। এই আপনার প্রধান কর্তব্য। দুর্যোধন যদি সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে একত্রে রাজ্যভোগ করে তাহলে আপনার আর কোন আশঙ্কা নেই। দুর্যোধন যদি রাজী না হয়, তাহলে তাকে নিগৃহীত করে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের আধিপত্য ছেড়ে দিন। দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ পাণ্ডবদের অনুগত হোক। আর দুঃশাসন ক্ষমা প্রার্থনা করুক দ্রৌপদী ও ভীমসেনের কাছে। এছাড়া আমি আর কি পরামর্শ দিতে পারি?"

বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বিদুরকে রূঢ়কণ্ঠে বললেন, "তুমি তো দেখছি আগেও যা বলেছ এখনও তাই বলছ। তোমার এই সব কথা পাণ্ডবদের হিতকর বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে নয়। দেখ, বিদুর, আমি তোমাকে অনেক সম্মান করে থাকি, কিন্তু তুমি যা বলছ

[পাঁচ]

অরণ্যের আশীর্বাদ

পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুর থেকে প্রথমে উত্তরে গঙ্গার কূল ধরে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। তারপর পশ্চিমে সরস্বতী দৃষদ্বতী ও যমুনার জলে স্নান করে তিন দিনের পথ অতিক্রম করে এক সমতল মরুপ্রদেশের নিকটে কাম্যক বনে এসে উপস্থিত হলেন। পশুপক্ষীসমাকুল মুনিঋষি তপস্বীসেবিত সেই নিবিড় অরণ্যে সরস্বতী নদীর তীরে তাঁরা কুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন।

এই শ্যামগম্ভীর ছায়ানিবিড় অরণ্যে তাঁদের কাটবে দীর্ঘ বার বৎসর। কাম্যক বন থেকে দ্বৈত বন, সেখান থেকে যমুনার উৎপত্তিস্থল বিশাখযূপ বন, এইভাবে ঘুরে ঘুরে চলবে তাঁদের আরণ্যক জীবন।

মহাভারতের বনপর্ব সত্যের তপস্যার জ্ঞানের পরিমণ্ডল রচনা করে কাহিনীকে ভারতীয় ভাবের গভীরে স্থাপন করেছে। ভারতীয় জীবন, ভারতীয় সাধনা আদিযুগ থেকেই অরণ্যে প্রতিষ্ঠিত। পত্রপুষ্প তরুলতার সবুজ আবেষ্টনে তা কোমল শ্যামল। মাটির স্পর্শের মত স্নিগ্ধ সুখাশ্রয়। বেদ উপনিষদ সে তো আরণ্যক জ্ঞান, অরণ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার ঊর্ধ্বমুখী আবেগ শাখা-প্রশাখা পত্রাবলী মেলে মুক্ত আকাশের দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে আলোকের মধ্যে। তাই অরণ্যের আধ্যাত্মিক অর্থ অন্তর্জীবন।

পাণ্ডবদের কাম্যক বনে প্রবেশ, তাঁদের পক্ষে আশ্রমে প্রবেশ। এখানে এসেই তাঁরা নূতন শক্তিতে নবজন্ম লাভ করবেন। এই পর্বের আগে তাঁদের চারিত্রিক গতি-প্রকৃতি মনের গঠন অনেকটাই ছিল কেমন নাগরিক। সভাপর্বের রূঢ় বাস্তবের কঠোরতায় শুষ্ক এবং অপরিণত। কিন্তু দীর্ঘ বার বছর বনবাসের পর তাঁরা যখন বেরিয়ে এলেন তখন তারা অন্য মানুষ। জ্ঞানে কর্মে জীবনদৃষ্টিতে অনেক পরিণত। জীবনের অনেক ঝড় জল বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেছে। তাঁরা এখন অভিজ্ঞতায় দৃঢ়। তারই প্রমাণ বনপর্বের শেষে অরণ্যের ভিতরে সরোবরের তীরে সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এক যক্ষের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও কুন্তীকে বলেছিলেন, "পাণ্ডবগণ নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ হর্ষ ক্ষুধা পিপাসা হিম রৌদ্র পরাজয় করে বীরোচিত সুখে নিরত রয়েছেন। তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করে

বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কখনও অল্পে সন্তুষ্ট হন না। বীরগণ হয় অতিশয় ক্লেশ, না-হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করে থাকেন। আর ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী যারা তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু তা দুঃখের কারণ; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।" (উদ্যোগপর্ব, ৮৯ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ এখানে বনবাসের দুঃখকে রাজ্যলাভের সুখের সঙ্গে এক করে দেখছেন। দুঃখ যে পায়নি সে সুখের অধিকারী হতে পারে না।

বেদের সত্যকে এখানে জীবনের নিকষে যাচাই হচ্ছে। সেই পরখ-নিরিখের ভিতর দিয়ে যে সুবর্ণরেখা অঙ্কিত হয়ে উঠছে তারই সঙ্কেতে ধরা পড়ছে প্রাচীন ভারতের অজস্র কাহিনী, উপাখ্যান, পুরাণকথা, আকাশের নক্ষত্রমালার মত ঋষিদের জীবনসাধনার দীপ্তি।

এই পর্বে ভারতের সব মূলতত্ত্ব ও শক্তি জেগে উঠছে, বল আহরণ করছে; কেবল অর্জুনের মত বাহুবল দিব্যাস্ত্রই সংগ্রহ করছে না, জেগে উঠছে ব্রহ্মবল আত্মবল—ভারতশক্তি।

ভাবের দিক দিয়ে মহাভারতের যে বিশালতা তার অনেকখানিই এই বনপর্বে। এই ঋষিসেবিত অরণ্যের মধ্যেই রয়েছে ভারতের সকল ভাবসম্পদ। সংক্ষেপে কেবল রামায়ণই নয়, চূর্ণ মুক্তার মত ছড়িয়ে রয়েছে আঠারটি পুরাণের মূল কথা ও কাহিনী, তথ্য ও তত্ত্ব, ভাব ও ভাষ্য।

আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্পশুদ্ধি নিয়ে বেদব্যাস একখানি পুরাণ-সংহিতাও রচনা করেছিলেন। সেটি তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য লোমহর্ষণকে দেন। লোমহর্ষণের কাছ থেকে তাঁর অপর ছয়জন শিষ্য সুমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি—এঁদের কাছে যায়। তাঁদের মধ্যে কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন তিনজনে লোমহর্ষণের সংহিতা থেকে তিনখানি পুরাণ প্রস্তুত করেন। বিষ্ণুপুরাণে সে-কথা বলা হয়েছে,—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥
(বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ছয় অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক)

বায়ুপুরাণ ও অগ্নিপুরাণেও একথার সমর্থন আছে, "প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সুতো বৈ লোমহর্ষণঃ" ইত্যাদি। ভাগবতের কথক, বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব বলছেন, "অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়)।

শ্রীঅরবিন্দ তাই বলছেন, "বেদব্যাসের রচিত পুরাণ যদি বিদ্যমান থাকিত তাহার আদর প্রায় শ্রুতির সমান হইত।" ('শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৯, পৃ. ৫৭) যদিও বেদব্যাসের সেই পুরাণ কবে হারিয়ে গিয়েছে তবু এই বনপর্বের মধ্যে তারই স্বর্ণরেণু সব ছড়িয়ে রয়েছে। যুগ যুগ সঞ্চিত তপস্যা জ্ঞানসিদ্ধি নানা রকম মিথ্ (myth) ও মিথলজির (mythology) ভিতর দিয়ে আজও আমাদের দেশের আপামর সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত আলোকিত করছে। এই সব মিথের আখ্যানের অতি চমৎকার নাম দিয়েছেন আমাদের ঋষিরা, বলছেন, "কল্পশুদ্ধি"। কালগত দূরত্ব পার হয়ে আমাদের ভাবের আকাশে শুদ্ধ কল্প রূপ নিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ঝকমক্ করছে।

অনেকে বলেন, বনপর্বে এসে মহাভারতের গল্প থেমে গেছে। কাহিনীর তীব্র গতি ও সংঘাত যা আমরা সভাপর্বে দেখেছি, এবং ভেবেছি এই স্রোত এবার আরও তীব্র হয়ে উত্তাল হয়ে সগর্জনে প্রবাহিত হবে। তা যেন হঠাৎ এখানে এসে থেমে গেছে। কাহিনীর গতিধারা তত্ত্বের মরুবালুতে পথ হারিয়েছে। এই বনপর্বটি মূল কাহিনীর প্রয়োজনের দিক থেকে বাহুল্য।

তাই কি? আমরা তো দেখি, বেদব্যাস এখানে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে হস্তিনাপুরের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কাম্যক বনের তপস্যার এক তীব্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে, ধর্ম ও অধর্মের আরাবে কাহিনীর সহস্রতন্ত্রীবীণাতে এক সুগম্ভীর রাগ বাজিয়ে তুলছেন। তার মধ্যে এক একবার অগ্নিময় জ্বালা ঝঙ্কার উঠছে— জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদীর অপহরণ, ঘোষ যাত্রায় কৌরবদের অকস্মাৎ অকারণ হানা ইত্যাদি। তাছাড়া সর্বদা চলেছে দূতের গুপ্তচরের কুটিল অলক্ষ্য আনাগোনা। পাণ্ডবেরা বনে আছেন বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তে শান্তিতে নেই। সর্বক্ষণ তাঁদের চলতে হচ্ছে সতর্ক হয়ে, সন্তর্পণে, পা টিপে-টিপে, অস্ত্রে হাত-রেখে। এখানে এই অরণ্যের ধ্যান মৌন স্তব্ধতা খান্‌খান্ করে, বৃক্ষশাখায় পাখিদের ভয়ার্ত ডাক আর ডানার ঝাপটে বাতাস চিরে-চিরে, বারবার শত্রুর অস্ত্র ঝলসে উঠছে।

এমনকি বন্ধুকে ফিরতে আসতে দেখলেও তাই শঙ্কায় চমকে ওঠে তাঁদের মন।

হস্তিনাপুর থেকে বিদুর আসছেন শুনে তাই শান্ত যুধিষ্ঠিরও শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেন, "কিন্নু ক্ষত্তা বক্ষ্যতি ন সমেত্য"—ক্ষত্তা বিদুর এসে আবার আমাদের কি বলবেন ? (বনপর্ব, ৫/৭) "আবার পাশাখেলার প্রস্তাব নিয়ে আসছেন নাকি ? আমাদের শেষ সম্বল অস্ত্রগুলিও কি ওরা কেড়ে নিতে চায় ?" এই সব স্বগত ভাবনার ভিতর দিয়ে বোঝা যায় যুধিষ্ঠিরের সরল নিষ্পাপ মনেও লাগছে অভিজ্ঞতার তাপ।

যুধিষ্ঠির আসন থেকে উঠে বিদুরকে সংবর্ধনা করলেন।

বিশ্রামের পর বিদুর বললেন, "ধৃতরাষ্ট্র আমার কাছে হিতকর মন্ত্রণা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার কথা তাঁর রুচিকর হল না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে চলে যেতে বললেন। তিনি আমায় ত্যাগ করেছেন। বলেছেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে কয়েকটি হিতকর উপদেশ দিতে তোমার কাছে এসেছি।" (বনপর্ব, পঞ্চম অধ্যায়)

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হয়ে বিদুরের কথা শুনতে লাগলেন। বনবাসের প্রাক্কালে বিদুর যা বলেছিলেন তা বস্তুত যুধিষ্ঠিরের বনবাসের দীক্ষামন্ত্র। কিন্তু এখন যে কথা বললেন, তা যেমন মন্ত্র তেমনি আবার মন্ত্রণাও।

বিদুর বললেন,

সত্যং শ্রেষ্ঠং পাণ্ডব। বিপ্রলাপং তুল্যান্নং সহ ভোজ্যং সহায়ৈঃ।
আত্মা চৈষামগ্রতো ন স্ম পূজ্য এবং বৃত্তির্বর্ধতে ভূমিপালঃ॥ ২১
(বনপর্ব, পঞ্চম অধ্যায়)

(পাণ্ডুনন্দন ! সত্য আশ্রয় করে, অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ করে, অন্ন ও মাঙ্গল্যদ্রব্য সহায়দের সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করবে। সহায়দের সম্মুখে আত্মপ্রশংসা করবে না। এইরূপ চরিত্রের রাজাই উন্নতিলাভ করেন।)

বিদুর এখানে বিচক্ষণ রাজমন্ত্রীর মত পাণ্ডবদের দিলেন তিনটি অতি প্রয়োজনীয় উপদেশ। পাণ্ডবেরা যাতে এই বনবাসের দীর্ঘকাল প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে গ্রহণ করে। প্রথমত, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করা ; দ্বিতীয়ত, সহায় সংগ্রহ করা, মিত্রপক্ষীয় রাজশক্তিকে একত্রিত করা ; আর তৃতীয়ত, মিতবাক্ আত্মশ্লাঘাশূন্য হয়ে মিত্রদের হৃদয় জয় করা।

বিদুরের এই উপদেশ পাণ্ডবেরা পালন করেছিলেন। এর পর থেকেই

তাঁদের বনবাসের জীবন সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলল, পেল একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গতি।

মঞ্চের দৃশ্য আবার ঘুরে গেল।...

কাম্যক বন থেকে হস্তিনাপুরের প্রাসাদ কক্ষ।...

ধৃতরাষ্ট্র বিচলিত চিন্তিত। বিদুর যে চলে গেছেন, তাঁর প্রতি তিনি যে রূঢ় আচরণ করেছেন সেজন্য তাঁর কোন অনুতাপ নেই। তিনি চতুর। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেতে তাঁর বিলম্ব হয়নি, তিনি জেনে গেছেন, বিদুর কাম্যক বনে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তিনি এও জানেন, রাজকার্যে বিদুরের মন্ত্রণা কত মূল্যবান্? সন্ধিবিগ্রহ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি কত সুদূরপ্রসারী। সেই বিদুর যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হন তাহলে তো পাণ্ডবদের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। একে তো তাদের সহায় রয়েছেন কৃষ্ণ, আবার বিদুরও যদি যোগ দেন তাহলে তো পাণ্ডবেরা অপরাজেয় হয়ে উঠবে। তাই ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

তিনি সভাকক্ষে এসে সকলের সামনে রীতিমত দক্ষ অভিনেতার মত বিদুরের শোকে বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করে বলতে লাগলেন, "আমি পাপী। রাগ করে আমি আমার ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছি। বিদুর ফিরে না এলে আমি প্রাণত্যাগ করব।" (বনপর্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়)

তখন এক দ্রুতগামী রথে করে সঞ্জয় চললেন কাম্যক বনে বিদুরকে ফিরিয়ে আনবার জন্য।

এদিকে বিদুর চলে যেতে দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, প্রভৃতি ভেবেছিল, যাক্, বুড়োটা বিদায় হয়েছে, আপদ গেছে। বিদুরকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠিয়েছেন শুনে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবল, হয়তো এবার বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদেরও ফিরিয়ে আনবেন।

শকুনি বলল, "না না। পাণ্ডবেরা সত্যপরায়ণ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তারা কখনো ফিরে আসবে না। আর এলেও আবার তাদের পাশা খেলায় হারিয়ে বনে পাঠাব।"

দুর্যোধনের মনের আশঙ্কা তবুও যায় না।

তা দেখে কর্ণ বীরদর্পে বলল, "বরং চল আমরা কাম্যক বনে গিয়ে যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের শেষ করে আসি। পাণ্ডবরা এখন দুঃখক্লিষ্ট, সহায়হীন,

নিঃসম্বল। শত্রুকে আক্রমণ করার এই তো উপযুক্ত সময়।" এই বলে তারা পৃথক পৃথক রথে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কাম্যক বনের দিকে চলল।

মহর্ষি বেদব্যাস তাদের মনের কথা জানতে পারলেন। তাদের নিরস্ত করে ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "বনবাসী পাণ্ডবদের বধ করতে গিয়ে ওরা নিজেরাই প্রাণ হারাবে। হে রাজা, তুমি, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, তোমরা সকলে মিলে এই সর্বনাশা বিরোধ মিটিয়ে ফেল। নইলে দুর্যোধনকেও বনবাসে পাঠাও। হয়তো পাণ্ডবদের সঙ্গে একত্রে বনবাসের দুঃখ ভোগ করলে দুর্যোধনের সুমতি হতে পারে।"

ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু সব বুঝেও অবুঝ। বললেন "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি অসহায়। দুর্যোধন আমার কথা শোনে না। আপনি বরং তাকেই শাসন করে বলুন।"

বেদব্যাস বললেন, "আমি তাকে কিছু বলব না। মহাঋষি মৈত্রেয় পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে তোমাদের কাছেই আসছেন। তিনি দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বলবেন।"

মৈত্রেয় ঋষি এলেন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সমাদর করে বসালেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন, "ভগবন্! কুরুজাঙ্গাল থেকে আসার পথে আপনার কোন ক্লেশ হয়নি তো? পাণ্ডবেরা সব কুশলে আছে তো? তারা কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করে?"

ধৃতরাষ্ট্রের এই ধূর্ত প্রশ্নটি শুনলেই বুঝতে পারা যায় তাঁর আসল মনোগত ইচ্ছাটি কি? মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি পলকেই ধৃতরাষ্ট্রের মনটি দেখে নিয়ে বললেন, "তোমার কাজ আগাগোড়া যুক্তিবিরুদ্ধ ও অন্যায় হয়েছে। পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রশ্নই ওঠে না। সন্ধিবিগ্রহকার্যে তুমি অদ্বিতীয় হয়ে এই সত্য উপেক্ষা করছ কেমন করে? দ্যূত সভায় যা ঘটেছে সেটা নিতান্ত দস্যুবৃত্তি। তপস্বীদের কাছে তুমি আর মুখ দেখাতে পারবে না।"

ঋষি তারপর দুর্যোধনকেও বললেন, "রাজা দুর্যোধন, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্ত আচরণ কর। আমার কথা শোন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ো না—কুরু মে বচনং রাজন! মা মন্যুবশমন্বগাঃ।" (বনপর্ব, দশম অধ্যায়)

অবাধ্য দুর্যোধন কোন কথা না বলে, করতলে আপন উরুদেশে আঘাত

করে মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, আর পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল।

উরূ গজকরাকারং করেনাভিজঘান সঃ।
দুর্যোধনঃ স্মিতং কৃত্বা চরণেনোল্লিখন্ মহীম্॥

(বনপর্ব, দশম অধ্যায়)

মাত্র দুটি কথার আঁচড়ে অবাধ্য দুর্বিনীত দাম্ভিক দুর্যোধনের একটা নিখুঁত ফটোগ্রাফ যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর ভাবছি, কথা বলতে বলতে কিংবা মানসিক উত্তেজনায় করতলে উরুদেশ আঘাত করা ("করেনাভিজঘান") কি তার একটা মুদ্রাদোষ? নাকি তার নিয়তি? কিংবা দুই-ই? সভাপর্বে পাণ্ডবদের সর্বস্ব জিতে নিয়ে উত্তেজনায় এমনি করে সে উরুতে আঘাত করেছিল। উদ্যোগপর্বে কণ্বমুনির কথায় উপহাস করে এমনি উরুদেশ আঘাত করেছিল ("উরুতাড়নম")। তখন আমাদের রাগ হয়েছিল, ঘৃণা হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা বেচারীর একটা মুদ্রাদোষ। রাজপুত্র বা রাজার পক্ষে যদিও তা কুরুচিপূর্ণ। নিয়তি দুর্যোধনের জীবনে কি বিধান দিয়ে রেখেছে, পরিণামে কি ঘটবে এ যেন দুর্যোধনের মনের অবচেতন থেকে উঠে আসা তারই একটা নাটকীয় ইঙ্গিত। সামান্য মুদ্রাদোষ হয়ে বারবার দেখা দিচ্ছে। ডেকে নিচ্ছে ক্রোধপ্রজ্বলিত ভীমের প্রতিজ্ঞা এবং জ্বলন্ত হুতাসনের ন্যায় মৈত্রেয় ঋষির অভিশাপ। ক্রোধে আরক্তলোচন হয়ে জলস্পর্শ করে মৈত্রেয় দুর্যোধনকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করছ না? এই অহঙ্কারের প্রতিফল তুমি পাবে। মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ভীম তোমার ওই উরু ভঙ্গ করবে।"

কুরুবংশের ভাগ্যের উপরে বজ্রাঘাত হল।

ধৃতরাষ্ট্র ঋষিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন।

ঋষি বললেন, "দুর্যোধন যদি শান্তভাবে চলে তাহলে আমার এই শাপ ফলবে না।"

এ এক অদ্ভুত অভিশাপ।

অভিশাপ ফলবে কি ফলবে না তা নির্ভর করবে অভিশপ্তের নিজেরই আচরণের উপর।

প্রসঙ্গত, আমরা একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করি, এই সব সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বর ও শাপ দেওয়ার ব্যাপারে। মনে হতে পারে, তাঁরা যেন ছিলেন সব, যাকে বলে, "hot-temper"-এর দল। হঠাৎ হঠাৎ রেগে ওঠেন, রেগে গেলে আর জ্ঞান কাণ্ড থাকে না। কথার কথায় এমন নিদারুণ সব

অভিশাপ দিয়ে ফেলেন, অধিকাংশ স্থলেই তা লঘুপাপে গুরুদণ্ড। আবার মেজাজ ঠাণ্ডা হলেই সব জল। তখন আবার প্রশমন করে দেন। অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতির উপায়ও বাতলে দেন। অভিশাপে যেমন বরদানেও তেমনি অকৃপণ। হয়তো তুচ্ছ একটু কারণে, অনেক সময়ে অকারণেই, উজাড় করে ঢেলে দেন স্বর্গের ঐশ্বর্য, আশীর্বাদ, রাজরাজত্ব, এমনকি অমরত্ব পর্যন্ত। দেখেশুনে তো মনে হয়, এইসব উগ্রতপা ঋষিদের আর যাই থাক অন্তত বিবেচনা সংযম আত্মকর্তৃত্ব ছিল না।

কিন্তু এভাবে দেখাটা ভুল। মহাভারতের এক একজন ঋষির কঠোর তপস্যা, আত্মসংযম, আত্মজয়ের বীর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের যেটুকু জ্ঞান কাণ্ড আছে তাঁদের তা-ও ছিল না, এ ভাবা মূঢ়তা মাত্র।

নানা কার্যকারণ সন্নিবেশে সৃষ্টির ধারায় যেসব সম্ভাবনা প্রকাশোন্মুখ আবেগে কালের গর্ভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, অনেক সময় তা তুচ্ছ একটা-কিছু বাহ্যিক কারণকে উপলক্ষ্য করে বাইরে ফেটে পড়ে। বাহ্যিক সেই উপলক্ষ্য থাকলে বা না-থাকলেও তা ঘটত। ঋষিদের অভিশাপ তেমনি একটা occult action। সূক্ষ্ম বা কারণ-জগতের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তারই অকস্মাৎ স্থূল-প্রকাশ। ঋষি মৈত্রেয় দুর্যোধনকে যে অভিশাপ দিলেন তা তার তখনকার সেই ঔদ্ধত্যের জন্য নয়। দুর্যোধনের স্বভাবে ও প্রকৃতিতে যে বিষ জারিয়ে উঠেছে, তারই অনিবার্য পরিণাম তিনি কেবল পাঠ করলেন। দুর্যোধনের উপরে ঋষির এই অভিশাপ যে বর্ষিত হবে তা বেদব্যাসও জানতেন। কারণ তিনিও দেখেছিলেন, দুর্যোধনের মাথার উপরে সূক্ষ্মলোকে তারই কৃতকর্ম কালবৈশাখীর অশনি-ঝঞ্ঝার রূপ নিয়ে থম্‌থম্ করছে।

শক্তির এক একটি স্তরের সাম্য-অবস্থায় থাকে এক একটি সত্য। একটি স্তরের একটি সত্যের স্থিতির ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে আর-এক অবস্থায় নিয়ে গেলে সেখানে জাগে আর-এক সত্য। এই প্রকারে রয়েছে স্তরের পর স্তর সত্যের ও স্থিতির সোপানাবলী—hierarchical। তাই যেমন অভিশাপ আছে তেমনি তার নিরাকরণ বা sublimation-ও আছে। ঋষি মৈত্রেয় তাই বললেন, "দুর্যোধন যদি শান্ত আচরণ করে তাহলে এই শাপ ফলবে না।"

অভিশাপ বা বরদানের পিছনেও একটা অতি সূক্ষ্ম ন্যায়-বিধান আছে, বলা যেতে পারে "logic of the Infinite"। যা হবার নয় তা হবে না। যা দেওয়ার নয় তাও দেওয়া যাবে না। যেমন, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ

করতে গিয়ে পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত ও অশেষ লাঞ্ছিত হয়ে মনের দুঃখে অপমানে গঙ্গাদ্বারে কঠোর তপস্যা করতে লাগল। জয়দ্রথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বর দিতে চাইলেন।

জয়দ্রথ বলল, "প্রভু, আমাকে এই বর দিন যাতে আমি পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে জয় করতে পারি।"

মহাদেব বললেন, "না, বৎস, তা হবে না। অর্জুন ছাড়া অপর পাণ্ডবদের তুমি মাত্র একদিনের জন্য জয় করতে পারবে।" (বনপর্ব, ২৭২ অধ্যায়)

তেমনি অযোগ্য পাত্র হয়ে বরলাভের চেষ্টা করেছিলেন ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত। (বনপর্ব, ১৩৫ অধ্যায়)

যবক্রীতের মনে বড় দুঃখ।

লোকে তাঁর পিতৃবন্ধু রৈভ্য এবং তাঁর দুই পুত্র অর্বাবসু ও পরাবসুকে বিদ্বান্ বলে খুব শ্রদ্ধা সমাদর করে। কিন্তু ভরদ্বাজকে যবক্রীতকে লোকে তেমন মান্য করে না। তাঁরা তো বিদ্বান্ নন, তাঁরা কেবল তপস্বী।

তাই শেষে যবক্রীত কনখল পর্বতে গঙ্গা ও মধুবিলা নদীর ধারে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

তাঁর তপস্যা দেখে স্বয়ং ইন্দ্র এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস, তুমি কেন তপস্যা করছ?"

যবক্রীত বললেন, "হে ত্রিদশনাথ, গুরুর কাছে অধ্যয়ন করে বেদের জ্ঞান লাভ করা বহুকালসাধ্য। তাই গুরুর কাছে কালক্ষেপ না করে, অধ্যয়ন না করেই আমি যাতে বেদজ্ঞান লাভ করতে পারি তারই জন্য তপস্যা করছি।"

ইন্দ্র বললেন, "ব্রাহ্মণ, তা হয় না। এই বৃথা তপস্যা না করে গুরুর কাছে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন কর, তাহলে অভীষ্ট লাভ হবে।"

যবক্রীত বললেন, "কিছুতেই না। আপনি যদি বর না দেন তাহলে আমি আরো ঘোর তপস্যা করব। নিজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে অগ্নিতে আহুতি দেব।"

ইন্দ্র আবার তাঁকে নিষেধ করলেন। বললেন, "তুমি বিপথগামী। তোমার অমঙ্গল হবে। তুমি এই বর প্রার্থনা ক'রো না।"

যবক্রীত তবু নিরস্ত হলেন না।

তখন ইন্দ্র এক বৃদ্ধ ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরে এসে গঙ্গার কূলে বসে স্রোতের জলে এক এক মুঠি করে বালি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

যবক্রীত এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি এ কি করছ?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি এক মুষ্টি করে বালুকা নিক্ষেপ করে গঙ্গার উপরে সেতু বাঁধব।"

যবক্রীত বললেন, "তা হয় নাকি ? এই বৃথা চেষ্টা কেন করছ ?"

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন হেসে বললেন, "বিনা অধ্যয়নে, বিনা গুরুলাভে বেদজ্ঞান লাভের জন্য তুমি যদি বৃথা তপস্যা করতে পার, তাহলে আমিও এমনি একমুষ্টি বালুকা নিক্ষেপ করে গঙ্গায় সেতু বাঁধবার বৃথা চেষ্টা করতে পারি।"

যবক্রীতের এতে কিছুটা চৈতন্য হল। বললেন, "প্রভু, আমার এই তপস্যা যদি বৃথা চেষ্টা হয়, তাহলে আপনি এমন বর দিন যাতে আমি শ্রেষ্ঠ একজন বিদ্বান্ হতে পারি।"

ইন্দ্র তখন বর দিলেন।

কিন্তু সেই বরপ্রভাবে অনায়াসলভ্য জ্ঞান পেয়ে যবক্রীত জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনল। (বনপর্ব, ১৩৬ অধ্যায়)

আমরা এও লক্ষ্য করি অনেক সময় বিষ অমৃত হয়ে কাজ করে, অমৃত হয় বিষ। অভিশাপ হয় আশীর্বাদ, আশীর্বাদ অভিশাপ।

এই ব্যাপারটা আমরা সমগ্র বনপর্বে বিশেষ করে লক্ষ্য করে যাব।

পাণ্ডবদের উপর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে বর্ষিত হচ্ছে ঋষিদের বর, অভয়, আশীর্বাদ। এমনকি স্বর্গে উর্বশীর অভিশাপও অর্জুনের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে কাজ করেছে। বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস কালে নপুংসক বৃহন্নলা হয়ে।

পুরোহিত ধৌম্য প্রথমে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে এক সূর্যমন্ত্র। সেই মন্ত্রবলে সূর্যের বরে পাণ্ডবেরা লাভ করলেন এক আশ্চর্য তাম্র থালি—"পিঠরং তাম্রং" (বনপর্ব, চতুর্থ অধ্যায়) যার কল্যাণে বনবাসকালে তাঁরা পেলেন পর্যাপ্ত আহারের নিশ্চয়তা।

আবার বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে দান করলেন এক বিশেষ "প্রতিস্মৃতি বিদ্যা"। যে বিদ্যাবলে অর্জুন প্রথমে হিমালয়ে গিয়ে কাঞ্চনতরুর ন্যায় উজ্জ্বল কিরাতবেশী মহাদেবকে তুষ্ট করে পেলেন মহাদেবের আশীর্বাদ ও তাঁর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র। তারপর স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে লাভ করলেন যাবতীয় দিব্যাস্ত্র। যম দিলেন তাঁর দণ্ড, বরুণ দিলেন তাঁর পাশ, কুবের দিলেন তাঁর বিশেষ "অন্তর্ধান" নামক গান্ধর্ব অস্ত্র। অর্জুনের এই সব অস্ত্র লাভ সম্ভব হল যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত বিদ্যাবলে। আমরা বলতে পারি, পাণ্ডবদের শক্তির মূলে রয়েছে যুধিষ্ঠিরের অবদান। শুধু তাই নয়, আমরা

দেখব, মৃত চার ভাই শেষ পর্যন্ত প্রাণ ফিরে পেলেন সরোবরের ধারে যক্ষের কাছ থেকে যুধিষ্ঠিরের বিদ্যাবলেই।

পাণ্ডবেরা যেমন দুহাতে পাচ্ছেন ঋষিদের আশীর্বাদ, এককথায় ভাগবদ-সম্পদ, তেমনি কৌরবেরা ক্রমাগত নিঃস্ব হচ্ছেন, শিরে বর্ষিত হচ্ছে অভিশাপ, কখনো উচ্চারিত কখনো-বা অনুচ্চারিত। তাদের শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। দিক্ সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন, বেদব্যাস, গান্ধারী, ভীষ্ম। দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করেও তারা বর লাভে বঞ্চিত হল নিজেদেরই দুরভিসন্ধিতে। অভিশাপ দিলেন ঋষি মৈত্রেয়। কর্ণ হারাল অমরত্বের প্রতীক তার সহজাত কবচকুণ্ডল। এমনকি দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞেও দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত হল না, পতিত হল শুধু ব্রাহ্মণদের তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ। (বনপর্ব, ২৫৬ অধ্যায়)

সুতরাং কৌরবদের পরাজয়ের আর বাকি কি ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগেই তো আসল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ তো সেই কথাই বললেন পরে যুদ্ধের সময়, “নিহতাঃ পূর্বমেব”।

[ছয়]

অশ্রুমুখী শ্বেতপদ্ম

কাম্যক বনে পঞ্চপাণ্ডবের পর্ণকুটির।

লতাবিতানে তরুপল্লবে সমাকীর্ণ। মৃদুমন্দ হাওয়ায় মর্মরিত বনভূমি। বৃক্ষশাখার অন্তরাল হতে বিচ্ছুরিত ছায়াতপের বিচিত্র কম্পমান আলোকরেখা। অদূরে সরস্বতী নদী অস্ফুট মন্ত্রধ্বনির মত কুলুকুলু নাদে প্রবাহিত।

চন্দ্র যেমন নীলাঞ্জন মেঘমেদুর রাত্রিকে আলোকিত করে তেমনি নীল-কুন্তলা দ্রৌপদী কুটির অঙ্গন আলো করে বসে আছেন। পদ্মপলাশাক্ষী, পদ্মগন্ধা, লক্ষ্মীসমা সর্বগুণান্বিতা, প্রিয়ংবদা দ্রৌপদী। সতীত্বের শ্বেতপদ্ম যেন। কিন্তু বুকের ভিতরে তিনি পাষাণভার এক মহাদুঃখ পাথর চাপা দিয়ে রেখেছেন। বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। সমস্ত পীড়ন দুঃখ তাঁর অন্তরে এক গভীর কল্যাণসিন্ধু মন্থন করে চলেছে।

দ্রৌপদীর এই সর্বংসহা অটল সৌন্দর্য বেদব্যাসের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মহাকবির আপন হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য দিয়ে গড়া। ব্যাসদেবের অন্তর যেন এক উত্তুঙ্গ শৈলশিখর। তপস্যার এক প্রস্তরকঠিন অটলতায় স্থির। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তিনি হলেন "unmixed Olympian"…"a granite mind"। তাঁর সেই হৃদয়ের সিদ্ধতপের সৌন্দর্য-প্রতিভাস দ্রৌপদী।

পাণ্ডবদের বনবাসের বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। বনপর্বের দীর্ঘ এগারটি অধ্যায় আমরা পার হয়ে এসেছি। কিন্তু কাপুরুষতার হাতে সতীত্বের লাঞ্ছনা ও অপমানে বুক ফেটে গেলেও দ্রৌপদী একবারও তা মুখ ফুটে প্রকাশ করেননি। না ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে, না পরন্তপ অর্জুনকে, না পরাক্রমী ভীমকে। না সেই শ্রীমান্ নকুল ও সহদেবকে। নীরবে আপন হৃদয়ে দুঃখকে বহন করেছেন। আর পরিণামে তাই এক খরশান খড়্গে পরিণত হয়েছে।

এতদিন পরে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের দেখতে এলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে এলেন অন্ধক ভোজ বৃষ্ণিবংশীয়গণ। এলেন পাঞ্চালরাজের পুত্রগণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও কেকয় রাজপুত্রগণ। পাণ্ডবের পর্ণকুটির তখন রাজসভার মত ঝল্‌মল্ করে উঠল।

যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে বিষণ্ণ মনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ভয়ঙ্কর যুদ্ধভূমি দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের শোণিত পান করবে। তাদের

অনুগামীদেরও আমরা বধ করব। অধর্মের অনুগামী যারা তাদের বধ করা সনাতন ধর্ম। আমরা তাদের পরাজিত ও নিহত করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অভিষিক্ত করব।" (বনপর্ব, ১২ অধ্যায়)

ক্রোধে আরক্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল থেকে যেন কালানল বহির্গত হচ্ছে। সর্বলোক যেন তাতে দগ্ধ হয়ে যাবে। অর্জুন তাঁর সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। যেমন আর একবার ভীত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে।

অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে শান্ত করার চেষ্টা করলেন :

স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীঃ পরন্তপ।
ব্রহ্মা সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধর্মো ধাতা যমোঽনলঃ॥
বায়ুর্বৈশ্রবণো রুদ্রঃ কালঃ খং পৃথিবী দিশঃ।
অজশ্চরাচরগুরুঃ স্রষ্টা ত্বং পুরুষোত্তম॥
(বনপর্ব, ১২ অধ্যায়)

(তুমি নারায়ণ হরি ব্রহ্মা সোম সূর্য ধর্ম ধাতা
যম অনিল বৈশ্রবণ রুদ্র কাল আকাশ পৃথিবী
দশদিক্ স্রষ্টা অজ চরাচর গুরু, তুমি পুরুষোত্তম।)

অর্জুনের এই দীর্ঘ স্তব ও বন্দনার ভিতর দিয়ে আমরা জানতে পারলাম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, সাধ্য ও সিদ্ধি। অর্জুন বলছেন, "আমি বেদব্যাসের কাছে শুনেছি, তুমি বহু বৎসর পুষ্কর তীর্থে, বদরিকাশ্রমে, সরস্বতী নদীর তীরে ও প্রভাসতীর্থে তপস্যা করেছ। তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বভূতের আদি ও অন্ত, তপস্যার নিধান, যজ্ঞস্বরূপ। ব্রহ্মা তোমার নাভিপদ্ম থেকে, শূলপাণি শম্ভু তোমার ললাট থেকে জন্মেছেন।"

এর আগে সভাপর্বেও (৩৮ অধ্যায়ে) আমরা শুনেছি—

বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যাধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে॥
(বেদ বেদাঙ্গের যাবতীয় দিব্যজ্ঞানে ও বলে গরীয়ান্
শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যলোকে আর কে আছে ?)

শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রস্তাব তাঁর শত্রু ও নিন্দুক শিশুপালও অস্বীকার করতে পারেনি। প্রতিবাদে কেবল বলেছিল, "তাহলে বেদব্যাসকে এই সম্মান দেওয়া হবে না কেন ?"

শ্রীকৃষ্ণ বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও।

ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ম্ ঋকে "স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায়" বলা হয়েছে। এই কৃষ্ণ যে কে ছিলেন তার উল্লেখ সায়ণ বা যাস্ক করেননি। তবে কৃষ্ণ বলে একজন ঋষি ছিলেন এইটুকু জানা যায়। (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ২য় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ. ১৫৫, টীকা দ্রষ্টব্য)

তবে ঋগ্বেদের ৮ম্ মণ্ডলের ৮৫ থেকে ৮৭ সূক্তের মন্ত্রগুলির ঋষি কৃষ্ণ যে শ্রীকৃষ্ণ এই অনুমান আমাদের দৃঢ় হয় যখন ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে জানতে পারি শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর ঋষির কাছে তপস্যা করেছিলেন। উপনিষদ বলছে—

"তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়ো-
ক্তোবাচাপিপাস এব স বভূব।"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩-১৭-৬)

সন্দেহ নেই, এই কৃষ্ণ তাহলে দেবকীনন্দন। ঘোরের পুত্র কণ্ব এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি-ও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। অতএব ঋষি ঘোর, বেদব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ সমসাময়িক এবং বেদবেদাঙ্গবিদ্।

অর্জুনের স্তবে শ্রীকৃষ্ণ শান্ত হলেন।

অর্জুনকে সস্নেহে বললেন, "অর্জুন তুমি আমার, আমিও তোমারই। যা আমার তাই তোমার। তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই।" সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরো একটা কথা বললেন,—"নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং"... (বনপর্ব, ১২/৪৭ শ্লোক)—"আমাদের পারস্পরিক ভেদ অসম্ভব।" শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যে একটা ব্যাসকূট আছে এ যেন তারই ইঙ্গিত। বস্তুত তাঁর কথা তাঁর নীরবতা, তাঁর চলনে বলনে আচরণে এক অদ্ভুত দিব্য রহস্য। যা মনুষ্যবুদ্ধি দিয়ে তল পাওয়া যায় না। তাই কারো কাছে তিনি চতুর-চূড়ামণি, কারো কাছে তিনি কপটশিরোমণি, আবার কারো কাছে-বা তিনি অচ্যুত অব্যয়। বেদব্যাস তাই কৃষ্ণকে ভূরিভূরি বিশেষণে ভূষিত করেননি, কেবল বলেছেন, তিনি "অপ্রমেয়ম্"। শ্রীকৃষ্ণের সার্থক ও একমাত্র পরিচয়। সমগ্র মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মত এমন দুর্জ্ঞেয় পুরুষ আর দ্বিতীয় নেই।

পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে এতদিন তাঁরই আগমন পথ চেয়ে বসেছিলেন। দুঃখের দিনে দুর্দিনে যাঁর কাছে দাঁড়ালে পরম ভরসা আর আশ্রয় পাওয়া যায়। স্বল্পভাষী অর্জুনও তাই এতদিন পরে এমন করে স্তববন্দনায় মুখর হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁর সৌম্য ধীরতায় পেলেন এক নতুন শক্তি।

আর দ্রৌপদী ?

তাঁর বুকের পাষাণ-চাপা দুঃখ যেন ফেটে বেরিয়ে এল। তাঁর আয়ত-পদ্মনেত্র থেকে উদ্বেল অশ্রুধারা নামল। দ্রৌপদীর সবখানি ব্যক্তিত্ব, তাঁর গরিমাদীপ্ত তেজ, তাঁর গর্ব, তাঁর সতীত্বের প্রভা এক আবেগমথিত কণ্ঠে কেঁদে উঠল। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলতে লাগলেন, "হৃষীকেশ, ব্যাসদেব বলেছেন, তুমি দেবগণেরও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর। তাই আমি ভালবেসে তোমাকে আমার মনের দুঃখ জানাচ্ছি। আমি পাণ্ডবদের ভার্যা, তোমার সখী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, তবে কেন আমাকে দুঃশাসন কুরুসভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আমি একবস্ত্রা, রজস্বলা, শোণিতার্দ্রবসনে দাঁড়িয়ে কাঁপছি, আমাকে তারা দাসীরূপে ভোগ করতে চেয়েছিল। ধিক্ পাণ্ডবের, ধিক্ ভীমসেনের বাহুবলে, ধিক্ অর্জুনের গাণ্ডীবে। কতকগুলি নীচ ব্যক্তি তাঁদের ধর্মপত্নীকে পীড়ন করছে তাঁরা তা বসে-বসে নীরবে দেখছিলেন। পাণ্ডবেরা শরণাপন্নকে ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে তাঁরা রক্ষা করেননি। কৃষ্ণ, আমি অনেক কষ্ট সহ্য করে আর্যা কুন্তীকে ছেড়ে এই বনে পুরোহিত ধৌম্যের আশ্রয়ে বাস করছি। আমি যে নির্যাতন সহ্য করেছি তা আমার সিংহবিক্রম বীরগণ কেন উপেক্ষা করলেন? মহৎ কুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডবদের প্রিয় ভার্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, তবু পঞ্চপাণ্ডবের সমক্ষে দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করেছিল।"

দ্রৌপদী পদ্মকোষতুল্য হস্তে তাঁর সুন্দর বিধুর মুখখানি আবৃত করে ক্ষুব্ধ অভিমানে ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন—

> ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ কৃষ্ণা মুখং প্রচ্ছাদ্য পাণিনা।
> পদ্মকোষপ্রকাশেন মৃদুনা মৃদুভাষিণী ॥১২২
> স্তনাবপতিতৌ পীনৌ সুজাতৌ শুভলক্ষণৌ।
> অভ্যবর্ষত পাঞ্চালী দুঃখজৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥১২৩
> চক্ষুষী পরিমার্জন্তী নিঃশ্বসন্তী পুনঃপুনঃ।
> বাষ্পপূর্ণেন কণ্ঠেন ক্রুদ্ধা বচনমব্রবীৎ ॥১২৪
> নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রাঃ ন বান্ধবাঃ।
> ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদনঃ ॥১২৫
>
> (বনপর্ব, ১২ অধ্যায়)

(মৃদুভাষিণী দ্রৌপদী তাঁর পদ্মকোষতুল্য সুন্দর কোমল হস্ত দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে রোদন করতে লাগলেন। নয়নবিগলিত অশ্রুধারা তাঁর দুটি সুজাত আপীন সুলক্ষণ স্তনযুগল অভিসিক্ত করতে লাগল। তারপর চোখের জল মুছে বারংবার নিঃশ্বাস ফেলে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, "মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, পিতা নেই, এমনকি তুমিও নেই।")

দ্রৌপদীর এতদিনের দুর্জয় অভিমান তাঁর রুদ্ধ আবেগ পাহাড়ী নদীর মত গিরিকন্দর ভেদ করে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এল। আমরা বুঝতে পারলাম, কতখানি গভীর মর্মবেদনা তিনি বহন করে চলেছেন পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি বন্ধু আত্মীয়দের প্রতি। নারী হৃদয়ের সেই মৌন বেদনার আকস্মিক ক্ষুব্ধ প্রকাশে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়ি। করুণ বেহালার ছড়ের একটা তীব্র টান—আমাদের হৃদয়ে সহসা এক কম্পন তুলে যায়। বিশেষ করে তাঁর শেষ কথাটি, "নৈব ত্বং মধুসূদনঃ"—কৃষ্ণ, তুমিও আমার নেই।

কথাগুলি অত্যন্ত সরল ঋজু তীক্ষ্ণ। শব্দগুলি যেন হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে-আসা ধনুঃশর—বাতাস চিরে নিঃশব্দে তীরবেগে ছুটে গেল। বেদব্যাসের বর্ণনায় কোন শব্দালঙ্কার, কবিত্বের ঝঙ্কার, সৌন্দর্যের আবেগের বর্ণের কোন বিচ্ছুরণ নেই। তার কোন চেষ্টাও নেই। এক নিঃস্পৃহ নিপুণ নিষ্কাম যত্নে সংক্ষিপ্ত শব্দের ভিতর দিয়ে তিনি লিখে দেন অবস্থার ঘটনার স্পষ্ট রূপটি। যা তার নিজস্ব গুরুত্বে শক্তিতে নিজেই বেগবান্। তিনি কথা বলেন একটা অমোঘ পৌরুষের কণ্ঠে। শ্রবণ মাত্র মনের মধ্যে এক শক্তি জেগে ওঠে। প্রতিটি শ্লোক ঋষির নগ্ন গাত্রের মত নিরাভরণ। কিন্তু তা দৃঢ় সমর্থ তেজপুঞ্জকলেবর।

এই মাত্র দ্রৌপদীর কণ্ঠে আমরা যা শুনলাম, তার মধ্যে একটা তীব্র চাপ আছে, শক্তি আছে, বিদ্যুৎলেখার মত আকাশে চকিতে চকিতে ঝলক হেনে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও নেই আবেগের বর্ণনা, কিংবা শব্দের অলঙ্কারের বর্ণচ্ছটা। দ্রৌপদী পরপর বলে গেলেন কেবল কতকগুলি নিছক ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির অভ্যন্তরের যে চাপ, বিদ্যুতের মত যে তীব্র বেগ, তা আমাদের মনকে মুহূর্তে তড়িতাহত করে। কেমনভাবে বলা হল তা দিয়ে নয়, কি বলা হল তারই নিজস্ব ওজন ও ভরের উপর দাঁড়িয়ে আছে বেদব্যাসের কবিত্বের গাম্ভীর্য। প্রয়োজন মত তাঁর শ্লোকের ছন্দ কখনো আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে অনুষ্টুপ্ থেকে ত্রিষ্টুভে। তাঁর কাব্যভাবনা অত্যন্ত দ্রুত হ্রস্ব তির্যক্ হয়ে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে যায়। তাঁর সেই দ্রুতলয়ের ভাবনাকে অনুধাবন করা ক্ষিপ্রলিখন গণেশের পক্ষেও সময়ে সময়ে তাই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ভাবিনি, তুমি যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ তারা অর্জুনের শরাঘাতে রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে লুটিয়ে পড়বে। তাদের ভার্যারা তোমারই মত রোদন করবে। পাণ্ডবদের জন্য যা সম্ভবপর আমি তা করব। তুমি শোক ক'রো না। কৃষ্ণা, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি। তুমি

আবার রাজরাণী হবে। যদি আকাশ পতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ডখণ্ড হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।" (বনপর্ব, ১২ অধ্যায়)

দ্রৌপদী তখন অর্জুনের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করলেন। এমনি করে আশায় ভালবাসায় অভিমানে স্বামীর প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করে দেখা দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য। আগেও আমরা দেখেছি, ঠিক এমনি করেই দ্রৌপদী তাকিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের দিকে সভাপর্বে দ্যূতক্রীড়ার আসরে। কথা না বলে বেদব্যাস কেমন ইঙ্গিতে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন।

অর্জুন তাঁকে বললেন, "দেবি, রোদন ক'রো না। মধুসূদন যা বললেন তার অন্যথা হবে না।"

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, "আমি দ্রোণকে বধ করব। শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্যোধনকে আর ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করবেন। ভগিনী, কৃষ্ণ আর বলরামকে সহায়রূপে পেলে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি।"

যুধিষ্ঠির সব শুনছেন।

আর মনে মনে ভাবছেন, তবে কেন এমন হল ?

অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আমি যদি দ্বারকায় থাকতাম তাহলে আপনার এই বিপত্তি হ'ত না। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন আমাকে না ডাকলেও আমি হস্তিনাপুরে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র সকলকে বুঝিয়ে ওই সর্বনাশা পাশা খেলা থেকে নিবৃত্ত করতাম। আমার ভালকথায় তারা রাজী না হলে আমি তাদের সবলে নিগৃহীত করতাম। আমি দ্বারকায় ফিরে এসে সাত্যকির কাছে আপনার বিপদের কথা শুনে আপনাদের দেখবার জন্য ছুটে এসেছি। হায়, আপনারা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়ে কত কষ্ট পাচ্ছেন!"

যুধিষ্ঠির তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কৃষ্ণ, তুমি দ্বারকা ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে ? কি হয়েছিল ?"

তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের শোনালেন শাল্ব বধের এক চমকপ্রদ বৃত্তান্ত। পশ্চিম-সাগরে এক দ্বীপে শাল্বের রাজধানী। শাল্ব এক পরাক্রান্ত দৈত্য সৌভ-পুরীর রাজা। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেছেন এই সংবাদ পেয়ে শাল্ব তার চতুরঙ্গিণী সেনা ও বিমান বাহিনী নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করে অবরোধ করে। শ্রীকৃষ্ণ তখন ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে যদুপতি উগ্রসেন দ্বারকাপুরী রক্ষার জন্য দ্বারকায় আগমনের সমস্ত সেতুপথ ভেঙে দেন। নৌকার যাতায়াতও বন্ধ করে দেন। বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাটির তলায় সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে রাত্রিকালে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

করেন। শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধে সমুদয় যদুবীরগণ পরাস্ত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এসে শাল্বর চতুরঙ্গিণী সেনা বিধ্বস্ত করে দ্বারকাপুরীকে অবরোধ-মুক্ত করেন। কিন্তু শাল্বের বিমানবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শর শাল্বের সৌভবিমান স্পর্শও করতে পারল না। তখন দেবর্ষি নারদের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর "মন্ত্রাহূত বাণে" শাল্বের সকল যোদ্ধাকে নিহত করেন এবং তাঁর "প্রজ্ঞাস্ত্র" দিয়ে তার কপট মায়া অপসারিত করেন। তারপরে মহাশূন্যে নির্মিত শাল্বের সৌভপুরী ও সৌভবিমানগুলি বিধ্বংস করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে শাল্বকে নিহত করেন। শাল্বের অদ্ভুত মায়াযুদ্ধের ভিতরে আমরা রামায়ণের স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই। মায়াযুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা বধ করেছেন দেখে শ্রীরাম মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তেমনি শাল্ব মায়া-বসুদেবকে বধ করেছেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

যাইহোক, শাল্ববধের বিবরণ শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি দ্যূত সভায় কেন যেতে পারিনি তার কারণ বললাম। আমি গেলে দ্যূতক্রীড়া হ'ত না।"

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ রথে আরোহণ করে দ্বারকা যাত্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিয়ে পাঞ্চালে ফিরে গেলেন। চেদি-রাজ ধৃষ্টকেতু তাঁর ভগ্নী, নকুলের পত্নী, করেণুমতীকে সঙ্গে নিয়ে আপন রাজধানী শক্তিমতীনগরে ফিরে গেলেন।...

সকলে চলে গেলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, "আমাদের বার বছর অরণ্যে বাস করতে হবে। অতএব তুমি এই মহারণ্যে এমন এক স্থান দেখ যেখানে মৃগ পক্ষী ফলমূল পুষ্প পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। যেখানে পুণ্যাত্মা ঋষি ব্রাহ্মণেরা বাস করেন।"

অর্জুন তখন বললেন, "অনতিদূরেই দ্বৈতবন অতি রমণীয় স্থান। সেখানে বিস্তীর্ণ সরোবর আছে। ফলমূল পুষ্প যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধু ব্রাহ্মণগণও বাস করেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "বেশ, তবে চল আমরা দ্বৈতবনে যাই।"

পঞ্চপাণ্ডব তখন দ্বৈতবনে এসে সরস্বতী নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন।

তখন বর্ষাকাল।

শাল তাল তমাল আম্র মধুক নীপ কদম্ব বনে ঘন নিবিড় মেঘমায়া

বর্ষণসিক্ত পত্রপল্লবে হিন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু বেদব্যাস তার উল্লেখ মাত্র করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

আমরা এখানে অভাববোধ করি মহাকবি বাল্মীকির। মেঘমন্দ্রিত বর্ষণ-মুখরিত দ্বৈতবনের সৌন্দর্য আমাদের কেবল কল্পনা করে নিতে হয়। বেদ-ব্যাসের কাছে এই অরণ্য শুধু এক মৌন তাপস. তাঁর কবিত্বের ভাষার মতই।

কিন্তু হতেন যদি বাল্মীকি, তাহলে তাঁর হৃদয়ের ভাবশীলতা দিয়ে বর্ষামেদুর বনানীর মর্মরিত বনচ্ছবি তিনি এক মায়াঞ্জন দিয়ে এঁকে দিতেন। আমাদের মনে পড়ে যায়—

নিস্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগ-পক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন॥
শনৈর্বিসৃজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্রতারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে॥
উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়ন্ প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া॥
নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।
যক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ॥

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩৪/১৫-১৮)

(নিস্তব্ধ বনানী। মৃগপক্ষীগণ আপন কুলায় নিলীন। দশদিক্ পরিব্যাপ্ত তমসা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আকাশ উন্মোচিত করে অগণিত নক্ষত্রমালা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। অদূরে শীতাংশু চন্দ্র অন্ধকার ছায়া অপসারিত করে জ্যোৎস্নাকিরণে প্রাণীকুলকে আহ্লাদিত করে তুলল। অরণ্যের সকল প্রাণী ইতস্তত বিচরণ করতে লাগল। যক্ষরাক্ষস আর শিবাকুল নৈশধ্বনি করে অরণ্যে বিচরণ করতে লাগল।)

এ বর্ণনার তুলনা মেলে কেবল কালিদাসে আর বর্তমান কালে আমাদের রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু বেদব্যাস এসব ক্ষেত্রে একটি-দুটি সংক্ষিপ্ত শব্দের সরল নগ্ন সৌন্দর্য দিয়েই ব্যক্ত করেছেন গহন সত্যের বিমূর্ত ভাবটিকে। কাব্যপ্রতিভার আশ্চর্য সংযম হলেন বেদব্যাস।

তার একটা দৃষ্টান্ত—

বনং প্রতিভয়ং শূন্যং ঝিল্লিকাগণনাদিতম্। ১
(ঝিল্লিমুখরিত গহন অরণ্যের ভয়ানক শূন্যতা।)

(বনপর্ব, ৬৪ অধ্যায়)

অথবা—

সা বহূন্‌ ভীমরূপাংশ্চ পিশাচোরগ-রাক্ষসান্‌। ৭
পল্বলানি তড়াগানি গিরিকূটানি সর্বশঃ ॥ ৮

(সে দেখল পিশাচ রাক্ষস উরগের অনেক ভীতিকর রূপ।
পল্বল তড়াগ আর উত্থিত শৈলশির।)

(বনপর্ব, ৬৪ অধ্যায়)

এ যেন আর এক সৌন্দর্য। রুক্ষ রিক্ত কঠোর কিন্তু বলিষ্ঠ।

যাইহোক, পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে পর্ণকুটিরে আছেন।

এমন সময় একদিন তাঁদের আশ্রমদ্বারে এসে দাঁড়ালেন মহাতপা ঋষি মার্কণ্ডেয়। তিনি পাণ্ডবদের পূজা গ্রহণ করে তাঁদের দিকে চেয়ে মৃদু একটু হাসলেন।

অতি রহস্যময় সে হাসি।

যুধিষ্ঠির উন্মনা হলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবন, আমাদের দুঃখে যখন সকলেই ব্যথিত, তখন আপনি আমাদের দেখে হাসছেন কেন?"

মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন, "বৎস, আমি তোমাদের দেখে আনন্দে হাসিনি। কেন যে হাসলাম বলছি শোন।"

[সাত]

মেঘ ও রৌদ্র

ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "রাজা, তোমার এই বনবাসের দুঃখ দেখে আমার মনে পড়ল সত্যব্রত দাশরথি রামের কথা। আমি তাঁকে ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বতের অরণ্যে দেখেছিলাম। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্ধর সেই বীর ছিলেন নির্লোভ নিষ্পাপ নবদুর্বাদলশ্যামকান্তি। তিনি পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।"

—"ঋষিবর, বলুন তাঁর কথা।"

—"কেবল দাশরথি রামই নন ; তাঁরও আগে, নাভাগ, ভগীরথ, অলর্ক, এঁরাও সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হয়ে সব তুচ্ছ করে ত্যাগ তপস্যা ও সত্যকে অবলম্বন করেছিলেন। নিজেকে শক্তিমান্ ভেবে কারো অধর্ম করা উচিত নয়। হে রাজা, তুমিও সত্য ধর্ম নম্রতা ও সদাচার গুণে সমস্ত লোক অতিক্রম করেছ। তোমার তেজ ও যশ সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ তোমাকে শুধু এই কথা বলে যাই, যুধিষ্ঠির, তুমিও প্রতিজ্ঞা অনুসারে অচিরে এই বনবাসের সকল দুঃখ পার হয়ে আবার রাজ্যশ্রী লাভ করবে।"

এই বলে ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে উত্তর দিকে চলে গেলেন।

এমনি করে প্রতিদিন কোন-না-কোন মহাতপা ঋষির আশীর্বাদে পাণ্ডবদের বনবাসের দিন কাটে।

ঘন বর্ষায় দ্বৈতবন যেন এক রহস্যময় মৌন মন্ত্র জপ করছে। কখনো রৌদ্র কখনো বৃষ্টি। এই আলো এই অন্ধকার। মাথার উপরে এলোকেশী আকাশ। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ। সময়হারা দিক্‌ভোলা বাতাস এসে পাণ্ডবদের পর্ণকুটিরের প্রাঙ্গনে পাতা ঝরিয়ে যায়।

তখন অপরাহ্ণ বেলা।

অদূরে সরস্বতী নদীর কূলে দিনান্তের ছায়া।

এমন সময় কুটির অঙ্গনে বসে সুন্দরী প্রিয়দর্শিনী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলছেন।

আমরা উৎকিত হই। এই তো উপযুক্ত পরিবেশ। হয়তো মহাকবি এবার আমাদের দেখাবেন এক মধুর প্রণয়ব্যাকুল দৃশ্য।

ভুবনবিখ্যাত সুন্দরী যিনি, যাঁকে লাভ করার জন্য সারা ভারতবর্ষের রাজা ও বীরগণ একদিন ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেই "নৈব হ্রস্বা ন মহতী ন কৃষ্ণা নাতি রোহিণী নীলকুঞ্চিতকেশী" (সভাপর্ব ৬৫/৩৩) দ্রৌপদীকে পাণ্ডবেরা বিবাহ করলেন ; কিন্তু হল না, অন্তত আমরা দেখলাম না, কোন মধুচন্দ্রিকা, কোন প্রেমবিলসিত ভাবলাস্য। বিবাহের পর একটিবার মাত্র আমরা দ্রৌপদীর বাসর শয্যা দেখেছি, তাতে আমাদের লেশমাত্র আনন্দ হয়নি। বরং দুঃখে বেদনায় অভিমানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে-মনে বেদব্যাসের প্রতি আমরা অভিযোগ করেছি, কবি, তোমার লেখনী এত নিষ্ঠুর কেন ?

অদ্ভুত সেই বাসর রাত্রি।

বেদব্যাস ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কবি সাহস পেতেন না লিখতে।

পাঞ্চালের এক গ্রামে, গরীব কুম্ভকারের মাটির ঘরে শয্যাহীন মাটিতে শুয়ে আছেন পঞ্চপাণ্ডব, নিদ্রিত পাঁচটি ব্রহ্মাস্ত্রের মত। আর তাঁদের পদতলে ভূমিশয্যায় নিজের সুকুমার বাহুকে উপাধান করে শুয়ে আছেন রাজনন্দিনী দ্রৌপদী। জানি না, সারা রাত তিনি জেগে ছিলেন কিনা অথবা কি ভাবছিলেন। শুধু জানি, দ্রৌপদীর জীবনে সুখ নেই। সুখের জন্য বেদব্যাস তাঁকে সৃষ্টি করেনওনি। তিনি অনলসম্ভূতা। যজ্ঞাগ্নির মত এক মহাযজ্ঞ সাধন করার জন্যই মহাভারতে এসেছেন। সেই অদ্ভুত বাসরশয্যা দেখিয়ে কবি হয়তো সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে এলেন পর্যাপ্ত উপঢৌকন, রথ শয্যা বস্ত্র ও মাঙ্গল্যদ্রব্য। দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের মর্যাদা রক্ষা হল। আমরাও আশ্বস্ত হলাম।

সে তুলনায় বনবাসী সীতা তো অনেক সুখী। অনেক ভাগ্যবতী। অন্তত বনবাসের শেষ দু-এক বছর বাদ দিয়ে। অযোধ্যার রাজ-অন্তঃপুর ছেড়ে চিত্রকূটের অরণ্যে সীতার তৃষিত হৃদয়কে প্রেমসুধায় ভরে দিচ্ছেন বাল্মীকি। চিত্রকূটের পুষ্পভারসমৃদ্ধ অরণ্যে সীতা আনন্দিতা। তাঁর ঘনকুঞ্চিত বেণী পৃষ্ঠে লম্বিত। তিনি স্মিত মুখে মহেন্দ্রধ্বজসদৃশ রামচন্দ্রের হাত ধরে বনছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রক্তবর্ণ অশোকপুষ্প চয়ন করছেন। কখনো-বা রামচন্দ্রের অঙ্কে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত সুখে মধুর কণ্ঠে কথা বলছেন। রামের প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি আনত হয়ে রয়েছে সীতার মুখচন্দ্রের উপরে। অদূরে গৈরিক রেণুপেত পর্বত অগ্নিশিখার মত গগন স্পর্শ করেছে। সূর্যের আলো পড়ে পর্বতের ধাতুগাত্র রৌপ্যচূর্ণের মত ঝলমল করছে। চিত্রকূটের কণ্ঠে নির্মল মুক্তা-হারের মত মন্দাকিনী প্রবাহিত। সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র সেই মন্দাকিনীর জলে স্নান করে

প্রস্ফুটিত পদ্ম তুলে সীতাকে উপহার দিচ্ছেন। কুসুমিত লতা উন্নত বৃক্ষকে জড়িয়ে রয়েছে তা দেখে রামচন্দ্র সীতাকে বলছেন, "তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে আমাকে যেমন করে আলিঙ্গন কর এই কুসুমিত লতা তেমনি করে বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে রয়েছে।"

বনপথ ধরে চলেছেন রামচন্দ্র ও সীতা। পথের দুধারে অজস্র বনফুল। পছন্দমত রামচন্দ্র লাল নীল ফুল সপল্লবে তুলে নিয়ে উপহার দিচ্ছেন সীতাকে। সেই শৈলমালা বেষ্টিত বনপথে তখন কোকিল ডাকছে। সীতা রামচন্দ্রের হাত ধরে হাসি মুখে মুগ্ধ হয়ে সেই কোকিলকুহরিত গান শুনছেন। মনঃশিলার উপরে জলসিক্ত অঙ্গুলি ঘষে রামচন্দ্র সীতার সীমন্তে প্রেমতিলক রচনা করে দিচ্ছেন। রঙীন কেশর পুষ্প তুলে সীতার কেশকলাপে পরিয়ে দিচ্ছেন আর স্নিগ্ধ আদরের কণ্ঠে বলছেন,

"নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ।"

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৫/১৭)

(আমি তোমার সঙ্গে থেকে এখন অযোধ্যার রাজপদ স্পৃহা করি না।)

এর চেয়ে সুখের এর চেয়ে সুন্দর সীতার জীবনে আর কি হতে পারে! বাল্মীকি এখানে দুহাতে উজাড় করে দিচ্ছেন সীতাকে। হয়তো এ সুখ ক্ষণ-স্থায়ী বলেই কবির দাক্ষিণ্য এত অকৃপণ। কবির হাতে যেন এখন লেখনী নেই, তিনি নিয়েছেন চিত্রকরের তুলি আর সুরকারের বীণা। সীতাকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে অজস্র বর্ণের ছবি আর বিচিত্র সুরের সঙ্গীত মূর্ছনা। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বাল্মীকির কবিপ্রতিভা হল চিত্রকরের, সে তুলনায় বেদব্যাসের প্রতিভা নিপুণ ভাস্করের বলিষ্ঠ স্থপতির।

বেদব্যাস দ্রৌপদীর মধ্যে দেখাচ্ছেন নারীত্বের আর-এক গভীর সুঠাম সৌন্দর্য।

সেই বর্ষার দ্বৈতবনে অপরাহ্ণ সন্ধ্যায় দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরকে কাছাকাছি বসিয়ে আলো ফেললেন কবি। না, দ্রৌপদীর কণ্ঠে কোন মুগ্ধ প্রণয়সম্ভাষণ নেই। আছে এক গভীর ভালবাসার স্পর্শ। যে স্পর্শ থাকে মায়ের কণ্ঠে। প্রেম গভীর হলে কি মায়ের মত হয়ে যায়?

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "মহারাজ, তুমি যখন মৃগচর্ম পরে বনবাসের জন্য যাত্রা করেছিলে তখন সকলেই অশ্রুপাত করেছিলেন। কেবল দুরাত্মা দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনির কোন দুঃখ হয়নি। তুমি ধর্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ-

ভ্রাতা, তবু সেই দুর্মীত তোমার প্রতি কঠোর বাক্য বলেছিল। তুমি কোনদিন দুঃখ পাওনি, সেই তোমাকেই তারা অশেষ দুঃখের ভিতরে ফেলেছে। তোমার আজকের এই বনবাসের শয্যা, এই কুশাসন দেখে আমার বারবার মনে পড়ে তোমার সেই রাজশয্যা রত্নমণ্ডিত সিংহাসন। তোমার পরিধানে একদিন ছিল শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র। আজ তুমি চীরধারী ধূলিধূসরিত কলেবর। একদিন কুণ্ডলধারী কত যুবা পাচকগণ নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তোমাকে খাওয়াত, আজ তোমার আহার বনের সামান্য ফলমূল। এই দৃশ্য দেখে আমার বুক ভেঙে যায়।

"যে ভীমসেন বিবিধ যানে আরোহণ করতেন, নানা রকম মহার্ঘ বসন পরতেন, তিনি আজ বনবাসী ভৃত্য মাত্র। অথচ তিনি একাই কুরুকুল ধ্বংস করতে পারেন। অর্জুনের বীরত্বের তো তুলনাই নেই। আর নকুল সহদেব তারুণ্যে বীরত্বে শৌর্যশালী। চিরসুখী তারা অথচ সকলেই আজ বনবাসে অত্যন্ত ক্লিষ্ট। এর চেয়ে কষ্টের আর কি হতে পারে!" দ্রৌপদীর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে আসে।

কিন্তু যুধিষ্ঠির মৌন।

যুধিষ্ঠিরের এই নীরবতাই তাঁর শক্তি। একটা নীল পাহাড় যেন আকাশের গায়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। দ্রৌপদী সেই পাহাড়কে টলাতে চাইছেন। তিনি চান যুধিষ্ঠির তাঁর সবখানি ধর্ম প্রজ্ঞা সহিষ্ণুতা এক করে দারুণ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ুন। সেই বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাক কুরুবংশের সকল পাপ।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন বলি-প্রহ্লাদের গল্প। দানবরাজ বলি পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে তাত, ক্ষমা এবং তেজ এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ?"

প্রহ্লাদ বললেন,

"ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা।"

(সর্বদা তেজ ভাল নয়। সর্বদা ক্ষমাও ভাল নয়।)

যে সর্বদা ক্ষমা করে তার অনেক ক্ষতি হয়। ভৃত্য শত্রু নিরপেক্ষ লোকেও তাকে অবজ্ঞা করে, কটুবাক্য বলে। আবার যারা কখনো ক্ষমা করে না, তাদেরও অনেক দোষ। যে ক্রোধবশে স্থানে অস্থানে দণ্ডবিধান করে তার অর্থহানি সন্তাপ মোহ শত্রুতা লাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদু যথাকালে কঠোর হবে। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ অল্প হলেও

দণ্ডনীয়। "মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লোভী, সর্বদা অপরাধী, তারা কোন কালেই ক্ষমার যোগ্য নয়। তাদের প্রতি তেজ প্রকাশ করাই তোমার কর্তব্য। মহারাজ, তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তেজ। তুমি সেই তেজ প্রকাশ কর। তুমি আমাদের দুঃখের দিকে চেয়ে, কৌরবদের পাপের কথা ভেবে একবার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠ!" (বনপর্ব, ২৮ অধ্যায়)

যুধিষ্ঠির এতক্ষণে কথা বললেন। কেননা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের স্বভাবের মূল স্থিতিকেই প্রতিবাদ করে প্রশ্ন করেছেন। দ্রৌপদী বুঝে নিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের অন্তরের সমস্যা কোথায়। কোথায় তাঁর আটকাচ্ছে। যুধিষ্ঠির উত্তরে এবার যা বললেন তা যতটা ভাবের সত্য ততটা বাস্তবের নয়। যুধিষ্ঠির অতি ঊর্ধ্বের অতি দূরের এক ব্যাপক সত্যকে আরোপ করছেন অত্যন্ত নিকটের সংকীর্ণ বাস্তবের উপরে। এ এক অধ্যারোপ। এক স্তরের সত্যকে আর-এক স্তরে নামিয়ে এনে দেখার যে ভ্রম তাই যুধিষ্ঠিরের হচ্ছে। এই প্রমাদ থেকে মুক্তি পেতে যুধিষ্ঠিরের অনেক সময় লেগেছিল। প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত চলেছিল তাঁর এই বিপর্যয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বারবার সাহায্য করেছেন এই দৃষ্টিবিভ্রম কাটিয়ে উঠবার জন্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে কাজ করেছেন বটে, কিন্তু অর্জুনের মত নিঃসংশয়চিত্তে নয়। তাই যুধিষ্ঠির মহাভারতের আরো অনেক চরিত্রের মতই অন্তরের এবং বাহিরের পরস্পর-বিরোধী ধর্মবোধের মূল্যবোধের বিক্ষিপ্ত ধারণাতে বিপরীত দায়িত্বে সংকটাপন্ন। এ সংকট তখনকার সমাজের ন্যায়নীতি, আদর্শ, ধর্মবোধের জটিলতা। এই জটিলতার গ্রন্থিমোচন করেছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের গীতা। গীতা তাই মহাভারতের প্রাণকেন্দ্র। মহাভারতে যে ধর্মচক্র আবর্তিত হচ্ছে তা শ্রীকৃষ্ণের গীতাকে আশ্রয় করেই। একটা কীলক যেমন তার চক্রকে ঘোরায়। সেই আবর্তে ঘুরে টলে ছিটকে যাচ্ছে প্রচলিত সমাজবিধান নীতিবোধ ধর্মবোধের সংস্কারের কুয়াশা। শ্রীকৃষ্ণ সত্যই জনার্দন।

যুধিষ্ঠির বললেন, "ক্রোধ সমস্ত বিনাশ করে। ক্রুদ্ধ হয়েই মানুষ পাপ করে। ক্রোধেই সমস্ত অমঙ্গল। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলে থাকে। অপরের ক্রোধ দেখেও যে ক্রুদ্ধ হয় না, সে নিজেকে এবং সেই সঙ্গে অপরকেও এক মহাভয় থেকে ত্রাণ করে। ক্রোধকে যিনি প্রজ্ঞা দিয়ে জয় করেছেন পণ্ডিতেরা তাঁকেই তেজস্বী বলে থাকেন।"

যুধিষ্ঠির যেন অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলছেন। কথাগুলি সবই সত্য, তবে অত্যন্ত দূরের সত্য। কিন্তু যুধিষ্ঠির সর্বান্তঃকরণে তা বিশ্বাস করেন,

তাই এমন মন্ত্রের মত অমোঘ শোনাচ্ছে। কাশ্যপ ঋষির বচন উদ্ধৃত করে যুধিষ্ঠির বলছেন,

"ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেবং জানাতি স সর্বং ক্ষন্তুমর্হতি॥ ৩৬
ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতঞ্চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচঃ ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ॥ ৩৭
... ...
ক্ষমা তেজস্বিতাং তেজঃ ব্রহ্ম তপস্বিনাম্।
ক্ষমা সত্যং সত্যবতাং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা শমঃ॥" ৪০
(বনপর্ব, ২৯ অধ্যায়)

(ক্ষমা ধর্ম ক্ষমা যজ্ঞ ক্ষমা বেদ ক্ষমা শ্রুতি, যিনি এসব জানেন তিনি সকলকে ক্ষমা করতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্য ক্ষমা ভূত ক্ষমা ভবিষ্যৎ ক্ষমা তপস্যা ক্ষমা শুচিতা, ক্ষমাই পৃথিবী ধারণ করে রয়েছে।
... ...
ক্ষমা তেজস্বীদের তেজ, ক্ষমা তপস্বীদের ব্রহ্ম, সত্যবান্ লোকের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই শান্তি।)

দ্রৌপদী এবার চঞ্চলরসনা হয়ে বললেন, "ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার। তোমার মতিভ্রম হয়েছে। জগতে কেউ কি দয়া ধর্ম ক্ষমা সরলতার গুণে লক্ষ্মীলাভ করেছেন? তুমি তো অনেক যাগযজ্ঞ করেছ, তুমি সরল মৃদু লজ্জাশীল সত্যবাদী, তবে তোমার কেন বিপরীত বুদ্ধিবশে পাশাখেলার মতি হল? তোমার বিপদ আর দুর্যোধনের সমৃদ্ধি দেখে আমি বিধাতাকেই নিন্দা করছি। তিনি এই বিষম ব্যবস্থা করেছেন।"

এবার যুধিষ্ঠির উত্তেজিত। বললেন, "যাজ্ঞসেনি, তোমার কথাগুলি সুন্দর। কিন্তু তুমি নাস্তিকের মত কথা বলছ। কুতর্ক করছ। তুমি মূঢ়বুদ্ধির বশে বিধাতার নিন্দা ক'রো না। ধর্মে সংশয় ক'রো না। তাতে পরিণামে তোমার তির্যকগতি হবে। তুমি এই নাস্তিকতা ত্যাগ কর—নাস্তিক্যং ভাবমুৎসৃজ।" (বনপর্ব, ৩১/৪০)

যুধিষ্ঠির এখন সত্যই ধর্মরাজ। ধর্ম ও সত্য তাঁর জীবনের সর্বস্ব। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন তাঁর আপন স্বভাবের বিশ্বাসকে।

"ধর্ম কখনো বিফল হয় না। অধর্মও কখনো ফলদান্ হয় না। যেমন তপস্যার ফল তেমনি বিদ্যার ফলও দৃষ্ট হয়ে থাকে—ন নাফলো ধর্মো

নাধর্মোঽফলবানপি। দৃশ্যন্তেঽপি হি বিদ্যানাং ফলানি তপসাং তথা।" বনপর্ব, ৩১/৩১)

এই কথাগুলি যুধিষ্ঠিরকে বুঝবার জন্য অত্যন্ত জরুরী। তাঁর অন্তরের ভাবটি আমাদের জানা দরকার। নইলে যুধিষ্ঠিরকে আমরা যে শুধু বুঝতে পারব না তাই নয়, ভুল বুঝব। তাঁকে মনে করব একটা ভীরু কাপুরুষ, ব্যর্থকাম নিতান্ত এক ভালমানুষ। যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে এই ধারণাই আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত অনুকম্পা নিয়ে আমরা তাঁকে দেখি। কিন্তু যুধিষ্ঠির বলছেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম করে তা থেকে পুণ্য দোহন করতে চায়, আর যে নাস্তিক ধর্ম করে ফলের আশঙ্কা করে, তারা উভয়েই ধর্মের প্রকৃত ফল পায় না। হে রাজপুত্রী, আমি ধর্মের ফল খুঁজে বেড়াই না। গৃহস্থের যা কর্তব্য আমার শক্তি অনুসারে তাই করি—নাহং ধর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি!...গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ।" (বনপর্ব, ৩১/২-৩)

এই হল যুধিষ্ঠিরের অন্তরের স্বভাব।

তাঁর হৃদয়ের স্থিতি ও ধৃতি।

আর এইখানেই তাঁর বারবার আঘাত লাগছে। তাঁর ক্ষমার আদর্শ নির্গুণ, তামস। তাই সেখানে এসে পড়ছে শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিধ্বজা।

দ্রৌপদী বললেন, "আমি ধর্মের বা ঈশ্বরের নিন্দা করি না। আমি অনেক দুঃখেই এতসব বলেছি। আরো কিছু বলতে চাই, তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন। আমার বলার উদ্দেশ্য হল, মহারাজ, তুমি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্মে উদ্যোগী হও। যে কেবল দৈবের উপরে নির্ভর করে আর যে 'হঠবাদী' তারা উভয়েই মন্দবুদ্ধি। নিজের কর্ম দিয়ে যা আয়ত্ত হয় তাই পৌরুষ। দেব আরাধনায় যা লাভ হয় তাই দৈব। আমি চাই, আমাদের এই বিপদে কেবল দৈবের উপরে নির্ভর না করে তুমি পুরুষকার অবলম্বন করে কর্মে প্রবৃত্ত হও।"

স্পষ্টত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। কর্মফল সম্বন্ধে দ্রৌপদী যা বললেন তাতে তিনি যে তৎকালীন ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনে বিদুষী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কর্মের যে চারিটি ধারা—দৈব, প্রাক্তন, পুরুষকার, স্বভাবজ—তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যুধিষ্ঠিরকে বললেন। এই জগৎ যেন একটা "দারুময়ী যোষা"—কাঠের পুতুল, নিয়ন্তার ইঙ্গিতে অবশ ভাবে চলছে; অথবা সুতোর-বাঁধা পাখির মত মানুষ দৈবাধীন—"শকুনিস্তন্তুবদ্ধো" (বনপর্ব, ৩০/২৫) ইত্যাদি এইসব ভাষণের ভিতরে আমরা লক্ষ্য করি বেদান্ত সূত্রের প্রতিধ্বনি

—"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম" (বেদান্ত, ২-১-৩৫)। এছাড়া নাস্তিক দর্শন বা চার্বাকবাদও রয়েছে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলছেন "হঠবাদী"—অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন সবকিছু হঠাৎ ঘটে। তখনকার দিনে চার্বাকপন্থীদের এমন বলা হ'ত।

মনে হয় তৎকালীন সমাজে চার্বাক মতবাদের বেশ একটা প্রভাব ছিল। চার্বাক ছিলেন দুর্যোধনের বন্ধু। দুর্যোধনের ইহসর্বস্ব ভোগবৃত্তির পিছনে চার্বাকের প্রভাব থাকাই সম্ভব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই চার্বাককে বধ করা হয়।

ধর্মার্থকুশলা দ্রৌপদীকে বেদব্যাস বলেছেন "প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা অথ কৃষ্ণা" (বনপর্ব, ২৭/২)। বিদুরও বলেছেন, তুমি সমস্ত গুণদ্বারা পিতৃমাতৃ উভয় কুলকেই অলঙ্কৃত করেছ—"সর্বৈর্গুণসমাধা নৈভূর্ষিতং তে কুলদ্বয়ম্" (সভাপর্ব, ৭৬ অধ্যায়)। দ্রুপদ রাজা তাঁর গৃহে একজন বৃহস্পতিতুল্য ব্রাহ্মণ রেখে দ্রৌপদীর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, একথা আমরা দ্রৌপদীর মুখেই শুনি। সে যুগে নারীশিক্ষা অবহেলিত ছিল না। শুধু বিদ্যায় নয়, তপস্যা ও সংযমেও তিনি অতুলনীয়া। তার প্রমাণ বেদব্যাস দেখিয়েছেন তাঁর "অসিপত্র ব্রতে" সিদ্ধিলাভ দেখিয়ে।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে আর কিছু বললেন না।

তখন অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীম শুরু করলেন তাঁর কূটতর্ক। ভীমের কথার মধ্য যুক্তির চেয়ে গায়ের জোরই বেশি। শক্তি বলতে তিনি বোঝেন কেবল শারীরিক বল। তাই যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আমরা কোন্ দুঃখে বনবাসী হয়ে কষ্টভোগ করব? আপনি অল্প একটু ধর্মের জন্য রাজ্য বিসর্জন দিয়েছেন। আর আমরাও আপনার শাসন মেনে নিয়ে শত্রুদের আনন্দিত করে বন্ধুদের দুঃখিত করে কষ্ট পাচ্ছি। নিজের ও মিত্রদের দুঃখ উৎপন্ন করে যা তা ধর্ম নয়, তা ব্যসন, তা কুপথ। কেবল ধর্ম-ধর্ম করে আপনার ক্লীবের দশা হয়েছে। মহারাজ, হয় আপনি সন্ন্যাস নিন, না হয় ধর্ম-অর্থ-কামের চর্চা করুন। এই দুয়ের মাঝামাঝি আতুরের জীবন। যার অর্থ নেই তার ধর্মও ক্ষীণ হয়ে আসে। তাই কেবল মাত্র ধর্ম, বা কেবল অর্থ বা কেবল কামে আসক্ত হওয়া ভাল নয়। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, তিনটিরই সেবা করা উচিত। পণ্ডিতেরা প্রভুত্বকেই ধর্ম বলেন। আপনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রবলে সেই প্রভুত্ব অর্জন করুন। মহারাজ, আপনি বল প্রকাশ করুন। বলেই অর্থের মূল। আপনি নিজের স্বভাব দোষেই কষ্ট পাচ্ছেন, আমাদেরও কষ্ট দিচ্ছেন। অর্থজ্ঞানশূন্য আপনার বুদ্ধি। কুৎসিত শ্রোত্রিয়

ব্রাহ্মণের মত আপনি কেবল বেদ আওড়ে চলেছেন। মনুর বচন আর তত্ত্বের নিষ্ফল ভার বয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বার্থ আপনি জানেন না। শাস্ত্র পড়ে-পড়ে আপনার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্রাহ্মণ না হয়ে ক্ষত্রিয়কুলে কেন জন্মেছেন ?

"তার চেয়ে অনুমতি দিন, আমরা এখনই যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাস্ত করে রাজশ্রী লাভ করি। কৃষ্ণের সহায়ে, সৃঞ্জয় কেকয় বৃষ্ণি ও পাঞ্চাল সৈন্য নিয়ে আমরা অনায়াসেই কৌরবদের পরাস্ত করতে পারব। পণ্ডিতেরা বলেন, সোমলতার প্রতিনিধি যেমন পূতিকা তেমনি বৎসরের প্রতিনিধি মাস। আপনি আমাদের বনবাসের এই তের মাসকে তের বৎসর বলে গণ্য করুন। যদি এরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তাহলে একটা ধর্মের ষাঁড়কে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করালেই সব দোষ কেটে যাবে। আর না-হয় থাকুন আপনার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই বনবাসে। আমরা যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করে রাজ্য অধিকার করি। আপনি তের বৎসর পরে ফিরে যাবেন রাজত্বে।"

ভীমের এইসব কুযুক্তি কুতর্ক নীরবে সহ্য করলেন যুধিষ্ঠির। ভীমের কথার ভিতরে যে আক্রমণ যে অপমান আছে, উদার যুধিষ্ঠির তাও শান্তভাবে গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর স্বভাবের মহত্ত্ব অত্যন্ত শুদ্ধ রাগে রঞ্জিত করে তুলেছেন বেদব্যাস। এই তো স্বাভাবিক। তিনি যে যুধিষ্ঠির ! পরম শত্রু যে দুর্যোধন, তাকেও তিনি ডাকেন "সুযোধন" বলে।

শান্ত ধীর উদাস কণ্ঠে তিনি বললেন, "তুমি যে বাক্যবাণে আমাকে বিদ্ধ করছ, তার জন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না। আমার দোষেই তোমাদের আজ এই কষ্ট।"

সেই সঙ্গে এক কাতর অভিমানও তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই। তিনি বলছেন, "দ্যূত সভায় তুমি পরিঘ অস্ত্র মার্জনা করে আমার হাত দুখানি আগুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে ; তখন অর্জুন তোমাকে শান্ত করেছিল। সেদিন তা করলে না কেন ? যখন পাশা খেলায় আমি একের পর এক পরাজিত হচ্ছি তখন আমাকে এমনি করে জোর করে বাধা দিলে না কেন ? উপযুক্ত সময়ে কিছু না করে এখন আমাকে ভর্ৎসনা করে লাভ কি ? এখন তবে ভবিষ্যৎ সুখোদয়ের জন্য প্রতীক্ষায় থাক। কেবল বলদর্পে মত্ত হয়ে চঞ্চল হয়ে কর্ম করলে তা সিদ্ধ হয় না। দৈবও অনুকূল হয় না। তাছাড়া ভাল করে ভেবে দেখ, দিগ্বিজয়ের সময় যেসব রাজাদের আমরা পরাজিত করেছিলাম তারা এখন কৌরবপক্ষে। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কৌরবপক্ষেই যুদ্ধ করবেন। অভেদ্যকবচধারী কর্ণও আমাদের উপরে

বিদ্বেষযুক্ত। এই সব দুর্জয় পুরুষদের পরাভূত না করে তুমি দুর্যোধনকে বধ করতে পারবে না।"

ভীম তখন বিষণ্ন মনে চুপ করে রইলেন।

এখানে আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি, ভীম ছাড়া আর কোন পাণ্ডবভ্রাতা এই বিতর্কে অংশ নেননি। একটা কথাও বলেননি। তাঁরা সেখানে উপস্থিত আছেন বলেই মনে হয় না। থাকলে ভীমের এইসব কটুকথার কোন প্রতিবাদ করলেন না? বাধা দিলেন না? অন্তত অর্জুন? অর্জুনের রুচি, শালীনতা, সম্ভ্রমবোধকে তো আমরা ইতিপূর্বে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছি, যখন দ্যূত সভায় ক্রুদ্ধ ভীমকে তিনি নিবৃত্ত করেছিলেন। সেই ভ্রাতৃবৎসল অর্জুন কি তবে সেখানে ছিলেন না? কিন্তু বেদব্যাস স্পষ্ট বলেছেন, "ততো বনগতাঃ পার্থাঃ সায়াহ্নে সহ কৃষ্ণয়া উপবিষ্টাঃ" (বনপর্ব, ২৭/১)। "পার্থাঃ" এই বহুবচন দিয়ে তো কবি পঞ্চপাণ্ডবকেই বুঝিয়েছেন। তবে তাঁরা নীরব কেন? ভীম যখন বিশেষ করে সকলের নাম নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "কৃষ্ণ অর্জুন অভিমন্যু আমি এবং মাদ্রীপুত্রগণ কেউই আপনার এই অবস্থায় অভিনন্দন করি না।" (বনপর্ব, ৩৩/১২) তাহলে তাঁরা সকলেই কি ভীমের অভিযোগে মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন? তাই যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, যুধিষ্ঠির সেদিন বড় অসহায়। নিদারুণভাবে একা। তাঁর পাশে সেদিন আর কেউ নেই। একমাত্র তাঁর অন্তরের জ্বলন্ত ধর্ম ছাড়া। কবি এখানে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তিনি নীরব। বড় ভীষণ বেদব্যাসের এই নীরবতা। কথার চেয়ে তাঁর এই নীরবতার শক্তি অনেক বেশি। মহাভারতের অনেক চাঞ্চল্যকর দৃশ্যের নাটকীয় সংঘাতকে তীব্রতর করে তুলেছে বেদব্যাসের এই নীরবতা। কৌরব সভায় দ্রৌপদী যখন লাঞ্ছিতা হচ্ছেন, তখন পাণ্ডবগণ আশ্চর্যভাবে নীরব। সভাপর্বে শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নিন্দায় আক্রোশে ফেটে পড়ছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়করভাবে মৌন। আবার বিরাট রাজার সভায় যুধিষ্ঠিরকে যখন প্রহার করা হয়েছে, তাঁর দেবোপম মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছে, তখনও পাণ্ডবদের রহস্যজনক মর্মান্তিক নিষ্ক্রিয় নীরবতা আমাদের স্তম্ভিত করে।

বেদব্যাস কিছু বলেননি বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। বিড়ম্বিত যুধিষ্ঠিরের ম্লান মুখখানি দেখে বললেন, "বেদ্মি তে হৃদয়স্থিতম—আমি ধ্যানে তোমার মনের ভাব জানতে পেরে তোমার কাছে এলাম।

তপস্যাপূত কর্ম দিয়ে আমি তোমার বিরুদ্ধশক্তিকে নাশ করব—তত্তেহহং নাশয়িষ্যামি বিধিদৃষ্টেন কর্মনা।” (বনপর্ব, ৩৬/২৬)

এই মত আশ্বাস দিয়ে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, “তুমি একটু অন্তরালে চল। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।”

বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

[আট]

ব্যথিত ফুলের গন্ধরেণু

বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অন্তরালে কথা বলছেন, "বৎস, তুমি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্যোধন এদের জন্য ভয় পাচ্ছ ? তুমি নির্ভয় হও। আমি তোমাকে এক বিশেষ বিদ্যা দান করব। সে বিদ্যা মূর্তিমতী সিদ্ধি। তুমি এই প্রতিস্মৃতি মন্ত্র গ্রহণ কর। এই মন্ত্রবলে যে শক্তি লাভ হবে তার কাছে কৌরবের শক্তি তুচ্ছ। তুমি অর্জুনকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিও। অর্জুন স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্র ও মহাদেবের থেকে সকল দিব্যাস্ত্র লাভ করবে।

"শোন, আরো বলি। এই দ্বৈতবনে আর বেশি দিন থেকো না। এক জায়গায় বেশিদিন থাকা সুখের হয় না—একত্র চিরবাসো হি ন প্রীতি-জননো ভবেৎ"। (বনপর্ব, ৩৬/৩৬)

এই বলে বেদব্যাস অন্তর্হিত হলেন।

তিনি পাণ্ডবদের সতর্ক করে দিয়ে গেলেন। তাদের বনবাসের জীবনের পিছনে শত্রুর চক্রান্ত ওত পেতে রয়েছে। যে কোন সময় যে কোন ভাবে বিপদ আসতে পারে। অতএব সাবধান।

এদিকে দুর্যোধন রাজ্যলাভ করে নিশ্চিন্তে বসে নেই। নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি সে সুদৃঢ় করে তুলছে। পাণ্ডবদের পিছনে লাগিয়েছে অসংখ্য গুপ্তচরের কুটিল প্রহরা। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি প্রবীণ কৌরবদের দুর্যোধন এখন গুরুর মত পূজা করছে। অন্যান্য যোদ্ধা ও সৈন্যদের সঙ্গেও অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করছে। পাণ্ডবদের থেকে হৃত রাজ্য দুর্যোধন ভাগ করে দিয়েছে দ্রোণ কর্ণ ও শকুনিকে। তারা সকলেই এখন আচার্যের সম্মান লাভ করে দুর্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট।

পাণ্ডবদের অগণিত ব্রাহ্মণ অনুগামীরা কৌরব সভার এই সব রাজনৈতিক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছেন। হস্তিনাপুর থেকে কাম্যক বনের দূরত্ব তো মাত্র তিন দিনের হাঁটা-পথ। সর্বোপরি অরণ্যচারী তপস্বী বেদব্যাস পরম স্নেহে পাণ্ডবদের বুক দিয়ে রক্ষা করে চলেছেন। দুর্যোধন জানে না, তার বেতনভুক শত গুপ্তচরের দৃষ্টির আড়ালে সদাজাগ্রত রয়েছে এই ত্রিকালজ্ঞ ঋষির যোগদৃষ্টি।

যুধিষ্ঠির কাওকে কিছু বললেন না।

অধৈর্য ও ক্ষুব্ধ ভ্রাতাদের শুধু বললেন, "চল, আমরা এই বন ত্যাগ করে অন্যত্র যাই।"

তাঁরা তখন দ্বৈতবন ছেড়ে আবার এলেন কাম্যক বনে সরস্বতীর তীরে।

যুধিষ্ঠির আপন মনে কেবল প্রতিস্মৃতি মন্ত্র নিয়ে তপস্যা করেন। শান্ত যুধিষ্ঠির আরো শান্ত হয়ে গেছেন।

পরে সময় যখন হল, একদিন অর্জুনকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, "ধনঞ্জয়, আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল তুমি। আমি বেদব্যাসের কাছ থেকে এক গূঢ়বিদ্যা লাভ করেছি। তুমি সেই বিদ্যা অধিগত করে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। তাহলে তুমি ইন্দ্র রুদ্র বরুণ কুবের যম এঁদের কাছ থেকে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করবে। শত্রুদের পরাস্ত করতে হলে শক্তি চাই। তুমি সেই শক্তি লাভ করে ফিরে এস। আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব।"

অর্জুন নতশিরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পালন করলেন। হাতে তুলে নিলেন তাঁর গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীর, কবচ, বর্ম, গোধাঙ্গুলিত্র এবং তাঁর কনকমুষ্টি খড়্গ।

অর্জুন কোন কথা বলছেন না। তিনি অগ্নিশিখার মত মৌন। বলেছি এমনি সব নীরবতা দিয়ে বেদব্যাস নাটকীয় তীব্রতা সঞ্চার করেন।

ব্রাহ্মণগণ এসে স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করে অর্জুনকে আশীর্বাদ করলেন। তখন প্রস্থানোন্মুখ অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন দ্রৌপদী।

অর্জুনকে বিদায় দিতে দ্রৌপদী শুধু একটি কথা বললেন। সেই একটি কথার ভিতরে তিনি ঢেলে দিলেন তাঁর নারীহৃদয়ের সবখানি প্রেম ও ভালবাসা। মনে হয় দ্রৌপদীর এতখানি বুকঢালা ভালবাসা অর্জুন ছাড়া আর কোন পাণ্ডব পাননি। বেদব্যাস একটি কথার ভিতরে এমনি করে সকল ভুবন ভরে দেন, শুনিয়ে দেন হৃদয়ের কণ্ঠস্বর, ফুটিয়ে তোলেন চোখের চাহনি। এক একটি শব্দ তাঁর হাতে যেন প্রদীপের মত জ্বলে ওঠে।

দ্রৌপদী বললেন, "তুমি দীর্ঘ প্রবাসী হয়ে চলে গেলে কোন ঐশ্বর্য কোন ভোগ এমনকি আমার জীবনেও আর কোন স্পৃহা থাকবে না।"

—"নৈব ন পার্থ ভোগেষু ন ধনে নোত জীবিতে।
তুষ্টির্বুদ্ধির্ভবিত্রী বা ত্বয়ি দীর্ঘপ্রবাসিনি॥" ২১

(বনপর্ব, ৩৭ অধ্যায়)

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, দ্রৌপদী এখানে প্রবাসী

অর্জুনের জন্য সকল পাণ্ডবের দুঃখের কথাই ব্যক্ত করছেন। কিন্তু অর্জুনের প্রতি তাঁর প্রেমকে এইভাবে তিনি আড়াল করেননি। দ্রৌপদী স্পষ্ট বলছেন, "জীবনে 'আমার' কোন তুষ্টি থাকবে না।" এক্ষেত্রে নীলকণ্ঠের টীকাই গ্রহণযোগ্য, তিনি শ্লোকটির অর্থ করছেন, "নেতি। নোঽস্মাকং মম স্থিতার্থঃ। তুষ্টিঃ সন্তোষঃ বুদ্ধিরিচ্ছা"। (নীলকণ্ঠ, ভারত কৌমুদী, টীকা দ্রষ্টব্য)

অর্জুন চলে গেলে দ্রৌপদী আরো একবার যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, "অর্জুন বিরহে পৃথিবীর সর্বত্র আমি শূন্য দেখছি। এই পুষ্পিত বনভূমিও আর আমার কাছে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না।"

শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্।
বহ্বাশ্চর্যমিদঞ্চাপি বনং কুসুমিতদ্রুমম্।
ন তথা রমণীয়ং বৈ তমৃতে সব্যসাচিনম্॥ ১৩
(বনপর্ব, ৮০ অধ্যায়)

দ্রৌপদীর হৃদয়ের এই জ্বলন্ত প্রেমের স্পর্শেই হয়তো অর্জুন স্বর্গের উর্বশীর প্রণয়-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। সতীর সেই শুদ্ধ প্রেমের আগুনে অপ্সরীর ক্ষণিক বিলাসের মোহ তো তুচ্ছ হয়ে যাবেই।

অর্জুন গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। ক্রমে অগ্রসর হয়ে দেখলেন এক শান্ত তপোবন।

হঠাৎ তিনি এক আকাশবাণী শুনলেন।

—"তিষ্ঠ।"

অর্জুন থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখেন পুষ্পিত বৃক্ষমূলে পিঙ্গলবর্ণ এক জটাধারী তপস্বী বসে আছেন।

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলেন, "এই শান্ত তপোবনে অস্ত্রধারী তুমি কে? এ ব্রাহ্মণদের আশ্রম। এখানে তোমার অসিকোষবন্ধন, ধনুর্বাণ হাতে আগমনের প্রয়োজন কি? তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর।"

অর্জুন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন না। তেজস্বী অর্জুনকে দেখে প্রীত হয়ে তপস্বী সহাস্যে বললেন, "আমি ইন্দ্র। তোমার মঙ্গল হোক। তুমি স্বর্গ প্রার্থনা কর।"

অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে ইন্দ্রকে প্রণাম করে বললেন, "আমি স্বর্গ চাই না। দেবত্বও আকাঙ্ক্ষা করি না। দেবতাদের ঐশ্বর্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে করি। আমি আমার ভাইদের বনবাসে রেখে এসেছি। তাই শত্রুজয়ের জন্য আমি চাই অস্ত্র।"

ইন্দ্র বললেন, "বৎস, তুমি যখন ত্রিলোচন শিবের দর্শন প্রাপ্ত করবে তখন তোমাকে সকল দিব্যাস্ত্র দান করব। শিবের দর্শনে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

এই বলে ইন্দ্র অন্তর্ধান করলেন।

অর্জুন তখন ইন্দ্রকীল পর্বতের তপোবন অতিক্রম করে আরো গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে পাহাড়ী ঝর্ণা কলস্বরে বয়ে চলেছে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় পাখির কাকলি। হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর কলকণ্ঠে বনমধ্যে পত্রনিস্বন তুলে বিচরণ করছে। বনছায়ায় সূর্যকিরণ ঝল্‌মল্‌ করছে। সেই ক্ষণসঞ্চারী আলো যেন ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি। সহসা অরণ্যের নির্জনতাকে কম্পিত করে আকাশে গম্ভীর শঙ্খনাদ ও পটহধ্বনি শোনা গেল। অর্জুনের চারিদিকে মেঘজাল বিস্তৃত হল। ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

তখন অর্জুন বৈদুর্যমণির মত নির্মল এক স্রোতস্বতীর কূলে অজিন আসন পেতে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপঃপ্রভায় চতুর্দিক ধূমায়িত হয়ে উঠল। মহর্ষিগণ তখন অর্জুনের কঠোর তপস্যার কথা মহাদেবকে জানালেন।

অর্জুন হঠাৎ দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পিনাক হস্তে কাঞ্চন তরুর মত উজ্জ্বল এক কিরাত মূর্তি। পাশে বনলক্ষ্মীর ন্যায় এক কিরাত রমণী। আর যত অরণ্য অনুচর নরনারী।

অর্জুন অবাক হয়ে দেখলেন, হঠাৎ সেই ঘোর অরণ্য নিঃশব্দ হয়ে গেল। পাতার মর্মর, প্রস্রবণের কলতান, পক্ষীর কাকলি সব থেমে গেল। চারিদিক মৌন স্তব্ধ রহস্যময়। শুধু তার সম্মুখে সুমেরু পর্বতের মত সেই কিরাত মূর্তি দাঁড়িয়ে।

সেই সময় মূক নামে এক দানব বরাহরূপ নিয়ে অর্জুনের দিকে ধাবিত হল।

অর্জুন গাণ্ডীব উত্তোলন করে বরাহকে শরাঘাত করতে গেলে কিরাত তাঁকে নিষেধ করলেন, "হে তাপস, আমিই আগে এই নীলমেঘবর্ণ বরাহকে মারবার ইচ্ছা করেছি।"

অর্জুন কিরাতের নিষেধ শুনলেন না। অর্জুন ও কিরাত একই সঙ্গে শর নিক্ষেপ করলেন। দুটি নিক্ষিপ্ত শর এক সঙ্গে গিয়ে বরাহের দেহ বিদ্ধ করল। মূক দানব ভীষণ মূর্তি ধারণ করে মারা গেল।

অর্জুন কিরাতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি কনককান্তি? এই ঘোর

অরণ্যে স্ত্রীদের নিয়ে ভ্রমণ করছ, তোমার ভয় করে না ? আমার এই শিকারের উপরে তুমি বাণ বিদ্ধ করলে কেন ? তুমি মৃগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করেছ, আমি তোমাকে বধ করব।"

কিরাত হাসতে হাসতে বললেন, "হে বীর, আমরা এই বনেই থাকি। আমাদের জন্য ভাবনা ক'রো না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই জনহীন অরণ্যে কেন এসেছ ?"

অর্জুন বললেন, "হে অরণ্যচারী দাম্ভিক ! তুমি জান না কার সঙ্গে কথা বলছ। দেখ আমার এই গাণ্ডীব আর অগ্নিতুল্য শরজালের শক্তি।"

অর্জুন কিরাতের উপর অজস্র ধারায় বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিরাত অনায়াসে সেই বাণ সব সহ্য করে হাসতে হাসতে বললেন, "আরো বাণ নিক্ষেপ কর। তোমার অক্ষয় তূণে যত বাণ আছে সব নিক্ষেপ কর।"

অর্জুনের সকল বাণবর্ষণ ব্যর্থ হল।

অক্ষত কলেবরে কিরাত হাসতে হাসতে অর্জুনের গাণ্ডীব কেড়ে নিলেন।

অর্জুন বাহু যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

কিরাতের একটা মুষ্টাঘাতে অর্জুন অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞালাভ করে বিমর্ষ হয়ে ভাবতে লাগলেন, কিরাতবেশী কে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ? অর্জুন মহাদেবের মৃন্ময় মূর্তি গড়ে পূজা করতে লাগলেন। আর বিস্মিত হয়ে দেখেন, তাঁর নিবেদিত পুষ্পমাল্য সব কিরাতের কণ্ঠে বিলগ্ন। অর্জুন তখন বুঝলেন, ইনিই দেবাদিদেব মহাদেব। অর্জুন সেই কাঞ্চনমূর্তি কিরাতের চরণে প্রণত হয়ে স্তব করতে লাগলেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। স্পর্শ মাত্র অর্জুনের অঙ্গেরসকল দুঃখক্ষত অপনোদন হল। মহাদেব বললেন, "এই নাও তোমার গাণ্ডীব। তোমার অক্ষয় তূণ আবার অক্ষয় হোক। পূর্বজন্মে তুমি বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সহচর হয়ে নররূপে অজুতবর্ষ তপস্যা করেছিলে। তোমার মত শ্রেষ্ঠ বীর স্বর্গেও নেই। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।"

অর্জুন বললেন, "হে ভগবন, আপনার ব্রহ্মশিরা পাশুপত অস্ত্র আমাকে দান করুন। কৌরব যুদ্ধে আমি তা শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করব।"

মহাদেব মূর্তিমান কৃতান্তের তুল্য তাঁর পাশুপত অস্ত্র অর্জুনকে দান করে, অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে বললেন, "মন চক্ষু বাক্য এবং শরাসন দ্বারা এই ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ করলে তার ফল অমোঘ। মানুষ তো দূরের কথা, ইন্দ্র যম কুবের বরুণ ও পবনও এই অস্ত্রের প্রয়োগ জানেন না। তবে হঠাৎ কখনো কোন ব্যক্তির উপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করবে

না ; কিংবা যে বীর নয় তাকেও এই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করবে না। তাহলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।" এই বলে মহাদেব তাঁর মন্ত্রঃপূত অস্ত্র অর্জুনকে দান করলেন।

সহসা তখন অরণ্য পর্বত মেদিনী কম্পিত হতে লাগল। আকাশমণ্ডলে ভেরী শঙ্খ দুন্দুভিনিনাদ হতে লাগল। দেব দানব স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখল মর্ত্যের মানুষ লাভ করল দেবতারও পক্ষে দুর্লভ সেই মহাশক্তি।

মহাদেব অন্তর্হিত হলেন।

তখন ইন্দ্র এসে অর্জুনকে দেবলোকে আমন্ত্রণ করলেন।

আকাশ আলো করে, মেঘ বিদীর্ণ করে, দশদিকে প্রতিধ্বনি তুলে, মাতলি চালিত মায়াময় রথে অর্জুন এবার চললেন স্বর্গের অমরাবতীতে।

কিন্তু স্বর্গে যাওয়ার আগে মর্ত্যের সন্তান অর্জুন ভুলতে পারেন না পৃথিবীর স্নেহ। এই মাটির ঋণ। তাই প্রথমে তিনি গঙ্গায় স্নান করলেন। তারপর বিনম্র স্তবে হিমালয়ের কাছে বিদায় নিলেন। বড় শোভন বড় মধুর সেই বিদায় প্রার্থনা। বেদধ্বনিমুখরিত উত্তুঙ্গ মহিমান্বিত হিমালয়ের কাছে স্বর্গের বৈভবও তখন ম্লান হয়ে যায়। স্বর্গে যাওয়ার প্রাক্কালে অর্জুনেরও তাই কোন আনন্দ হয়নি। তিনি প্রবাসীর ভারাক্রান্ত মন নিয়েই মাতলির রথে উঠলেন।...

এদিকে কাম্যক বনে অর্জুনবিহীন পাণ্ডবদের বিষণ্ণ দিন কাটে। যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা দেন তবুও ভীমের ক্ষোভ ও ক্রোধ যায় না। তাঁদের সকলের মৌন অভিযোগ আর অভিমান যুধিষ্ঠির নীরবে সহ্য করেন। গভীর মর্মবেদনায় তাঁর অন্তর দীর্ণ হয়ে যায়। বড় নির্জন বড় সন্তপ্ত যুধিষ্ঠির। তিনি বিরলে কেবল অধ্যয়ন জপ ও হোম করে দিন অতিবাহিত করেন।

একদিন উত্তেজিত ভীমকে যুধিষ্ঠির প্রবোধ দিচ্ছেন এমন সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব এসে উপস্থিত হলেন।

যুধিষ্ঠির ঋষিকে মধুপর্ক দিয়ে অর্চনা করলেন।

আসন গ্রহণ করে বিশ্রামের পর বৃহদশ্ব বললেন, "হে যুধিষ্ঠির, তুমি নিজেকে সবচেয়ে দুঃখী সবচেয়ে মন্দভাগ্য বলে মনে করছ ? কিন্তু তোমার চেয়েও দুঃখী রাজা এক ছিলেন। তাঁর কথা বলছি শোন।"

বৃহদশ্ব তখন শুরু করলেন এক নিটোল প্রেমের গল্প। মহাভারতের মধ্যে যেন আর-এক মহাভারত। সেই পাশা খেলা, সেই রাজ্যনাশ, সেই ভ্রাতৃবিরোধ, বনবাস বিচ্ছেদের মর্মন্তুদ কাহিনী—নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান। নল যেন পাণ্ডবদেরই প্রতিরূপ আর দময়ন্তী হলেন দ্রৌপদী।

নিষধ রাজ্যে বীরসেনের পুত্র রাজা নল। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বীরশ্রেষ্ঠ ও রূপবান্। পাশা খেলায় ছিল তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ।

আর বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক রাজা ছিলেন। মহর্ষি দমনের বরে ভীমের এক কন্যা জন্মে। মহর্ষি দমনের আশীর্বাদে জন্ম বলে তার নাম দময়ন্তী। দময়ন্তী ভুবনবিখ্যাত সুন্দরী। দ্রৌপদীর মতই সে কৃষ্ণকুন্তলা, শ্যামাঙ্গিনী, পদ্মপলাশাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় লাবণ্যময়ী। সেই সৌন্দর্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে দময়ন্তীর দুই ভ্রূর মধ্যে পদ্মের ন্যায় সুন্দর এক জটুল চিহ্ন।

চারদিকে নলের যশ-গৌরব ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শুনে দময়ন্তী মনে-মনে নলকে ভালবাসলেন। কিন্তু নলকে তিনি চোখে দেখেননি।

একদিন ভ্রমণ করতে করতে সরোবরের ধারে নল এক স্বর্ণহংস ধরলেন। হংস তাঁকে বলল, "মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার কথা বলব। তাহলে দময়ন্তী আপনাকে পতিরূপে বরণ করবেন।"

নল হংসকে আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

উড়তে উড়তে হংসদূত দময়ন্তীর কাছে গিয়ে নলের রূপগুণের কথা বলল। তাই শুনে দময়ন্তী মনে-মনে নলকে হৃদয় সমর্পণ করলেন।

একদিন বিদর্ভ রাজা দময়ন্তীর বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। দেশ বিদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ রাজারা আসছেন দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হয়ে। রাজা নলও চলেছেন। স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র বরুণ অগ্নি এঁরাও চলেছেন দময়ন্তীকে লাভ করবার আশায়।

পথে নলের সঙ্গে দেবতাদের দেখা।

দেবতারা নলকে অনুরোধ করলেন, "রাজা, তুমি গিয়ে দময়ন্তীকে বল, তিনি যেন আমাদের মধ্যে কোন এক জনকে বরণ করেন।"

নল আর কি করেন, দেবতাদের বরে অদৃশ্য হয়ে দময়ন্তীর নিভৃত কক্ষে গিয়ে তাঁদের প্রস্তাব জানালেন।

দময়ন্তী বললেন, "আমি তো তোমাকেই মনে-মনে পতিরূপে বরণ করেছি। অন্য কাওকে বরণ করে আমি দ্বিচারিণী হতে পারব না।"

নল এসে দেবতাদের জানালেন সেই কথা।

স্বয়ম্বর সভায় এসে দময়ন্তী অবাক হলেন। দেখেন সেখানে পাঁচজন নল বসে। দেবতারা সবাই নলের রূপ ধারণ করেছেন। দময়ন্তীর সামনে নলের বেশে পঞ্চস্বামী—দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর তাৎপর্যের আভাস নয়তো?—

যাইহোক, দময়ন্তী পড়লেন মহাবিপদে। নিরুপায় হয়ে তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "আপনারা আমাকে দয়া করুন। নলকেই আমি স্বামীরূপে বরণ করেছি। আমি যেন সত্য ও সতীত্ব থেকে ভ্রষ্ট না হই।"

দেবতারা তখন প্রসন্ন হয়ে স্বরূপ ধারণ করলেন। আর দময়ন্তী নলকে বরমাল্য দিয়ে বরণ করলেন। একে একে দেবতারা নলকে আশীর্বাদ করলেন।

ইন্দ্র বললেন, "যজ্ঞস্থলে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করবে।"

অগ্নি বললেন, "তুমি ইচ্ছা করলেই অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারবে।"

যম বললেন, "তুমি যা রন্ধন করবে তাই সুস্বাদু হবে।"

বরুণ বললেন, "তুমি যেখানে জল চাইবে সেখানেই জল পাবে।"

স্বয়ম্বর সভা থেকে দেবতারা ফিরে চলেছেন। পথে কলি ও দ্বাপরের সঙ্গে দেখা। কলি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "কি, সামান্য মানবীর এত স্পর্ধা! দেবতাদের উপেক্ষা করে দময়ন্তী মানুষকেই বরণ করেছে? আমি এর প্রতিশোধ নেব। আমি নলের শরীরে প্রবেশ করব, আর দ্বাপর, তুমি পাশার হৃদয়ে প্রবেশ কর। আমরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকব।"

অবশেষে একদিন সে সুযোগ এল।

নল ভুল করে অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যাপূজায় বসেছেন, সেই ত্রুটি ধরে কলি নলের শরীরে প্রবেশ করল। আর নলের ভাই পুষ্করকে প্ররোচিত করল পাশা খেলায়।

পুষ্কর পাশা খেলতে নলকে ডাকল।

নল রাজী হল।

চলল তখন দুই ভাইয়ে সর্বনাশা পাশা খেলা। আমরা যেন সভাপর্বের দ্যূতক্রীড়ার পুনরভিনয় দেখছি। যুধিষ্ঠিরের আসনে বসেছেন এখন নল। পাশা খেলায় দময়ন্তীকেও পণ রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল পুষ্কর। কিন্তু নল সম্মত হননি। যুধিষ্ঠিরের মত সর্বনাশের শেষ ধাপে নেমে যাওয়ার মত সাহস অথবা দুঃসাহস নলের ছিল না।

নল সর্বস্বান্ত হলেন।

দময়ন্তীর হাত ধরে নল বনে গমন করলেন। বনের মধ্যে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুজনেই কাতর। অদূরে এক ঝাঁক হাঁস দেখতে পেয়ে নল তাঁর পরিধানের বস্ত্র দিয়ে সেই হাঁস ধরতে গেলেন। কিন্তু এমনি কপাল, হাঁসগুলি তখন নলের বস্ত্র নিয়ে উড়ে গেল। উড়তে উড়তে হাঁসের ঝাঁক কলরব করে বলে

গেল, "আমরাই পাশা হয়ে তোমাকে সর্বস্বান্ত করেছি। আমরাই এখন তোমাকে বিবস্ত্র করলাম।"

নিরুপায় হয়ে তখন দময়ন্তীর শাড়ি দুজনে পরে বনের পথে চলতে লাগলেন।

নল দময়ন্তীকে বললেন, "আমার সঙ্গে থেকে বৃথা কেন কষ্ট পাচ্ছ তুমি? বিদর্ভরাজ্যে পিতার কাছে তুমি বরং যাও।"

দময়ন্তী বললেন, "তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। যদি যেতে হয় তুমিও চল আমার সঙ্গে।"

নল রাজী হলেন না। বললেন, "সর্বস্বান্ত হয়ে আমি এখন বিদর্ভ রাজের সামনে দাঁড়াব কেমন করে?"

এমনি করে অসহায়ভাবে অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে তাঁদের দিন কাটে। একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে দময়ন্তী ভূমিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নলের চোখে ঘুম নেই। ভাবছেন, আমি যদি দময়ন্তীকে ত্যাগ করে চলে যাই তাহলে সে নিশ্চয়ই পিতৃগৃহে যাবে। আমার ভাগ্য নিয়ে আমি চলব একা। যতদিন না সুদিন আসে।

একই বস্ত্র ছিল দুজনের পরনে।

হঠাৎ সামনে দেখেন একটা খড়্গ। সেই খড়্গ দিয়ে দময়ন্তীর বস্ত্রের এক ভাগ কেটে নিয়ে, কোন রকমে তাই পরিধান করে, নিঃশব্দে দময়ন্তীকে সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যে একা ফেলে রেখে নল নিরুদ্দেশ হলেন।

যুধিষ্ঠির শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বৃহদশ্ব সস্নেহ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন,

ঘুমভেঙে উঠে দময়ন্তীর হৃদয় হাহাকার করে উঠল। অরণ্যের মধ্যে সেই কঠিন শিলাতলে দাঁড়িয়ে দময়ন্তীর সর্বাঙ্গ শোকাহত ক্রন্দনে দীর্ণ হতে লাগল—

…বিললাপ সুদুঃখিতা।
ভর্তৃশোকপরীতাঙ্গী শিলাতলমথাশ্রিতা।

(বনপর্ব, ৬৪/১২)

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দময়ন্তী বনে-বনে স্বামীর অন্বেষণ করছিলেন এমন সময় এক অজগর তাঁকে আক্রমণ করল। তখন বনের এক ব্যাধ এসে দময়ন্তীকে বাঁচায়। কিন্তু ব্যাধ দময়ন্তীর অসামান্য রূপে লুব্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করতে এল। দময়ন্তীর সতীত্বের তেজে ব্যাধ নিহত হল।

এমনি করে অনেক লাঞ্ছনা অনেক দুঃখ সয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি এক তপোবনে একদল তপস্বীকে দেখতে পেলেন। তপস্বীদের কাছে দময়ন্তী তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা জানালেন। তপস্বীগণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "শীঘ্রই তুমি তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে। তোমরা আবার রাজ ঐশ্বর্য লাভ করবে।"

দুঃখের দিনে ঋষিদের আশীর্বাদই দময়ন্তীর একমাত্র সম্বল।

যেতে যেতে একদল বণিকের সঙ্গে দেখা। কিন্তু রাত্রে এক বন্যহস্তী এসে বণিকের আস্তানা তছনছ করে অনেককে নিহত করল। পথের আপদ মনে করে দময়ন্তীকে তারা তখন তাড়িয়ে দিল।

তারপর অনেক পথ হেঁটে অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী এক রাজার রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজপথ দিয়ে চলেছেন পাগলিনীর মত। রাস্তার বালকেরা তাঁকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়া করছে। রাজপ্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজমাতা এই করুণ দৃশ্য দেখলেন। তাঁর মায়া হল। রাজমাতার পরিচারিকা এসে দময়ন্তীকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল। দময়ন্তী তাঁর দুঃখের কথা বললেন কিন্তু নিজের পরিচয় দিলেন না। দময়ন্তী রাজমাতাকে বললেন, "আমি আপনার আশ্রয়ে থাকব ; কিন্তু কারো উচ্ছিষ্ট খাব না। কারো পায়ে হাত দেব না, পা ধুইয়ে দেব না।"

বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস কালে রাজমহিষী সুদেষ্ণাকেও দ্রৌপদী এই একই অঙ্গীকার করিয়েছিলেন। সুদেষ্ণাও ছদ্মবেশী দ্রৌপদীকে রাজপথ থেকে ডেকে আনিয়েছিলেন। সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁকে কারো চরণ বা কারো উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করতে হবে না।

দ্রৌপদী ও দময়ন্তী যেন সমমাত্রিক চরিত্র। রূপে স্বভাবে ভাগ্যে তাঁরা উভয়েই সমান। সুদেষ্ণা যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে দ্রৌপদীর রূপ দেখে অবাক হয়ে বলছেন, তখন আমরা সেই বর্ণনার মধ্যে দময়ন্তীকেও দেখতে পাই। পায়ের গ্রন্থি উচ্চ নয়। ঘনসন্নিবিষ্ট উরু। নিম্ন নাভি। মৃদু কণ্ঠস্বর। নম্র স্বভাব। উন্নত নাশা, আপীন স্তন, সুগঠিত নিতম্ব। ওষ্ঠাধর, পদতল ও করতল রক্তবর্ণ। হংসগদভাষিণী সুকেশী সুস্তনী। এই একই রূপ দ্রৌপদীর এবং দময়ন্তীর।

কিন্তু অন্তরাত্মার স্বভাবের দিক থেকে দময়ন্তীর সাদৃশ্য যতখানি দ্রৌপদীর সঙ্গে তার চেয়ে অনেক বেশি মিল যেন রামায়ণের সীতার সঙ্গে। সকল দুঃখকে মাথায় নিয়ে নীরব প্রেমের যে অবিচল শান্তশ্রী তার জীবন্ত মূর্তি

হলেন সীতা ও দময়ন্তী। দুজনের মধ্যে রয়েছে জল ও মাটির গুণ। কিন্তু দ্রৌপদীর মধ্যে পাই আগুনের স্পর্শ।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, দময়ন্তী বা সাবিত্রী উপাখ্যান বেদব্যাসের প্রথম জীবনের রচনা। যখন তিনি মহাকবি বাল্মীকির সুললিত কাব্যশ্রীর প্রভাবে অনুপ্রাণিত। ক্রমে বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যাসের কাব্যপ্রতিভা পেয়েছিল যে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি, কঠোর তপঃসিদ্ধ তীব্রতা, তারই সুষমারূপ হলেন দ্রৌপদী।

দময়ন্তী ও সীতা প্রেমের নিষ্কম্প প্রদীপের মত অথবা রাত্রিশেষের আকাশের শুকতারার মত। কিন্তু দ্রৌপদী যজ্ঞের দৃপ্ত অগ্নিশিখা।...

রাজমাতাকে দময়ন্তী আরো বললেন, "আমার স্বামীর সন্ধানের জন্য কেবল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেখা করব, আর কোন পরপুরুষের মুখ দেখব না। কোন পুরুষ যদি আমাকে অপমান করতে আসে তাহলে আপনাকে তার বধদণ্ড দিতে হবে।"

রাজমাতা সম্মত হলেন। রাজকন্যা সুনন্দার সখী হয়ে দময়ন্তী সেই রাজবাড়ীতে আশ্রয় নিলেন।

যুধিষ্ঠিরের দুই চোখে বুঝি করুণার অশ্রু। জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু রাজা নলের কি হল?"

বৃহদশ্ব বলে চলেন, দিশাহারা হয়ে নল বনে-বনে বিচরণ করতে লাগলেন। বনের মধ্যে হঠাৎ দেখেন দাবানল জ্বলছে। অগ্নিপরিবেষ্টিত হয়ে কর্কোটক নামে এক নাগ প্রাণ রক্ষার জন্য সকাতরে নলের কাছে প্রার্থনা করছে। নল তখন কর্কোটককে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু নাগ আচম্কা নলকে দংশন করল। দংশন বিষে নলের সুন্দর রূপ বিকৃত হয়ে গেল।

নল তখন বললেন, "নাগ, তুমি আমার এ কি দশা করলে?"

নাগ বলল, "মহারাজ, আপনি ভয় পাবেন না। এখন আপনাকে আর কেউ চিনতে পারবে না। আপনি অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের কাছে তাঁর সারথি হয়ে বাস করুন। আপনি তাঁকে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা দেবেন। তিনি আপনাকে অক্ষবিদ্যা শেখাবেন। তাতেই আপনি আবার আপনার পত্নী ও রাজ্য ফিরে পাবেন। আর যখন আপনার পূর্বরূপ ফিরে পেতে ইচ্ছা হবে তখন এই বস্ত্রখানি পরিধান করবেন।" এই বলে নাগ একখানি বস্ত্র নলকে দিল।

নল ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে বাহুক নাম নিয়ে তাঁর সারথি হয়ে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভরাজ ভীম কন্যা জামাতার সন্ধানে নানাদেশে ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করলেন। চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। একদিন সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চেদিরাজ্যে এসে রাজপুরীতে দময়ন্তীর সন্ধান পেলেন। রাজমাতা আশ্চর্য হয়ে জানলেন সুনন্দার সখী এই আশ্রিতা কন্যা আর কেউ নয় তাঁরই ভগ্নীর কন্যা দময়ন্তী। এরপর দময়ন্তী পিতৃগৃহে গেলেন।

পিতৃগৃহে এসে দময়ন্তী নলের সন্ধান করতে লাগলেন। পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ অবশেষে ঋতুপর্ণের রাজত্বে হ্রস্ববাহু বিকৃতরূপ সারথি বাহুককে দেখে কথা প্রসঙ্গে নল বলে সন্দেহ করলেন। সেই সংবাদ পেয়ে দময়ন্তী পিতাকে না জানিয়ে সুদেবকে পাঠিয়ে ঋতুপর্ণকে সংবাদ দিলেন যে আগামী কাল দময়ন্তীর পুনরায় স্বয়ম্বর হবে।

অযোধ্যা থেকে বিদর্ভ অনেক দূর।

ঋতুপর্ণ ভাবছেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে এতটা পথ অতিক্রম করে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হবেন।

বাহুক তাঁকে বললেন, "মহারাজ, আপনি কোন চিন্তা করবেন না! আমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। যথা সময়ে আপনাকে স্বয়ম্বর সভায় পৌঁছে দেব।

বাহুক বিদ্যুৎ বেগে রথ চালালেন।

বিদর্ভে পৌঁছে ঋতুপর্ণ দেখেন স্বয়ম্বরের কোন আয়োজন নেই। তবে রাজা ভীম সাদরে ঋতুপর্ণকে অভ্যর্থনা করলেন।

রাজবাড়ীর অশ্বশালার এক কোণে বাহুক আশ্রয় নিলেন।

দময়ন্তী তাঁর পরিচারিকা কেশিনীকে গোপনে পাঠালেন বাহুকের উপরে নজর রাখতে।

কেশিনী এসে দময়ন্তীকে এক বিস্ময়কর সংবাদ দিল। বলল, "ভর্তৃদারিকে, আমি এমন আশ্চর্য মানুষ জীবনে দেখিনি, কখনো শুনিওনি। বাহুক ইচ্ছামত অগ্নি সৃষ্টি করতে পারেন। ইচ্ছামত শূন্য পাত্র জলপূর্ণ করতে পারেন। পুষ্প মর্দন করলে পুষ্প মলিন হয় না, বরং তার সৌরভ আরো বৃদ্ধি পায়। নীচু দ্বার দিয়ে প্রবেশের সময় বাহুক মাথা নত করেন না, বরং দ্বারই উঁচু হয়ে যায়। অগ্নিতেও তাঁর অঙ্গ দগ্ধ হয় না।"

দময়ন্তীর মনে পড়ল বিবাহের সময় দেবতাদের আশীর্বাদের কথা। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, এই বিকৃত রূপ বাহুকই তাঁর জীবনস্বামী রাজা নল। বাহুককে রাজঅন্তঃপুরে ডেকে আনা হল।

দময়ন্তীর রুক্ষ বিস্রস্ত কেশ, তাঁর পরিধানে গৈরিক সেই অর্ধবস্ত্রখণ্ড মাত্র।

দময়ন্তীর মলিন বিধুর বিরহিণী মুখখানি দেখে নল বিহ্বল হয়ে কেঁদে উঠলেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে আবার নলের অন্তরে জ্বলে ওঠে ঈর্ষা সন্দেহ অবিশ্বাস। তিনি দময়ন্তীকে কঠিন প্রশ্নে বিদ্ধ করে বলেন, "তুমি আবার স্বয়ম্বর ডেকে স্বৈরিণীর মত দ্বিতীয় স্বামী বরণ করতে চেয়েছিলে কেন? কেনই-বা ঋতুপর্ণকে গোপনে সংবাদ দিয়েছিলে? তোমার আহ্বানে ঋতুপর্ণ কেন এত ব্যগ্র হয়ে ছুটে এল তোমার কাছে?"

দময়ন্তীর চোখে জল...

বললেন, "আমি সকল দেবতাগণকে উপেক্ষা করে তোমাকে বরণ করেছিলাম, সেকি দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য? ব্রাহ্মণ পর্ণাদের কাছে যখন শুনলাম, তুমি ঋতুপর্ণের রাজত্বে বাহুক হয়ে আছে তখন এই স্বয়ম্বর সভার ছল করে তোমাকে এখানে এনেছি। দময়ন্তী তোমার। চিরকাল তোমার।"

নল তখন কর্কোটক প্রদত্ত বস্ত্র পরে আপন সুন্দর রূপ কান্তি ফিরে পেলেন। দময়ন্তীকে চরণতল হতে হাত ধরে তুলে বললেন, "বৈদর্ভি, ওঠ, রোদন ক'রো না।"

রাজপুরীতে তখন আনন্দশঙ্খ বেজে উঠল। মধুর হল সেদিন তাঁদের মাধবী নিশীথিনী।

একমাস পরে নল বিদর্ভ রাজের সৈন্য সামন্ত নিয়ে নিষধ রাজ্যে পুষ্করকে বললেন, "আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, কিংবা পুনরায় পাশা খেলায় এস।"

অক্ষক্রীড়ায় নল পুষ্করকে পরাজিত করে নিজ রাজ্য ফিরে পেলেন।

গল্প শেষ করে ঋষি বৃহদশ্ব বললেন, "যুধিষ্ঠির, তুমি আশ্বস্ত হও। বিষাদগ্রস্ত হয়ো না। তোমার মনে এখনও ভয় আছে, পাছে কৌরবেরা আবার অক্ষক্রীড়ায় ডেকে তোমাকে সর্বস্বান্ত করে। আমি অক্ষহৃদয় জানি। তোমাকে সেই গুহ্যবিদ্যা দান করছি, তুমি শিক্ষা কর।" এই বলে যুধিষ্ঠিরকে নিখিল অক্ষবিদ্যা শিখিয়ে বৃহদশ্ব তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন···

এদিকে আবার সেই হস্তিনাপুর রাজসভা।···

উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অন্ধদৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁর চোখে অন্ধকার। কঠিন নিরেট অন্ধকার। তাঁর অন্তরের হাহাকার সেই অন্ধকারে পিশাচের চিৎকারের মত প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে।

—"সঞ্জয় !"

—"আজ্ঞা করুন মহারাজ।"

—"সঞ্জয়, গুপ্তচরেরা কি সংবাদ নিয়ে এসেছে ? গোপন ক'রো না। আমাকে বল। আমি অন্ধ, কিন্তু মনে ক'রো না আমি দৃষ্টিহীন। জানবে, অম্বিকানন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রজ্ঞাচক্ষু। তোমাদের ক্ষীণ নেত্রদৃষ্টির চেয়ে তাঁর দৃষ্টি অনেক প্রখর, অনেক সুদূরপ্রসারী। মহর্ষি দ্বৈপায়নের কাছে আমি সব শুনেছি। এখন তোমার গুপ্তচরদের সংগৃহীত বিবরণ কি বল।"

—"কৌরবদের পক্ষে তা দুঃসংবাদ মহারাজ। গুপ্তচরেরা যে বিবরণ সংগ্রহ করেছে বলছি শুনুন।"

[নয়]

ব্রাহ্মণ বিপ্লব ও ওঙ্কারে টঙ্কার

গুপ্তচরেরা যেসব সংবাদ সংগ্রহ করেছে সঞ্জয় তা সবিস্তারে ধৃতরাষ্ট্রকে বিবৃত করলেন। পাঞ্চাল কেকয় বৃষ্ণিপ্রধানদের নিয়ে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপনে মিলিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আশ্বাস দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যুদ্ধে কৌরবদের বিনাশ করে যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অভিষিক্ত করবেন। অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে মহাদেবের থেকে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছেন এবং যাবতীয় দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য তিনি এখন অমরাবতীতে অবস্থান করছেন। সঞ্জয় আরো জানালেন, যুধিষ্ঠির তাঁর অপর তিন ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে লোমশমুনির তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের সকল তীর্থগুলি ভ্রমণ করছেন। তাঁদের সঙ্গে অগণিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী। গুপ্তচরদের অনুমান, যুধিষ্ঠিরের এই তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। কৌরবদের প্রতি বিরূপ রাজন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সহায় ও বলবৃদ্ধির চেষ্টায় তাঁরা নিযুক্ত। সেই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের বার্তাবহ দূতের কাজ করছেন। তাঁরা দিকে-দিকে জনমত গঠন, জনসমর্থন লাভের ও সামরিক শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

শুনে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হলেন।

দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি সব জানি সঞ্জয়। অর্জুন ও পাণ্ডবদের কৃতিত্বের সংবাদ অবগত আছি। আর এও জানি, আমার পুত্র দুর্যোধন দুরাচারী পাপমতি গ্রাম্যধর্মে প্রমত্ত। অচিরেই সে রাজ্যচ্যুত হবে। এক কালান্তক ঘোর যুদ্ধ আসন্ন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি সঞ্জয়, সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দুর্যোধনকে রক্ষা করে এমন রথী কে আছে? ভীষ্ম ও দ্রোণ বীর বটে, কিন্তু তাঁরা এখন বৃদ্ধ স্থবির। আর কর্ণ? সে বড় প্রমাদী, দুর্বলচিত্ত, দয়ালু। কর্ণের উপরে নির্ভর করা যায় না। মন্দমতি বিচেতন কর্ণ আর সৌবল এরা মন্ত্রী হয়ে দুর্যোধনকে কেবল অহরহ পাপে উত্তেজিত করে তুলছে।

"এদিকে পাণ্ডবেরা শৌর্যশালী সমরনিপুণ অস্ত্রদক্ষ। তারা ধীর অপ্রমত্ত ধৈর্যশালী। যুধিষ্ঠির সত্যাশ্রয়ী। স্বয়ং বাসুদেব তাদের মন্ত্রী রক্ষক সুহৃদ। অতএব পাণ্ডবদের অজেয় কি আছে?" (বনপর্ব, ৪৮ অধ্যায়)

দেখা যাচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমগ্র পরিস্থিতি নিখুঁতভাবে স্পষ্ট। তাঁর বুদ্ধির কোন অভাব নেই। সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সত্য নিরূপণ করতেও তিনি পারেন। কিন্তু প্রতিকার করবার কোন শক্তি নেই। অশুদ্ধ চিত্তে পঙ্কিল মনে কি করে সকল জ্ঞান বন্ধ্যা হয়ে যায় ধৃতরাষ্ট্র তারই এক করুণ দৃষ্টান্ত।...

সকলের কথায় আচরণে চিন্তায় আশঙ্কায় নিয়তির মত অমোঘ হয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে অনিবার্য যুদ্ধের নিশ্চয়তা। উভয়পক্ষের মনে শত্রুতার আগুন বহ্নি-উচ্ছ্বাস নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘটনার সূত্রগুলি এক অদৃশ্য হস্ত যেন অতিদ্রুত আকর্ষণ করে চলেছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের সকল পুরুষপ্রধান বুঝে নিয়েছেন কি ঘটতে চলেছে। কি তার পরিণাম। তবু নিবারণ করবার সাধ্য কারো নেই। কালের এই অনিবার্য করাল গতির মধ্যেই রয়েছে মহাভারতের ট্র্যাজেডির মূল। মহাভারতের নায়ক যেই হোক, নায়ক-শক্তি মহাকাল। যেন অলক্ষ্যে থেকে মহাকাল পাশার দান ফেলে সকল কৃত সংগ্রহ করছেন,—"কৃতামিব শম্নী বিচিনোতি কালে"। আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই কবি সেই কথা আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। বেদব্যাস বলছেন, কালই সব প্রজা সৃষ্টি করছেন, সংহার করছেন, সংহারের পর কাল আবার কালের মধ্যে লয় পাচ্ছেন।—"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ॥" (আদিপর্ব, প্রথম অধ্যায়, ২৪৯ শ্লোক)

যুদ্ধের পরেও আবার বেদব্যাস সন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, তুমি ভীম অর্জুন নকুল সহদেব তোমরা কেউই কৌরবদের বধ করনি। কালই পর্যায়-ক্রমে তাদের প্রাণ নিয়েছে।—

"ন ত্বং হন্তা ন ভীমোহয়ং নার্জুনো ন যমাবপি।
কালঃ পর্যায়ধর্মেণ প্রাণানাদত্ত দেহিনাম্॥"

(শান্তিপর্ব, ৩৩/১৬)

শ্রীকৃষ্ণও বলছেন, যা ঘটেছে তা ভবিতব্য—"ভবিতব্যং হি তত্তথা"। (আশ্বমেধিকপর্ব, ২/৮)

অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবধারিত।

এই যুদ্ধ বাদ দিয়ে মহাভারত হয় না। আবার যুদ্ধের কারণগুলি বাদ দিলেও যুদ্ধ হয় না। আদিপর্ব থেকে স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত—এই দীর্ঘ আঠারটি পর্ব জুড়ে প্রতিটি অনুষ্টুপ্ শ্লোকের অন্তরালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-

ভাবে ধ্বনিত হয়েছে যুদ্ধের দামামা। ক্ষত্রিয়ের জ্যা-ঘোষ আর ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-ঘোষ—এই দুয়ের মিলিত ওঙ্কারে ও টঙ্কারে অরণ্য-আকাশ প্রতিধ্বনিত করে রচিত হয়েছে মহাভারতের আবহসঙ্গীত। বেদব্যাস একটি মাত্র শ্লোকে তা ধরে দিয়েছেন—

"জ্যাঘোষশ্চৈব পার্থানাং ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্।
সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ভূয় এব ব্যারোচত ॥ ৪"
(বনপর্ব, ২৬ অধ্যায়)

(পাণ্ডবদের ধনুষ্টঙ্কার আর ব্রাহ্মণের বেদধ্বনির ওঙ্কার
—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে বড়ই শোভা ধারণ করেছে।)

কিন্তু কেন এই সর্বনাশা যুদ্ধ ?

সে কি শুধু দুর্যোধনের ঈর্ষা আর লোভের জন্য ? হস্তিনাপুরের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র ? দ্রৌপদীর অপমান আর লাঞ্ছনাই কি এর কারণ ?

এগুলি কারণ বটে, তবে আসল কারণ নয়। হরিবংশে (ভবিষ্যপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়) আমরা দেখেছি, বেদব্যাস বলছেন, রাজসূয় যজ্ঞই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ। কুরুপাণ্ডবের জ্ঞাতিবৈরের পশ্চাতে রয়েছে তৎকালীন ভারতবর্ষের আরো সব ব্যাপক বিস্তৃত রাজনৈতিক কার্য-কারণের সংঘাত। সেই সব ঐতিহাসিক কার্য-কারণের নানা রকম চিহ্ন অভিজ্ঞান মহাভারতের নানা স্থানে বেদব্যাস ইঙ্গিত করে গেছেন। মহাভারতের বিরাট কলেবরে অরণ্য পর্বতের গাত্রে-গাত্রে আমরা দেখি কতসব আগুনের পোড়া-দাগ ক্ষত ধ্বংসচিহ্ন। বোঝা যায় ভারতবর্ষের উপর দিয়ে সেই সময় বেশ কয়েকটি সমাজ-বিপ্লব রাষ্ট্র-বিপ্লবের ঝড় বয়ে গেছে। আর তারই শেষের দিকে শুরু হয় এক ভীষণ ব্রাহ্মণ-বিপ্লব। সেই ভয়ঙ্কর বিপ্লবের উগ্রতা প্রশমিত হলেও তার জের তখনও কাটেনি। সমাজের সেই অস্থির রক্তাক্ত পরিবেশ মহাভারতের পশ্চাৎপট।

যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্য করে ইতিহাসের সেই সব চিহ্নগুলি কবি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ ভারতবর্ষের তৎকালীন ইতিহাসের উপাদানে সমাকীর্ণ। মণিমালার মত গেঁথে দেওয়া হয়েছে কত সব শ্রুত অশ্রুত ঘটনা দুর্ঘটনা কাহিনী উপাখ্যান। তার অনেকখানিই হয়তো আজকের যুগে আমাদের কাছে অতিপ্রাকৃত অবাস্তব অদ্ভুত অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেইসব বিচিত্র কাহিনীর ভিতরে যে ইঙ্গিত যে প্রতীক যে দ্যোতনার আভাস রয়েছে, তখনকার সমাজের ও জীবনের যে

ছবি, মানুষের জীবনযাত্রার যে ঘর্মাক্ত নিঃশ্বাস তার ঐতিহাসিক মূল্য তো কম নয়।

ঔর্ব ঋষি, চ্যবন, পরশুরাম, কার্তবীর্যার্জুন, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ, শক্তি-কল্মষপাদের কাহিনীগুলির অন্তরালে ইতিহাসের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

এক সময় দেশ জুড়ে চলেছিল ব্রাহ্মণহত্যার মারণযজ্ঞ। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ দেখলেই তাঁদের শিরচ্ছেদ করতে থাকে। ব্রাহ্মণপত্নীদের গর্ভস্থ সন্তানদের পর্যন্ত তারা নির্বিচারে নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে। ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে ব্রাহ্মণেরা দলে দলে অরণ্যে পর্বতে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। প্রায় একশ বছর ধরে চলেছিল সেই নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞ।

তারই প্রতিবাদে মহাতেজা ঔর্ব ঋষি যে নিদারুণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন তার প্রচণ্ডতায় স্বর্গ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। (আদিপর্ব, ১৭৮ অধ্যায়)

ফলে সমাজে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরে আসে।...

কিন্তু আবার আগুন জ্বলে ওঠে।

ক্ষত্রিয় হৈহয় রাজবংশের কার্তবীর্যার্জুনের সময়ে চলে পুনরায় নির্বিচারে ব্রাহ্মণহত্যা। আশ্রমে তপস্যানিরত ঋষি জমদগ্নি পর্যন্ত অসহায়ভাবে নিহত হলেন কার্তবীর্যার্জুনের হাতে। দিকে-দিকে ব্রাহ্মণদের তপোবন ধ্বংস করে তাঁদের পর্ণকুটিরগুলি লুণ্ঠিত করে আগুন লাগান হল।

জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম তখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধকল্পে তাঁর নির্মম কুঠার হস্তে কার্তবীর্যার্জুনকে বধ করে হৈহয় রাজবংশ ধ্বংস করলেন। ভারতের সকল ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করলেন। এইভাবে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করে পিতৃতর্পণ করলেন পরশুরাম। কুরুক্ষেত্রের নিকটে সমন্তপঞ্চকে ক্ষত্রিয়ের রক্তে-ভরা পাঁচটি হ্রদ সৃষ্টি করলেন তিনি।

এমনি করে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে চলে আসে—"পৃথিবী চাপি বিজিতা রামেণামিততেজসা।" (বনপর্ব, ১১৭/১৫) পরশুরামের অধিকৃত সমস্ত দেশ তিনি কশ্যপ মুনিকে দান করেন। এবং কশ্যপ মুনির অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণগণ তা খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। সেই জন্য ব্রাহ্মণদের নাম হল "খাণ্ডবায়ন"। (বনপর্ব, ১১৭/১৩) পরশুরামের প্রতাপে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বীরশূন্য হয়ে পড়ে। তাই মহর্ষি ঋচীক এই ঘোর কর্ম থেকে পরশুরামকে নিবৃত্ত করেন। পরশুরাম তাঁর দুর্ধর্ষ ভার্গব ধনু উত্তোলন করে অযোধ্যায় রামচন্দ্রকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের সেই তেজ ও প্রতাপকে সংহরণ করেন। (বনপর্ব, ৯৯ অধ্যায়)

এই একই বিপ্লবের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিরোধের মধ্যেও। এই বিরোধ সেই প্রথম থেকেই। তখনও বিশ্বামিত্র ঋষি হননি। মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জের রাজা। ক্ষত্রিয় তেজে প্রতাপান্বিত। একদিন রাজা বিশ্বামিত্র মৃগয়াক্লান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত রাজাকে বশিষ্ঠ অনেক আপ্যায়ন করলেন। রাজার অতিথি-সৎকারের জন্য বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনু নন্দিনীকে বললেন, "অতিথি পূজার জন্য যা প্রয়োজন তুমি দাও।"

নন্দিনী তখন উৎপন্ন করল বিভিন্ন রকমের রাজকীয় ভোজ্য ও পেয়, নানা প্রকার মণিরত্ন ও বসন।

বশিষ্ঠের এই কামধেনু নন্দিনীর আশ্চর্য গুণ ও দিব্যকান্তি দেখে মুগ্ধ হলেন বিশ্বামিত্র। হংসের ন্যায় ধবল, চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধকান্তি নন্দিনী। সুচারু শৃঙ্গ, মনোহর পুচ্ছ ও স্থূল পয়োধরা এই সুরভী।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে তাঁর কামধেনুটি চাইলেন।

বশিষ্ঠ রাজী হলেন না। বললেন, "মহারাজ, আমি অর্থ কিংবা রাজ্যের লোভেও আমার দেবকার্য, পিতৃকার্য, অতিথি সৎকার ও যজ্ঞানুষ্ঠানের এই একমাত্র সহায় আমার নন্দিনীকে দিতে পারব না।"

বিশ্বামিত্র বললেন, "তাহলে আমি জোর করে এই গাভী নিয়ে যাব।" এই বলে সবলে নন্দিনীকে হরণ করে কষাঘাতে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

নন্দিনী তখন বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করল, "ভগবন, বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের কষাঘাতে আমি অনাথের ন্যায় আর্তনাদ করছি। আপনি আমার এই লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করছেন কেন?"

বশিষ্ঠ বললেন, "ক্ষত্রিয়ের বল তেজ; ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। কল্যাণী, আমি তোমাকে ত্যাগ করিনি। যদি তোমার শক্তি থাকে তাহলে তুমি আমার কাছেই থাক।"

বশিষ্ঠের এই ইচ্ছাই নন্দিনীকে দিল অমোঘ শক্তি। পয়স্বিনী নন্দিনী তখন ভীষণ মূর্তি ধারণ করে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের বিতাড়িত করল। তার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হল বিভিন্ন সব জাতি। তারা সকলেই অনার্য এবং ম্লেচ্ছ! যেমন, পহ্লব, দ্রাবিড়, শক, যবন, কিরাত, শবর, খস, পুলিন্দ, হূণ, চিবুক, বর্বর, সিংহল, পৌণ্ড্র, ইত্যাদি। (আদিপর্ব, ১৭৫ অধ্যায়)

মনে হয় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই বিরোধে বশিষ্ঠের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল তৎকালীন যত অনার্য জাতি। বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে তারাই অস্ত্র ধারণ

করেছিল। কামধেনুর গল্পটি রূপক হলেও তার ভিতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকেও আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজের কাছে তাঁর সকল ক্ষত্রবল পরাস্ত হয়। সেই থেকেই হিংসার এক মাদক বিষ বিশ্বামিত্রের অন্তরে প্রবেশ করে। এবং বিশ্বামিত্র তাঁর যজমান অযোধ্যার রাজা কল্মষপাদের সাহায্যে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে বধ করান।

দুটি উদ্দত তরবারী যেমন মুখোমুখী হয়, তেমনি বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি এবং ক্ষত্রিয় রাজা কল্মষপাদ একদিন বনের পথে হঠাৎ পরস্পরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। (আদিপর্ব, ১৭৬ অধ্যায়)

কল্মষপাদ ক্রুদ্ধ দম্ভে বললেন, "পথ ছেড়ে দাঁড়াও, ব্রাহ্মণ। আমি রাজা।"

শক্তি বললেন, "তুমি রাজা। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ। পথের অগ্রাধিকার ব্রাহ্মণের। রাজা, তুমি ব্রাহ্মণকে আগে পথ ছেড়ে দাও।"

তখন উদ্ধত রাজা পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এবং উন্মত্ত ক্রোধে ব্রাহ্মণ শক্তিকে কশাঘাত করতে লাগলেন। প্রহারজর্জরিত শক্তি তখন অভিশাপ দিলেন, "তুমি রাক্ষস হও।"

এমনি পথের অগ্রাধিকার নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হতে দেখি ব্রাহ্মণপুত্র অষ্টাবক্র ও রাজা জনকের মধ্যেও। অষ্টাবক্র বলছেন জনককে, "ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকলে সর্বাগ্রে রাজাকেই পথ ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাগত হলে রাজা পর্যন্ত আগে ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেবেন—রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য সমেত্য তু ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ।" (বনপর্ব, ১৩৩/১)

জনক তখন সসম্ভ্রমে ব্রাহ্মণ বালক অষ্টাবক্রকে পথ ছেড়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের এই নাটকীয় সংঘাত অত্যন্ত তীক্ষ্ণমুখ হয়ে উঠেছে শক্তি-কল্মষপাদের এই গল্পের মধ্যে। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যেসব ক্ষত্রিয় দাঁড়িয়েছিল তারা রাজা হলেও তাদের বলা হয়েছে রাক্ষস। যেমন ব্রাহ্মণঘাতী ইল্বল যদিও রাজা তবু সে রাক্ষস। ইল্বলের এত ঐশ্বর্য ছিল যে তৎকালীন তিন জন শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রুতর্বা, ব্রধ্নশ্ব ও ইক্ষাকুবংশীয় ত্রসদস্যুর যাবতীয় ঐশ্বর্যের চেয়ে সে বেশি ধনশালী ছিল। ব্রাহ্মণশত্রু এই ইল্বলকে অগস্ত্য বিনাশ করেন ওই তিন রাজাকে সঙ্গে নিয়েই।

বেদব্যাসের পিতা শক্তি-পুত্র পরাশর মুনিও পিতৃবধের প্রতিশোধে ক্ষত্রিয় নিধনের জন্য এক ভয়ঙ্কর যজ্ঞ করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করে সেই যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত করেন। পরাশর তখন

এক রাক্ষসযজ্ঞ করে রাক্ষস নিধন করতে আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত ঋষি অত্রি এসে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। (আদিপর্ব, ১৮১ অধ্যায়)

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই বিরোধ কেবল সৈন্যবল আশ্রয় করেই হয়নি। সমাজ-বিধান ও ধর্মবিধানকে অবলম্বন করে এই তিক্ত বিরোধ তখনকার দিনে প্রতিটি গৃহকোণে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

সেই থেকেই সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি। ক্ষত্রিয়েরাও হয়ে উঠলেন ব্রাহ্মণের অনুগত। তবুও পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষ তেমন প্রচণ্ড হয়ে না উঠলেও সময়ে-সময়ে স্থানে-স্থানে তার উৎকট প্রকাশ ঘটেছে। চ্যবন ঋষির ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভন, বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদাঘাত, ভৃগুর অভিশাপে নহুষের স্বর্গচ্যুতি—এইসব আখ্যানের ভিতরে ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রভুত্বের ইতিহাস স্পষ্ট। দুর্বাসা, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ভৃগু—এঁরা মহাভারতে সম্রাট অপেক্ষাও পূজনীয়।

কুরুক্ষেত্রের অদূরে ওঘাবতী নদী

এই নদী বলছে ইতিহাসের এক গল্প।

একবার ক্ষত্রিয় রাজা সুদর্শন সমাগত কোন ব্রাহ্মণ অতিথিকে রাত্রে সেবার জন্য তাঁর পত্নীকে দান করেন। পত্নী সম্মত হন না। তখন ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজমহিষী ওঘাবতী নদী হয়ে ভেসে গেলেন। ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের যুগে এই গল্প কি ইঙ্গিত করে? রাজা কি ব্রাহ্মণের ভয়ে অসম্মতা পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন?

তেমনি আমরা শুনি রাজা কল্মষপাদের অনুরোধে তাঁর পত্নীর গর্ভে বশিষ্ঠের পুত্রোৎপাদন। যদিও তার পিছনে এক ব্রাহ্মণপত্নীর অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। একি ক্ষত্রিয় রাজাদের ব্রাহ্মণ পরিতোষণের কাহিনী?

এমনি আরো কত-না গল্প যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণের পথে পথে ইতিহাসের রহস্যযবনিকা তুলে ধরছে।

তাই মহাভারতকে ভাল করে বুঝতে হলে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিটি জানা দরকার। কেননা মহাভারত কেবল কুরু-পাণ্ডবের পারিবারিক শত্রুতার কাহিনী নয়। তা ভারতের তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। যার কেন্দ্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাই মহাভারতের "খিল" অর্থাৎ শেষ কথা 'হরিবংশ'—শ্রীকৃষ্ণের জীবন।...

প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল যেন একটা মহাদেশ। আধুনিক ইউরোপের মত তা কতকগুলি জাতি বা নেশনের সমষ্টি। তারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করেছে। একে অন্যের উপরে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা

করেছে। কিন্তু যখনই কোন বাইরের অনার্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে তখনই তারা সকলে মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। কেননা তাদের সকলকে এক করে ধরে রেখেছিল এক ধর্ম এক সংস্কৃতি।

সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ দুইটি শক্তির অভিঘাত লক্ষ্য করেছেন। একটি হল Centripetal—কেন্দ্রমুখী শক্তি; যা বারবার ভারতবর্ষের সার্বভৌম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে; আর-একটি হল Centrifugal—কেন্দ্রাতিগ শক্তি, যার চাপে আবার সেই সাম্রাজ্য বারবার অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে-ভেঙে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়েছে। মহাভারতের আগে ক্রমাগত চলেছে এইরকম ভাঙা-গড়া উত্থান-পতন।

তখনকার রাজশক্তি বা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান হল, কোশল, মগধ, চেদি, বিদেহ এবং হৈহয়। মধ্যভারতে কুরু, পাঞ্চাল এবং ভোজ। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও অনেকগুলি যুযুধান দুর্ধর্ষ জাতি ছিল, কিন্তু তারা কেউই মধ্যভারতের মত ততটা শক্তিশালী হতে পারেনি। মূল আর্যাবর্ত বলতে তখন বোঝাত এই মধ্যভারত।

এই সব রাজশক্তিদের নিয়ে অন্তত পাঁচবার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল।

প্রথম দুইবার ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজত্বকালে, মরুত্তরাজ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার আমলে।

তৃতীয়বার হৈহয় রাজবংশের অর্জুন-কার্তবীর্যের সময়ে।

চতুর্থবার ইক্ষ্বাকু বংশের ভগীরথের সময়ে।

পঞ্চমবার কুরু বংশের ভরতের রাজত্বকালে।

এর মধ্যে হৈহয়দের রাজত্বকালে হিন্দু ভারতের বিরাট এক বিপর্যয় ঘটে। হৈহয় বংশ অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ। তারা সর্বদা চেষ্টা করেছে ভারতের আর্যপ্রভাব ও প্রতিপত্তির বাইরে থাকতে। তারাই ছিল প্রধানত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের এই বিরোধ পরিণামে এক Civil war বা সমাজ বিপ্লবে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ পরশুরামের হাতে এই হৈহয় বংশ ধ্বংস হয়ে যায়।

হৈহয়দের পতনের পরে ভারতবর্ষে আবার ইক্ষ্বাকু ও কুরুবংশের প্রাধান্য ফিরে আসে।

ইক্ষ্বাকু রাজা ভগীরথের রাজত্বেই ভারতে প্রকৃত স্বর্ণযুগের সূচনা। এই ভগীরথেরই বংশ-পরম্পরা কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে—অযোধ্যার রামচন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত।

কালক্রমে কোশল রাজত্বেরও অবক্ষয় শুরু হল। দেশের রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের চাপে সেই সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল।

কেটে গেল আরো কয়েক হাজার বছর।

সেই যুগের ইতিহাস অস্পষ্ট ও অনির্দেশ্য।

কেবল পুরাণ আখ্যান কল্পশ্রুতির ভিতরে তার কিছু ধূসর ইঙ্গিত ছড়ান।

মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের সময় আবার লক্ষ্য করা যায় সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাজন্যদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। অনেকগুলি জাতি তখন শক্তি ও মর্যাদায় বড় হয়ে উঠছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, (১) দ্রুপদ রাজার অধীনে পাঞ্চাল ; (২) ভীষ্মক ও অকৃতি, যাঁকে বলা হ'ত দ্বিতীয় পরশুরাম, তাঁদের অধীনে ভোজ বংশ ; (৩) শিশুপালের অধীনে চেদি ; (৪) বৃহদ্রথের অধীনে মগধ ; (৫) পৌণ্ড্রবাসুদেবের অধীনে সুদূর বঙ্গের পৌণ্ড্র দেশ ; (৬) বৃদ্ধক্ষত্রের অধীনে সিন্ধু ; (৭) শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নেতৃত্বে যাদব ও বৃষ্ণিগণ। যদিও তারা জাতি হিসাবে বিশৃঙ্খল ও সংহতিহীন, কিন্তু ব্যক্তিগত শৌর্য ও বীরত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সাতটি জাতিই তখন ভারতে সপ্তরথী শক্তি।

এরা সকলেই যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু কুরুবংশের অপ্রতিহত শক্তিকে তারা অতিক্রম করতে পারেনি। কেবল মগধরাজ জরাসন্ধ সাময়িকভাবে কুরু বংশের এই রাজনৈতিক শক্তি-সাম্যকে টলিয়ে দিয়েছিল।

জরাসন্ধ ক্ষত্রিয় বিরোধী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। একশজন ক্ষত্রিয় রাজাকে বশীভূত করে তার উপাস্য দেবতার কাছে বলি দেওয়ার যে সঙ্কল্প জরাসন্ধ করেছিল, তাতেই প্রমাণ হয়, ক্ষত্রিয়-বিরোধী ব্রাহ্মণ বিপ্লবের রক্ততরঙ্গ তখনও মন্দীভূত হয়নি। ক্ষত্রিয় প্রভুত্বের বিশেষ করে মধ্যভারতের কুরু পাঞ্চাল বংশের বিরোধী রাজন্যবর্গ জরাসন্ধকে আশ্রয় করেই সারা ভারতবর্ষে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জরাসন্ধ ছিল উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে অপ্রতিহত সম্রাট। জরাসন্ধের সেই রাজনৈতিক প্রভুত্বের কথা আমরা সভাপর্বে শ্রীকৃষ্ণের মুখেই শুনেছি। তার সামরিক শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাকে পরাস্ত করা এক রকম অসম্ভব। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুনকে সঙ্গে করে নিশীথ রাত্রে ছদ্মবেশে গোপনে জরাসন্ধের রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, তাঁরা গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। জরাসন্ধের রাজত্বে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ছিল অবাধগতি। এমনকি রাজপুরীর প্রহরীরাও তিন ব্রাহ্মণবেশী আগন্তুককে রাজবাড়ীতে

প্রবেশ করতে বাধা দেয়নি। ব্রাহ্মণ জেনেই জরাসন্ধ স্বয়ং এসেছিল তাঁদের পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে।

জরাসন্ধ বধের পর কুরুবংশের রাজনৈতিক প্রভুত্ব আবার ফিরে এল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তখন অত্যন্ত সংকীর্ণ খাত ধরে বইতে শুরু করেছে। সতরঞ্চের ছকের সবগুলি লাল-কালো ঘুঁটি দুই পক্ষে ভাগ হয়ে গুটিয়ে এসেছে কুরুবংশের জ্ঞাতি-শত্রুতাকে আশ্রয় করে।

কুরুবংশের এই জ্ঞাতিবিরোধ ও শত্রুতার পিছনে রয়েছে বহুদিনের পারিবারিক হিংসা ও বঞ্চনার ইতিহাস। দুর্যোধন ও পাণ্ডবদের জন্মেরও অনেক আগে থেকে তার সূত্রপাত।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ।

অতএব ছোটভাই পাণ্ডু হলেন রাজা।

রাজত্ব পেয়ে পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বার হলেন। কিন্তু তার পরেই কাহিনীর মধ্যে রহস্য ঘনিয়ে এল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বেশ তো পাণ্ডু বনে বনে শিকার করতে ভালবাসেন, রাজধানী রাজসিংহাসন ছেড়ে বছরের পর বছর অরণ্যে বিহার করেন, ভাল কথা, কিন্তু তিনি যদি সত্যিই হস্তিনাপুরের রাজা হবেন তাহলে রাজবাড়ীর বা রাজ্যের কেউ তাঁর কোন সংবাদ রাখবেন না? তাঁকে রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা হবে না? তিনি রাজা, স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডু কুন্তীকে বিবাহ করলেন, কিন্তু হস্তিনাপুরে তার কোন সংবাদ এল না। হল না কোন উৎসব আড়ম্বর। সম্ভবতঃ প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত পাণ্ডু ছিলেন নির্বাসিত রাজা। এবং তাঁর স্বভাবটা ছিল সন্ন্যাসী পিতা বেদব্যাসের মতই অরণ্যচারী। কুন্তীকে বিবাহ করে পাণ্ডু কুরুবংশের কুলপ্রথাকে উল্লঙ্ঘন করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের তাতে সম্মতি ছিল না। তাই তাঁকে কুলপ্রথা অনুযায়ী গৃহে নিয়ে এসে পুনরায় বিবাহ দেওয়া হয় মাদ্রীর সঙ্গে। কুলবৃদ্ধদের মতে পাণ্ডুর দ্বিতীয় অনাচার হল: তৎকালীন সমাজ-বিধান অনুসারে পতির অবর্তমানে বা অসামর্থ্যে "দেবরেণ সুতোৎপত্তি"—মনুর এই আপৎকালীন অনুশাসন পাণ্ডু উল্লঙ্ঘন করেছিলেন। পাণ্ডবেরা পাণ্ডুর ঔরসপুত্র নন, অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় কোন আত্মীয়েরও ঔরসপুত্র নন, কুন্তী ও মাদ্রীর পুত্রগণের জন্ম দেবতাদের ঔরসে। সুতরাং পাণ্ডবেরা পাণ্ডুর যথার্থ পুত্র বলে বিবেচিত হতে পারে না, তাই পাণ্ডবদের উত্তরাধিকারেরও কোন যোগ্যতা স্বীকার করা যায় না, এই ছিল কৌরবদের যুক্তি। যে রাজা নির্বাসিত, যাঁর পুত্রদের জন্ম সম্বন্ধে সামাজিক আপত্তি, পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে তাঁর সেই পত্নী ও পুত্রদের রাজবাড়ীতে

গ্রহণ করতেও বিলক্ষণ দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। ভাবতে অবাক লাগে, ভারতবর্ষের রাজা ও রাণীর মৃতদেহ এবং তাঁর বিধবা পত্নী ও পাঁচটি অনাথ পুত্রকে একদল ঋষি সেই সুদূর শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসছেন, ঋষিদের সবিস্তারে বলতে হচ্ছে পাণ্ডুর মৃত্যুর কথা, পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম ও পরিচয়ের কথা (আদিপর্ব, ১২৬ অধ্যায়)। কৌরবরা তার কিছুই জানতেন না? পাণ্ডু তাহলে কি রকম রাজা ছিলেন? পাণ্ডবদের জন্ম নিয়ে দুর্যোধনের বক্রকটাক্ষ, "তোমাদের যে কি রকম জন্ম তা আমাদের জানা আছে! ভবতাঞ্চ যথা জন্ম তদপ্যাগমিতং ময়া।" (আদিপর্ব, ১৩৭ অধ্যায়)—দুর্যোধনের এই ছোট্ট একটু মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় তারা পাণ্ডবদের ভাই বলে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। কেবল ভীষ্ম ও বিদুরের মুখ চেয়ে, এবং রাজবংশে যাতে সামাজিক কলঙ্ক না হয় সেই ভয়ে, সুচতুর ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও পাণ্ডবদের আপাতত রাজপরিবারে গ্রহণ করেছিলেন। এবং পরে বারণাবতে যতুগৃহ নির্মাণ করে ঘরে আগুন লাগিয়ে কুলের কাঁটা কুন্তী ও পাণ্ডবদের গুপ্ত হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র তার মন্ত্রী কণিকের সঙ্গে। কূটনীতি ও সূক্ষ্ম ভেদবুদ্ধিতে কণিক আজকের দিনেও শিরোমণি হতে পারেন। শান্তিপর্বে ১৩৯ ও ১৪০ অধ্যায়ে এই কণিকের উপদেশই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন। সব বলে আবার যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করে দিচ্ছেন, "দেখো, আপৎকাল ছাড়া এই বুদ্ধি কিন্তু কখনো কাজে লাগিও না।"

অতএব বাইরে সারা দেশের প্রকাশ্য রাজনীতি আর ভিতরে হস্তিনাপুরে এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র—এই দুয়ের চক্রান্তে দেশের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখা গেল ; (১) সেই সব রাজা ও রাজগোষ্ঠী যারা স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী; (২) যারা কুরুবংশের প্রভুত্বকে ভেঙে নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় ; আর (৩) যারা এক অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিল। এদের মধ্যে প্রথম দুইটি দল মদ্র, অবন্তী, সিন্ধু, সৌবীর, দক্ষিণ মহীশূর থেকে উত্তর কান্দাহার পর্যন্ত তার সঙ্গে অর্ধ-সভ্য গাঙ্গের উপজাতিগোষ্ঠী দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। তারা জানত দুর্যোধনের রাজত্ব তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে, তখন তাদের আপন-আপন স্বাতন্ত্র্য অর্জন সহজ হবে। আর তৃতীয় দল, যারা চেয়েছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ, তারা হলেন মধ্য ভারতের পাঞ্চাল ও যাদবগণ, পূর্ব ভারতীয় ইক্ষাকুবংশীয়গণ, এ'রা সবাই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। এই হল মহাভারতের সতরঞ্চের ছক।

এছাড়া আবার ভাঙনের মধ্যেও ভাঙন।

কৌরবদের ভিতরেও দুইটি দল হয়ে পড়ল।

বর্ষীয়ান্ প্রবীণদের এক দল। যাঁদের প্রধান হলেন বিদুর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ। এ'রা শান্তিবাদী। যুদ্ধের বিপক্ষে।

অন্যদিকে নবীনদের এক দল। তারা যুদ্ধবাদী। কর্ণ শকুনি দুঃশাসন দুর্যোধন যুদ্ধের পক্ষে।

আর উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দোলায়মান অব্যবস্থিতচিত্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। একদিকে তাঁর অন্তরের শুভবুদ্ধি প্রবীণদের সম্মতি দিচ্ছে; অপর দিকে তাঁর পাপবুদ্ধি আর মোহ তরুণদলকে সমর্থন করছে। এই দুই শক্তির টানে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন তাঁর অন্তর।

কিন্তু এই যুদ্ধ যদি কেবল কুরু-পাণ্ডব দুই জ্ঞাতির মধ্যে নিবদ্ধ থাকত তাহলে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না। যুদ্ধের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তাঁরা যদি নিরপেক্ষও থাকতেন, তাহলেও দুর্যোধনের সাধ্য বা সাহস ছিল না যুদ্ধ করে। ধৃতরাষ্ট্রেরও সাহস হ'ত না দুর্যোধনের সমর্থন করেন। কিন্তু এ যুদ্ধ কেবল জ্ঞাতি-বিরোধের জন্য নয়, তার পিছনে রয়েছে এক বৃহত্তর রাজনীতি।

ভীষ্ম দেখলেন, যুধিষ্ঠিরের পিছনে দাঁড়িয়েছেন কুরু বংশের চিরশত্রু পাঞ্চাল ও মৎস্য রাজ। যুধিষ্ঠিরের জয় অর্থ হল পাঞ্চাল, মৎস্য ও মগধের জয়। কুরু বংশের মর্যাদা ও প্রভুত্বহানি। তাই কুলগৌরব রক্ষার জন্য অন্যায় জেনেও, এবং ব্যক্তিগতভাবে সে যুদ্ধ ভীষ্মের কাছে মর্মবিদারক হলেও, তিনি যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন। পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ কিংবা মৎস্যরাজ বিরাট ভারতের সম্রাট হোক তা তিনি চাননি। তাই আত্মীয় হয়েও মাতুল মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের পক্ষ নিতে পারলেন না। প্রতিবেশী মদ্র ও মৎস্য রাজ্যের পারস্পরিক বিরোধ ও শত্রুতাই শল্যকে শেষ পর্যন্ত ঠেলে দিল দুর্যোধনের পক্ষে।

দ্রোণও তাঁর প্রিয় শিষ্য ও পুত্রতুল্য পাণ্ডবদের বিপক্ষে দাঁড়ালেন। কেন? কারণ তাঁর ঘোর শত্রু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দাঁড়িয়েছেন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে। পাঞ্চাল বা দ্রুপদের অভ্যুদয় দ্রোণের কাছে অসহ্য। তিনি ভুলতে পারেন না তাঁর প্রথম জীবনের দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার কথা। দ্রুপদ তো ছিলেন দ্রোণের বাল্যবন্ধু। দ্রুপদের পিতা রাজা পৃষত এবং দ্রোণের পিতা ঋষি ভরদ্বাজ ছিলেন পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমেই দ্রুপদ ও দ্রোণ এক সাথে ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখে খেলাধূলা করে মানুষ হয়েছেন। পিতার মৃত্যুর পর দরিদ্র দ্রোণ বাল্যসখা দ্রুপদের কাছেই প্রথমে গিয়েছিলেন সাহায্য

ও আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু দ্রুপদ তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "একদিন আমরা বন্ধু ছিলাম বটে। কিন্তু আজ তার কি? এখন তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর আমি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ।" অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় দ্রুপদ আরো বলেছিলেন,

> ন দরিদ্রো বসুমতো নাবিদ্বান্ বিদুষঃ সখা।
> ন শূরস্য সখা ক্লীবঃ সখিপূর্বং কিমিষ্যতে॥৯
>
> (আদিপর্ব, ১৩১ অধ্যায়)

> (দরিদ্র কখনো ধনবানের বন্ধু হয় না। মূর্খও হয় না বিদ্বানের বন্ধু। ক্লীব কখনো বীরের সখা হয় না। আমাকে সখা সম্বোধন করে কি চাইতে এসেছ?)

অপমানিত দ্রোণ তখন নিরাশ্রয় নিরন্ন হয়ে পথে পথে ঘুরছেন। তাঁর শিশুপুত্র অশ্বত্থামা একটু দুধ খাবার জন্য কাঁদতে থাকলে তিনি পুত্রের জন্য সেই দুধটুকু পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। অবোধ শিশুকে তিনি দুধ বলে পিটুলি-গোলা জল দিয়েছিলেন। সেই দুঃখ তিনি জীবনে ভুলবেন কেমন করে? অবশেষে পাঞ্চালদের শত্রু কুরুবংশে তিনি আশ্রয় পেলেন। হলেন রাজকুমারদের অস্ত্রগুরু। এবং গুরুদক্ষিণা হিসাবে অর্জুনের কাছে প্রথমেই চাইলেন দ্রুপদের উপর প্রতিশোধ। অর্জুন কুরুসৈন্য নিয়ে পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করে জয় করলেন। পাঞ্চালের অর্ধেক দ্রোণ নিজের অধীনে রেখে বাকী অর্ধেক দ্রুপদকে দান করে অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। দ্রোণ হলেন রাজা। চর্মন্বতী নদী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ-পাঞ্চাল হল দ্রোণের রাজত্ব। অহিচ্ছত্রপুরীতে গড়ে উঠল দ্রোণের রাজধানী। (আদিপর্ব, ১৩৮ অধ্যায়)

তাই দ্রোণ যে পাঞ্চালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন এ তো স্বাভাবিক। কোন ন্যায় নীতি ধর্মবোধের বশে নয়, কেবল রাজনৈতিক balance of power-এর টানেই ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ দুর্যোধনের পক্ষে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁদের অন্তরের টান রইল যুধিষ্ঠিরের পক্ষে। যুদ্ধ করছেন দুর্যোধনের হয়ে, কিন্তু মনে-মনে চাইছেন যুধিষ্ঠিরের জয়। তাঁদের জীবনে এ এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত।

যুদ্ধের আগে তাই ভীষ্ম স্পষ্ট বলছেন দুর্যোধনকে, "যুদ্ধে আমি সকলকেই বিনাশ করব; কিন্তু পাণ্ডবদের বধ করব না—সর্বংস্ত্বন্যান হনিষ্যামি···ন তু কুন্তীসুতান্ নৃপ।" (উদ্যোগপর্ব, ১৭২/২১)

এই একই অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্রোণের মধ্যেও। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে বলছেন,

"আমি দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করব, কিন্তু তোমার জন্যই বিজয় প্রার্থনা করি—যোৎস্যেঽহং কৌরবস্যার্থে তবাশাস্যো জয়ো ময়া।" (ভীষ্মপর্ব, ৪৩/৫৭)। দ্রোণ পুনরায় আশীর্বাদ করলেন, নিশ্চয়ই তোমার জয় হবে—"ধ্রুবস্তে বিজয়ো।" (ভীষ্মপর্ব, ৪৩/৫৯)। সেই থেকে ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করে "পাণ্ডবদের জয় হোক" এই বলে প্রার্থনা করে তাঁদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন।

বাইরে এক যুদ্ধ, অন্তর্জগতে তাঁদের চলেছে আর-এক যুদ্ধ। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাঁদের সেই মর্মন্তুদ ব্যথা আর তো কেউ জানেন না।

[দশ]

দুইটি অরণিকাষ্ঠ

দুইটি অরণিকাষ্ঠ—পরস্পর সন্নিপাতে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে আগুন। সেই সমিদ্ধ অগ্নিতেই যজ্ঞ। ঋষিরা এইভাবেই যজ্ঞ-সঞ্চার করতেন। এই অরণি-মন্থনই বেদব্যাসের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য।

কবি সন্নিবেশ করে ধরেছেন, কখনো দুটি বিপরীত তত্ত্বকে, কখনো বিরোধী দুটি অবস্থাকে, আবার কখনো বিপ্রতীপ দুটি চরিত্রকে, বিষম কালকে বিরুদ্ধ ভাবকে। তাদের সংকর্ষে সংঘর্ষে জ্বলে উঠছে আগুন। আমরা তাই দেখি, ধর্মের সম্মুখে প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছে অধর্ম। দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকার। প্রেমের বিরুদ্ধে মৃত্যু। ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে দারিদ্র্য। ধৃতরাষ্ট্রের সামনে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির। অর্জুনের সামনে কর্ণ। দুর্যোধনের পাশে ভীম। বিদুরের পাশে কণিক। প্রতিটি শ্লোকের যুগ্ম চরণের মত দুটি বেগবান্ রথ যেন সমান্তরালে ছুটে চলেছে। কিংবা দুই বিপরীত মেরু যেমন বিদ্যুৎকে ধরে রাখে, এঁরাও তেমনি মহাভারতের শক্তিকে বেঁধে রেখেছে। আর এই সবকিছু নিয়ে সমগ্র মহাভারতকে বেদব্যাস দুই যুগের দুই অরণিকাষ্ঠ দিয়ে মন্থন করছেন। দ্বাপর আর কলির যুগসন্ধিতে জ্বলে উঠেছে কুরুক্ষেত্রের সমরাগ্নি। আদিপর্বের শুরুতেই বেদব্যাস দুই যোর কালকে তুলে ধরেছেন—

> অন্তরে চৈব সংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরযোরভূৎ।
> সমন্তপঞ্চকে কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ ॥১৩
>
> (আদিপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)

সেই থেকে পর্বে-পর্বে কবি মহাকালের গম্ভীর মৃদঙ্গ বাজিয়ে আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, একটি যুগ চলে যাচ্ছে, আসছে আর-এক যুগ—

> এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাৎ প্রবর্ততে।
>
> (বনপর্ব, ১৪৯/৩৮)
>
> প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি
>
> (শল্যপর্ব, ৬০/২৫)
>
> কলিয়াসন্নমাবিষ্টং নিবাস্য…
>
> (আশ্বমেধিকপর্ব, ১৪/২০)

কোন কিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে না। বিত্ত ঐশ্বর্য জীবন

যৌবন ধন মান সুখ দুঃখ সব কালের প্রবল স্রোতে ভেসে চলেছে—"অনিত্যমুপলক্ষ্যেহ কালপর্যায়ধর্মতঃ"। (শান্তিপর্ব, ২২৪/৫)

জীবন যেমনই হোক, সে যুধিষ্ঠিরের হোক আর দুর্যোধনের হোক, সামনে পিছনে সমানে জ্বলছে আগুন। দুটি জ্বলন্ত অরণিকাষ্ঠ যেন আমাদের প্রত্যেককে চেপে ধরে রয়েছে—"দগ্ধমেবানুদহ্যতি" (শান্তিপর্ব, ২২৪ অধ্যায়)—গম্ভীর গহন অনন্ত অগ্নিসাগরে আমরা নিমজ্জিত। মানুষ পৃথিবী চরাচর সকলই ঘুমায়, কেবল কাল সর্বদা জেগে থাকেন—"কালো সুপ্তেষু জাগর্তি"। মহাভারত সেই কালাগ্নির বহ্নি-উচ্ছ্বাস।

অনেক অশ্রু দিয়ে অনেক বেদনা দিয়ে যুধিষ্ঠির এই কথাটা বুঝে নিয়েছেন। তবু যেন সবটা এখনো বুঝতে পারেননি। কেননা কেবল অশ্রু দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না। তাকে পেতে হয় বুকের রক্ত দিয়ে। আবার সে রক্ত কেবল নিজের নয়, নিজের ভাই ও পরিজনদেরও নয়, সর্বাগ্রে যে গুরু, সেই গুরুরক্ত দিয়ে হবে নিদারুণ ভয়ঙ্কর এক উপলব্ধি,—যখন তাঁর অন্তর হাহাকার করে কেঁদে উঠবে, "আমি গুরুহন্তা"—স ময়া রাজ্যলুব্ধেন পাপেন গুরুঘাতিনা—(শান্তিপর্ব, ২৭/১৩)।

কিন্তু সে সময় তাঁর এখনো আসেনি। কোন দিন না এলেই হয়তো ছিল ভাল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ভাগ্যে তো বিধাতা শান্তি দেননি। ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ তিনি অথচ একজন ঘোর পাপীর চেয়েও বেশি দুঃখী। কোনদিন যা চাননি, যে কাজ তিনি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে এসেছেন, ভাগ্যের পরিহাস এমনি, ঠিক তাই যুধিষ্ঠিরকে করতে হয়েছে পদে পদে।

বনপর্বে তিনি ভীমকে খুব বড়গলা করে বলেছিলেন, "আমি মিথ্যা বলতে পারব না। মিথ্যা আমাতে নেই"—অনৃতং নোৎসহে বক্তুং ন হ্যেতন্ময়ি বিদ্যতে। (বনপর্ব, ৫২ অধ্যায়) "রাজ্য রক্ষা আমার কাছে বড় কথা নয়। আমি সত্যরক্ষা করতে চাই।"—সত্যং তু মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্। (বনপর্ব ১২০/২৭)

অথচ ঘটল তারই বিপরীত। যে মিথ্যাবাক্য বলার প্রস্তাব অর্জুনের মনঃপূত হয়নি, শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ সত্ত্বেও যে কথা বলতে অর্জুন সম্মত হননি, সেই সাংঘাতিক মিথ্যা যুধিষ্ঠিরকেই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে হল এবং সব জেনে শুনেই।

আবার যে যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ, ধর্মপুত্র, প্রাণ গেলেও যিনি ধর্মের নিন্দা করেন না, দেবতা ব্রাহ্মণের নিন্দা করেন না, সেই যুধিষ্ঠির কিনা নিজের

ভাইদের ও দ্রৌপদীর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে রাগে দুঃখে বিহ্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও দেবতার নিন্দা করে বসলেন—

ক্রোধমাহারয়চ্চৈব তীব্রং ধর্মোসুতো নৃপঃ।
দেবাশ্চ গর্হয়ামাস ধর্মং চৈব যুধিষ্ঠিরঃ॥৫০
(স্বর্গারোহণপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)

(ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির মনে-মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের ও ধর্মের নিন্দা করতে লাগলেন।)

এমনি করে পদে-পদে যুধিষ্ঠিরের জীবনে সত্য-অসত্য ধর্ম-অধর্ম সম্পর্কে মনগড়া যত ধারণা যখন সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে গেল, তখনি তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করলেন, ধর্ম কি, সত্য কি।

ইন্দ্র এসে তাঁকে বললেন, "সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা মহাবাহো।" (স্বর্গারোহণপর্ব, ৩/১১)—হে মহাবাহো, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ।

ধর্ম তাঁকে বারবার পরীক্ষা করেছেন, চরম সংকট মুহূর্তে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন, তাঁর জীবনে ধর্মের ও সত্যের উপলব্ধি কতখানি সার্থক।

যুধিষ্ঠির প্রতিবারই সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন; তবু তার মধ্যে থেকে গেছে অনেকখানি অসম্পূর্ণতা, অনেকখানি মনুষ্যভাব। তাঁর ধর্মের ও সত্যের তপস্যা সম্পূর্ণ দেবভাবে উর্জিত হয়ে ওঠেনি। সশরীরে স্বর্গে গিয়েও তিনি সুখদুঃখে-গড়া মর্ত্যের মানুষই থেকে গিয়েছেন।

পথের বন্ধু সেই নিরীহ কুকুরটি তাঁর সঙ্গে রয়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্গদ্বারে। তখন ইন্দ্র এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "ত্যজ শ্বানং—এই কুকুরটাকে ত্যাগ কর। এর স্বর্গে প্রবেশের কোন অধিকার নেই।"

এর উত্তরে হৃদয়বান্ যুধিষ্ঠিরই কেবল বলতে পারেন, "নিজের সুখের জন্য এই কুকুরটাকে ত্যাগ করতে পারব না। ত্যক্ষ্যাম্যেনং স্বসুখার্থী মহেন্দ্র।"

এইভাবে যুধিষ্ঠির তাঁর আপন হৃদয়কে স্বর্গের উপরে স্থান দিয়েছেন। ভ্রাতৃবৎসল স্বজনপ্রিয় যুধিষ্ঠির নরকে দাঁড়িয়ে বলছেন, "যেখানে আমার ভাইয়েরা রয়েছে সেখানেই আমার স্বর্গ। এই নরকই আমার স্বর্গ। আমি স্বর্গে যেতে চাই না। যত্র তে মম স স্বর্গো…" (স্বর্গারোহণপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)।

ধর্মের পরীক্ষায় হয়তো তিনি সব সময় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারেননি, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় তিনি সদা সার্থক।

যুধিষ্ঠিরের এই মানুষভাব শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে বেদব্যাস মহাভারতে মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছেন—স্বর্গাদপি গরীয়ান্ করে তুলেছেন।

তখন ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন,

এষা দেবনদী পুণ্যা পার্থ ত্রৈলোক্যপাবনী।
আকাশগঙ্গা রাজেন্দ্র তত্রাপ্লুত্য গমিষ্যতি ॥২৮

অত্র স্নাতস্য ভাবস্তে মানুষো বিগমিষ্যতি।
গতশোকো নিরায়াসো মুক্তবৈরো ভবিষ্যসি ॥২৯
(স্বর্গারোহণপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়)

এমনি করে যুধিষ্ঠিরকে বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে দুই আগুনের মাঝখানে। একদিকে তাঁর অন্তরের ধর্ম ক্ষমা, অপর দিকে তাঁর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম প্রতিহিংসা, একদিকে বৈরাগ্য অপরদিকে রাজ্য সমৃদ্ধি। পশ্চাতে তাঁর অপসৃয়মান দ্বাপর যুগের সূর্যাস্তের আলো, আর সম্মুখে আগত-প্রায় কলিযুগের সন্ধ্যার অন্ধকার। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই যুগসন্ধিতে—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির। দুই বিষম ধর্মের সন্নিপাতে তাঁর সিংহাসন পাতা।

মাথার উপরে মঘা নক্ষত্র।

আসন্ মঘাসু মুনঃ শাসতি পৃথ্বীং
যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্‌দ্বিকপঞ্চ দ্বিযুতং শক কালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ।
(বৃহদ্‌সংহিতা, ১৩-৩)

আর্যভট তাঁর 'কালক্রিয়াপদ'-এ (দশম শ্লোকে) গণনা করে বলেছেন, যুধিষ্ঠিরের এই সময় হল "যুগপাদা ব্যাধিকা"।

এই দারুণ গ্রহসংযোগ মাথায় নিয়েই যুধিষ্ঠিরের জীবন পরিক্রমা। বনপর্বে দীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণ তারই প্রতীক। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের এই প্রাথমিক প্রস্তুতি। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা শেষের এক শুভক্ষণে পুষ্যা নক্ষত্রযোগে যুধিষ্ঠির তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন। (বনপর্ব, ৯৩/২৬) পদব্রজে ভ্রমণ করলেন আসমুদ্রহিমাচল। নৈমিষারণ্যের অরণ্য-সন্ধ্যা, ভৃগুতীর্থে প্রভাতসূর্যের জবাকুসুম ছড়ানো আলো, ঋষভকূট পর্বতের সানুতে সূর্যাস্তের আবীর-ঢালা আকাশ, মহেন্দ্র পর্বতের ধবল চূড়া, প্রভাস তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য, অগস্ত্য তীর্থের পুণ্যস্নান, পথে-পথে পায়ে-পায়ে কত কথা, কত কাহিনী, ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবন—সব মিলে যেন সামগানের এক উদাত্ত সুর। ভারত সম্রাট হলেন ভারত পথিক। স্নান তর্পণ করলেন গঙ্গা যমুনা গোদাবরী

সিন্ধু কাবেরী নদীর জলে ; দর্শন করলেন মৈনাক শ্বেতগিরি কালশৈল দ্বারক্রৌঞ্চ এবং কৈলাস।

ভারতের যা-কিছু তপস্যা যা-কিছু সিদ্ধি তা এইসব তীর্থে-তীর্থে জাগ্রত শক্তি হয়ে বিরাজ করছে। যুধিষ্ঠিরের চোখের সামনে ষড়ৈশ্বর্যে প্রকাশিত হলেন "পর্বতকুণ্ডলা বসুধারিণী মহি"—এই ভারতবর্ষ। মঙ্গলময়ী সর্বশস্য-দায়িনী মহাভাগা দেবী পৃথিবী—"শিবা দেবী মহাভাগা সর্বশস্যপ্ররোহিণী" (বনপর্ব, ১৪২ অধ্যায়)। তিনি উপলব্ধি করলেন সত্যরূপা তপস্বিনী এই ভারতকে, সেই মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তি পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছেন, "ইয়ং তপস্বিনী সত্যা ধারয়িষ্যতি মেদিনী" (শান্তিপর্ব, ৩৪৯/৩৪)। তিনি জানলেন, এই ভারত হল মহাক্ষেত্র—"ভূমিরাবপনং মহৎ" (বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)। পাণ্ডবেরা ভাগ্যবান্, তাঁরা রাজ্য হারিয়ে পথে-প্রান্তরে ঘুরে-ঘুরে অন্তরে লাভ করলেন ভারতলক্ষ্মীকে। ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা যাঁরা করবেন তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হল এই ভারতদর্শন। মহাভারতের মূল ভাবের গভীরতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের এই বনবাস এই তীর্থ ভ্রমণ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। পাণ্ডবদের এই প্রব্রজ্যা, পাহাড়ী ঝর্ণার মত নিরন্তর এই গতি, যা তাঁদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তীর্থে তীর্থে—এ হল দেবভাব। দেবতারা কেবল চলেন। আর অসুরেরা স্থাণু।

> তে দেবাশ চক্রম্ অচয় এঙ্ছালম
> অসুরা আসন্।
>
> (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৮-৬-১১)

পাণ্ডবেরা যে দেবপক্ষ এবং কৌরবরা যে অসুরপক্ষ তার একটা তুলনা করেছেন ড. সুকুমার সেন, ('ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন, পৃ. ৬৬-৬৭), তিনি বলছেন, "গোড়ার দিকে ঠিক এমনি ব্যাপার ছিল কৌরব পাণ্ডবের। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর ছেলেরা হস্তিনাপুরে অচলভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডু আর তাঁর ছেলেরা স্থায়ী না হয়ে অথবা না হতে পেরে ঘুরে বেড়াতেন।"

শতপথ ব্রাহ্মণে বলছে, দেবতারা হৃদয়বান্, হাস্যময়, যাযাবর পর্যটক, আর অসুরেরা বুদ্ধিমান, শিল্পজ্ঞ দক্ষ স্থিতিশীল স্থাণু। আমরাও দেখি, কৌরবদের বুদ্ধি আছে কিন্তু হৃদয় নেই। দক্ষতা ও চাতুর্য আছে কিন্তু চারুতা প্রসন্নতা নেই।

ধর্মের স্থান হৃদয়ে। ধর্মের চলার পথ হৃদয় থেকে হৃদয়ে। তাই ধর্ম

হৃদয়বান্ চিরপথিক যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করেই ভ্রমণ করেছেন, আবার ছদ্মবেশ ধরে পায়ে-পায়ে অনুসরণও করেছেন তাঁকে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত।

কিন্তু আগে থেকে কিছুই জানতে পারেন না যুধিষ্ঠির। নিষ্পাপ শুধু নয়, তিনি সরল। যুধিষ্ঠিরের সেই সরলতা অনেক সময় অজ্ঞতার মাত্রাকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। তিনি অর্জুনের মত বীর নন, শ্রীকৃষ্ণের মত দেবতা নন, অন্যান্য পাণ্ডবদের মত রণপারদর্শীও নন। কিন্তু ভীষ্মের বৃহ আক্রমণের প্রত্যুত্তরে বারবার যুধিষ্ঠিরই সেনাব্যূহ রচনা করেছেন। রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে শিবিরে গিয়ে আত্মরক্ষাও যেমন করেন, তেমনি আবার মিথ্যা ও কপটতার আশ্রয় না-নিয়ে একমাত্র তিনিই ন্যায়-যুদ্ধে বীরের মত শল্যকে পরাজিত করেন। যুধিষ্ঠির অশেষ গুণবান্ হয়েও দেবতা নন, আবার অনেক ত্রুটি দুর্বলতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষও নন। তাঁর অন্তরের সকল স্ববিরোধীতা সকল মনস্তাপের মধ্যেও আপন হৃদয়ের নির্জন পথ ধরে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন, বীরের মত নয়, একান্তভাবে তাঁরই মত দ্বিধাহীন অথচ অনিশ্চিত পদক্ষেপে। চলছেন তিনি আপন বিশ্বাসে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন জানেন না। দোষে গুণে সাধারণ অসাধারণের গণ্ডির বাইরে এই একমাত্র মানুষটিকে আমরা ভাল না বেসে পারি না। একটি দেবশিশুর গায়ে আঘাত লাগলে যেমন কষ্ট হয়, যুধিষ্ঠিরের ব্যথায় আমরা তেমনি ব্যথিত হই।

পরম শত্রু যে দুর্যোধন সেও কিন্তু চায় না যুধিষ্ঠির নিহত হোক। রণক্ষেত্রে দ্রোণকে দুর্যোধনের অনুরোধ করতে শুনি, "আপনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করবেন না। তাঁকে কেবল জীবন্ত ধরে নিয়ে আসুন।"

দুর্যোধনের সেই অনুরোধ শুনে দ্রোণ বলে ওঠেন, "সাবাশ যুধিষ্ঠির! আজ জানলাম তুমি সত্যই অজাতশত্রু। দুর্যোধন, তুমিও বলতে পারলে না যে যুধিষ্ঠির নিহত হোক।"...

দুঃখের দিন যত দীর্ঘই হোক তারও শেষ আছে। তীর্থ যাত্রায় ভারত প্রদক্ষিণ করে বনবাসের সাত বছর কাটিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে এসে পাণ্ডবেরা অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর কুবের উদ্যানে কাটল আরো চার বৎসর। বনবাসের কাল শেষ হয়ে আসছে। যুধিষ্ঠির মনে-মনে তার সতর্ক হিসাব রেখেছেন। তাই কুবের উদ্যান ত্যাগ করে বৃষপর্বার আশ্রমে এক রাত্রি কাটিয়ে, বদরিকাশ্রমে এক মাস থেকে, বিশাখযূপ বন হয়ে আবার ফিরে এলেন দ্বৈতবনে হস্তিনাপুরের কাছে। শত্রুদের চোখের সামনে। অত্যন্ত সুচিন্তিত এই পরিকল্পনা। শত্রুদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের চোখে ধুলো দেওয়া।

দুর্যোধনের গুপ্তচরেরা অবাক হল।

আর মাত্র কদিন পরে যাঁদের চলে যেতে হবে অজ্ঞাত বাসে, তাঁরা কিনা এখনও প্রকাশ্যে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! গুপ্তচরদের সন্ধানী জাল ভেদ করে তাঁরা পালাবেন কোথায়?

একদিন বেলা শেষে কুটির অঙ্গনে বসে আছেন পঞ্চপাণ্ডব। ম্লান বনস্থলীর নীরবতার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁদের নীরব হৃদয়। পশ্চাতে তাঁদের দীর্ঘ পথের ক্লান্তি, সম্মুখে দুর্জ্ঞেয় অনিশ্চয়তা।

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ ছুটতে ছুটতে তাঁদের কাছে এসে বললেন, "হে রাজন্, আমার বড় বিপদ। আমাকে উদ্ধার করুন।"

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে যুধিষ্ঠির তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে?"

[এগার]

আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা

পূর্ণসাগরের মত যুধিষ্ঠির নীরব।

অপর পাণ্ডবগণ দাঁড়িয়ে আছেন বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য নিয়ে।

তাঁদের সামনে অসহায় ব্রাহ্মণ আর্তচকিত কণ্ঠে বলছেন, "আমার অগ্নিহোত্রের উপচার অরণি ও মন্থদণ্ড একটি গাছে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। এক হরিণ এসে সেই গাছে গাত্রঘর্ষণ করছিল। তারপর তার শিঙে আটকে সে অরণিমন্থ দুটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। হে রাজা, আপনি ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন। আমার অরণিসনাথ সেই মন্থদণ্ডটি উদ্ধার করে দিন।"

পঞ্চপাণ্ডব ব্রাহ্মণহিতার্থে সর্বদা ব্রতধারী।

তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

যুধিষ্ঠির তখনই ধনু ও কবচ ধারণ করে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে পলায়মান হরিণের অন্বেষণে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে অদূরে বনান্তরালে চকিত-প্রেক্ষণ দ্রুতচারী সেই হরিণটিকে দেখতে পেলেন। কার্মুকটঙ্কারে সেই ধাবমান হরিণটিকে লক্ষ্য করে তাঁরা নিক্ষেপ করতে লাগলেন কর্ণি, নালীক, নারাচ, সুতীক্ষ্ণ শায়কের যত অব্যর্থ সন্ধান। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। পলকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই রহস্যময় হরিণটি। পাণ্ডবগণ শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে দুঃখিত মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতল ছায়ায় এসে বসলেন।

সেই গহন বনানী, সেই ব্যর্থ মৃগয়ার ক্লান্ত পরিশ্রম, সেই চকিত হরিণের দ্রুত পলায়নের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র ছাড়া এখানে কোন বর্ণনা নেই। নেই কোন কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ। ভাষা যেন হরিণের মতই দ্রুতসঞ্চারী। তথাপি এর সবখানি চিত্র পাঠকের মনে আপনার থেকে ভেসে ওঠে। এক না-বলা বাণীর ঘনদ্যোতনায় ভরা বেদব্যাসের সেই বাক্‌রীতি। বলছেন না কিছুই, কিন্তু সেই গহন অরণ্যের নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশটুকু স্বপ্নের মত আপনিই জেগে উঠছে। বাল্মীকি হলে আমরা এখানে পেতাম দীর্ঘ বাঙ্‌মুখর বর্ণাঢ্য সুললিত কাব্যের লহরীবিলাস। যদিও শান্ত গভীর সেই জলস্রোতের কল্লোল। কিন্তু বেদব্যাস অন্য প্রতিভার কবি। কথার বদলে কেবল একটু দৃষ্টি, শব্দের বদলে তীক্ষ্ণ নৈঃশব্দ্য দিয়ে রচা কিছু উপল-বিস্তার, পর্বতগাত্রের মত অমসৃণ ঘনত্ব দিয়ে গড়া এক ভাস্কর্য।

কেমন সেই অরণ্য ?

গাছের উপর থেকে তার একটা ছবি দেখিয়ে দিচ্ছেন কবি।

যুধিষ্ঠির বলছেন নকুলকে, "এই গাছে উঠে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখ দেখি, নিকটে কোন জলাশয় কিংবা জলাশয় তীরবর্তী কোন বৃক্ষ আছে কিনা ?"

নকুল তখন নিকটবর্তী বৃক্ষে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে বলছেন,

> পশ্যামি বহুলান্ রাজন্ বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্।
> সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকসংশ্রয়ম্ ॥৮
>
> (বনপর্ব, ৩১২ অধ্যায়)

(মহারাজ, জলতীরস্থ বহু বৃক্ষ দেখতে পাচ্ছি। ওই বৃক্ষগুলিতে এক ঝাঁক সারসপক্ষীর কলরব শুনতে পাচ্ছি। মনে হয় নিকটেই কোন সরোবর আছে।)

নিঃসন্দেহে এ হল গাঢ়নিবদ্ধ কাব্য। কিন্তু এরই মধ্যে এরই তলায় প্রথিত রয়েছে গদ্যের এক দৃঢ় ভিত্তি। মহাভারতের সময় যদিও গদ্য ছিল না, তবুও গদ্যের মধ্যে থাকে যে একটা সমতল দৃঢ়ভিত্তি পাদচারণার ক্ষেত্র, গদ্যের সেই স্বকীয় সুঠাম বৈশিষ্ট্যটুকু প্রয়োজন মত কখনো কখনো বেদব্যাস প্রয়োগ করেছেন তাঁর অনুষ্টুপের চরণবিন্যাসের অন্তরালে। বাল্মীকি যেখানে কবি বেদব্যাস সেখানে কবি এবং কথাকার। তার একটা দৃষ্টান্ত, কবি দধীচ মুনির আশ্রম বর্ণনা করছেন—

> ষট্‌পদোদ্গীতনিনদৈর্বিঘুষ্টং সামগৈরিব।
> পুংস্কোকিলরবোন্মিশ্রং জীবং জীবকনাদিতম্ ॥১৪
> মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি।
> তত্র তত্রানুচরিতং শার্দূলভয়বর্জিতৈঃ ॥১৫
> করেণুভির্বারণৈশ্চ প্রভিন্নকরটামুখৈঃ।
> সরোহবগাঢ়ৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥১৬
> সিংহ-ব্যাঘ্রৈর্মহানাদান্নদদ্ভিরনুনাদিতম্।
> অপরৈশ্চাপি সংলীনৈর্গুহাকন্দরশায়িভিঃ ॥১৭
> তেষু তেষবকাশেষু শোভিতং সুমনোরমম্।
> ত্রিবিষ্টপসমপ্রখ্যং দধীচাশ্রমাগমন্ ॥১৮
>
> (বনপর্ব, ১০০ অধ্যায়)

(পুরুষ কোকিলের মধুস্বরের সঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জন মিশে সামগানের মত শোনাচ্ছে। সমস্ত আশ্রমটি পক্ষীকূজনে সজীব। মহিষ শূকর সৃমর ও চমর

মৃগ সমূহ ব্যাঘ্রভয়শূন্য হয়ে আশ্রমে বিচরণ করছে। মদস্রাবী হস্তীসব হস্তিনী সমভিব্যাহারে আশ্রম সরোবরে স্নান করে বৃংহতিধ্বনি তুলে চারিদিকে ছোটাছুটি করে খেলা করছে। পর্বতের গুহাকন্দরে শয়ান সিংহ ব্যাঘ্র সমূহ গর্জন করছে। গুহার মধ্যে অন্যান্য প্রাণীদেরও শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইরূপ সর্বপ্রকার মনোরম দৃশ্যে সুশোভিত স্বর্গতুল্য সেই দধীচ মুনির আশ্রমে দেবগণ এসে উপস্থিত হলেন।)

শব্দের ধ্বনির এমন কড়িকোমল মিশ্রণ, যুক্তাক্ষরের সমাসের দৃঢ়বদ্ধ ঠাস-বুনানী, দন্ত, তালু ও মূর্ধার 'স'-স্বরের এই হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রয়োগ, পুরুষ-কঠোর রিক্ততার সঙ্গে এমন আরণ্যক সৌন্দর্য, কঠোরে-ললিতে এমন যুগনদ্ধ বাক্-প্রতিমা অতি অল্পই দেখা যায়। অথচ তারই সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি নাকি গদ্যের একটা চাল, শ্রেণীবদ্ধ সেনানীর ভারী পদশব্দের মত সুবলয়িত পদক্ষেপ ?

বেদব্যাসের কাব্যের মধ্যে মিশে আছে এক উচ্চমনা ক্ষত্রিয়ের ওজঃ এবং বীর্য। ক্ষত্রিয়ের বহুবিচিত্র রাজকীয় গাম্ভীর্য ও গরিমা। মহাভারতের শ্লোকের চরণে-চরণে ধ্বনিত হয়েছে এক যুদ্ধগামী সেনানীর দ্রুত পদচারণা। শ্রীঅরবিন্দ এই বাক্‌রীতিকে বলেছেন, "a swift yet measured movement like the march of an army towards battle"। (*Vyasa and Valmiki, 1956, page 35) বেদব্যাসের কাব্যে আছে একটা ঝড়ো-হাওয়ার দুরন্ত গতি,* যা ঘটনার ঘূর্ণি নিয়ে অরণ্যের শাখাপল্লব আলোড়িত করে চলে। শ্রীঅরবিন্দ তাই বেদব্যাসকে বলেছেন, "a poet of action"। তিনি যতটা না প্রকৃতির কবি তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্জগতের অন্তর্জীবনের কবি। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখে মানুষের মনোজগতের বিচিত্র আলোছায়া ঘাত-প্রতিঘাত।

পঞ্চপাণ্ডব বনমধ্যে সেই শীতল বটের ছায়ায় বসে আছেন।...

ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত বিষন্ন।...

কবি দেখাচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের অন্তরের ভাব। কি তাঁরা ভাবছেন। সকলেই এক ভাগ্যে বাঁধা। কিন্তু প্রত্যেকেই জ্বলছেন স্বতন্ত্র আগুনে। তাঁদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের মত তাঁদের ব্যথাও ভিন্ন ভিন্ন। কেবল যুধিষ্ঠিরের কোন অন্তর্দাহ নেই। কোন খেদ নেই, অভিযোগ নেই।

প্রশ্নটা তুললেন প্রথমে নকুল। বললেন, "আমাদের বংশে কখনো ধর্ম লোপ হয়নি। আলস্যে আমরা কোন কাজ অসিদ্ধ রাখিনি। আমরা কখনো কোন প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিইনি। কিন্তু আজ আমাদের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হল কেন ? সম্প্রাপ্তাঃ স্মঃ সংশয়ং কিং নু রাজন্ ?"

যুধিষ্ঠির এর উত্তর দিলেন এক উদার নিস্পৃহ কণ্ঠে। তাঁর কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় যুধিষ্ঠিরের মনের আকাশ কতখানি নির্মল এবং উর্ধ্বে প্রসারিত। বললেন, "বিপদ যে কত রকম হয় তার কোন সীমা নেই। তার কারণও জানা যায় না। ধর্মই পাপপুণ্য ফল ভাগ করে দেন।"

অসহিষ্ণু ভীম তখন বললেন,—

"দুঃশাসন দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, তথাপি তাকে আমি বধ করিনি, সেই পাপে আমাদের এই দশা!"

এবার অর্জুন—

"সূতপুত্র কর্ণের তীক্ষ্ণ কটুবাক্য সহ্য করেছিলাম, আজ তারই ফল।"

সহদেবের উত্তর—

"শকুনি যখন দ্যূতে জয়ী হয় তখন আমি তাকে হত্যা করিনি, তাই এমন হয়েছে।"

যুধিষ্ঠির ধীর। তিনি বোঝেন তাঁর ভাইদের অন্তরের দুঃখ ও মনস্তাপ। তাই শান্তভাবে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা পাল্‌টে দিতে চাইলেন। সস্নেহে নকুলকে বললেন, "দেখ তো, নিকটে কোন জলাশয় আছে কি না। আমরা সকলেই তৃষ্ণার্ত। তুমি শীঘ্র গিয়ে তূণে করে জল নিয়ে এস।"

নকুল জল আনতে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখেন এক নির্মল জলাশয়। এক ঝাঁক সারস পাখি উড়ছে। তিনি জল পান করতে যাবেন এমন সময় শুনলেন কে যেন বলছে, "মা তাত সাহসং—তুমি জল পান করতে সাহস ক'রো না। এই সরোবর আমার অধিকারে। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পরে জল পান করে জল নিয়ে যাও।"

তৃষ্ণার্ত নকুল নিষেধ শুনলেন না।

জল পান করা মাত্র তখনি ভূপতিত হলেন।

নকুলের বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও অদৃশ্য কণ্ঠের নিষেধবাণী শুনলেন, তবু জল পান করতেই ভূপতিত হলেন।

যুধিষ্ঠির একে একে অর্জুন ও ভীমকে পাঠালেন। তাঁদেরও একই দশা হল। কেউ আর ফিরে এলেন না। যুধিষ্ঠির তখন চিন্তিত উদ্বিগ্ন হয়ে ওই মহাবনে প্রবেশ করলেন। নীলাম্বর বনমধ্যে সুবর্ণময় পদ্মকেশর শোভিত এক সরোবর দেখতে পেলেন। স্বয়ং বিশ্বকর্মা সেই সরোবর তৈরী করেছিলেন। সরোবরের চারিদিকে সিন্ধুবার বেতস কেতকী করবী পুষ্পের বৃক্ষ সুশোভিত।

হঠাৎ যুধিষ্ঠির বিস্মিত হয়ে দেখেন সরোবরের তীরে ধনুর্বাণ বিক্ষিপ্ত

হয়ে আছে। আর তাঁর ইন্দ্রতুল্য চার ভাই প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে আছেন। তাই দেখে যুধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে শেষে ভাবতে লাগলেন, এ কেমন করে সম্ভব? এদের গায়ে তো কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই! কারো শরাসনও ভঙ্গ হয়নি। মাটিতে কারো পদচিহ্নও নেই। তবে কি মহাশক্তিধর অলৌকিক কোন জীব এদের হত্যা করেছে? অথবা দুর্যোধন শকুনির লোক এসে কি গুপ্তহত্যা করেছে? জলে বিষ মেশানো নেই তো? তিনি ভাল করে সরোবরের জল পরীক্ষা করে দেখলেন। তা বিষদূষিত দেখলেন না।

যুধিষ্ঠির তখন সরোবরে নেমে জল পান করতে গেলেন, এমন সময় অন্তরীক্ষ থেকে সেই আকাশবাণী গর্জন করে উঠল। "মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ। প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ। (বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)—আমাকে অবজ্ঞা করার সাহস ক'রো না। কুন্তীনন্দন, আমার প্রশ্নগুলির আগে উত্তর দাও, তার পরে জল পান করে জল নিয়ে যাও।"

যুধিষ্ঠির থমকে দাঁড়ালেন।

তিনি অন্যদের মত হঠকারী নন। তিনি শান্ত, তিনি ধীর। অশরীরী কণ্ঠকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, "পৃচ্ছামি ভগবংস্তস্মাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি।—আমি জানতে চাই, কে আপনি?"

—"আমি যক্ষ।"

মহাকায় বিকটাকার সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এক যক্ষ বৃক্ষে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, "রাজা, আমি বহুবার বারণ করেছিলাম তথাপি তোমার ভ্রাতারা জল পান করতে গিয়েছিল। তাই আমি তাদের প্রাণহরণ করেছি। যুধিষ্ঠির, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জল পান কর।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনি প্রশ্ন করুন। আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দেব।"

যক্ষ তখন প্রশ্ন করলেন।

তাঁর প্রথম প্রশ্ন।

যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানের অনুভবের মূল ভিত্তিটাকেই যেন একটু নাড়া দিয়ে দেখতে চাইলেন তা কতখানি তপস্যাসিদ্ধ।

যক্ষের প্রশ্ন: "কে সূর্যকে ঊর্ধ্বে ধরে রেখেছে? কে সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?"

…যক্ষ যতই নিজেকে ছদ্ম পরিচয় দিন না কেন, তাঁর এই প্রথম প্রশ্নেই যুধিষ্ঠিরের বোঝা উচিত ছিল যক্ষ কে ? কেননা মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে তো তিনি আগেই শুনেছেন, সাবিত্রী ঠিক এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন ধর্মরাজ যমকে, তাঁর অনিন্দ্য "স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া" ভাষাতে বলেছিলেন,

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি ।৪৮
(বনপর্ব, ২৯৭ অধ্যায়)

(সাধুজনেরাই সত্যের দ্বারা সূর্যকে চালিত করেন।
সাধুজনেরাই সত্যের দ্বারা পৃথিবী ধারণ করেন।)

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ ।
ধর্মশ্চাস্তং নয়তি চ সত্যে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪৬
(বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)

(ব্রহ্মাই সূর্যকে উদিত করান। দেবগণই তাঁর পার্শ্বচর, ধর্মই সূর্যকে অস্তগমন করান। এবং সত্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত।)

…সূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে যে ঋত, যুধিষ্ঠির তাকেই বলছেন ব্রহ্ম বা ধর্ম। সূর্যের এই আহ্নিক গতির সঙ্গে মানুষের জীবনের তার অন্তরেরও কোথায় যেন একটা ছন্দলয় মিল আছে। যুধিষ্ঠির তাকে বলেছেন "সত্য"। সাবিত্রীর বচনে "সন্তো" আর যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে "সত্যে চ"—এই দুয়ে মিলে—মানব জীবনের ধর্ম আর জাগতিক নিয়মের সত্য বিধৃত হয়েছে জ্যোতির্ময় সূর্যচেতনার এক আধ্যাত্মিক আদিত্যপ্রভায়।

আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই একথা বলা হয়েছে যে, সমগ্র মহাভারতের মধ্যে এই বনপর্ব হল গ্রন্থিস্থল ("অরণীপর্বরূপাঢ্য"), অথবা ভারত-বৃক্ষের বিটঙ্ক (পক্ষী থাকিবার স্থান)—"অরণ্যবিটঙ্কবান্"—তত্ত্ব ও অর্থ, যোগ ও তপস্যার সে দৃঢ়গ্রন্থি।

মহাভারতে মোট আট হাজার আট শত শ্লোককূট রয়েছে যা গূঢ়ার্থ-সমন্বিত। বেদব্যাস বলেছেন, "তার অর্থ কেবল আমি জানি, শুকদেব জানে, আর সঞ্জয় জানতেও পারে বা নাও পারে—অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সংজয়ো বেত্তি বা ন বা।"

সেই শ্লোকগুলি প্রকৃতপক্ষে "গ্রন্থগ্রন্থি"। তার রহস্য ভেদ করতে কেউ পারেনি বলে সৌতি জানাচ্ছেন। সেগুলির অর্থ যেমন গূঢ়, তার শব্দগুলিও তেমনি যোগদৃষ্টি দিয়ে ব্যক্ত।

আমাদের মনে হয়, যক্ষের প্রথম প্রশ্নটি (এবং আরও দুই একটি) তার অন্যতম। যার অর্থ বলে দিলেও রহস্য ভেদ হয় না। বৈদিক ভারতের এ হল সেই যোগভাষা—"বেদরহস্যং"।

যম-সাবিত্রী সংলাপে, যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নোত্তরে প্রতিফলিত হয়েছে কঠোপনিষদেরই মন্ত্র—

> যতশ্চোদিতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
> তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
> এতদ্বৈ তৎ॥
> (কঠোপনিষদ, ২-১-৯)

(যাঁর মধ্য থেকে সূর্য ওঠেন, যাঁর মধ্যে তিনি অস্ত যান, তাঁরই কাছে সকল দেবতা নিজেদের অর্পণ করেছেন। তাঁকে অতিক্রম করে কেউ চলে যেতে পারে না। ইনিই হলেন তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম।)

আবার কেবল কঠোপনিষদই নয়, তারও আগে, ঋগ্বেদের সূর্যা ঋষিও বলছেন একই কথা—

> সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
> ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ॥
> (ঋগ্বেদ, ১০-৮৫-১)

(সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, ঋতপ্রভাবেই সোম সেই স্থান আশ্রয় করে আছেন।)

...সন্দেহ নেই, গীতার বাণী ঘোষণার সময় তার পরিবেশ অত্যন্ত নাটকীয়, একটা দুর্যোগ তার সবখানি ত্রাস ও আতঙ্ক নিয়ে যেন থমকে দাঁড়িয়ে, তথাপি যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নোত্তরের পটভূমি আরো ভয়ঙ্কর আরো বিচিত্র। সেই সায়াহ্নে হ্রদের ধারে একা দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির। তাঁর বীরশ্রেষ্ঠ চার ভাইয়ের মৃতদেহ ভূমিতে লুটিয়ে। এখন তাঁর কেউ নেই! রাজ্য

হারিয়ে অশেষ লাঞ্ছনার ভিতরেও তাঁর অন্তত এই সান্ত্বনা ছিল যে, তাঁর প্রাণপ্রতিম চার ভাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। শক্তিশেলে আহত মৃতপ্রায় লক্ষ্মণের পাশে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল তাঁর সীতা উদ্ধারের সঙ্কল্প, রাবণ বধের প্রয়াস। ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত শ্লোক—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥
ইত্যেবং বিলপন্তং তং শোকাবিহ্বলিতেন্দ্রিয়ম্।
বিচেষ্টমানং করুণমুচ্ছ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ॥
(রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১০১ সর্গ)

এমনি করে শোকবিহ্বল হৃদয়ে বিবশ হয়ে রামচন্দ্র উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বিলাপ করতে লাগলেন।

তার চেয়েও মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির এখন অটল। তাঁর সম্মুখে কর্কশকণ্ঠ "পুরুষাক্ষর" সেই যক্ষ। তীক্ষ্ণ বাণের মত একের পর এক নিক্ষেপ করে চলেছেন রহস্যকূট প্রশ্নের পর প্রশ্ন। যুধিষ্ঠিরকে তার জবাব দিতে হচ্ছে হৃদয়ের অতল থেকে জ্ঞান মন্থন করে। যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে কি হবে তা জানেন না। তাঁর ভাইদের আবার ফিরে পাবেন কি না তাও জানেন না।

যুধিষ্ঠিরকে বাছা-বাছা মোট চৌত্রিশটি প্রশ্ন করেছিলেন যক্ষ। প্রতিটি প্রশ্নের ভাঁজে-ভাঁজে আবার আরো দু'তিনটি করে প্রশ্ন। একুনে শতাধিক। মহাভারতের মূল তত্ত্বের একটা মোটামুটি কাঠামো আছে তাতে। যুধিষ্ঠিরের সুচিন্তিত উত্তরগুলির মধ্যে শুধু যে তার অন্তরের ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই তাই নয়, একটা সুস্পষ্ট রেখায়িত আভাস ফুটে ওঠে—জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, স্বর্গ-নরক, সত্য-তপঃ-দয়া-দানের চার যুগের চতুষ্পদ স্থিতি।

যক্ষ

ব্রাহ্মণ হয় কি প্রকারে? মানুষ কিসে মহৎ পদ লাভ করে? কিসে দ্বিতীয়বান্ হয়? কিসে বুদ্ধিমান হয়?

যুধিষ্ঠির

বেদ অধ্যয়নেই ব্রাহ্মণ। তপস্যাতেই মহৎ পদ লাভ হয়। ধৈর্য মানুষকে সহায়বান্ দ্বিতীয়বান্ করে। জ্ঞানীব্যক্তির সেবার দ্বারাই মানুষ বুদ্ধিমান হয়।

যক্ষ

ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি? কোন্ ধর্মের জন্য তাঁরা সাধু? তাঁদের মনুষ্যভাব কি? অসাধুভাব কেন হয়?

যুধিষ্ঠির

স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণের দেবত্ব। তপস্যার ফলে সাধুতা। মৃত্যু আছে তাই তাঁদের মনুষ্যভাব। পরনিন্দার ফলে তাঁরা অসাধু হন।

যক্ষ

ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? তাঁদের ধর্ম কি? কিসে তাঁদের মনুষ্যভাব? তাঁদের অসাধুতা কি?

যুধিষ্ঠির

অস্ত্রনিপুণতাই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব। যজ্ঞই তাঁদের সাধু ধর্ম। ভয়ই মনুষ্যভাব। শরণাগতকে পরিত্যাগই তাঁদের অসাধুভাব।

যক্ষ

যজ্ঞিয় সাম কি? যজ্ঞিয় যজুঃ কি? যজ্ঞকে বরণ করে কি? কি সেই যাকে যজ্ঞ অতিক্রম করে না?

যুধিষ্ঠির

প্রাণ যজ্ঞিয় সাম। মন যজ্ঞিয় যজুঃ। ঋক্‌মন্ত্র যজ্ঞকে বরণ করে। যজ্ঞ তাকে অতিক্রম করতে পারে না।

যক্ষ

কৃষকের কাছে প্রধান কি? বপনকারীর কাছে প্রধান কি? প্রতিষ্ঠিত ধনীর কাছে শ্রেষ্ঠ কি? জনকের কাছে প্রধান কি?

যুধিষ্ঠির

কৃষকের কাছে বর্ষণ, রোপণকারীর কাছে বীজ, ধনীর কাছে গো-সম্পদ, সন্তানেচ্ছুর কাছে পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

যক্ষ

এমন ব্যক্তি কে আছে যে বুদ্ধিমান, সকলের সম্মানিত, বিষয়ভোগে নিরত, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে তথাপি জীবিত নয়?

যুধিষ্ঠির

যে ব্যক্তি দেবতা অতিথি ভৃত্য পিতৃপুরুষগণ এবং আত্মা—এই পঞ্চবিধকে দানাদি দিয়ে পোষণ করে না, সে জীবিত থেকেও মৃত।

যক্ষ

পৃথিবীর অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশের থেকে উচ্চতর, বায়ুর চেয়ে দ্রুততর এবং তৃণ অপেক্ষা বহুতর কি?

যুধিষ্ঠির

মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর। পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর। মন বায়ু অপেক্ষা দ্রুততর এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।

যক্ষ

তাকিয়ে ঘুমায় কে? কে জন্মের পরেও নিস্পন্দ থাকে? কার হৃদয় নেই? বেগ দ্বারা কে বৃদ্ধি পায়?

যুধিষ্ঠির

মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মুদ্রিত করে না। অণ্ড প্রসূত হয়েও স্পন্দিত হয় না। পাষাণের হৃদয় নেই। নদী বেগে বৃদ্ধি পায়।

যক্ষ

প্রবাসী গৃহবাসী আতুর ও মুমূর্ষু—এদের বন্ধু কে?

যুধিষ্ঠির

প্রবাসীর মিত্র সহযাত্রী। গৃহবাসীর মিত্র ভার্যা। আতুরের মিত্র চিকিৎসক। মুমূর্ষুর মিত্র দান।

যক্ষ

সকল প্রাণীর অতিথি কে? সনাতন ধর্ম কি? অমৃত কি? জগতের স্বরূপ কি?

যুধিষ্ঠির

সকল প্রাণীর অতিথি অগ্নি। অবিনাশী নিত্যধর্মই সনাতন ধর্ম। গো-দুগ্ধই অমৃত। বায়ু সর্বজগতের স্বরূপ।

যক্ষ

একাকী কে বিচরণ করে? জাত হয়েও আবার জন্মায় কে? হিমের ঔষধ কি? মহাক্ষেত্র কিং?

যুধিষ্ঠির

সূর্যই একাকী বিচরণ করেন। চন্দ্রমা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিই হিমের ঔষধ। এই পৃথিবীই মহাক্ষেত্র।

যক্ষ

ধর্মের যশের স্বর্গের ও সুখের মুখ্যস্থান কি?

যুধিষ্ঠির

ধর্মের মুখ্যস্থান দক্ষতা। যশের মুখ্যস্থান দান। সত্য স্বর্গের এবং চরিত্র সুখের মুখ্যস্থান।

যক্ষ

মনুষ্যের আত্মা কে? দৈবকৃত সখা কে? জীবনের সহায় কি? পরম অবলম্বন কি?

যুধিষ্ঠির

পুত্রই মনুষ্যের আত্মা। ভার্যাই দৈবকৃত সখা। মেঘ তার সহায় এবং দানই পরম অবলম্বন।

যক্ষ

উত্তম গুণ কি? উত্তম ধন কি? উত্তম লাভ কি? উত্তম সুখ কি?

যুধিষ্ঠির

দক্ষতা উত্তম গুণ। বেদজ্ঞান উত্তম ধন। আরোগ্য লাভ উত্তম। অন্তরের সন্তোষ উত্তম সুখ।

যক্ষ

কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম সদা ফলদায়ী? কাকে সংযত করলে আর অনুশোচনা করতে হয় না? কার দ্বারা সন্ধিভঙ্গ হয় না?

যুধিষ্ঠির

দয়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বেদোক্ত ত্রয়ীধর্মই সদা ফলদায়ী। মনকে সংযত করলে আর অনুশোচনা করতে হয় না। সাধু ব্যক্তি দ্বারা সন্ধিভঙ্গ হয় না।

যক্ষ

কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে শোক হয় না? কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে সুখী হয়?

যুধিষ্ঠির

অভিমান ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়। ক্রোধ ত্যাগ করলে কখনো শোক করতে হয় না। কামনা ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়। লোভ ত্যাগ করলে লোকে সুখী হয়।

যক্ষ

ব্রাহ্মণকে, নট ও নর্তককে, ভৃত্য এবং রাজাকে কেন দান করা হয়?

যুধিষ্ঠির

ধর্মের জন্য ব্রাহ্মণকে, যশের জন্য নট ও নর্তককে, প্রতিপালনের জন্য ভৃত্যকে এবং ভয়ের জন্য রাজাকে দান করা হয়।

যক্ষ

জগৎ কি দিয়ে আবৃত? কেন তা প্রকাশিত হয় না? কিসের জন্য মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে? কিসের জন্য মানুষ স্বর্গে যায় না?

যুধিষ্ঠির

অজ্ঞানের দ্বারা জগৎ আবৃত। তমোগুণের দ্বারা একে অপরকে প্রকাশিত করে না। লোভের বশে মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে। সংসার-আসক্তির জন্য মানুষ স্বর্গে যায় না।

যক্ষ

কোন্ মানুষ, কোন্ রাষ্ট্র, কিরূপ শ্রাদ্ধ এবং কিরূপ যজ্ঞকে মৃত বলে?

যুধিষ্ঠির

দরিদ্র মানুষ, অরাজক রাষ্ট্র, ব্রাহ্মণহীন শ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞকে মৃত বলা হয়।

...যক্ষের বোধহয় প্রশ্নবাণ শেষ হয়ে আসছে। তাই একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন—

যক্ষ

কাকে দিক্ কাকে উদক কাকে অন্ন এবং কাকে বিষ বলে? শ্রাদ্ধের কাল কি? এই কথার উত্তর দিয়ে জলপান করতে পার।

যুধিষ্ঠির

সাধুগণ দিক্, আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, যাচ্ঞা বিষ। ব্রাহ্মণই হলেন শ্রাদ্ধের কাল। (...এই বলে যুধিষ্ঠির পালটা প্রশ্ন করলেন) এবিষয়ে আপনি কি বলেন?

উত্তর না দিয়ে যক্ষ আবার প্রশ্ন করলেন—

যক্ষ

তপস্যার লক্ষণ কি? দম কাকে বলে? পরম ক্ষমা এবং পরম লজ্জা কি?

যুধিষ্ঠির

স্বধর্মনিষ্ঠাই তপস্যা। মনের দমনই দম। দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাই ক্ষমা। অকার্য থেকে নিবৃত্ত হওয়ার নামই লজ্জা।

যক্ষ

জ্ঞান কি? দয়া শম সরলতাই-বা কি?

যুধিষ্ঠির

আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞানই জ্ঞান। চিত্তের শান্তিই শম। সকলের সুখ ইচ্ছা করা দয়া এবং সমচিত্ততাই সরলতা।

যক্ষ

কোন্ শত্রু দুর্জয়? কোন্ ব্যাধি অশেষ? কে সাধু, কেই-বা অসাধু?

যুধিষ্ঠির

ক্রোধ দুর্জয় শত্রু। লোভ মানুষের অশেষ ব্যাধি। সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী যিনি তিনিই সাধু। নির্দয় মানুষই অসাধু।

যক্ষ

রাজন্, মান মোহ আলস্য এবং শোক কাকে বলে?

যুধিষ্ঠির

ধর্মমূঢ়তাই মোহ। আত্মাভিমানই মান। ধর্মে নিষ্ক্রিয়তাই আলস্য। অজ্ঞানই শোক।

যক্ষ

ঋষিরা ধৈর্য, স্থৈর্য, পরম স্নান ও পরম দান কাকে বলেছেন?

যুধিষ্ঠির

স্বধর্মে স্থিরতা স্থৈর্য। ইন্দ্রিয়সংযম ধৈর্য। মনের মালিন্য ধুয়ে ফেলাই পরম স্নান। প্রাণীগণের রক্ষা পরম দান।

যক্ষ

পণ্ডিত, নাস্তিক, মূর্খ, কাম এবং মাৎসর্য কাকে বলে ?

যুধিষ্ঠির

ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে। নাস্তিককে মূর্খ বলা হয়। সংসারের হেতু কাম। হৃদয়ের সন্তাপকে বলে মাৎসর্য।

যক্ষ

অহঙ্কার, দম্ভ, পরম দৈব এবং পৈশুন্য (খলতা) কাকে বলে।

যুধিষ্ঠির

অজ্ঞানকে অহঙ্কার বলে। নিজেকে অত্যন্ত ধার্মিক মনে করাই দম্ভ। দানের ফল পরম দৈব। অন্যের উপর দোষারোপ করাকেই পৈশুন্য বলে।

…যক্ষ এবার তাঁর মোক্ষম প্রশ্নটি ছুঁড়লেন—

যক্ষ

ধর্ম অর্থ কাম এরা পরস্পর বিরোধী। নিত্য বিরোধী এই তিনের একত্র অবস্থান কি সম্ভব ?

…প্রশ্নটি যেমন জটিল এবং ব্যাপক, যুধিষ্ঠিরের উত্তরও তেমনি ঋজু এবং সরল। তাঁর উত্তর থেকে বোঝা যায় যুধিষ্ঠিরের জীবনতপস্যা কতখানি উন্মুক্ত এবং উদার। সেখানে নেই কোন নৈতিকতার গোড়ামী কিংবা জীবন-বিমুখ কৃচ্ছ্রতার আত্ম-অস্বীকৃতি। তাই অতি সহজেই যক্ষের এই কূট প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারলেন নিজের বুকে হাত রেখে। হয়তো দ্রৌপদীকে পত্নী হিসেবে লাভ না করলে যুধিষ্ঠির এতবড় প্রশ্নের এমন সহজ উত্তর দিতে পারতেন না।

মহাভারতের মধ্যে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারটি তত্ত্বেরই সমন্বয় ও সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে ;—"ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থৈঃ সমাস-ব্যাসকীর্তনৈঃ।" (আদিপর্ব, ১/৮৫) অতএব যক্ষের এই প্রশ্নটি মহাভারতের অন্যতম মূল

প্রশ্নেরই এক গ্রন্থগ্রন্থি। শুধু মহাভারতই নয়, ভারতবর্ষের ভাবজগতের অপরার্ধ যে রামায়ণ, তাও ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধনের উপায় বলে বর্ণিত হয়েছে—

> ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং সাধনঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
> শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা রামায়ণপরামৃতম্ ॥২৪
>
> (শ্রীস্কন্দপুরাণ, উত্তর খণ্ড, প্রথম অধ্যায়)

যুধিষ্ঠির এর উত্তর দিলেন বটে কিন্তু অধিকার ভেদে সকলের কাছে তা সমানভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে না। তার জন্যে চাই এক যোগসাধনা। যুধিষ্ঠিরের সে সাধনা ছিল বলেই এমন সহজে এমন কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন। উভয়ভারতীর এমনি এক প্রশ্নের উত্তর দিতে সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যকে কিছু দিনের জন্য ফিরে যেতে হয়েছিল সংসারে।…

যুধিষ্ঠির

যখন ধর্ম এবং ভার্যা পরস্পর অবিরোধী হয় তখন সদা পরস্পরবিরোধী ধর্ম অর্থ কামের একত্র অবস্থান সম্ভব।

…যুধিষ্ঠিরের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে যক্ষ বোধহয় অবাক হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন। যেন তাঁর তর সইছে না। বলছেন, তাড়াতাড়ি উত্তর দাও।…

যক্ষ

কে অক্ষয় নরকে গমন করে?

যুধিষ্ঠির

প্রার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে নিজেই ডেকে এনে পরে 'নেই' বলে ফিরিয়ে দেয় সেই অক্ষয় নরকে যায়।

ধর্মশাস্ত্র বেদ ব্রাহ্মণ দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি যে মন্দবুদ্ধি রাখে সেই অক্ষয় নরকে যায়।

অর্থ থাকতেও যে দান করে না, দানযোগ্য ব্রাহ্মণকে দেয় না, স্ত্রীপুত্রদের দেবার সময় 'নেই' বলে প্রত্যাখ্যান করে, সেই অক্ষয় নরকে যায়।

যক্ষ

কুল, সদাচার, স্বাধ্যায়, এবং শাস্ত্র শ্রবণ—এর মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়?

যুধিষ্ঠির

কুল স্বাধ্যায় শাস্ত্রশ্রবণ এর কোনটাই উত্তম ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয়। ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তির আচরণেই উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়।

চারি বেদে পারদর্শী হয়েও যে ব্রাহ্মণ দুরাচারী সে শূদ্রের অধম। আবার বিদ্বান্ না হয়েও যিনি ব্রতপরায়ণ দমগুণসম্পন্ন তিনিই ব্রাহ্মণ।

যক্ষ

মিষ্টভাষী, বিচার-বিবেচনা করে যিনি কাজ করেন, যিনি বহু মিত্রকারী ধর্মপরায়ণ তিনি কি লাভ করেন ?

যুধিষ্ঠির

মিষ্টভাষী সকলের প্রিয় হন। ভেবেচিন্তে যিনি কাজ করেন তিনি বেশি সাফল্য লাভ করেন। বহু মিত্রকারী সুখী হন। আর ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সদ্গতি লাভ করেন।

…এবার যক্ষ নিক্ষেপ করলেন তাঁর চতুর্মুখী এক ভয়ঙ্কর গূঢ় প্রশ্ন। তাঁর প্রথম প্রশ্নের মতই সমান দুর্জ্ঞেয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এর উত্তরে যুধিষ্ঠিরের বিখ্যাত বচনটি হাজার হাজার বছর পরে আজো আমাদের মুখে-মুখে। এমনকি আমরা যারা মহাভারত পড়িনি তারাও যুধিষ্ঠিরের এই কথা কটি স্থানে অস্থানে ব্যবহার করে থাকি।…

যক্ষ

সুখী কে ? আশ্চর্য কি ? পথ কি ? বার্তা কি ?

যুধিষ্ঠির

দিবসের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠভাগে (সন্ধ্যায়) নিজের গৃহে বসে যে শাকান্ন আহার করে, যে অঋণী অপ্রবাসী, সেই সুখী।

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি যে গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী স চ বারিচর মোদতে ॥১১৫
(বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)

প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে দেখেও মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে ?

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্ ।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্ ॥ ১১৬
(বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)

তর্কের শেষ নেই, শ্রুতিসমূহও বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়, তার কোনটাই একমাত্র প্রমাণ বলে গণ্য নয়, সুতরাং ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। তাহলে মহাজন যে পথে গেছেন তাঁদের পথই একমাত্র পথ।

তর্কেঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১১৭
(বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)

এই মহামোহরূপ কটাহে মহাকাল প্রাণসমূহকে পাক করছেন। সূর্য তার অগ্নি, রাত্রিদিন তার ইন্ধন, মাস ঋতু তার আলোড়নের দর্বী (হাতা), এই হল বার্তা।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্বীপরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥১১৮
(বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)

যক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ। এখন বল, পুরুষ কে? সর্বধনেশ্বর কে?

যুধিষ্ঠির বললেন, পুণ্যকর্মের যশোগৌরব পৃথিবী ও স্বর্গ স্পর্শ করে, যতকাল সেই গৌরববাণী থাকে ততকালই লোকে পুরুষ বলে গণ্য হয়। প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, অতীত-ভবিষ্যৎ যিনি তুল্যজ্ঞান করেন তিনিই সর্বধনেশ্বর।

এবার যক্ষ ক্ষান্ত হলেন। তাঁর আর কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা তখনও বুঝি শেষ হয়নি। যক্ষ দেখতে চান, যুধিষ্ঠির এতক্ষণ যে সব উত্তর দিলেন তা কেবল মুখের কথা না তাঁর জীবনের ধর্ম? কেননা, জ্ঞানকে বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া এক কথা আর তাকে জীবনে সত্য করে তোলা আর এক তপস্যা।

যক্ষ বললেন, "রাজা, তুমি তোমার এক ভ্রাতার জীবন প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "তাহলে নকুলকে বাঁচিয়ে দিন।"

—"ভীম অর্জুনের জীবন না চেয়ে তুমি নকুলের জীবন চাইলে কেন?" যক্ষ প্রশ্ন করেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, "ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ—ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্মই আমাকে রক্ষা করবে। কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার মাতা। আমি চাই, আমার দুই মায়েরই অন্তত দুটি সন্তান বেঁচে থাকুক।"

যক্ষ এবার সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "ভারতশ্রেষ্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনৃশংসতাই শ্রেষ্ঠ মনে কর, অতএব তোমার সকল ভ্রাতাই জীবন লাভ করুক।"

যুধিষ্ঠিরের চার ভাই তখন জীবন পেয়ে জেগে উঠলেন।

তিনি বিস্মিত হয়ে যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোন্ দেবতা? মনে হচ্ছে আপনি আমাদের পরম সুহৃদ!"

এতক্ষণে যুধিষ্ঠিরের চিনতে ভুল হয়নি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমাদের পিতা নয় তো? ন পিতা ভবান্?"

যক্ষ বললেন, "বৎস, আমি তোমার পিতা ধর্ম। তুমি বর প্রার্থনা কর।"

পিতা-পুত্রের এই প্রথম সাক্ষাৎ। আশ্চর্য পরিবেশে দারুণ জীবন-সংকটের মধ্যে। তিনি বর দান করতে চাইছেন। ইচ্ছা করলেই যুধিষ্ঠির বর প্রার্থনা করে আবার ফিরে পেতে পারেন তাঁর হারানো রাজত্ব লুপ্ত বৈভব অপসৃত যশোগৌরব। কিন্তু তিনি নিষ্কাম নির্লোভ নিরাশী। কিছুই তিনি চাইলেন না। এত কাণ্ডের মধ্যেও ব্রাহ্মণহিতব্রতী যুধিষ্ঠির ভোলেননি সেই অসহায় ব্রাহ্মণের কথা। বললেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর অরণিমন্থ ফিরে পান শুধু এই বর প্রার্থনা করি।"

ধর্ম বললেন, "আমিই মৃগরূপ ধারণ করে ব্রাহ্মণের অরণি হরণ করেছিলাম শুধু তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য। আমি ব্রাহ্মণকে তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠিরকে বরাভিসিক্ত করার জন্য ধর্ম যেন উদ্গ্রীব। তাঁকে সব দিয়েও যেন প্রাণ ভরে না। বলছেন, "তোমাকে সকল বর দান করেও আমি তৃপ্তি-লাভ করতে পারছি না। ন তৃপ্যামি নরশ্রেষ্ঠ প্রযচ্ছন্ বৈ বরংস্তথা।"

যুধিষ্ঠির তখন বললেন, "বার বছর বনবাসের পর ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত। আমাদের এই অজ্ঞাতবাস যেন কেউ জানতে না পারে।"

ধর্ম বললেন, "তাই হবে। তোমরা নিজ-নিজ রূপে বিচরণ করলেও কেউ চিনতে পারবে না। আরো একটা বর প্রার্থনা কর।"

এর উত্তরে যুধিষ্ঠির যা চাইলেন তা তাঁরই যোগ্য প্রার্থনা। বললেন,

"লোভ মোহ ক্রোধকে জয় করে দান তপস্যা সত্যে যেন আমার মন প্রতিষ্ঠিত থাকে—দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ।"

ধর্ম বললেন, "তুমি তো ধর্মস্বরূপ। তথাপি যা ইচ্ছা করছ তাই হবে।"

এই বলে ধর্ম অন্তর্হিত হলেন।...

পাণ্ডবদের হাতে আর সময় নেই।

আজই শেষ দিন।

আগামীকাল থেকে তাঁদের অজ্ঞাতবাস শুরু হবে।

পুরোহিত ধৌম্য ও সমবেত ব্রাহ্মণদের থেকে বিদায় নিয়ে, এক ক্রোশ দূরে এক নির্জন পর্বতসানুতে ম্লান সন্ধ্যার ধূসর আলোয় বসে তাঁরা মন্ত্রণা করতে লাগলে।

তাঁদের পশ্চাতে পর্বত চূড়ার আড়ালে তখন ধীরে-ধীরে সূর্যাস্ত হচ্ছে।

অর্জুন তো দূরের কথা, সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণকে বধ করা দেবরাজ ইন্দ্রেরও অসাধ্য। সেই কর্ণ পাণ্ডবদের চিরশত্রু। যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কিন্তু আর কোন ভয় নেই।

অজ্ঞাতবাসে যাবার আগেই যুধিষ্ঠির জেনে গেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে স্নানতর্পণরত দাতা কর্ণের কাছ থেকে তার অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করে নিয়ে গেছেন। কর্ণ এখন নিঃস্ব অরক্ষিত। সমরে দুর্জয় হলেও সে এখন অমর নয়।

আশ্চর্য চরিত্র এই কর্ণ।

কর্ণের জীবন একদিকে স্বর্গ থেকে যেমন আহরণ করেছে যত মহত্ত্ব বীরত্ব শ্রেষ্ঠ গুণবৈভব, অন্যদিকে আবার অন্ধকার নরক থেকে তুলে এনেছে যত নীচতা আর ক্রূর হিংসার বিষাক্ত নিঃশ্বাস। তার অন্তরখানির একপিঠে আলো আর-এক পিঠে অন্ধকার। সৌন্দর্য-কলঙ্ক-মাখা এক পাণ্ডুর সুষমা। এমন পৌরুষদীপ্ত দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত বীর মহাভারতে আর দ্বিতীয় নেই। দৈব ও পুরুষকার, আশীর্বাদ ও অভিশাপ, দয়ার্দ্র হৃদয়ের সঙ্গে তীক্ষ্ণকঠোর জিহ্বা, ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে সর্বনাশী অজ্ঞানতা, ধার্মিক হয়েও অধর্মের চির-সহচর, দেবতার ঔরসে উচ্চকুলে জন্মেও হীনকুলোদ্ভব বলে ধিকৃত, মাতা থাকতে মাতৃহীন, সব থেকেও যে কিছুই পেল না, এমন সাফল্যময় নিষ্ফল জীবন মহাভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

সম্পর্কে কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ভাই। পাণ্ডবদের সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শৌর্যে বীর্যে সে অর্জুনের তুল্য। অর্জুনের যেমন গাণ্ডীব, কর্ণের তেমনি বিজয় ধনু। তার রূপেরও তুলনা নেই। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত দীর্ঘ নয়ন, কমলদলের মত উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, সুন্দর ললাট, সুন্দর কেশ, সূর্যসম তেজস্বী, দিব্যকুণ্ডলভূষিত সিংহলোচন বৃষস্কন্ধ কর্ণ—

> স্বাগাদিত্যবর্চসম। দিব্যবর্মসমাযুক্তং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্।
> পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাম্রদলোজ্জ্বলম্॥
> সুললাটং সুকেশান্তং...
> হর্যক্ষং বৃষভস্কন্ধং যথাস্য পিতরং তথা।

(বনপর্ব, ৩০৮/৫, ১৮-১৯)

কর্ণের দীপ্ত গমনভঙ্গীর তুলনা দিতে কবি বলেছেন, হিমালয়ের অরণ্য থেকে নির্গত কেশরীদের মধ্যে সে যেন সিংহ—"হিমবদ্বনসম্ভূতং সিংহং কেশরিণং"।

যে সৌভাগ্য নিয়ে কর্ণ জন্মেছিল যদি তেমনি স্বাভাবিকভাবেই সে লালিত হ'ত তাহলে তার জীবন এমন এক বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হ'ত না। তাহলে মহাভারতের ইতিহাসও হ'ত অন্যরূপ।

কিন্তু সেদিন রাত্রির অন্ধকারে অশ্বনদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল এই সূর্যকান্ত নবজাত দেবশিশুকে। কেউ জানল না। কেউ দেখল না। দিনমণি গেল অস্তাচলে। নদীর কূলে দাঁড়িয়ে রাজবাড়ীর এক ধাত্রী আর আকুল ক্রন্দনে উদ্বেল অশ্রু নিয়ে দাঁড়িয়ে বালিকা মাতা কুন্তী। অসহায় শিশু অন্ধকারে নদীর জলে ভেসে গেল নামহীন পরিচয়হীন এক অনিশ্চিত ভবিতব্যের দিকে। সেই দিন থেকে কর্ণের জীবনের পিছনে রইল শুধু গোপন লজ্জার এক অশ্রুলেখা।

মায়ের ক্রন্দন মায়ের স্নেহ যে কি মর্মান্তিকভাবে করুণ তা অনাড়ম্বরে নিখুঁত নিপুণ হাতে এঁকেছেন বেদব্যাস। তাঁর লেখনী টলেনি, তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি। যে-পেটিকা করে সদ্যজাত ভ্রূণকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, কবি শুধু সেই মঞ্জুষার বর্ণনা দিচ্ছেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। শিশুটিকে দেখাচ্ছেন না, মায়ের মুখখানিও দেখাচ্ছেন না, অন্ধকার অশ্বনদীর অকূলজলকল্লোল শোনাচ্ছেন না। আমরা দেখছি শুধু সেই নিষ্ঠুর পেটিকা। শুনছি সেই অভিশপ্ত মঞ্জুষা কেমন করে তৈরী হল তার বিশদ বর্ণনা : সেই পেটিকার মধ্যে সুন্দর শয্যা বিছিয়ে দিলেন কুন্তী। তারপর চারিদিকে মোম মাখিয়ে দিলেন যাতে জল প্রবেশ করতে না পারে। এই ভাবে পেটিকাটি যখন সর্বাঙ্গসুন্দর সুখপ্রদ হল তখন তার মধ্যে শিশুটিকে শুইয়ে দিলেন। তখন ধাত্রী শিশুটিকে অশ্বনদীতে ভাসিয়ে দিল—

> মঞ্জুষায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ ॥৬
> মধূচ্ছিষ্টস্থিতায়াং সা সুখায়াং রুদতী তথা।
> শ্লক্ষ্ণায়াং সুপিধানায়ামশ্বনদ্যামবাসৃজৎ ॥৭
>
> (বনপর্ব, ৩০৮ অধ্যায়)

অশ্বনদীতে অন্ধকারে ভাসতে-ভাসতে চলল সেই পেটিকা। অনেক দূরে গিয়ে শেষে স্রোতের টানে এসে পড়ল চর্মন্বতী নদীতে। সেখান থেকে আবার ভাসতে-ভাসতে যমুনার জলে। যমুনা থেকে গঙ্গায়। তরঙ্গে-তরঙ্গে দুলতে-দুলতে শেষে এসে ভিড়ল গঙ্গার কূলে চম্পাপুরীর ঘাটে।

চম্পাপুরীতে ছিল হস্তিনাপুরের কয়েক ঘর সূতের বাস। ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু অধিরথ নামে এক সূত এবং তাঁর সন্তানহীনা পত্নী রাধা তখন ঘাটে স্নান

কুন্তী নিতান্ত বালিকা। শুদ্ধচারিণী ব্রাহ্মণসেবিকা। দুর্বাসা তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে এক সিদ্ধমন্ত্র দিয়ে বলেছিলেন, তুমি ইচ্ছা করা মাত্র এই মন্ত্রবলে আহূত যে কোন দেবতা এসে তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন।...

একদিন কুন্তী রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে। প্রভাতসূর্যের নির্মল আলো এসে পড়েছে তার সুন্দর মুখে। চোখে তার ঘুম-জড়ানো স্বপ্নের আবেশ। প্রভাতসূর্যের উদীয়মান জ্যোতির দিকে তাকিয়ে কুন্তী। সূর্যকিরণ তার দৃষ্টিকে তাপিত করল না। কেমন এক মোহময় মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিল। কুন্তীর মনে পড়ল তখন দুর্বাসার সিদ্ধমন্ত্রের কথা। ঋষির মন্ত্রশক্তি যথার্থ তো? সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কুন্তীর দিব্যদৃষ্টি লাভ হল। সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দিব্য কবচ-কুণ্ডল শোভিত এক মোহন পুরুষকে দেখতে পেলেন। আর তখনই বালিকা কুন্তী হল রজস্বলা—"ব্রীড়িতা সাভবদ্ বালা কন্যাভাবে রজস্বলা (বনপর্ব, ৩০৬/৩)। বালিকা জীবনের প্রথম রজঃদর্শন। তার শিরায়-শিরায় যৌবনের প্রথম পদসঞ্চার। বিস্ময় আনন্দ আর লজ্জা একসঙ্গে তাকে বিহ্বল করে দিল।

সূর্যের প্রভাবে কুন্তী দিব্যদৃষ্টি লাভ না করলে সূর্যমণ্ডলে ওই মোহন পুরুষকে সে দর্শন করত না। আর ঠিক তখনই তার বালিকা তনুতে রজঃসঞ্চার না হলে অমন বিহ্বলতাও আসত না। কুন্তী কৌতূহলের বশে, কিছুটা-বা মোহে মন্ত্রবলে সূর্যদেবকে স্মরণ করল। সূর্যদেব তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তৎক্ষণাৎ তার সামনে উপস্থিত। তাঁর অঙ্গের কান্তি মধুর ন্যায় উজ্জ্বল। পিঙ্গল বর্ণ। দীর্ঘ বাহু। শঙ্খের মত গ্রীবা। সুন্দর বাহুতে তাঁর অঙ্গদ। মস্তকে মুকুট। অধরে মধুর হাস্য। দিক্ সমূহ আলোকিত করে বিরাজমান সেই দিব্যপুরুষ—

> মধুপিঙ্গো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো হসন্নিব।
> অঙ্গদী বদ্ধমুকুটো দিশঃ প্রজ্বালয়ন্নিব ॥ ৯
>
> (বনপর্ব, ৩০৬ অধ্যায়)

কুমারী কুন্তী হঠাৎ সম্মুখে এই দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখে ভীত হল। বলল, "ভগবন্, আমি নিতান্ত কৌতূহলের বশেই আপনাকে আহ্বান করেছিলাম। আপনি দয়া করে ফিরে যান।"

সূর্য বললেন, "সুন্দরী, তা হয় না। তোমার মন যে চেয়েছে সূর্যদেবের মত কবচকুণ্ডলধারী অতুলনীয় বীর্যবান্ এক পুত্র।"

কুন্তী তবুও বলে, "দয়া করে আপনি চলে যান।"

সূর্য তখন ভয় দেখালেন, "যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমার মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ এবং পিতা উভয়কেই অভিশাপে দগ্ধ করব।"

কুন্তী ভীত হল।

সূর্যদেব যেমন ভয় দেখাচ্ছেন তেমনি আবার মধুর বচনে অনুনয়ও করছেন। এই ভয় আর অনুনয়ের মাঝখানে হেমন্তের বিশীর্ণ পাতার মত কুন্তী কাঁপছে।

আর সেই অনুনয়ের কি ঘটা! কুমারীর চিত্তহরণকারী যত মধুর সম্ভাষণ আছে সবই সূর্যদেব বলে চলেছেন প্রণয়ে আশ্বাসে অনুনয়ে দীর্ঘ একটা অধ্যায় জুড়ে। কুন্তীকে গাঢ় কণ্ঠে ডাকছেন, সুস্মিতে, তনুমধ্যমে, সুভগে, শুভে, অনবদ্যাঙ্গি, ভীরুভাবিনি, সুন্দরি, বরবর্ণিনি, সুশ্রোণি, ইত্যাদি আরো কতভাবে। বলছেন, "তুমি নিতান্ত বালিকা বলেই তোমাকে এত অনুনয় করছি—বালেতি কৃত্বানুনয়ং।" কুন্তীর বাস্তবিকই কোন উপায় নেই। সূর্যদেব বললেন, "অন্য কোন স্ত্রীলোক হলে এই অনুনয়ের অবসর পেত না—নান্যানুনয়ং লভেত।"

তারপর মোহাবিষ্ট লজ্জিত কুন্তী একসময় ছিন্ন লতার মত তার পুণ্যশয্যার উপরে পতিত হল—"তস্মিন্ পুণ্যে শয়নীয়ে পপাত মোহাবিষ্টা ভজ্যমানা লতেব" (বনপর্ব, ৩০৭/২৭)। আর সূর্যদেব নিজ তেজে মোহিত করে কুন্তীর নাভি স্পর্শ করে যোগবলে গর্ভসঞ্চার করলেন।

এর মধ্যে কুন্তীর পাপ কোথায় ? বেদব্যাস নিজেও এর মধ্যে কোন পাপ বা গ্লানি দেখেননি। দেখলে তিনি কুমারীর গর্ভসঞ্চারের সেই শয্যাকে "পুণ্যে শয়নীয়ে" বলতেন না। রাজকন্যার শয্যার অনেক বিশেষণ থাকতে তিনি ভেবেচিন্তে এই "পুণ্যশয্যা" কথাটা ব্যবহার করতেন না। পরে সেকথা বেদব্যাস অত্যন্ত স্পষ্ট করেই কুন্তীকে বলেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে, কুন্তী যখন বেদব্যাসের আশ্রমে, সেই আশ্রমবাসিকপর্বে, একদিন কুন্তী তার অতীত জীবনের এই মর্মান্তিক কাহিনী জানিয়ে বললেন, "সারা জীবন আমি এই অন্তর্দাহ নীরবে বহন করছি।"

কুন্তীর কথা শুনে বেদব্যাস বললেন, "এতে তোমার কোন অপরাধ হয়নি। দেবগণ অণিমাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন, তাঁরা অন্যের শরীরে প্রবিষ্ট হতে পারেন। দেবতারা সঙ্কল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও সমাগম এই পাঁচ প্রকারে পুত্র উৎপন্ন করে থাকেন। কুন্তী, দেবধর্ম দ্বারা মনুষ্যধর্ম দূষিত হয় না, একথা তুমি জেন। তোমার মানসিক চিন্তা দূর হোক"—

অপরাধশ্চ তে নাস্তি কন্যাভাবং গতা হ্যসি।
দেবাশ্চৈশ্বর্যবন্তো বৈ শরীরাণ্যাবিশন্তি বৈ ॥২১

সন্তি দেবনিকায়াশ্চ সংকল্পাজ্জনয়ন্তি যে।
বাচা দৃষ্টা তথা স্পর্শাৎ সংঘর্ষেণেতি পঞ্চধা ॥২২
মনুষ্যধর্মো দৈবেন ধর্মেণ হি ন দুষ্যতি।
ইতি কুন্তী বিজানীহি ব্যেতু তে মনসো জ্বরঃ ॥২৩
(আশ্রমবাসিকপর্ব, ৩০ অধ্যায়)

বেদব্যাস আরো বললেন, "তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা এমন হবার ছিল বলেই হয়েছে—সর্বমিদং ভাব্যমেবমেতদ্।"

কর্ণের জন্মের মধ্যে কোন পাপ না থাক, কিন্তু তার জীবনে কি এক দুর্দৈব দুর্ভাগ্য ছায়ার মতই অনুসরণ করছে। বিধাতা তাকে অনেক দিয়েছেন, দিয়েছেন রূপ কান্তি শৌর্য বীর্য সাহস বীরত্ব ত্যাগ বৈরাগ্য; কিন্তু তারই সঙ্গে কি যেন একটু অনুপান ঢেলে দিয়েছেন, তাতে সর্বকিছু কেমন কটু কর্কশ হয়ে উঠেছে। বীরত্বের তলায়-তলায় এসে মিশেছে দম্ভ আত্মাভিমান, সহৃদয়তার সঙ্গে কোথা থেকে এসেছে কিছু নিষ্ঠুরতা। সত্যবাদী গুরুভক্ত কর্ণকে কেমন করে যেন কীটের মত এসে দংশন করেছে নিদারুণ এক মিথ্যা।

দ্রোণ কৃপের কাছে অস্ত্রশিক্ষার পর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র লাভের জন্য গেল দ্রোণের গুরু পরশুরামের কাছে। ব্রাহ্মণ বিপ্লবের একদা নায়কশ্রেষ্ঠ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছাড়া কাওকে অস্ত্রশিক্ষা দেন না। তাই কর্ণ নিজেকে ব্রাহ্মণকুমার পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল। কিন্তু মিথ্যা দিয়ে তো বিদ্যালাভ হয় না।

একদিন নিদ্রিত গুরুর মস্তক অঙ্কে ধারণ করে কর্ণ বসে আছে, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা বিফল করার জন্য, এক কীটের রূপ ধারণ করে তার জানুতে দংশন করলেন। কর্ণের জানু থেকে রক্তধারা বইতে লাগল। পাছে গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে কর্ণ সেই তীব্র দংশন-জ্বালা আর রক্তপাত নীরবে সহ্য করতে লাগল।

পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হল।

তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে তুমি জাগাওনি কেন?"

—"আপনার নিদ্রার বিঘ্ন হবে বলে জাগাইনি।"

শুনে পরশুরাম বললেন, "এতখানি ধৈর্য সহিষ্ণুতা তো ব্রাহ্মণের থাকে না। তুমি ব্রাহ্মণকুমার নও। কে তুমি, সত্য করে বল?—ন ত্বং বিপ্রঃ কোঽসি সত্যং বদেতি।"

নতমুখে কর্ণ বলল, "ভগবন্, আমি কর্ণ, সূতপুত্র রাধার নন্দন। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

জ্বলন্ত অগ্নির মত পরশুরাম তখন অভিশাপ দিলেন, "যে ব্রহ্মাস্ত্র তুমি আমার থেকে লাভ করেছ তা তোমার বিফল হবে। কার্যকালে এই বিদ্যা তুমি বিস্মৃত হবে। ন কর্মকালে প্রতিভাস্যতি ত্বাম।" (কর্ণপর্ব, ৪২ অধ্যায়)

শিরে বজ্রাঘাতের মত পতিত হল গুরুর অভিশাপ। কর্ণের জীবনে এই শেষ নয়, আরো আছে।

একসময় বিজয় নামে কোন এক ব্রাহ্মণের আশ্রমের নিকট কর্ণ অস্ত্র অভ্যাস করছিল। হঠাৎ অসাবধানে তার হাতের নিক্ষিপ্ত বাণ ব্রাহ্মণের একটি হোমধেনুকে বধ করে।

তখন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ণকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "আমার হোমধেনুকে তুমি বধ করেছ। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার জীবনের শেষে ঘোর যুদ্ধে মেদিনী তোমার রথচক্র গ্রাস করবে।—শ্বভ্রে তে পততাং চক্রমিতি মাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীত।" (কর্ণপর্ব, ৪২ অধ্যায়)

তবুও ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণ ছিল সংগ্রামে অজেয়। তার ছিল সূর্যপ্রদত্ত কবচ-কুণ্ডল। যতদিন সে ওই দৈব কুণ্ডলে ভূষিত থাকবে ততদিন সে যুদ্ধে অবধ্য। গুরু ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ মাথায় নিয়েও কর্ণ অপরাজেয়।

তাই আবার এলেন অর্জুনহিতৈষী অর্জুনের পিতা ইন্দ্র, এবার আর কীট হয়ে দংশন করতে নয়, ব্রাহ্মণ হয়ে ভিক্ষা নিতে। ভিক্ষার ছলে কর্ণের জীবনের শেষ রক্ষাকবচটি হরণ করতে। কর্ণ তা জানে।

আগের দিন রাত্রে সূর্যদেব স্বপ্নে তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, "তুমি যদি তোমার সহজাত কবচ-কুণ্ডল ইন্দ্রকে দান কর তাহলে জানবে তোমার আয়ু শেষ হয়েছে। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে।"

> যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে।
> আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি ॥১৮
> (বনপর্ব, ৩০০ অধ্যায়)

কর্ণ বলল, "দেব, আপনি আমাকে নিবারণ করবেন না। আমাকে ব্রতভঙ্গ করতে বলবেন না। ন নিবার্যো ব্রতাদস্মাৎ।"

কর্ণ দাতা। বিশেষত কোন ব্রাহ্মণ প্রার্থী হয়ে এলে কর্ণ নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে দ্বিধা করে না। কর্ণের সেই দানব্রত ত্রিলোকবিশ্রুত।

স্মিত হেসে কর্ণ ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে বলল, "দেবদেবেশ, আমি আগেই জানতাম আপনি আমার কাছে এসে এই ভিক্ষা চাইবেন। কিন্তু আপনাকে আমি নিরাশ করব না।"

ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের হাতে কর্ণ তার অঙ্গ থেকে কুণ্ডল মোচন করে সেই রক্তাক্ত কুণ্ডল অম্লানবদনে ইন্দ্রের হাতে তুলে দিল। তখন অন্তরীক্ষে দেবতা গন্ধর্ব দানব সিংহনাদ করতে লাগল। স্বর্গে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল। দেবতারা কর্ণের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

কর্ণের কবচকুণ্ডলের বিনিময়ে ইন্দ্র দিলেন এক অমোঘা শক্তি। বললেন, "যখন তোমার কাছে আর কোন দিব্যাস্ত্র অবশিষ্ট থাকবে না, যখন তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত হবে, কেবল তখনই, মাত্র একবার, তুমি এই ঐন্দ্রীশক্তি নিক্ষেপ করতে পারবে। তোমার শত্রুকে বিনাশ করে এই অস্ত্র আবার আমার কাছেই ফিরে আসবে।" ইন্দ্র যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "কিন্তু তুমি যে শত্রুর কথা ভেবে এই অস্ত্র গ্রহণ করছ তাকে কিন্তু বধ করতে পারবে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাকে রক্ষা করছেন—তেন কৃষ্ণেণ রক্ষতে।"

শুনে কর্ণ নির্বিকার। সে নির্ভয়। বস্তুত ভয় কি জীবনে কর্ণ তা জানে না। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে শল্যকে বলেছিল, "ভয়ে ভীত হবার জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিনি। আমার জন্ম পরাক্রম প্রদর্শনের জন্য, যশ বিস্তারের জন্য—

> ন হি কর্ণঃ সমুদ্ভূতো ভয়ার্থমিহ মদ্রক!
> বিক্রমার্থমহং জাতো যশোঽর্থঞ্চ তথাত্মনঃ ॥৬
>
> (কর্ণপর্ব, ৪৩ অধ্যায়)

দৈব বিরূপ, ভাগ্য বিরূপ, এমনকি তার নিজের বিবেকও তার প্রতি বিরূপ, তবুও আপন পৌরুষ আর পরাক্রম নিয়ে কর্ণ আজীবন যুদ্ধ করেছে শত্রুর সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে নিজের সঙ্গেও।

আপন বাহুবলে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেছে কর্ণ। তার সেই দিগ্‌বিজয়ের তুলনা কেবল অর্জুনের বীরত্বের সঙ্গেই। প্রথমে কর্ণ পরাজিত করল পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদকে, উত্তর ভারতের রাজা ভগদত্তকে, তারপরে তার অভিযান চলল ভারতের উত্তরে নেপাল পর্যন্ত।

পূর্বদিকে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ শুণ্ডিক মিথিলা মগধ কর্কখণ্ড,—আরো দূরে আবশীর যোধ্য ও অহিক্ষত্র দেশ।

দক্ষিণ-ভারতে পরাজিত হলেন ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী, কেরল রাজ্যের রাজা নীল। ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, ম্লেচ্ছ, যবন ও শশব, প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিমণ্ডলী। কেউই কর্ণের পরাক্রমের কাছে দাঁড়াতে পারল না।

অবন্তী-দেশের রাজা ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সঙ্গে সামনীতি সন্ধিতে মিলিত হয়ে কর্ণ জয় করল সমগ্র পশ্চিম-ভারত।

দিগ্‌বিজয় করে কর্ণ ফিরে এল হস্তিনাপুরে।

দুর্যোধন বিজয়-তোরণ নির্মাণ করে কর্ণকে অভ্যর্থনা করল।

কিন্তু চির অবজ্ঞাত স্নেহবঞ্চিত কর্ণের এই দিগ্‌বিজয় তার নিজের জন্য নয়। আসমুদ্র ভারতের রাজমুকুট সে হাসতে-হাসতে তুলে দিল বন্ধু দুর্যোধনকে। সেই দুর্যোধন, হোক সে পাপমতি, কুচক্রী, অধার্মিক, তবু সে তার বন্ধু। কেননা ভাগ্য যখন তার জন্ম নিয়ে উপহাস করেছে, হীন কুলে জন্ম বলে সবাই যখন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন দুরাচারী দুর্যোধনই তাকে বন্ধু বলে হাত ধরেছে, রাজ্য দিয়ে রাজা বলে তাকে সম্বোধন করেছে। তাই চিরকৃতজ্ঞ কর্ণ আজীবন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুর্যোধনের সঙ্গে।...

পাণ্ডবদের দূত হয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গিয়েছিলেন হস্তিনাপুরে দুপক্ষের বিরোধ মিটিয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য। কিন্তু তাঁর সকল প্রয়াস ব্যর্থ হল। ফিরে যাবার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথে তুলে নিলেন কর্ণকে। বললেন, "বসুষেণ, চল আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।"

পথে যেতে-যেতে তাঁর সঙ্গে কথা হল। (উদ্যোগপর্ব, ১৪০ অধ্যায়).

সেদিন শ্রীকৃষ্ণের মুখে কর্ণ জানল তার সত্য পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "তুমি আজ আমার সঙ্গে চল। পাণ্ডবেরা জানুন তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। কুন্তী ও মিত্রগণ আনন্দিত হন। পাণ্ডবভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ হোক। যুধিষ্ঠির তোমাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে শ্বেত চামর ব্যজন করবেন। ভীম ধরবেন রাজচ্ছত্র। অর্জুন হবেন তোমার রথের সারথি। পঞ্চপাণ্ডব হবেন তোমার আজ্ঞাবহ সেবক। এবং দ্রৌপদী করবেন তোমার চরণ বন্দনা। ভারতের সমস্ত রাজা, রাজকুমার, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধাগণ তোমারই চরণে মস্তক নত করবেন। পুরোহিত ধৌম্য করবেন তোমার রাজ্যাভিষেক। সূত মাগধ বন্দীগণ করবে স্তুতি ও যশোগান। পাণ্ডবেরা মহারাজ বসুষেণ কর্ণের বিজয় ঘোষণা করবেন।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে কর্ণ বিষণ্ণ বদনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মধুসূদন, তুমি যা বললে তা আমি জানি। আমার মঙ্গলের জন্য একথা বলছ তাও জানি। কিন্তু কৃষ্ণ, আমি কেমন করে ভুলব, অধিরথ সূত আমাকে পরম স্নেহে লালন করেছেন। তাঁর পত্নী রাধার স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছে আমারই জন্য। তাঁরা যে আমাকে পুত্র বলে মনে করেন। আমিও যে তাঁদের পিতা-মাতা বলেই মনে করি। তাঁদেরই আশ্রয়ে আমি যৌবনে বিবাহ

করেছি। পত্নীদের সঙ্গেও আমার প্রেমের বন্ধন আছে। আমার পুত্রপৌত্রও হয়েছে। সেই সব সম্পর্ক আমি কেমন করে মিথ্যা বলে চলে যাব? সমস্ত পৃথিবী এবং অতুলনীয় সুখ ঐশ্বর্যের বিনিময়েও আমি তা পারব না। তাছাড়া দুর্যোধন আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, বন্ধু বলে ভালবেসেছে। আমারই উপরে ভরসা করে সে আজ যুদ্ধের উদ্‌যোগ করছে। কোন্‌ লোভে কিসের ভয়ে আমি তার সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করব?

"হে গোবিন্দ, তোমাকে আমি একটা অনুরোধ করি। তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপন রেখ। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যদি জানতে পারেন যে আমি কুন্তীর প্রথম পুত্র, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তবে আর তিনি রাজ্য গ্রহণ করবেন না। স্বয়ং হৃষীকেশ তাঁর নেতা, অর্জুন তাঁর যোদ্ধা, তাই আমি বলি, যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করুন। কেশব, সেই হবে ভাল। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যে কি ঘটবে তা তুমি সব জান। বৃথা কেন আমাকে ভোলাতে চাইছ? আর কি তোমাকে দেখতে পাব? অথবা স্বর্গেই কি আমাদের মিলন হবে? আমি তাহলে যাই?"

এই বলে কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দীন মনে প্রস্থান করলেন।

কর্ণ চলে যাচ্ছে। তার প্রস্থানপথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর সারথিকে বললেন, "দারুক, শীঘ্র চল।"

[তের]

এ পরবাসে—

দুর্গম পর্বত। চারিদিকে ঘন অরণ্য। তখনও রাত ভোর হয়নি। আকাশে শুকতারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। সেই অন্ধকার অরণ্যপথে যমুনা নদীর দক্ষিণ তীর ধরে পাণ্ডবেরা এগিয়ে চলেছেন শঙ্কিত মনে ত্বরিত চরণে।

আজ থেকে তাঁদের অজ্ঞাতবাস শুরু। যদি তাঁদের কেউ চিনে ফেলে তাহলে আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস। তখন হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়া আকাশ কুসুমের মত আকাশেই মিলিয়ে যাবে।

পাণ্ডবেরা পথশ্রমে ক্লান্ত। সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন। জীর্ণ বাস। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। হস্তে ধনু। কটিদেশে খড়্গ। তাঁদের দেখে পথচারীরা অবাক হয়। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা ব্যাধ, বনবাসী শিকারী।

পর্বতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে যমুনার তীর ধরে অরণ্য পথে পদব্রজে চলেছেন তাঁরা। ক্রমে চম্বল ও বেতোয়া নদীর মধ্যে, দশার্ণ দেশের উত্তরে, গঙ্গা যমুনার অন্তর্গত পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ দিক দিয়ে তাঁরা হেঁটে চলেছেন। কিছুদূরে মথুরা। তার পাশে যকৃল্লোম ও শূরসেন প্রদেশ।

পাণ্ডবেরা উন্মনা হন। ওই তো অদূরে মথুরা। সখা শ্রীকৃষ্ণ যাদব বৃষ্ণিগণের দেশ। কিন্তু না, পরিচয় দেওয়া চলবে না। তাঁরা স্থির করেছেন এই অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর দক্ষিণে মৎস্য দেশেই কাটাবেন।

পথ আর যেন শেষ হয় না।···

দ্বিপ্রহরে পথশ্রমে আর চলতে পারছেন না। মৎস্য রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু রাজধানী অনেক দূর। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের আলপথ দিয়ে তাঁরা হাঁটছেন। চারিদিকে রৌদ্রোজ্জ্বল সবুজ ধানের ক্ষেত। কাঁচা-সোনার রঙ নিয়ে হাওয়ায় দুলছে যেন মায়ের আঁচল। মাঠ পেরিয়ে একটি গ্রামের কাছে এসে ক্লান্ত দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "দেখুন, চারিদিকে কতরকম শস্যক্ষেত্র, পায়ে-হাঁটা সরু আলপথ। মনে হয় বিরাট

রাজার রাজধানী এখনও অনেক দূর। বরং এখানেই আমরা এক রাত্রি বাস করি। আমি আর চলতে পারছি না।"

পশৌকপদ্যো দৃশ্যন্তে ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ।
ব্যক্তং দূরে বিরাটস্য রাজধানী ভবিষ্যতি।
বসামেহাপরাং রাত্রিং বলবান্ মে পরিশ্রমঃ॥৬
(বিরাটপর্ব, পঞ্চম অধ্যায়)

যুধিষ্ঠির বললেন, "আমরা এখন বনপথ ছেড়ে লোকালয়ে এসে পড়েছি। আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত হবে না। অর্জুন, তুমি যাজ্ঞসেনীকে বহন করে নিয়ে চল। রাজধানীতে পৌঁছে তবে আমরা বিশ্রাম করব।"

তাঁরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছেন।

লোকালয় ছাড়িয়ে ক্রমে এলেন বনের মধ্যে এক নির্জন শ্মশানে। শ্মশানের ধারে একটা উঁচু টিলা। টিলার উপরে কাঁটাবন ঝোঁপ জঙ্গলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিরাট এক শমীবৃক্ষ। ঘন শাখাপল্লব ছড়িয়ে মূর্তিমান অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে। বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়ের কোন চিহ্ন নেই। নির্জন শ্মশানের হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ভয়ানক অরণ্যপথে লোকজনও চলা ফেরা করে না।

সেদিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, "আমরা যদি সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ করি তবে লোকে উদ্‌বিগ্ন হবে। অর্জুনের বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু অনেকেই জানে, তা দেখে আমাদের চিনে ফেলবে।"

অর্জুন বললেন, "শ্মশানের ধারে ওই বৃহৎ শমীবৃক্ষ রয়েছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ওই গাছে বেঁধে রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না।"

তখন পাণ্ডবগণ তাঁদের ধনু থেকে জ্যা মুক্ত করে ধনু খড়্গ তূণ ক্ষুরধার বাণগুলি একসাথে বেঁধে ফেললেন। নকুল সেই শমীবৃক্ষে উঠে একটি দৃঢ়শাখায় সেগুলি এমন করে বেঁধে রাখলেন যাতে বৃষ্টির জল না লাগে। সহজে লোকের চোখে না পড়ে। তারপর তিনি একটি গলিত মৃতদেহ সেই গাছে বেঁধে রাখলেন, লোকে যাতে ভয়ে পূতিগন্ধে না আসে।

একদল রাখাল অদূরে গরু মোষ চরাচ্ছিল, তারা দেখতে পেলে পাণ্ডবেরা বললেন, "এই মৃতদেহ আমাদের মায়ের। তাঁর বয়স প্রায় একশ বছর হয়েছিল। মৃতদেহ দাহ না করে গাছে বেঁধে রাখাই আমাদের বংশের প্রথা।"

তারপর যেতে-যেতে তাঁরা রাজধানীর উপকণ্ঠে এসে পড়লেন। নিজেদের মধ্যে তাঁরা পাঁচটি গুপ্ত নাম রাখলেন : জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন ও জয়দ্বল। দরকার হলে এই নামে তাঁরা পরস্পর সংবাদ আদান-প্রদান করবেন।

পাণ্ডবেরা নদীতে স্নান তর্পণ করলেন। যুধিষ্ঠির অগ্নি অর্চনা করে মাঙ্গলিক মন্ত্র জপ করতে-করতে পূর্বাস্য হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে মনে-মনে ধর্মকে স্মরণ করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির উষ্ণীষ, কমণ্ডলু, ত্রিদণ্ডধারী হয়ে,মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত বসন পরে ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করলেন। বৈদূর্যখচিত স্বর্ণময় পাশক, শারিফলক বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে, মেঘাবৃত সূর্যের মত, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত, প্রথমে রাজসভায় রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির।

—"মহারাজ, আমি বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আমার সর্বস্ব বিনষ্ট হয়েছে। জীবিকার জন্য তাই আপনার কাছে এসেছি। পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমি দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ। আমার নাম কঙ্ক।"

বিরাট রাজা বললেন, "আপনাকে দেখে দীন ব্রাহ্মণ বলে মনে হয় না। আপনি দেবকল্প। আপনি রাজ্য লাভের যোগ্য। এই মৎস্যদেশ আপনি শাসন করুন। দ্যূতকারগণ আমার প্রিয়। আপনাকে লাভ করে আমি প্রীত হয়েছি। আজ থেকে আপনি আমারও সখা।"

মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় যুধিষ্ঠির তখন বললেন, "রাজা, আপনি এই বর দিন যেন দ্যূতক্রীড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে আমার বিবাদ না হয়।"

—"তাই হবে, কঙ্ক। রাজভবনের সকল দ্বার আজ থেকে তোমার জন্য উন্মুক্ত। আতুর অর্থার্থী যে কোন প্রজা এসে তোমার কাছে যা চাইবে আমি তাই দান করব। সমবেত প্রজাবৃন্দ, শোন, এই ব্রাহ্মণ কঙ্ক আমার সখা, এই রাজ্যের প্রভু। একই রথে আমরা ভ্রমণ করব।"

কিছুক্ষণ পরে রাজসভায় এলেন আর-একজন আগন্তুক। বলবান্ সিংহবিক্রম উজ্জ্বলকান্তি। পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র, হাতে হাতা-খুন্তি, কটিবন্ধে ঝক্‌ঝকে একটি কালো ছুরি।

রাজার সম্মুখে এসে বিনীতভাবে বললেন, "মহারাজ, আমি পাচক। আমার নাম বল্লব। পূর্বে আমি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সূপকার ছিলাম। আমি উত্তম রন্ধন করতে পারি। আমি মল্লযুদ্ধেও পটু। আমাকে কর্মে নিযুক্ত করুন।"

রাজা বললেন, "বল্লব, তোমাকে পাচক বলে বিশ্বাস হয় না। তোমার রূপ আকৃতি বিক্রম দেখে সর্বজনমান্য কোন ব্যক্তি বলে মনে হয়। যাইহোক, তুমি যখন বলছ, তখন তোমাকে আমার পাচকশালায় প্রধান করে নিযুক্ত করলাম।"

এদিকে প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজমহিষী কেকয়-নন্দিনী সুদেষ্ণা হঠাৎ দেখতে পেলেন রাজপথে এক নারীকে। পরনে একখানি মলিন বস

মাথায় কুঞ্চিত কেশপাশ ডানপাশে চূড়া করে বস্ত্রাবৃত করে বাঁধা। কৃষ্ণনয়না সেই নারী দুখিনীর মত পথে বিচরণ করছেন।

রাজমহিষী তাঁকে ডেকে আনালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, "ভদ্রে, তুমি কে? কি চাও?"

—"রাজ্ঞী, আমি সৈরন্ধ্রী। ভাগ্যক্রমে এখানে এসে পড়েছি। যিনি আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁরই কর্ম করব।"

রাণী বললেন, "এত রূপ তোমার! তোমাকে তো সামান্যা দাসী বলে মানায় না। সুদর্শনা, তুমি যক্ষী, দেবী, গন্ধর্বী না অপ্সরা? তুমি পুণ্ডরিকা, মালিনী, না ইন্দ্রাণী?"

—"রাজ্ঞী, আমি সৈরন্ধ্রী। পূর্বে আমি কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা ও পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর সেবিকা ছিলাম। দ্রৌপদী আমাকে আদর করে নাম দিয়েছিলেন মালিনী। আমি কেশবিন্যাস করে দিতে জানি। অঙ্গরাগ পেষণ করতে পারি। বিচিত্র ফুলের মালা রচনা করি।"

সুদেষ্ণা বললেন, "রাজা যদি তোমার ওই রূপে লুব্ধ না হন তাহলে তোমাকে মাথায় করে রাখব। দেখ, রাজবাড়ীর বৃক্ষগুলিও যেন মুগ্ধ হয়ে তোমাকে প্রণাম করছে। রাজভবনের সকল নারী বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে তোমাকে নিরীক্ষণ করছে। তাই আশঙ্কা হয়, কোন্ পুরুষ না তোমাকে দেখে মোহিত হবে? তুমি তোমার ওই তরলায়িত লোচনে যার দিকে তাকাবে সেই তোমার বশীভূত হবে।"

—"রাজ্ঞী, সে আশঙ্কা নেই। বিরাট রাজা বা অন্য কেউই আমাকে পাবে না। কেননা, মহাবলশালী পাঁচ জন গন্ধর্ব আমার স্বামী। তাঁরা সর্বক্ষণ অলক্ষ্যে থেকে আমাকে রক্ষা করছেন। কোন পুরুষ সাধারণ রমণীর মত যদি আমাকে অভিলাষ করে তাহলে সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হবে। আমি এক কঠোর ব্রত পালন করছি, এ সময়ে যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দেবেন না, কারো পাদপ্রক্ষালন করাবেন না, তাঁর প্রতি আমার গন্ধর্ব পতিরা তুষ্ট হবেন।"

সুদেষ্ণা বললেন, "বেশ, তুমি যেমন চাও তাই হবে। কারো উচ্ছিষ্ট বা চরণ তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না।"

সৈরন্ধ্রী তখন রাজ অন্তঃপুরে থেকে গেলেন।…

এবার রাজা বিরাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন আর-এক জন। বেশভূষা কথাবার্তায় ঠিক যেন একজন গ্রাম্য গোপ। লোকটি আগ্রহের সঙ্গে রাজার গোশালাটি দেখছে। তার হাবভাব রাজার কৌতূহল উদ্রেক করল। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন।

—"তুমি কে ? কোথা থেকে আসছ ? কি চাও ?"

গ্রাম্য গোপভাষায় লোকটি উত্তর দিল, তার কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর, "আমি জাতিতে বৈশ্য। আমার নাম অরিষ্টনেমি। পূর্বে আমি পাণ্ডবদের গোরক্ষক ছিলাম। লোকে আমাকে তন্তিপাল বলে জানে। এখন পাণ্ডবেরা কোথায় আছেন জানি না। তাই আপনার কাছে এসেছি কিছু কর্মের সন্ধানে। কাজকর্ম না হলে তো আর বাঁচা যায় না। অন্য কোন রাজার কাছে যেতেও ইচ্ছা করে না। তাই আপনি যদি কোন কাজ দেন। আমি দশ যোজন ব্যাপী গরুর দল গণনা করতে পারি। গাভীকুলের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলতে পারি। গো-চিকিৎসায় আমি অভিজ্ঞ। আমি সুলক্ষণ বৃষ চিনতে পারি, যাদের মূত্র আঘ্রাণ করলে বন্ধ্যা নারীও গর্ভবতী হয়। আমার কাজ-কর্মের গুণাগুণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভালভাবেই জানতেন. আমাকে তিনি প্রশংসা করতেন।"

বিরাট রাজার গোধন অতুলনীয়। তাই তিনি খুব খুশি মনে তন্তিপালকে তাঁর রাজ্যের গোধন রক্ষা ও পরিচর্যার কাজে প্রধান করে নিযুক্ত করলেন।…

এমন সময় হঠাৎ সকলের দৃষ্টি পড়ল দুর্গপ্রাচীরের ধারে এক মৃত্তিকা স্তূপের উপরে। একজন রূপবান্ বিশালকায় পুরুষ এদিকেই আসছেন। কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খবলয় ও স্বর্ণকেয়ূর, মস্তকে দীর্ঘ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত।

রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্যামবর্ণ মাল্যধারী এলায়িত বেণী সুঠাম যুবাপুরুষের মত আকৃতি এই ব্যক্তি কে ?"

—"মহারাজ, আমি একজন ক্লীব। কেমন করে যে আমি ক্লীব হলাম সে দুঃখের কথা আপনাকে আর বলতে চাই না। আমার নাম বৃহন্নলা। আমার পিতা মাতা নেই। আমাকে আপনি পুত্র বা কন্যা বলেই জানবেন। আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ। মাল্যরচনা, গন্ধলেপন, স্নান দর্পণমার্জনে এবং সুন্দর তিলক রচনায় পটু। আমি আপনার কন্যা ও কন্যাস্থানীয়াদের নৃত্য গীত শিক্ষা দিতে পারি। আমাকে আপনি অন্তঃপুরে কর্মে নিযুক্ত করুন।"

রাজা তখন বৃহন্নলার কলাবিদ্যা নৃত্যগীত বাদ্যের পারদর্শিতা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেন। মন্ত্রীদের পরামর্শ মত স্ত্রীলোকদের দ্বারা তার ক্লীবত্ব পরীক্ষা করলেন—অপুংস্ত্বমপাস্য নিশম্য চ স্থিরম্। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বৃহন্নলাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করলেন।…

সবশেষে এলেন ছদ্মবেশী নকুল।

রাজার কাছে এসে তিনি বললেন, "মহারাজের জয় হোক। [illegible] সকলের শুভ হোক। আমি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণের তত্ত্বাবধান করতাম।

আমার নাম গ্রন্থিক। আমি অশ্বের স্বভাব, অশ্বের শিক্ষাদান পদ্ধতি, তাদের সর্বপ্রকার চিকিৎসা জানি। দুষ্ট অশ্বকে বশ মানাতে পারি।"

—"গ্রন্থিক, তুমি হয়তো জান, আমি পাণ্ডবদের হিতৈষী। পাণ্ডবদের মতই তুমি প্রিয়দর্শন। তোমাকে দেখে আমি যেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেই দেখছি। জানি না পরিচর্যাশূন্য ভৃত্যবিহীন হয়ে পাণ্ডবেরা এখন কত না দুঃখে কষ্টে বনে বাস করছেন।"

এমনি করে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর "অমোঘদর্শনাঃ" পাণ্ডবেরা সামান্য ভৃত্য হয়ে মৎস্য রাজ্যে বাস করতে লাগলেন।...

প্রতাপ ও আভিজাত্যে সমুজ্জ্বল রাজার পক্ষে বনবাস কষ্টকর হলেও কঠিন নয়। তার মধ্যে থাকে এক তপস্যা ও বৈরাগ্যসিদ্ধি। সে আর এক ধরনের রাজগরিমা। রাজশ্রীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর সমুজ্জ্বল এক ব্রাহ্মীশ্রী।

রাজচ্ছত্র ও বনানীর শীতল ছায়া উভয়ই রাজার কাছে সমান সুখপ্রদ। মনে পড়ে রামচন্দ্র ভরতকে বলছেন, "ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং... এতেষামহ্‌পি কাননদ্রুমাণাং ছায়াং..." (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ)

কিন্তু দীনহীন এই ভৃত্যজনোচিত অজ্ঞাতবাস, যাঁরা এতকাল কেবল আদেশ করে এসেছেন তাঁদের পক্ষে এখন আদেশ পালন করার এই হীনতা, বনবাসের চেয়ে কঠিন বৈকি। বেদব্যাস বলেছেন এই অবস্থা তাঁদের পক্ষে আরো বেশি দুঃখজনক—"সমুদ্রনেমিপতয়োঽতিদুঃখিতাঃ"। হোক বনবাস, তবু তাঁরা এতদিন রাজার মতই মাথা উঁচু করে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করেছেন, মুনি ঋষি ব্রাহ্মণদের সেবা করেছেন, পেয়েছেন তাঁদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ, জ্ঞান ও শিক্ষা। কিন্তু আজ? আত্মপরিচয়হীন পরাধীন ভৃত্যের জীবন! পাণ্ডব-হৃদয়-কুসুম দ্রৌপদী বনবাসেও তাঁর রূপশ্রী হারাননি। কিন্তু এই অজ্ঞাতবাসে এসেই তিনি খিন্ন মলিন শুষ্ক হয়ে গিয়েছেন। তাঁর পদ্মচক্র-চিহ্নিত রক্তিম কোমল করতল এখন দাসীর হস্তের মত কর্কশ কিণযুক্ত (কড়া পড়েছে)—"পাণী কৃতকিণাবিমৌ"। সেই খিন্ন মলিন হাতে ("করৌ কিণবদ্ধৌ") মুখ ঢেকে দাসীর মত দ্রৌপদীকে রোদন করতে দেখে ভীম অস্থির হয়ে ওঠেন।

পাণ্ডবদের অন্তর্দেবতা তাঁদের স্বভাবের প্রকৃতির মূল পর্যন্ত এইভাবে উৎপাটিত করে ধরেছেন। তাঁরা ক্ষত্রিয় বলে বলীয়ান্ কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়, অধ্যাত্ম ভারতে যাঁরা ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন তাঁদের চাই ক্ষত্রিয় বলের অধিক ব্রহ্মবলে অধিষ্ঠিত হওয়া। এই বনবাস, অন্ধকার কণ্টক কান্তারে এই দীর্ঘ পদযাত্রা, তার চেয়েও অধিক এই হীন দাসত্ব, এই হল পাণ্ডবদের

জীবন-তপস্যা। তাঁদের জীবনের ভিতর দিয়েই ভারতের ভাগ্য মন্থন হয়ে চলেছে। তাতে যেমন উঠছে বিষ তেমনি অমৃত। আকণ্ঠ তাঁরা সেই বিষামৃত পান করে চলেছেন।

অবস্থা বুঝেই হয়তো নতুন পরিস্থিতিতে কিভাবে চলতে হবে সে বিষয়ে পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "যুধিষ্ঠির ও অর্জুন সর্বদা দ্রৌপদীকে রক্ষা করবে। তোমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ, লোকব্যবহারেও জ্ঞান, তথাপি রাজভবনে কি রকম আচরণ করতে হবে তোমাদের বলি। নিজেকে রাজার প্রিয়পাত্র মনে করে কখনো রাজার আসনে কিংবা তাঁর শয্যায় উপবেসন করবে না। রাজার সম্মুখেও বসবে না। বাক্‌সংযম করে বিনীতভাবে রাজার দক্ষিণে অথবা বামে উপবেসন করবে। পশ্চাতে কেবল দেহরক্ষীদের স্থান। রাজার হস্তী রথে বা যানে আরোহণ করবে না। রাজার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলবে না। কৌতুকজনক কোন আলোচনাতেও উন্মত্তের মত হাসবে না। প্রয়োজন মত সামান্য একটু মৃদু হাসবে। রাজসকাশে ওষ্ঠ হস্ত বা জানু সঞ্চালন করবে না। রাজা জিজ্ঞাসা না করলে কথা বলবে না, উপদেশ দেবে না, কখনো বৃথা বাক্য বলবে না। মতামত প্রকাশের সময় যা প্রিয় ও হিতকর তাই শুধু বলবে। রাজার পত্নী অথবা অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিদের সঙ্গে হৃদ্যতা করবে না। রাজার শত্রু কিংবা যাদের প্রতি তিনি বিরূপ তাদের সঙ্গেও হৃদ্যতা করবে না। অতি সামান্য কার্যও রাজার জ্ঞাতসারে করবে। রাজা যা বলবেন তাই করবে। যা জিজ্ঞাসা করবেন তারই শুধু বর্ণনা দেবে। অসতর্কতা অহঙ্কার বা ক্রোধ প্রকাশ করবে না। রাজারা মিথ্যাবাদী লোকেদের অপ্রিয় জ্ঞান করেন। তিনি নিজেও যদি কোন মিথ্যা কথা বলে ফেলেন তা প্রকাশ করবে না। রাজার মন্ত্রণা কখনো অন্যের কাছে ব্যক্ত করবে না। রাজার সমান বেশভূষা করতে নেই। তার একান্ত সন্নিধানেও থাকতে নেই। রাজার কাছে নীরবে থাকতে হয় এবং সময়ে-সময়ে বিনীতভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। রাজা যেসব বস্ত্র অলঙ্কার দান করবেন তা নিত্য ব্যবহার করলে এবং তাঁর প্রিয় কার্য করলে রাজা সন্তুষ্ট হন।"

শুনে যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে প্রণাম করে বলেছিলেন, "আপনি যা-যা বললেন সব আমাদের মনে থাকবে। কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন এমন সদুপদেশ আমাদের আর কেউ দিতে পারেন না।"...

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি ভালভাবেই কাটতে লাগল। এক

একটি দিন যায় আর তাঁদের শুভদিন সমাগত হতে থাকে। অপরদিকে হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের উৎকণ্ঠা ও তৎপরতা বাড়তে থাকে।

ব্রাহ্মণ কঙ্ক রাজসভায় পাশা খেলে সকলকে আনন্দ দেন। দ্যূতক্রীড়ায় যে অর্থ পান তা গোপনে অন্যান্য ভাইদের দিয়ে দেন। পাকশালায় পাচক বল্লব মাংস ও ভোজ্যবস্তু কঙ্ককে বিক্রয় করেন। বৃহন্নলা রাজ অন্তঃপুর থেকে প্রাপ্ত উপঢৌকন বস্ত্র অলঙ্কার বিক্রয়ের ছলে কঙ্ক বল্লব তন্তিপাল ও গ্রন্থিককে দান করে দেন। তন্তিপাল গোশালার দুগ্ধ ঘৃত বিক্রয়ের ছলে অন্যান্য ভাইদের দেন। আর সৈরন্ধ্রী সকলের অগোচরে তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং অপরিচিতের মত আচরণ করেন। এমনি করে তাঁরা গর্ভস্থ সন্তানের মত ("পুনর্গর্ভাধৃতা ইব") অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি অতিবাহিত করতে থাকেন।

দিন কেটে যায়।

বুকচাপা দীর্ঘশ্বাসের মত গুরুমন্থর গতিতে দিনরাত্রির ছায়া ফেলে যায়।···

মৎস্য রাজ্যে ব্রহ্মার উৎসব হয় বেশ সাড়ম্বরে। সেই উৎসবে পাচক বল্লব মহামল্ল জীমূতকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে সকলকে চমৎকৃত করেন। রাজঅন্তঃপুরে ব্যাঘ্রসিংহের সঙ্গে ক্রীড়া প্রদর্শন করে রাজমহিষী ও রাজকন্যাদের আনন্দ দেন। সৈরন্ধ্রী ভীমের এই উৎকট সাহসের কার্য দেখে উৎকণ্ঠিত ম্রিয়মাণ হন। তাই দেখে নারীমহলে দাসদাসীদের মধ্যে কুৎসা আলোচনা চলতে থাকে। সৈরন্ধ্রী ও বল্লবের মধ্যে গোপন-প্রণয়ের সম্বন্ধ আছে বলে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করে।

অজ্ঞাতবাস শেষ হবার মাত্র দুমাস বাকী। পাণ্ডবেরা ভাবছেন হয়তো নির্বিঘ্নে কেটে যাবে এই দুটি মাসও।

কিন্তু না।

দুর্যোগ ঘনিয়ে এল।

বিরাট রাজার শ্যালক এবং সেনাপতি, সুদেষ্ণার মাসতুত ভাই কীচক হঠাৎ একদিন অন্তঃপুরে দেখল আশ্চর্য সুন্দরী সৈরন্ধ্রীকে। কামুকের দৃষ্টিতে লক্‌লক্ করে উঠল লালসা। সে নির্জনে প্রস্তাব করল নির্লজ্জের মত। নারীর রূপের এই এক বিড়ম্বনা। নিষ্কলঙ্ক স্বর্গীয় রূপ যেখানে সেখানেই বারবার এগিয়ে আসে কামের কলুষের খর্ব বিকৃত লোল হস্ত। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপ তো কেবল শান্ত কোমল সুষমাই নয়, সে যে অত্যুজ্জ্বল অগ্নি। তেজে তপস্যায় শিখাময়ী বহ্নি। বারবার সেই আগুন শিখায়-শিখায় জ্বলে উঠতে দেখেছি, তাঁর কণ্ঠে ও আচরণে ঝলসে উঠেছে প্রজ্বলিত বহ্নিকৃপাণ, অগ্নি-

রৌদ্র তেজপ্রভা, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন, "a fiery and pregnant apopthegm"। সে যে কি ভয়ানক তার পরিচয় পেয়েছিল সভাপর্বে দুঃশাসন, বনপর্বে জয়দ্রথ, এবং এই বিরাটপর্বে মন্দবুদ্ধি কীচক।

স্বভাবতই আমাদের মনে তুলনা এসে পড়ে সীতার সঙ্গে দ্রৌপদীর। পরস্ত্রীলুব্ধ কামুকের হাতে ধর্ষিতা সতীদ্বয়ের বর্ণনা দিয়েছেন দুই মহাকবি বাল্মীকি এবং বেদব্যাস। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি অসাধারণ পার্থক্য। ভাবে রসে গুরুত্বে মহত্ত্বে কবিত্বের দুই বিপরীত মেরুশিখর যেন। বাল্মীকি যেখানে শ্লোকের পর শ্লোকে অরণ্যে দাবানল জ্বালিয়েছেন, বেদব্যাস সেখানে দেখিয়েছেন নিরুদ্ধ এক পাথর-চাপা আগুন। যার প্রচণ্ড উত্তাপে সেই শিলাতল কেবল ফেটে যাচ্ছে। শ্লোকগুলি সব সংক্ষিপ্ত কিন্তু রয়েছে এক তীব্র পাষাণ-ফাটা উত্তাপ।

মহাকাশে আপন কক্ষপথে ঘুরতে-ঘুরতে দুইটি গ্রহ যেমন একে অপরকে আড়াল করে, একের ছায়া পড়ে অপরের উপর—আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী যাকে বলেন "Occultation"—জ্যোতিষ্কগ্রহণ—এও যেন ঠিক তাই। ভাবের আকাশে রামায়ণ ও মহাভারত তেমনি অত্যন্ত সন্নিকটে এসে পড়েছে একই ধরনের সঙ্কট মুহূর্তে। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ এবং দ্রৌপদীর প্রতি কীচকের লাম্পট্য প্রকাশ দুই মহাকবি দেখিয়েছেন আশ্চর্য সাহস ও সংযমে। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর কবিদের হাতে যা হয়ে পড়তে পারত কুৎসিত বিভৎস এবং অশ্লীল। বাল্মীকির বর্ণনা যেখানে উদ্দাম বর্ণোচ্ছল বিপুল, বেদব্যাসের শ্লোক সেখানে সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ তির্যক্।

সীতাকে রাবণ কেশাকর্ষণ করে ক্রোড়ে তুলে রথে আকাশমার্গে গমন করছে। সীতার অঙ্গের মাল্য ও অলংকার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে (ক্লিষ্টমাল্যাভরণং)। তাঁর ললাটের সিন্দূরতিলক বিস্রস্ত হয়ে মুছে গেছে (বিপ্রমৃষ্টবিশেষকাম্)। জানকীর পীতকৌশেয় বসন রাবণের বুকের উপর দিয়ে হাওয়ায় উড়ছে। সূর্যের কিরণ লেগে সেই পীত বসন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। রাবণকে দেখে মনে হচ্ছে যেন দাবানল-বেষ্টিত এক পর্বত (গিরির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা)। রাবণের অঙ্কে রক্তপল্লবের মত সীতা যেন নীল হস্তীর বুকে সোনার কাঞ্চী (কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা)। মেঘমালার মধ্যে স্ফুরন্ত বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা)। সীতার স্তনযুগলের মধ্য থেকে অগ্নিবর্ণ চন্দ্রহার স্খলিত হয়ে ঝনন্ শব্দে পতিত হতে লাগল স্বর্গ থেকে আপতিত গঙ্গার মত (গঙ্গেব গগনচ্যুতা)। দিবসে উদিত চন্দ্রের মত (দিবাচন্দ্র ইবোদিত) সীতা অত্যন্ত ম্লান বিবর্ণ হয়ে ভীত কণ্ঠে কেবল

কাঁদতে-কাঁদতে ডাকছেন, "হা রাম. হা লক্ষ্মণ, আমাকে উদ্ধার কর।" সমস্ত চরাচর ভয়ঙ্কর লজ্জায় অন্ধকার হয়ে গেল (জগৎসর্বমমর্যাদং তমসান্ধেন সংবৃতম্)। বাতাস স্তব্ধ। সূর্যমণ্ডল নিষ্প্রভ। এইভাবে বর্ণের পর বর্ণ, ছবির পর ছবি, ধ্বনির পর ধ্বনি। আলোতে অন্ধকারে আগুনে সোনায়, নীলে লোহিতে পীতে, এমনকি অঙ্গের-উত্তাপে-উষ্ণ অলঙ্কারের শিঞ্জনে যে বিহ্বলতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। একেই বলে প্রতিভার স্পর্শ :

> তপ্তাভরণবর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী।
> ররাজ রাজপুত্রী তু বিদ্যুৎসৌদামনী যথা ॥১৪
> উদ্ধূতেন চ বস্ত্রেণ তস্যাঃ পীতেন রাবণং।
> অধিকং পরিবভ্রাজ গিরির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা ॥১৫
> তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাস্তাম্রাণি সুরভীণি চ।
> পদ্মপত্রাণি বৈদেহ্যা অভ্যকীর্যন্ত রাবণম্ ॥১৬
> তস্যাঃ কৌশেয়মুদ্ধূতমাকাশে কনকপ্রভম্।
> বভৌ চাদিত্যরাগেণ তাম্রমভ্রমিবাতপে ॥১৭
>
> ...
>
> সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্।
> শুশুভে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা ॥২৩
>
> ...
>
> তস্যাঃ স্তনান্তরাদ্‌ভ্রষ্টো হারস্তারাধিপদ্যুতিঃ।
> বৈদেহ্যা নিপতন্ ভাতি গঙ্গেব গগনচ্যুতা ॥৩৩

(রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৫২ সর্গ)

নারীধর্ষণের এমন যে নির্মম ঘটনা কবি তা অবলীলাক্রমে বলে চলেছেন। রসের দিক দিয়ে কোথায়ও একটু নীচু পর্দায় নেমে যায়নি। অথবা ভয়ঙ্কর বা বিভৎস রসে ঘোলাটেও হয়ে পড়েনি। শব্দে বর্ণে চিত্রে এক পবিত্রতা, ভাবের এক সমুচ্চতা নিয়ে কবিত্বের এক বিশিষ্ট গরিমা লাভ করেছে।

কিন্তু বেদব্যাসের মানসকন্যা মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদী সীতার মত অত অবলা নন। তিনি তেজময়ী, শক্তিমতী। দুষ্টের হস্ত তাঁকে স্পর্শ করতে এলে তিনি আগুনের মত জ্বলে ওঠেন। ক্রুদ্ধ ললাটে ফুটে ওঠে ভ্রূকুটি। বিলাপ নয়, তিরস্কারে দগ্ধ করেন সেই নীচতাকে। কামার্ত জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীর কাছে প্রণয় নিবেদন করতে আসে তখন দ্রৌপদীর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। ললাটে ফুটে ওঠে তাঁর ঘৃণাপূর্ণ ভ্রূকুটি—"সরোষরাগোপহতেন সরাগনেত্রেণ নতোন্নতভ্রুবা" (বনপর্ব, ২৬৮/১) ;—তিরস্কার করে বলেন,

তুমি কুকুরের মত কথা বলছ, "ভষন্তি হৈবং শ্বনরাঃ।" তথাপি জয়দ্রথ যখন তাঁর আঁচল টেনে ধরল তখন দৃপ্তময়ী দ্রৌপদী জয়দ্রথকে এমন এক ধাক্কা দিলেন যে সেই পাপী তখন ছিন্নমূল বৃক্ষের মত মাটিতে পড়ে গেল,—জয়দ্রথস্তং সমবাক্ষিপৎ সা। তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥ (বনপর্ব, ২৬৮/২৪) ঠিক একই ঘটনা ঘটল এবং একই ভাষায় কীচক যখন কামাবেশে দ্রৌপদীর আঁচল টেনে ধরল, তখনও সেই ক্রুদ্ধা তেজস্বিনী এক ধাক্কায় কীচককে মাটিতে ফেলে দিলেন—

প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন
মুহুর্বিনিঃশ্বস্য চ রাজপুত্রী।
তয়া সমক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥৮
(বিরাটপর্ব, ১৬ অধ্যায়)

জয়দ্রথ যখন বলপূর্বক দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে গেল তখন সীতা হরণের মত কোন প্রত্যক্ষ বর্ণনা নেই। কোন কথা না বলে সবখানি বলার এক আশ্চর্য সংযম বেদব্যাসের। তিনি সেই মর্মন্তুদ ঘটনার নাটকীয় তীব্রতা অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন। কুটিরে প্রত্যাগত পাণ্ডবেরা শুনছেন ধাত্রেয়িকার মুখে দ্রৌপদী-হরণের কথা (বনপর্ব, ২৬৯ অধ্যায়)। পরিচারিকা শোকে আক্ষেপ করে বলছে, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে নিয়ে গেছে, যেন ফুলের মালা শ্মশানে ফেলে দেওয়া হয়েছে (শ্মশানে স্রগিবাপাবিদ্ধ্যাতে); যজ্ঞের সোমরস যেন কুকুরে পান করেছে (সোমোঽধ্বর-গোঽবলিহ্যতে); পথের কুকুর যেন যজ্ঞের পুরোডাশ স্পর্শ করেছে (শ্বা বৈ পুরোডাশমিবাধ্বরস্থম্); ভস্মে যেন যজ্ঞের ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়েছে (ভস্মনি স্রুচম্); পবিত্র সরোবরে যেন শৃগাল এসে স্নান করেছে (শৃগালো নলিনীং বিগাহতে)…

এমনি কয়েকটি নিপুণ সুনির্বাচিত উৎপ্রেক্ষা ছাড়া কোন বর্ণনা নেই। সে অবকাশও রাখেননি কবি। ধাত্রেয়িকাকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠির, "প্রতিক্রাম নিষচ্ছ বাচং"।…

কীচকের গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ক্লিষ্টা দ্রৌপদী এসে দাঁড়ালেন রাজসভায়, যেখানে ব্রাহ্মণ কঙ্কের বেশে রাজা যুধিষ্ঠির বসে আছেন।

অপমানিত ক্রুদ্ধ কীচক ছুটে এল রাজসভায়।

সকলের সমক্ষে সে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে পদাঘাত করল। দ্রৌপদীর মুখ দিয়ে রক্তপাত হতে লাগল।

দ্রৌপদীর অপমানে পাচকবেশী ভীম প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভীমের অঙ্গুষ্ঠ চেপে ধরে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। দ্রৌপদী তাঁর উগ্র দৃষ্টি দিয়ে পাণ্ডবদের দগ্ধ করতে লাগলেন।

প্রত্যক্ষ রাজসভায় চলছে আর-এক অলক্ষ্য নাটক। বেদব্যাস এখানে কবি এবং নাট্যকার। পাত্রপাত্রীর মৌন ইঙ্গিতের ভিতর দিয়ে তিনি সঞ্চারিত করে দেন এক নাটকীয় সংঘাত ও তীব্রতা। ভীম বাইরের দিকে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করছেন। ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাটও ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর ভয়, পাছে ভীম আত্ম-বিস্মৃত হয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে। অজ্ঞাতবাসের আর তো মাত্র কিছু দিন বাকী। অতএব যেমন করেই হোক নিজেদের সংযত রাখা দরকার। তাই কঙ্ক বল্লবকে বললেন, "ওহে সূদ (পাচক), তুমি বাইরে গাছের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? তোমার কি রান্নার কাঠ দরকার? তাহলে বাইরে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে পার। কিন্তু যে গাছের শীতল ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যায় তার পাতাটাও নষ্ট করতে নেই।"

যুধিষ্ঠিরের কথা ভীম বুঝতে পেরে নিরস্ত হলেন। দ্রৌপদীও বুঝলেন। তখন দ্রৌপদী রাজা বিরাটকে কঠোর ভর্ৎসনা করে বললেন,

"আমি নিরপরাধ। আমাকে লাঞ্ছিত হতে দেখেও আপনি নিষ্ক্রিয়। রাজা, আপনি ধর্মদূষক। মৎস্যরাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ নন। রাজাকে ঘিরে যাঁরা বসে সেই সভাসদ্‌গণও ধর্মজ্ঞ নন।"

দ্রৌপদীর এই কথায় মনে পড়ে সভাপর্বে দ্যূতসভায় উপস্থিত রাজন্যদের প্রতি দ্রৌপদীর সেই অসহায় আর্ত অভিযোগ—"কিন্নু ধর্ম মহীক্ষিতাম্? রাজাদের ধর্ম কোথায় গেল?"

মৎস্যরাজের দ্বারা কোন প্রতিকারের আশা নেই জেনে সভামধ্যে ব্রাহ্মণ কঙ্ক বললেন, "সৈরন্ধ্রী, তোমার স্থানকাল সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। সামান্য নটীর মত রোদন ক'রো না। রাজসভায় বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রো না। অন্তঃপুরে যাও। মনে হয় তোমার গন্ধর্বপতিগণ এখন ক্রোধ প্রকাশের উপযুক্ত কাল বলে মনে করছেন না। তাই তাঁরা এগিয়ে আসছেন না। তুমি যাও। বোধ করি, গন্ধর্বগণ যথা সময়ে তোমার অপমানের প্রতিবিধান করে তোমার দুঃখ দূর করবেন।"

দ্রৌপদী তখন যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিত বুঝে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। অপমানে ক্রোধে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ। কেশপাশ বিস্রস্ত।...

দ্রৌপদীর হৃদয়ে প্রতিশোধ সঙ্কল্প জেগেছে। কীচকের নিধন চাই।

তিনি দেখলেন, ভীম ছাড়া একাজ আর কারো দ্বারা সম্ভব হবে না। সেই রাত্রেই গোপনে পাকশালায় গিয়ে নিদ্রিত ভীমকে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে প্রেমে আবেগে অনুনয়ে তাঁকে প্রতিহিংসায় উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। দ্রৌপদীর সেই উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে লাঞ্ছিত সতীত্বের এক তীব্র বেদনা উৎসারিত হল। সামান্য রমণীর বিলাপের মত তা শুধু শিথিল রিক্ত দুর্বল উচ্ছ্বাস নয়। অন্তরের তপ্ত তেজের এক তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর। ধনুকের টঙ্কারের মত অনুরণিত উষ্ণ-নিঃশ্বাসে-ভরা সেই শ্লোক—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ।
নামৃতস্য হি পাপীয়ান্ ভার্যামালভ্য জীবতি ॥১৫
(বিরাটপর্ব, ১৭ অধ্যায়)

(ওঠ, ওঠ ভীম, জীবিত ব্যক্তির ভার্যাকে লাঞ্ছিত করে
কোন পাপিষ্ঠ কি বেঁচে থাকতে পারে ?)

এই একটি মাত্র কথার ভিতর দিয়ে দ্রৌপদীর সকল ব্যক্তিত্ব, তাঁর সতীত্ব, তাঁর তেজ ও গর্ব, ক্ষমাহীন হৃদয়ের রৌদ্রভাব, তাঁর বলিষ্ঠ মনের সকল উত্তাপ রক্তিম আবেগে ঝলসে উঠেছে। এই একটি শ্লোকে আগুনের রঙে আঁকা রয়েছে বেদব্যাসের কবিপ্রতিভার জ্বলন্ত স্পর্শ। যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে বাল্মীকির থেকে, এবং সকল যুগের সকল মহাকবিদের থেকে স্বতন্ত্র করে ধরেছে।

ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে রাত্রে ডেকে আনলেন রাজার নির্জন নৃত্যশালায়। সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষা করে ভীম তেমনি সেই রাত্রে নৃত্যশালায় কীচকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সৈরন্ধ্রী আছে এই মনে করে কীচক অন্ধকারে প্রবেশ করল। তৎক্ষণাৎ ভীম তাকে ভূমিতে পেষণ করে হাত-পা ভেঙে মথিত কূর্মাকৃতি করে বধ করলেন।

দ্রৌপদীকে ডেকে ভীম বললেন, "কামুকটাকে কি করেছি এসে দেখ।"

নৃত্যশালার রক্ষকরা জানল সৈরন্ধ্রীর গন্ধর্বপতিদের হাতে কীচক নিহত হয়েছে।…

অজ্ঞাতবাস শেষ হতে আর মাত্র কদিন বাকী।

[চৌদ্দ]

কোন্ পথে ধর্ম ?

মহাভারতের মূল কথা হল ধর্ম। একে বলা হয়েছে "ধর্মশাস্ত্র", আবার "জয়শাস্ত্র"—"যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"। কিন্তু দুই অক্ষরের এই ছোট্ট শব্দটি যেন বজ্র আর আগুন দিয়ে গড়া। যেমন সূক্ষ্ম তেমনি ভীষণ। একে লাভ করা দুঃসাধ্য, অস্বীকার করাও অসাধ্য। পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে শক্তির চিরন্তন এক রহস্যগ্রন্থি হল এই ধর্ম। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্র এই রহস্যগ্রন্থি দিয়ে বাঁধা।

সকলের মুখেই শুনি ধর্মের কথা, ধর্মই তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। কিন্তু তারা যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথেই চলেছে তাই নয়, তারা এসে দাঁড়িয়েছে একে অন্যের বিরুদ্ধে, বৈপরীত্যে সংঘর্ষে। প্রত্যেকের কথা যখন শুনি, তাদের অন্তরের ব্যথা যখন অনুভব করি, তখন মনে হবে তাঁরা যেন ঠিকই বলছেন, ঠিকই করছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে তা এমন বিরুদ্ধ ও বিপরীত-মুখী যে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আবার অনেক সময় ধর্ম দেখা দিচ্ছে অধর্মের রূপ নিয়ে—"বিভ্রদ্ ধর্মোধর্মরূপং তথা" (উদ্যোগপর্ব, ২৮/২)। অতএব ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম এবং গহন।

একটি আহত হরিণ বনের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সেই পলাতক হরিণের রক্তপদচিহ্নের মত ধর্ম অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য।

যথা মৃগস্য বিদ্ধস্য পদমেকং পদং নয়েৎ।
লক্ষেদ্ রুধিরলেপেন তথা ধর্মপদং নয়েৎ ॥
(শান্তিপর্ব, ১৩২/২১)

সাপের পদচিহ্ন যেমন দেখা যায় না, তেমনি ধর্মের গতিপথও অদৃশ্য—"অহেরিব হি ধর্মস্য পদং দুঃখং গবেষিতুম্।" (শান্তিপর্ব, ১৩২/২০)

যুধিষ্ঠিরও বলছেন, "ধর্ম কি তা বুঝতে পারি বা না পারি, কিন্তু এটা বুঝি ধর্ম ক্ষুরের ধারের চেয়েও সূক্ষ্ম, পর্বতের চেয়েও গরীয়ান্।"

বেদ্মি চৈবং ন বা বিদ্ম শক্যং বা বেদিতুং ন বা।
অণীয়ান্ ক্ষুরধারায়া গরীয়ানপি পর্বতাৎ ॥
(শান্তিপর্ব, ২৬০/১২)

ধর্ম কূটস্থ অচল ধ্রুব। আবার আলোকের চেয়েও তীব্র বেগবান্‌ অস্থির চঞ্চল। একই সঙ্গে কালাতীত এবং কালগত। স্থিতি আর গতির প্রহেলিকার মধ্যে ধর্ম এক রহস্যময় মন্ত্রগুপ্তি।

তাই ধর্মকে মহাভারতে প্রথমে তার এই স্থিতির দিক দিয়ে অনুধাবন করার সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেষ্টা হয়েছে। ধর্মের অঙ্গ কি দিয়ে গড়া, কি তার লক্ষণ, কেমন তার মুখশ্রী, তার চরণ? তারপর ধর্মের গতির দিক থেকে জীবনের মধ্যে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা কয়েকটি চমৎকার গল্পও শুনেছি। গল্পগুলি যেমন বিচিত্র তেমনি নাটকীয়। যেমন, প্রহ্লাদ ও ইন্দ্রের গল্প (শান্তিপর্ব, ১২৪ অধ্যায়), তপস্বী জাজলি ও তুলাধারের গল্প (শান্তিপর্ব, ২৬১ অধ্যায়), কৌশিক ব্রাহ্মণ ও ধর্মব্যাধের গল্প (বনপর্ব, ২০৭ অধ্যায়), রাজা উশীনর ও শ্যেনপক্ষীর গল্প (বনপর্ব, ১৩১ অধ্যায়)। একে একে আমরা শুনব সেইসব গল্প, দেখব সেইসব গুণলক্ষণ। আর বুঝতে চেষ্টা করব ধর্ম কি? কোন্‌ পথে?

কিন্তু একথা আগেই স্বীকার করে রাখা ভাল, ধর্মের এই সমস্ত গুণলক্ষণ দেখে এবং এতগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প শুনেও, আমাদের কাছে ধর্ম আগের মতই কুয়াশাচ্ছন্ন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় থেকে যাবে। মহাভারতে একের পর এক দুর্ধর্ষ সব ঘটনার নিরিখে বারবার আমরা আমাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ধর্মবোধের মানদণ্ড নিরূপণ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার আবর্তে সংঘাতে সেইসব মূল্যবোধ অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। সঠিকভাবে ধরবার বুঝবার যেন কোন উপায় থাকে না।

এমন করে কাহিনীর বিপুল ঘটনাজালের মধ্যে আমরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিরথ। সেই বহ্নিরথের নেমিঘোষে আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। আর তারই অগ্নিরেখায় ফুটে উঠছে ধর্মের সুস্পষ্ট দুই পক্ষ। একপক্ষে মহাভারতের প্রচলিত সমাজ ধর্ম ন্যায় নীতির ধারণা. অন্যপক্ষে ধর্মের নতুন এক বৈপ্লবিক সংজ্ঞা।...

প্রথমে দেখি প্রচলিত অর্থে ধর্মের সংজ্ঞা কি? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ধর্ম সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে। তাই তাকে ধর্ম বলা হয়। "ধারণাদ্‌ ধর্মমিত্যাহুধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।" (কর্ণপর্ব, ৬৯/৫৮) ভীষ্ম বলছেন, ধর্মের দ্বারা সকল জীবের বৃদ্ধি ও অভ্যুদয় হয়—"ধর্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বদা।" (শান্তিপর্ব, ৯০/১৭) ইহলোক ও পরলোকের স্থিতির অনুকূলে যে আচরণ তাই ধর্ম। "লোকযাত্রামিহৈকে তু ধর্মং প্রাহুর্মনীষিণঃ।" (শান্তিপর্ব, ১৪২/১৯)

ধর্মরূপী যক্ষ বলছেন যুধিষ্ঠিরকে, ধর্মের দশটি শরীর : যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য, দান, তপস্যা, ও ব্রহ্মচর্য। (বনপর্ব, ৩১৪ অধ্যায়)

দশটি যেমন শরীর, তেমনি মনুসংহিতায় আবার বলা হয়েছে ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা : ধৃতি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অস্তেয়, পবিত্রতা, সংযম, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। কোথাও বলা হয়েছে ধর্মের লক্ষণ সাতটি : অহিংসা, শৌচ, অক্রোধ, অক্রূরতা, দম, শম ও সরলতা। (আশ্বমেধিকপর্ব, ১৩ অধ্যায়)

ধর্মের প্রবেশপথ পাঁচটি : শান্তি, সমতা, দয়া, অহিংসা ও অমাৎসর্য। (বনপর্ব, ৩১৪ অধ্যায়)

ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে আবার ছয়টি পায়ে ভর দিয়ে। জন্ম থেকে ক্ষুধা ও ও তৃষ্ণা, যৌবনে শোক ও মোহ এবং বার্ধক্যে জরা ও মৃত্যু। (বনপর্ব, ৩১৪ অধ্যায়)

ধর্মের চার মূর্তি। এক মূর্তিতে ভূতলে তপস্যানিরত, দ্বিতীয় তাঁর লোকসাক্ষীরূপ, তৃতীয় রূপে মানুষকর্ম সাধক এবং চতুর্থ রূপে তিনি অনন্ত-শয়ান। (দ্রোণপর্ব, ২৮ অধ্যায়) বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সংকর্ষণ।

এই জগৎ হল ধর্মের সার—"ধর্মসারমিদং জগৎ" (রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৯ সর্গ)। এই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সত্যের উপর—"সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্" (শান্তিপর্ব, ২৫৯ অধ্যায়)। ব্রহ্মা যে সৃষ্টিপদ্মের উপরে বসে আছেন সেই পদ্মের প্রধান দলকে বলে সত্য—সত্যাখ্যদল—"স্বাজস্যোত্তরে দলে" (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, দশম সর্গ. ২৭ শ্লোক)।

কিন্তু এমনি করে যতই আমরা ধর্মের গুণলক্ষণ অঙ্গাদির বিচার করি না কেন তবু সব অস্পষ্টই থেকে যায়। কেননা মহাভারতের বহু চরিত্রই এই সব গুণলক্ষণে ভূষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা জীবনে ধর্মকে কি লাভ করতে পেরেছিলেন ? কৌরব পিতামহ ভীষ্ম, ব্রাহ্মণবীর দ্রোণাচার্য, কর্ণকেই-বা ভুলি কেমন করে ? আবার ধর্মস্বরূপ যে বিদুর এবং যুধিষ্ঠির, তাঁরাও কি জীবনে ধর্মকে পেয়েছিলেন ? অতএব যুধিষ্ঠিরের কথাতেই বলতে হয়, "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"। (বনপর্ব, ৩১৩ অধ্যায়)।

দেখছি ধর্ম এমন এক শক্তি এমন এক বিধান যা জীবনের সব কিছুর মধ্যে অনুস্যূত থেকেও সব কিছুর ঊর্ধ্বে এক চিৎশক্তি। জীবনকে উজ্জীবিত করে ধরছে, কিন্তু জীবন তাকে ধরতে পারছে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ভাষায়, এ যেন জীবনের এক Orthogenesis। গুহ্য সাধকদের যেমন,

প্রতীকচক্র একটির মধ্যে অসংখ্য তত্ত্বের ও অর্থের সমন্বয়, অথবা একটি mystic number-এর মধ্যে যেমন গুপ্তভাবে থাকে অসংখ্য সংখ্যা। ধর্ম সম্পর্কে এমনি একটা প্রহেলিকাপূর্ণ গল্প শুনিয়েছেন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে। (শান্তিপর্ব, ১২৪ অধ্যায়)

ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি তো জান না, রাজসূয় যজ্ঞের পর ইন্দ্রপ্রস্থে তোমাদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তার মনের দুঃখ বলে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ধৃতরাষ্ট্র সস্নেহে দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে তুমি কেন ঈর্ষান্বিত হচ্ছ ? তাদের মত তুমিও গুণবান্ শীলবান্ হয়ে ওঠ, তাহলে তোমার সৌভাগ্য ওদের চেয়েও বৃদ্ধি পাবে। জান তো 'পৃথিবী গুণক্রীতা স্বয়মাগতা', যার উপযুক্ত গুণশীল আছে পৃথিবী তার কাছে সকল ঐশ্বর্য নিয়ে আপনিই উপস্থিত হয়। বৎস, তুমিও গুণবান্ হয়ে ওঠ।

দুর্যোধনকে তিনি শোনালেন ইন্দ্র-প্রহ্লাদের গল্প। দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ আপন গুণশীলে ইন্দ্রের স্বর্গ পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন।

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন, পিতা, শীল কি ?

—মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা কখনো কারো শত্রুতা করবে না, সকলের প্রতি দয়াশীল হয়ে যথাশক্তি দান করবে। একেই বলে শীল—

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ শীলমেতৎ প্রশস্যতে ॥৬৬

(শান্তিপর্ব, ১২৪ অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্র ভাবলেন, কোন্ গুণে প্রহ্লাদ আমাকে স্বর্গচ্যুত করল ? তিনি তখন দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে গেলেন। বললেন, গুরুদেব, আমার কল্যাণের উপায় বলুন।

বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিলেন তাঁর উপদেশ।

ইন্দ্র বললেন, এছাড়া আর কি বিশেষ কোন বিদ্যা আছে ? কো বিশেষো ভবেদিতি ?

বৃহস্পতি বললেন, এর চেয়ে মহত্তর বিদ্যা তো আমার জানা নেই। তুমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে যাও। তাঁর আছে সেই জ্ঞান।

ইন্দ্র গেলেন শুক্রাচার্যের কাছে।

শুক্রাচার্য ইন্দ্রকে দিলেন আরো মহত্তর জ্ঞান। কিন্তু ইন্দ্র তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, এছাড়াও কি বিশেষ কোন বিদ্যা নেই ?

ভার্গব বললেন, এর চেয়ে মহত্তর বিদ্যা আছে প্রহ্লাদের কাছে। তুমি বরং তার কাছে যাও।

ইন্দ্র তখন চললেন প্রতিপক্ষ প্রহ্লাদের কাছে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। শক্তিতে তেজে যাকে পরাভূত করতে হবে তারই কাছে তো জেনে নিতে হবে তার শক্তির রহস্য কি ?

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন, ভগবন্, আমি আপনার কাছে শ্রেয়লাভ করতে এসেছি। আপনি আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন।

প্রহ্লাদ বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি বর্তমানে ত্রিলোকের শাসন পালনে ব্যস্ত। তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার সময় আমার নেই।

ইন্দ্র বললেন, আপনার যখন সময় হবে তখনই উপদেশ দেবেন। আমি আপনার অবকাশের অপেক্ষায় থাকব।

ইন্দ্রের বিনীত বচনে প্রহ্লাদ সন্তুষ্ট হলেন। তাঁকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন। অক্লান্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে ইন্দ্র প্রহ্লাদকে গুরুরূপে সেবা করতে লাগলেন। তাঁর গুরুসেবায় প্রহ্লাদ প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সকল বিদ্যা দান করে বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি তোমার নিষ্ঠা দেখে ও সেবা লাভ করে সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, আমি জানতে চাই, আপনি কোন্ গুণে ইন্দ্রকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন ?

প্রহ্লাদ বললেন, ভূতলে অমৃতস্বরূপ গুরুর উপদেশ। আমি সেই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করে রাজার অভিমান না রেখে ত্রিলোক পালন করি। ব্রাহ্মণদের পূজা করি। এই আমার ধর্মশীলতা।

ইন্দ্র তখন বললেন, আপনি আমাকে বর দান করতে চেয়েছেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হন তাহলে আপনার ওই শীল আমাকে দান করুন।

প্রহ্লাদ খুশি হয়ে বললেন, এবমস্তু।

ইন্দ্র তখন আনন্দিত হয়ে প্রহ্লাদকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

এদিকে প্রহ্লাদ অকারণে কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, আমার এ কি হল ? বসে-বসে চিন্তা করছেন, এমন সময় তাঁর দেহ থেকে এক কান্তিময় তেজমূর্তি ছায়াশরীর নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি ?

—আমি শীল। তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, তাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমার শিষ্য সেই ব্রাহ্মণের কাছে চললাম।

প্রহ্লাদের দেহ থেকে তারপর আর-এক তেজমূর্তি বেরিয়ে এল।

—আপনি কে ?

—প্রহ্লাদ, আমি ধর্ম। সেই ব্রাহ্মণ, যাঁকে তুমি শীল দান করেছ, আমি তাঁর কাছে চললাম। যেখানে শীল সেখানেই ধর্ম অবস্থান করে।

এবার প্রহ্লাদের দেহ থেকে তৃতীয় এক তেজমূর্তি বেরিয়ে এল। আপন তেজে আপনি প্রজ্বলিত সেই মূর্তি।

বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে ?

—প্রহ্লাদ, আমি সত্য। ধর্ম যেখানে গেছেন আমিও সেইখানেই চললাম।

প্রহ্লাদ দেখছেন, তাঁর দেহ থেকে একে একে চলে যাচ্ছেন শীল ধর্ম সত্য। আরো তিনটি আলোকমূর্তি বেরিয়ে এল, সদাচার, বলবীর্য ও লক্ষ্মীশ্রী। প্রহ্লাদের দেহকান্তি ক্রমশ বিবর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে গেল। তিনি ভীত হলেন। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবি, কে সেই ব্রাহ্মণ, যে এমনি করে আমার সব হরণ করে নিয়ে গেল ?

লক্ষ্মী বললেন, বৎস, সেই ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী ইন্দ্র। যে ধর্মশীলতার কল্যাণে তুমি স্বর্গ পর্যন্ত অধিকার করেছিলে, ইন্দ্র তোমার শিষ্য হয়ে এসে তোমার সেই কল্যাণ হরণ করে নিয়ে গেছে। তুমি নিজেই তো তাকে দান করেছ। জানবে, যেখানে শীল, সেখানেই ধর্ম সত্য সদাচার বল ও লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করে।

গল্প শেষ করে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন, যে কাজ করলে মনে সঙ্কোচ অনুভব হয় তা কখনো করবে না।—"অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্যাৎ কথঞ্চন।" (শান্তিপর্ব, ১২৪/৬৭)

ধৃতরাষ্ট্র বলতে চাইছেন ধর্মের স্থান অন্তরে। ধর্ম মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করে—"ধর্মো হৃদি সমাশ্রিতঃ" (শান্তিপর্ব, ২৮০/২৬)—সেই অন্তর্জ্যোতির মধ্যে রয়েছে বিচিত্র সব কিরণমালা। তাদের ছটা জীবনের মধ্যে নিয়ে আসে প্রভা স্ফূর্তি বীর্য বল বৈভব। আর এই সব গড়ে ওঠে জীবনের প্রতি একটা নির্দিষ্ট মনোভাব নিয়ে। এক অব্যক্ত বিবেক দেখিয়ে দেয়, কোথায় ধর্ম, কোথায় নয়।

কিন্তু ধর্মের একটা সুস্পষ্ট মেরুরেখা, একটা অক্ষপথ (axis) এখানে তবু আমরা পাচ্ছি না। অথচ মনে হচ্ছে তার খুব কাছাকাছি এসেছি। দেখা যাক্ জাজলি তুলাধার ও ধর্মব্যাধের গল্পে আমরা তা পাই কি না।…

দুটি গল্পেরই বিষয়বস্তু প্রায় এক। তপস্বী জাজলি ও ব্রাহ্মণ কৌশিক

দুজনেই কঠোর তপস্যা করেছেন। সেই কঠোরতা ও তীব্রতা বিস্ময়কর। কিন্তু কেউই প্রকৃত ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা চরম ধর্মতত্ত্ব লাভ করলেন এমন দুজন লোকের কাছে যাঁরা জন্মে বৃত্তিতে জীবনে অতি তুচ্ছ এবং হীন। একজন কাশীর সামান্য বণিক, আর একজন মিথিলার নীচ কসাই।...

ব্রাহ্মণ জাজলি দীর্ঘকাল বনবাসে কঠোর তপস্যা করেছেন। তপস্যায় অনেক সিদ্ধিলাভও করেছেন। তপোবলে তিনি ইচ্ছামত শূন্যে অথবা সমুদ্রে বিচরণ করতে পারেন। মাথায় তাঁর এমন জটার ভার যে সেই জটার মধ্যে পাখিরা বাসা বেঁধে নিশ্চিন্তে বাস করে। জাজলি মনে-মনে বললেন, তাঁর মত শ্রেষ্ঠ ধার্মিক বোধহয় আর কেউ নেই।

এমন সময় তিনি শুনলেন, কারা যেন অদৃশ্য কণ্ঠে বলছে, ব্রাহ্মণ, এমন কথা কাশীর তুলাধার বণিকও বলেন না।

তাই নাকি? তিনি তবে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক?

জাজলি তখন চললেন কাশীতে তুলাধারকে দেখতে। কেমন সেই ধার্মিক একবার দেখতে হয়।

কাশীতে এসে তুলাধারকে দেখে জাজলি অবাক হন। এ তো একজন সামান্য মুদি! দোকানে বসে জিনিসপত্র ওজন করে বিক্রি করছে! জাজলি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছেন আর ভাবছেন।

হঠাৎ তুলাধার তাঁকে দেখতে পেয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আসুন। আপনি যে আমার কাছে আসছেন, আপনার সকল তপস্যা ও সিদ্ধির কথা আমি জানি। আকাশবাণী শুনে আমাকে দেখতে এসেছেন, ভাবছেন, এই লোকটা আবার ধার্মিক হল কেমন করে?"

তুলাধারের প্রজ্ঞাদৃষ্টি দেখে জাজলি স্তম্ভিত হলেন। তখন তুলাধার তাঁকে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে সরল ও সাধারণ কয়েকটি কথা বললেন।

তুলাধার বললেন, "আমার বৃত্তি সামান্য। কিন্তু আমি কখনো ছল কপটতা বা অসত্য অবলম্বন করি না। আমার মন বাক্য ও কর্ম দ্বারা সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করি। নিন্দা-প্রশংসা, মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, লোষ্ট্র-কাঞ্চন আমার কাছে সমান। আমার হাতের এই দাঁড়িপাল্লার মতই জগতের সবকিছু আমার কাছে সমান। তুলা মে সর্বভূতেষু সমা তিষ্ঠতি।" (শান্তিপর্ব, ২৬২/১০)

তুলাধারের হাতের তুলাদণ্ড ধর্মেরই প্রতীক। এ যেন ধর্মের নিজস্ব দৃষ্টি। সৃষ্টির অতি ঊর্ধ্ব থেকে ধর্ম যেন জগতের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। ধর্মের

চোখে জগৎ যা এ তাই। এ হল ধর্মের Omega Vision—তুরীয় এক সাক্ষীদৃষ্টি। কিন্তু ধর্মের যে অধিভূত দৃষ্টি, জগতের সংক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বের মধ্যে নেমে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখার যে দৃষ্টি, এ তো তা নয়। সবই সমান, সবই এক, সবই নারায়ণ, একথা ঠিক, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সরস রসিকতাটুকুও মনে রাখা দরকার। জীবনের পথে চলার সময় হাতী-নারায়ণ আর মাহুত-নারায়ণ এক নয়। ধর্মের সেই সূক্ষ্ম discrimination,—শ্রীকৃষ্ণ যাকে বলেছেন—"ধর্মবিভাগ", বৈদিক ঋষিরা যাকে বলেছেন সরমাদৃষ্টি, তা কিন্তু তুলাধার আমাদের দিতে পারলেন না। তিনি হয়তো বলবেন, তাঁর সেই তুরীয় দৃষ্টির মধ্যেই সরমাদৃষ্টি সম্বোধি হয়ে কাজ করে, যা কথা দিয়ে বোঝান যায় না। ওই ভূমিতে উঠলে সাধকের আপনার থেকেই জাগবে সেই সজাগ বিবেকী দৃষ্টি। হয়তো তাই।

এবার দেখা যাক, মিথিলার সেই কসাই আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারে।

ব্রাহ্মণ কৌশিকও অত্যন্ত তপস্বী। তিনি বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর অনেক তপোসিদ্ধিও আছে। তাঁর দৃষ্টিতে গাছের পক্ষী পর্যন্ত ভস্ম হয়ে যায়। তথাপি তাঁর সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি নেই যাতে ধর্মের সূক্ষ্মগতি লক্ষ্য করতে পারেন। এক সতীসাধ্বী তাঁকে বলে দিলেন, মিথিলাতে যাও, সেখানে এক ব্যাধ আছেন, তাঁর কাছে ধর্মের তত্ত্ব জানতে পারবে।

কৌশিক এলেন মিথিলাতে।

ধর্মব্যাধকে দেখলেন কসাইখানায় বসে হরিণ আর মহিষের মাংস বিক্রয় করছে। তাকে ঘিরে অনেক ক্রেতার ভিড়। তার হাতে-পায়ে পশুর রক্তে মাখামাখি। ব্রাহ্মণ একপাশে দাঁড়িয়ে তাই দেখে অবাক হয়ে ভাবছেন, এ কেমন কথা ?

ব্যাধ কৌশিককে দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনাকে প্রণাম। আপনি যে আমার কাছে আসছেন, কেন আসছেন জানি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি হাতের কাজ সেরে নিই।"

কাজ শেষ করে ব্যাধ বললেন, "এই বিশ্রী স্থানে আপনার মত ব্রাহ্মণের অপেক্ষা করা উচিত হবে না। আপনি আমার গৃহে চলুন।"

ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করে নিজের গৃহে এনে ব্যাধ তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। তারপর কৌশিকের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

তুলাধার যা-যা বলেছিলেন ব্যাধও প্রথমে তাই বললেন। সেই সর্বভূতে

দয়া, চিত্তের সমতা, দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর ভাব, সেই মান-অপমান, লাভ-অলাভ তুল্য জ্ঞান। তবে ব্যাধ আরো কিছু বেশি বললেন। সমাজ কল্যাণের জন্য চারি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ বৃত্তি পালনই স্বধর্ম পালন। তাতে সমাজে শৃঙ্খলা আসে শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই বর্ণধর্ম পালনে উচ্চ নীচ বলে কিছু নেই। রাজা হলেন সকল বর্ণের রক্ষাকর্তা। যে যার স্বধর্ম যদি পালন না করে তাহলে বর্ণসঙ্কর হয়। সমাজ উৎসন্নে যায়। বিকৃত হয়ে পড়ে। ধর্মব্যাধের মতে, এই যে বর্ণাশ্রম, তা সৃষ্টি হয়েছে জন্মসূত্রে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, শূদ্রের পুত্র শূদ্র। "কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং পরম্" (বনপর্ব, ২০৭/২০)। আমি যে কসাইখানায় বসে মাংস বিক্রয় করছি তাতে আমি দুঃখিত নই। বরং এই আমার ধর্ম লাভের পথ ও উপায়। তারপর ধর্মব্যাধ উপসংহার করলেন এই বলে, "বেদের সার সত্য, সত্যের সার দম, দমের সার হল ত্যাগ, ত্যাগের আশ্রয় শিষ্টাচার।"

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ।
দমস্যোপনিষৎ ত্যাগঃ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬৭
(বনপর্ব, ২০৭ অধ্যায়)

তুলাধারের চেয়ে ধর্মব্যাধ অনেক practical। ধর্মকে তিনি ব্যবহারিক জীবনে সমাজ বিজ্ঞানের কেন্দ্রে এনে স্থাপন করেছেন। সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তারও আভাস দিচ্ছেন। তাই এক ধাপ এগিয়ে বলছেন "শরীর একটা নদী, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার জল, জন্ম-মৃত্যুর দুর্গম প্রদেশে এই নদী বয়ে চলেছে।" ধর্ম মানুষের জীবন-তরী বেয়ে চলেছে। কর্ম হল জলস্রোত। নিষ্কাম কর্ম দিয়ে পাপীর পাপও ক্ষালন হয়—"কর্মণা যেন তেনেহ পাপাদ্"। (বনপর্ব, ২০৭/৫২)

কথায়-কথায় ধর্মব্যাধ আমাদের শ্রীকৃষ্ণের গীতার প্রায় কাছে এনে হাজির করেছেন। তবুও কোথায় একটা ব্যবধান রয়েছে দুস্তর। ধর্মব্যাধকে আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, স্বধর্ম আর স্বভাব কি সর্বদা এক হয়? জন্ম দিয়েই কি বর্ণ নির্ধারণ করা যায়? ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই কি সে ব্রাহ্মণ হতে পারে? অনেক সময় স্বভাবে সে চণ্ডালের অধম কি হয় না? বর্ণাশ্রম নির্ধারিত কর্মই কি কর্ম? কাকে বলি কর্ম? কর্মের স্রোতে এত যে ঘূর্ণিপাক তার সমাধান কে করবে? ধর্মব্যাধের কাছে তাই ধর্মের মেরুরেখার সন্ধান আমরা পেয়েও পেলাম না।

আর সেই সন্ধান জানা নেই বলে মহাভারতের সকল চরিত্রই জীবনের চরম এক-একটি সংকট মুহূর্তে বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করেন, এখন কি করব ?

পণ্ডিতের তর্কে তাত্ত্বিকের তত্ত্বে জীবনের সংক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বের মধ্যে ধর্মের পথ নির্দেশ পাওয়া যায় না। তখন মনে হবে যেন ধর্ম বলে কিছু নেই। ইন্দ্রজিতের হাতে মায়া-সীতা নিহত হয়েছেন শুনে বিহ্বল লক্ষ্মণও বলেছিলেন, "কোথায় ধর্ম ? অনর্থ থেকে ধর্ম তো আমাদের রক্ষা করল না ? চারিদিকে স্থাবর জঙ্গম দেখছি, কিন্তু ধর্ম তো দেখছি না। মনে হয় ধর্ম বলে কিছু নেই।"

ভূতনাং স্থাবরাণাঞ্চ জঙ্গমানাঞ্চ দর্শনম্।
যথাস্তি ন তথা ধর্মস্তেন নাস্তীতি মে মতিঃ ॥১৫
(রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৮৩ সর্গ)

রাজা উশীনর পড়েছিলেন তেমনি এক সংকটে।

শরণাগতকে রক্ষা করা রাজার ধর্ম। ব্রহ্মহত্যা গো-হত্যায় যে পাপ— শরণাগতকে পরিত্যাগ করাও সেই পাপ। রাজা রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় একটি কপোত শ্যেনপক্ষী দ্বারা তাড়িত হয়ে রাজার চরণে আশ্রয় নিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইল।

শ্যেনপক্ষী বলল, "রাজা, তুমি কপোতকে ছেড়ে দাও। আমি ক্ষুধার্ত। কপোত আমার ভক্ষ্য। ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করা তোমার অধর্ম।"

রাজা বললেন, "কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করা রাজার ধর্ম। অন্যথায় আমি ব্রহ্মহত্যার পাপী হব। তুমি ক্ষুধার্ত, বেশ তো, আমি তোমাকে উপযুক্ত পরিমাণ মাংস দিচ্ছি, তুমি তাই ভক্ষণ কর, কপোতকে ছেড়ে দাও।"

শ্যেন বলল, "কপোতের মাংসই আমার খাদ্য। আমি অন্য মাংস কেন গ্রহণ করব ? তবে যদি কপোতের প্রতি এতই দয়া হয় তাহলে কপোতের সমপরিমাণ মাংস তোমার দেহ থেকে কেটে আমাকে দাও।"

রাজা খুশি হয়ে তুলাদণ্ডে একদিকে কপোতকে রেখে অন্যদিকে নিজ দেহ থেকে মাংস কেটে-কেটে দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কপোতের ওজনের সমান হয় না। তখন রাজা নিজেই তুলাদণ্ডে গিয়ে বসে পড়লেন। এতক্ষণে দুই পাল্লা সমান হল। এখানেও দেখি সেই তুলাধারের তুলাদণ্ড। ধর্মকে পেতে চাও তো তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে তার সমান হও। শুধু দু-এক টুকরো মাংস কেটে দিলে হবে না। গোটা জীবন নিয়ে ধর্মের তুলাদণ্ডে গিয়ে বসতে হবে।

গল্পটা নিছক রূপক। সেই কপোত হলেন অগ্নি আর শ্যেনপক্ষী হলেন ইন্দ্র। তাঁরা উশীনরকে ধর্মের পরীক্ষা করছিলেন।

কিন্তু জীবন যে এক পিপাসার রঙ্গভূমি। এখানে সব কিছু চলেছে একটা দ্বৈতের দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে। জীবন তার সমস্ত গুণলক্ষণ নিয়ে তীব্র স্রোতের মত মিশ্র জটিল কুটিল গতি নিয়ে বয়ে চলেছে। নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কি ভাল আর কি মন্দ, কি সত্য আর কি মিথ্যা। হয়তো বলা গেলেও, একটা থেকে আর একটা পৃথক করা যায় না। স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ কোন অবিসংবাদী তত্ত্ব দিয়ে জীবনের এই জটিল জট ছাড়ান যায় না।

ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ তার লোকসিদ্ধি চিরকালই আপেক্ষিক। দেশ কাল পাত্র ভেদে মানুষে-মানুষে ধর্মের প্রয়োগ ভিন্ন-ভিন্ন। ধর্ম সবার ক্ষেত্রে এক রকম নয়। আবার একই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এক-এক সময় ধর্ম এক-এক রকম। শরশয্যায় ভীষ্ম ধর্ম প্রসঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে,—

স এব ধর্মঃ সোঽধর্মস্তং তং প্রতি নরং ভবেৎ।
পাত্রকর্মবিশেষেণ দেশ-কালাববেক্ষ্য চ ॥

(শান্তিপর্ব, ৩০৯/১৬)

স্বয়ং বেদব্যাসও যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, আমরা যাকে অধর্ম বলি তাও অনেক সময় আপেক্ষিকভাবে ধর্ম বলে স্বীকৃত—

স এব ধর্মঃ সোঽধর্মো দেশ-কালে প্রতিষ্ঠিতঃ।
আদানমনৃতং হিংসা ধর্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ ॥

(শান্তিপর্ব, ৩৬/১১)

ধর্মের তাই কোন ধরা-বাঁধা ছক নেই।

কিন্তু মহাভারতের তৎকালীন সমাজে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। জীবন যেমনই হোক, তাকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে কাঠামোতে ফেলে ঢালাই-পেটাই করার চেষ্টা হ'ত। যেটা সব সময় মিলন না হয়ে পীড়ন হয়ে উঠত। আর সকল পীড়নের চেয়ে উৎকট হল এই ধর্মের পীড়ন।

সকল জটিলতার মধ্যেও জীবনে একটা ভারসাম্য বৈদিক ঋষিরা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী কালে হারিয়ে-যাওয়া সেই ভারসাম্য আবার নতুনভাবে ফিরে এসেছিল উপনিষদের যুগে। তাই তাঁরা বলতে পেরেছিলে, কেবল শীল কেবল চাতুর্বর্ণ্যই ধর্ম নয়। চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেও ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন না,

তখন তিনি ধর্মকে সৃষ্টি করলেন। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১-৪-১১) অবিদ্যা মিথ্যা মৃত্যুকে বাদ দিয়ে নয়, তারই ভিতর দিয়ে, একটা তপে তেজে বীর্যে শোধন ও ঊর্ধ্বপাতনের ভিতর দিয়ে আমরা ধর্মকে পাব—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতং অশ্নুতে"। (ঈশোপনিষদ, ১১) অনেক সময় যা মিথ্যা, যা ঘোরকর্ম, যা নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যা তাই মহাভারতে ধর্ম হয়ে উঠেছে দেখি। মহাভারতে সেই অগ্নিদীক্ষার দরকার ছিল—কেননা মহাভারতের সমাজ উপনিষদের সেই এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠং তখনও পায়নি। তাই উপনিষদের যুগের পরে বিপর্যস্ত বিশৃঙ্খল সমাজে নতুন করে রক্ততিলক এঁকে ধর্মের সেই অগ্নিদীক্ষা দিতে এলেন কুরুক্ষেত্র-সারথি শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই মনে হয়, তাঁর অধরের বঙ্কিম হাসির কৌতুক রেখায় যেন ধর্মের গূঢ়রহস্য কাঁপছে। কেউ না পারলেও তিনি বলে দিতে পারেন, ধর্মের পথ কোথা দিয়ে কোথায় গেছে ? ধর্ম শান্তি না আগুন ? অমৃত না বিষ ? সৃষ্টি না প্রলয় ? বৃন্দাবন থেকে মথুরা—মথুরা থেকে কুরুক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র থেকে মহাপ্রস্থান—কোন্ পথ দিয়ে চলেছেন ধর্ম ?

[পনের]

ধর্ম—অধর্ম

না, স্থির করে কিছুই ধরা যায় না। সত্য বলে অবলম্বন হিসাবে যেখানেই আমরা পা রাখতে যাই, দেখি সে এক চোরাবালি। সব তলিয়ে যায়। ভাগ্যতরী হঠাৎ ডুবে যায় কোন্ পাষাণের ঘায়। জীবনে আমরা নিজেরাই নিজের শত্রু হয়ে উঠি—"আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"। আমরা ভাবি এক কার্যত হয় আর-এক—"অন্যথা চিন্তিতং কার্যমন্যথা তৎ তু জায়তে"। (কর্ণপর্ব, ৯/২০) তখন ধৃতরাষ্ট্রের মত আমাদেরও মন বলে, "এখন কোথায় যাব ? কাং দিশং প্রতিপৎস্যামি ?" আমাদের সকল ব্যর্থ মনস্কামের পিছনে বুঝি রয়েছে এমনি এক অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ছায়া, দুঃখে সন্তাপে সে বলে ওঠে, "মনুষ্য জীবনে ধিক, এর চেয়ে মরণ ছিল ভাল—ধিগস্তু খলু মনুষ্যং··· ···মরণং বহু মন্যতে।" (স্ত্রীপর্ব, অষ্টম অধ্যায়) জীবনের ঝড়ো বাতাসে প্রাণ তখন এমনি করে কেঁদে বেড়ায়। স্বপ্নের দিনগুলি সব কখন একসময় সোনার খাঁচা শূন্য করে হারিয়ে যায়।···

মহাভারতের সকলেই তো ধর্মের নামে একটা অটল ভূমিতে দাঁড়াতে চেয়েছেন, যে-যার বুদ্ধি বৃত্তি কর্ম নিয়ে চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো কিছুই দাঁড়াল না। সবশেষে মহাপ্রস্থানের ধূসর পর্বতচূড়া আর নির্জন আকাশের নিঃসীম প্রসার—আমাদের মনে স্থিরপটে আঁকা হয়ে যায় এক নির্জন শূন্য পৃথিবী—"নির্জনেয়ং বসুমতী শূন্যা" (স্ত্রীপর্ব, প্রথম অধ্যায়)।

কেবল অধার্মিক কপট খলবুদ্ধি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রই নয়, ধর্মস্বরূপ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও গান্ধারীর সামনে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে বলেন, "আপনার পুত্রহন্তা ক্রূরকর্মা পৃথিবী বিনাশের কারণ এই আমি যুধিষ্ঠির আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। দেবি, আমি আপনার অভিশাপের যোগ্য। আমাকে অভিশাপ দিন।"

> পুত্রহন্তা নৃশংসোঽহং তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ।
> শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শাপস্ব মাম্ ॥ ২৬
>
> (স্ত্রীপর্ব, ১৫ অধ্যায়)

এইসব দেখে শুনে মনে হয় ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ঠিক দানা বাঁধেনি। কেবল ঘটনার সংক্ষুব্ধ তরঙ্গ উত্তাল হয়ে জীবনের উপকূলে আমাদের আছড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তার অতল রহস্যের সন্ধান দেয় না।

ভগবান কেন যে কি করেন, কি করলে যে কি হয়, তার তল মানুষ বুদ্ধি বিচার দিয়ে কোনদিনই পাবে না। শুধু রূপ গুণ আকার বৈশিষ্ট্য দিয়ে ধর্মকে কখনই জানা যাবে না। তার রূপের পরিবর্তন হয়। গুণের বৈলক্ষণ্য আসে। অবস্থা অনুসারে কখনো সুন্দর কখনো ভয়ঙ্কর। কখনো শান্ত কখনো রুদ্র। মধুর বৃন্দাবন, আবার অমোঘ কুরুক্ষেত্র। ক্ষমা দয়া করুণার রূপ, আবার কখনো নিষ্ঠুর কঠোর করাল তার মূর্তি—ধর্মের সেই বিশ্বরূপ, অর্জুন যা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ধর্ম আলোর মত সব রং নিয়েও শুভ্র, কিন্তু তা আবার ফুলের মধ্যে রঙীন পাতার মধ্যে সবুজ এবং মাটির মধ্যে এসে কালো হয়ে যায়। তাই আলোকে পেতে হলে ওই কালোকে, তার বর্ণ-বৈচিত্র্যকে সবুজ শ্যামল বসুন্ধরাকে বাদ দেওয়া চলে না।

ধর্ম এবং অধর্ম, বিষ এবং অমৃত, সত্য এবং মিথ্যা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু নয়। ধর্মেরই বিকৃতি ব্যভিচার বা অপভ্রংশ হল অধর্ম। পরস্পরের মধ্যে শুধু একটা মাত্রা ও অনুপাতের পার্থক্য। ধর্ম-অধর্ম, "ভাল-খারাপ যমজ সন্তান, উভয়ের চেহারা একই ছাঁচের তবে একজন কালো আর একজন জ্যোতির্ময়, এই পার্থক্য। শয়তান যাহাকে বলি সে তো এক কালে ছিল এঞ্জেল—এঞ্জেলদের মধ্যে সেরা এঞ্জেল, তাহার নাম Lucifer—জ্যোতি যে লইয়া আসে—Son of the morning—ঊষার পুত্র।" (শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, 'রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯)…"সুতরাং ভালকে চাহিলে যে খারাপের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু করিতে হইবে, খারাপ যেদিকে চলিয়াছে ঠিক তাহার উল্টা দিকেই চলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বরং অনেক সময় দেখি খারাপ চলিয়াছে ভালর একেবারে গা ঘেঁষিয়া ; এক জায়গায় সামান্য একটু বাঁকিয়া মুচড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই ভাল হইতে হইতে একটা জিনিস খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, একটা উপাদান কোথাও একটু বেশি হইয়াছে কি কম হইয়াছে, অনুপান সামান্য কড়া হইয়াছে কি মিঠা হইয়াছে আর তাহারই ফলে অতি ভালকেও দেখা যাইতেছে অতি খারাপ।" (তদেব, পৃ. ১৪৯)

শ্রীনলিনীকান্তের এই উক্তির জীবন্ত উদাহরণ অন্যান্য অনেকের মতই প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র—যিনি বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞানে মহর্ষিতুল্য—"শ্রুতে মহর্ষিপ্রতিম" (কর্ণপর্ব, ৯/২)। অথচ যাঁর অধর্মের বক্রগতি দেখে আমাদের মন বারবার বিরূপ হয়ে ওঠে। সেই ধৃতরাষ্ট্রই বলছেন বিদুরকে, "বিদুর, তুমি আমাকে প্রতিদিন যে উপদেশ দাও, যা করতে বল, সে-সবই সত্য বলে জানি, আমিও তাই করতে চাই, পাণ্ডবদের আমি সর্বদা স্নেহ করি, কিন্তু যখনই

দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা হয় তখন আমার সব বুদ্ধি কেমন বিপরীত হয়ে যায়।"—

এবমেতদ্ যথা ত্বং মামনুশাসসি নিত্যদা।
মমাপি চ মতিঃ সৌম্য ভবত্যেবং যথাত্থ মাম্॥ ৩০
সা তু বুদ্ধিঃ কৃতাপ্যেবং পাণ্ডবান্ প্রতি মে সদা।
দুর্যোধনং সমাসাদ্য পুনর্বিপরিবর্ততে॥ ৩১

(উদ্যোগপর্ব, ৪০ অধ্যায়)

এই হল ধৃতরাষ্ট্রের মর্মের কথা। তাঁর প্রকৃত পরিচয়। এই কথা কয়টি যেন তাঁর জীবনের এপিটাফ্। ধর্ম কেমন করে হঠাৎ টাল-খেয়ে অধর্ম হয়ে ওঠে তারই এক নিখুঁত ছবি।

ধর্ম-অধর্ম সত্য-মিথ্যা চলেছে এমনি পাশাপাশি, অনেক সময় হাত ধরাধরি করে। "সত্যকে পাইতে হইলে তাই মিথ্যার পাশে পাশেই চলিতে হয়—মিথ্যাকে একান্ত অসত্য বলিয়া যে মিথ্যাকে সামনেই আনিবে না, তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া শত হস্ত দূরে চলিবে, সত্যের সন্ধান সে কখনই পাইবে কিনা সন্দেহ। এই কথাটিকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ বলিতেছে—

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতং অশ্নুতে।

মিথ্যার ধারে ধারে চলিতে হয়, কিন্তু অতি সন্তর্পণে, সজাগ হইয়া, দেখিয়া শুনিয়া, যাচাই বাছাই করিতে করিতে। তেমন ভাবে চলিবার কৌশল যে আয়ত্ত করিয়াছে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সেই অমৃতত্ব লাভ করে; আর তেমন চাতুর্য যাহার নাই, সে অমৃতত্ব লাভ করে না, মৃত্যুই আগে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।" (শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, 'রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯)

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সত্য-মিথ্যা ধর্ম-অধর্মের ধারণাকে সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিলেন। তিনি বললেন, "সত্য কথা বলা উত্তম। সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই। কিন্তু সত্যের যথার্থ স্বরূপ জানা অত্যন্ত কঠিন।"

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্॥ ৩১

(কর্ণপর্ব, ৬৯ অধ্যায়)

এই বলে হতবুদ্ধি অর্জুনকে আরো বিস্মিত করে দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে তিনি বললেন, "অনেক সময় সত্য মিথ্যা হয়ে যায়, মিথ্যা সত্য হয়ে ওঠে—তত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ।" (কর্ণপর্ব, ৬৯/৩৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "কেউ কেউ আছেন, ধর্মকে তর্ক-বিতর্ক দিয়ে জানতে চান, তাঁরা বলেন, বেদের উক্তি দিয়েই ধর্ম নিরূপিত হয়। আমি কোন পক্ষকেই ভাল কি মন্দ বলছি না। আমি শুধু বলি ধর্মকে জানতে হবে ধর্ম দিয়েই। (কর্ণপর্ব, ৬৯ অধ্যায়) "যদি দেখ যে সত্য কথা বললে অমঙ্গল হবে তাহলে চুপ করে থাকবে, যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সত্য না-বলে বরং মিথ্যা বলবে। অসত্যকে এখানে সত্য বলেই জানবে—শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্।" (কর্ণপর্ব, ৬৯/৬০)

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। অর্জুন তো আমাদের মতই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, শুধু সেই যুগেই নয়, আজকের যুগেও যাদের বীরত্ব আছে, সততা আছে, কিন্তু দূরদৃষ্টি নেই। আন্তরিক ভাবে ধর্ম পথেই চলতে চায় কিন্তু ধর্ম কি তা জানে না। তাই যুধিষ্ঠির যখন অর্জুনের গাণ্ডীবের অসম্মান করে কথা বললেন, তখন ক্রুদ্ধ অর্জুন খড়্গ তুলে যুধিষ্ঠিরকেই হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কেননা অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, গাণ্ডীবের অসম্মান যে করবে, সে যে-ই হোক, তাকে তিনি বধ করবেন। ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

—"এ কি ? তুমি খড়্গ হাতে নিয়েছ কেন ? কিমিদং পার্থ গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত ?"

—"আমি রাজাকে বধ করব। বধিষ্যামি রাজানং।"

শ্রীকৃষ্ণ কঠোর ভর্ৎসনা করে অর্জুনকে বললেন, "ধিক্ তোমাকে। তুমি নরাধম। তুমি মূর্খের মত কাজ করতে যাচ্ছ। যে ধর্মবিভাগ জানে সে কখনো এমন কাজ করতে পারে না। যে মূর্খ, যে অজ্ঞান, তার আচরিত ধর্ম নিয়ে আসে কেবল পাপ।"

এই বলে তিনি অর্জুনকে শোনালেন কৌশিক মুনির গল্প। ব্রাহ্মণ কৌশিক এক গ্রামে নদীর ধারে বাস করতেন। তিনি ঠিক করেছিলেন, সব সময় সত্য কথা বলবেন। আশপাশের সকল লোকে তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত। একদিন একদল ডাকাত কিছু লোককে তাড়া করে। লোকগুলো তখন প্রাণভয়ে বনের মধ্যে এসে লুকিয়ে পড়ে। ডাকাত দল এসে ওই কৌশিক মুনিকে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কোথায় পালিয়েছে ? আপনি তো সত্যবাদী, যদি জানেন তো সত্য করে বলুন ওরা কোথায় ?"

কৌশিক সত্যবাদী। অতএব ডাকাত দলকে তিনি বলে দিলেন, "ওই জঙ্গলে তারা লুকিয়ে আছে।" তখন ডাকাতরা গিয়ে তাদের মেরে ফেলল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "এই কৌশিক ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানেন না। তাঁর ওই সত্য কথা এখানে ঘোর পাপ সৃষ্টি করেছে।"

যতবড় সত্যই হোক আসলে অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তা আপেক্ষিক। প্রাসঙ্গিক সেই সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সত্য আর সত্য থাকে না, তা হয়ে পড়ে আমাদের বুদ্ধির ফাঁস, মতবাদের গোঁড়ামি। জীবনকে তা সংকীর্ণ করে, বিভ্রান্ত করে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বললেন অর্জুনকে, "তুমি কবে অবোধ বালকের মত কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে সেই অনুসারে আজ নিতান্ত মূর্খের মত ধর্মের নাম করে অধর্ম করতে চলেছ।" (কর্ণপর্ব, ৬৯/২৭)

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য : "Every truth, however true in itself, yet, taken apart from others which at once limit and complete it, becomes a snare to bind the intellect and a misleading dogma ; for in reality each is one thread of a complex weft and no thread must be taken apart from the weft." (*Essays on the Gita*, 1937, p. 313)

এই জীবন ও জগৎ জটিল মিশ্র উপাদানে গড়া। জীবনের ধর্মও তাই জটিল হতে বাধ্য। এক অবস্থায় যা ধর্ম পরিবর্তিত অবস্থায় তা আর তেমন থাকছে না। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম এবং বহুমুখী—"সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্মস্য বহুশাখা হ্যনন্তিকা" (বনপর্ব, ২৯০ অধ্যায়)।

প্রত্যেকটি মানুষ তো আলাদা আলাদা। কেউ কারো মত নয়। তাদের স্বভাবের অন্তরাত্মার ধারাও ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের সমাজও তাই জটিল এবং মিশ্র। সমাজকে শ্রীঅরবিন্দ প্রধানত তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। (দ্রষ্টব্য : 'মূল বাংলা রচনাবলী' পৃ. ১৩২-৩৩) (১) শরীরপ্রধান প্রাণনিয়ন্ত্রিত মানুষ, স্বার্থপ্রণোদিত কামতাড়িত, পারস্পরিক সংঘাতে যে ব্যবস্থা সুবিধাজনক তাকেই তারা "ধর্ম" বলে। (২) বুদ্ধিপ্রধান মানুষ তার কাম ও স্বার্থকে বুদ্ধি দিয়ে শাসন করে চলে, এই নিয়ন্ত্রণের শাসনের যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশীলন তাকেই তারা "ধর্ম" বলে। (৩) আত্মপ্রধান মানুষ বুদ্ধি মন প্রাণ শরীরের অতীত যে আত্মার সন্ধান পেয়েছে, আত্মজ্ঞানেই যে জীবনের গতি প্রতিষ্ঠা করে, তাকেই সে "ধর্ম" বলে। মন বুদ্ধি আবেগ বাসনা যে ধর্ম রচনা করে তা খণ্ডিত ধর্ম, যেন গোধূলির অস্পষ্ট ছায়াপাত। শরীর ও প্রাণপ্রধান প্রথম অবস্থা থেকে বুদ্ধিতে উঠে দাঁড়ান এবং বুদ্ধির দ্বিতীয় অবস্থা থেকে বুদ্ধির অতীত আত্মায় ধাপে-ধাপে মানুষ উঠে চলে—এই হল জীবনের ঊর্ধ্বায়নী

পর্বত আরোহণ। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি বলেছেন, "এক আলোক-স্তম্ভের মত এই ঊর্ধ্ব সোপান ধরে মানুষ উঠে চলেছে। ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বতর ক্ষেত্রে মানুষ যতই আরোহণ করে ততই তার সম্মুখে প্রকট হয় আরো বহুতর করণীয় কর্ম—উদ্বংশমিব যেমিরে। যৎসানো সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বং..." (ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, দশম সূক্ত, ১-২)।

এই ঊর্ধ্বারোহণে মানুষ বাঁধা রয়েছে তিনটি বাঁধনে। পায়ে তার জড়ের বাঁধন, বুকের কাছে প্রাণ তাকে বেঁধে রেখেছে, আর মাথা বাঁধা রয়েছে বুদ্ধির পাশে। ধর্ম মানুষের এই তিনটি বাঁধন খুলে মুক্ত করতে চাইছে। সেই শাশ্বত সনাতন ধর্ম যার প্রেরণায় এই নিখিল বিশ্ব চলেছে। এই বাঁধন-টোটার শিকল ভাঙার গান গাইছেন ঋগ্বেদের শুনঃশেপ ঋষি, "উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত। আবাধমানি জীবসে ॥" (ঋগ্বেদ, ১-২৫-২১) —*আমাদের উপরের বাঁধন উপর দিয়ে খুলে দাও। মধ্যের পাশ খুলে দাও, নীচের পাশ খুলে দাও। আমাদের মুক্ত হয়ে বাঁচতে দাও।*

ধর্মের যেমন বিবিধ গতি, তেমনি আবার প্রত্যেক ধর্ম ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হয়ে উঠেছে। একই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ধর্ম তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। অনেক সময় এই সব ধর্মগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তাতেই আমাদের জীবনতরী টালমাটাল হয়ে ওঠে। ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে স্তরে দাঁড়িয়ে সেই অনুসারে তার থাকে একটা ব্যক্তিগত ধর্ম, বংশ হিসাবেও থাকে তার একটা কুলধর্ম, জাতি হিসাবে জাতিধর্ম, বর্ণ বা বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম, আবার একটা বিশেষ যুগে বাস করে বলে তার থাকে একটা যুগধর্ম, এই সবকিছুর উপরে রয়েছে মানুষের অন্তরাত্মার এক সনাতন ধর্ম। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ধর্ম তার কুলধর্ম, জাতিধর্ম যুগধর্মকে স্বীকার করবে, নইলে সমাজে ও জীবনে বিশৃঙ্খলা ধর্মসঙ্কর সৃষ্টি হবে। ক্ষুদ্র ধর্মগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ধর্মগুলির অংশ হিসাবে কাজ করবে। যদি তা না-করে, যদি ধর্মবিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ক্ষুদ্র ধর্ম ত্যাগ করে বৃহৎ ধর্ম গ্রহণ করবে এবং সব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাতে শরণ নেবে—"সর্বধর্মানাং পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ।" (গীতা, ১৮/৬৬)।

এই হচ্ছে ধর্মের সোপান। বিদুরও দিচ্ছেন একই উপদেশ—

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ ১৭

(উদ্যোগপর্ব, ৩৭)

(কুলধর্ম রক্ষার জন্য একজন মানুষকে, গ্রাম রক্ষার জন্য কুলকে, দেশ রক্ষার জন্য গ্রামকে এবং আত্মার কল্যাণের জন্য সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করবে।)

বিদুরের মত ঠিক একই ভাষায় একই উপদেশ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ কৌরব রাজন্যদের (উদ্যোগপর্ব, ১২৮/৪৯)।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকে এমনি করে এক বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিরাচরিত যত নীতিশাসন সেসব এক আপেক্ষিক তত্ত্বে বিধৃত করলেন। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-অসত্য, ধর্ম-অধর্ম, গুণাগুণ, তখন আর অবিসংবাদী থাকল না। তিনি বললেন, "যাকে অন্যায় বলে ভাবছ, তাই অনেক সময় হয়ে ওঠে একমাত্র ন্যায়, মন্দ বলে অসত্য বলে অধর্ম বলে যাকে অস্বীকার করতে চাইছ, এক বৃহত্তর সূক্ষ্মতর ধর্মের বিধানে অনেক-সময় তাই হয়ে ওঠে একমাত্র ভাল, একমাত্র সত্য, একমাত্র ধর্ম।" শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টত মহাভারতে মনুসংহিতার গণ্ডি পেরিয়ে গেলেন। স্থানে স্থানে বেদকেও দিলেন প্রচণ্ড নাড়া। তিনি বললেন, "বিচারবিহীন হয়ে বেদবাদে অনুরক্ত যারা, যারা স্বর্গকামী, জন্মকর্মফলদায়ী ক্রিয়াকর্মে নিরত, যারা নানা রকম শ্রুতি-মধুর কথা বলে, তারা বিভ্রান্তচিত্ত (অপহৃতচেতসাং), তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেদসমূহ ত্রিগুণাত্মক। অর্জুন, তুমি ওই তিন গুণ ছাড়িয়ে ত্রিগুণাতীত হও—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" (গীতা, ২/৪২-৪৫)

তাই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, মহাভারতের সময়ে রক্ষণশীল সমাজের প্রধানগণ কেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতখানি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা ভাবতেন ধর্মলঙ্ঘনকারী দুরাচারী বিদ্রোহী বলে।

এই প্রতিক্রিয়া তো স্বাভাবিক।

অল্পবিস্তর সকলের ভাগ্যেই তা ঘটেছে।

এমনি সঙ্কট এসেছিল রাজমাতা গান্ধারীর জীবনে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত দুর্যোধনের ধূলিলুণ্ঠিত দেহের উপরে শোকাহত গান্ধারী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করে সাশ্রুনেত্রে ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "বৃষ্ণিনন্দন, এই সর্বনাশা যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন দুর্যোধন আমার সামনে এসে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছিল, 'মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। আমি যেন যুদ্ধে জয়ী হই। জয়মম্বা ব্রবীতু মে'।" (স্ত্রীপর্ব, ১৭ অধ্যায়)

"কিন্তু আমি জানি, কি ঘটতে চলেছে। আমার জীবনে সে এক মহা-সঙ্কট উপস্থিত হল। আমি তাকে কি বলব? শেষ পর্যন্ত বলেছিলাম, 'বৎস, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়'।"

ধর্মসাধ্বী গান্ধারী, তবু তিনি জননী। কোন্ ধর্ম রাখবেন তিনি?

তাঁর সম্মুখে নতজানু পুত্র।

ম্লানমুখে মিনতি করে প্রার্থনা করছে মায়ের আশীর্বাদ। মা তিনি। স্নেহাতুর ওই পুত্রের মুখে তিনি স্তন্যসুধা দিয়েছেন। কতদিন কত রাত্রি মায়ের কল্যাণদৃষ্টি নিয়ে ওই করুণ মুখখানির উপর স্নেহের জ্যোৎস্না বুলিয়ে দিয়েছেন। আজ সেই স্নেহের পুত্র উৎকণ্ঠিত মুখ তুলে নতজানু হয়ে বলছে, "মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।"

কিন্তু গান্ধারী পারলেন না।

মায়ের চোখের জল আর পুত্রের বুকের রক্ত দিয়ে সেদিন লেখা হল সেই ভয়ঙ্কর বাণী—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।—গান্ধারীর সেই বাণী আজো ভারতবর্ষের ভাবের আকাশে সপ্তর্ষির জ্যোতি নিয়ে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। চিরকাল করবে।

যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে, যুদ্ধের ঠিক আগে, কৌরবপক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবশিবিরে যোগ দিলেন (ভীষ্মপর্ব, ৪৩ অধ্যায়), তখন তাঁর পিছনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সমবেত ধিক্কার। সে কুলধর্মত্যাগী, সে বংশের কুলাঙ্গার, ভাই বন্ধু জ্ঞাতির প্রতি সে বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু অন্তরের বৃহত্তর ধর্মবোধ এমনি করে ক্ষুদ্র ধর্ম ত্যাগ করতে যুযুৎসুকে সাহস দিয়েছিল।

তেমনি আবার আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি ও কুলকে ত্যাগ করেছিলেন বিভীষণ। ইন্দ্রজিৎ তাই বিভীষণকে ধিক্কার দিয়ে বলছে, "তোমার লজ্জা করে না? তুমি নিজের বংশ কুল স্বজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শত্রুকে সাহায্য করছ?"

বিভীষণ শান্তভাবে তার উত্তর দিলেন, "যদিও আমি রাক্ষসকুলে জন্মেছি, তবু আমার স্বভাবধর্ম সে রকম নয়। মানুষের যে শ্রেষ্ঠধর্ম আমি তাই আশ্রয় করেছি। যদি তোমার গৌরব থাকে তাহলে তুমিও এই শত্রুভাব ত্যাগ কর।"

> রাক্ষসেন্দ্রসুতাসাধো পারুষ্যং ত্যজ গৌরবাৎ।
> কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্॥
> গুণো যঃ প্রথমো নৄণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্॥ ১৯
>
> (রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৮৭ সর্গ)

কিন্তু জীবনে এমনি করে শ্রেষ্ঠধর্মকে অবলম্বন করা সহজসাধ্য নয়। এই মাটির টান, নিম্নতর সত্তার মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা কঠিন। সত্তার সহস্র

নাড়ীতে লাগে টান। অন্তরটা যেন ছিঁড়ে যেতে থাকে। অনেক বেদনায় সেই পথ পার হতে হয়। দুর্বলের জন্য এ পথ নয়। ধর্মকে লাভ করতে হলে আগে নিজের ভিতরে সকল দুর্বলতাকে শক্তির খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করতে হবে—"বজ্রং ঘনা দদীমহি" (ঋগ্বেদ, ১-৮-৩)—এই শক্তির খড়্গ যে পায়নি, ধর্ম তার কাছে দূরের বস্তু। ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ধর্ম হল ভয়ঙ্করপথ-বাহী—"আ যাতং রুদ্রবর্তনী" (ঋগ্বেদ, ১-৩-৩)। যাঁরা সেই পথ দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে চোখের জল দিয়ে পথের আঁধার পার হতে হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য যখন শেষরাত্রে নিদ্রিত বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে যাচ্ছেন সন্ন্যাসে, তখন তাঁর দুই চোখে যে অশ্রুর ধারা তার বেদনা অনুভব করবে কে?

বিভীষণও ইন্দ্রজিৎকে বধ করবার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারছেন না, লক্ষ্মণকে বলছেন, "আমার চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।" (রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৮৯ সর্গ)

আবার পরাজিত কৌরব শিবিরে যুযুৎসুর নীরব অনুগমন তাঁর অন্তরের মৌন ব্যথাকেই প্রকাশ করে না কি? যুযুৎসু চিরকালই গম্ভীর, এখন যেন আরো গম্ভীর। তার সকল রণসাজ বক্ষ-আবরণের অন্তরালে বুকখানা যে ভেঙে যাচ্ছে সে কথা কজন জানে?

যুযুৎসুর এই অন্তরের ব্যথার তুলনা আমরা দিতে পারি এযুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে সুপ্রিয়ের মধ্যে।

সুপ্রিয় তার প্রাণপ্রতিম বন্ধু ক্ষেমংকরের গোপন রাজদ্রোহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল রাজাকে জানিয়ে দিয়ে। ক্ষেমংকর হল বন্দী। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

তখন শৃঙ্খলিত ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে প্রশ্ন করল ক্রুদ্ধ বিস্মিত কণ্ঠে, "সুপ্রিয়, বন্ধু, তুমি?"

সুপ্রিয় উত্তরে বলল, চোখে তার জল,

"বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিঃশ্বাস—
প্রাণসখে, ধর্ম সে আমার।"

(—রবীন্দ্রনাথ, 'মালিনী')

ধর্ম তাই কেবল জ্ঞানীর তত্ত্বদর্শীর তপস্বীর জন্যই নয়, ধর্ম এক সাধারণ লোকব্যবহার—"ধর্মস্যাখ্যা ব্যবহার ইতীষ্যতে" (শান্তিপর্ব, ১২১/৯)—ধর্ম প্রতিটি মানুষের আত্মার নিঃশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ জানেন, সব মানুষ এক ছাঁচে গড়া নয়। সমাজধর্ম অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্য যেমন সত্য তেমনি মানুষের স্বভাববৈশিষ্ট্যও সমান সত্য। তাই তিনি চাতুর্বর্ণ্যকে ধর্মব্যাধের মত জন্মগত বলে মানেন না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সমাজে চাতুর্বর্ণ্য মানুষের গুণকর্মের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" (গীতা, ৪/১৩)। মানুষের এই গুণকর্মবিভাগ তিনি করেছেন মনুসংহিতার বিধানকে ধরে নয়, মানুষের স্বভাবের মনস্তত্ত্বের গতি অনুসারে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন গুণ এককভাবে বা মিশ্রভাবে মানুষের নানা রকম স্বভাব প্রকৃতি সৃষ্টি করে। সেই স্বভাবকে প্রকৃতিকে দমন নিগ্রহ বা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। সকল প্রাণীই নিজ নিজ স্বভাবকে অনুসরণ করে চলে, তাকে নিগ্রহ করে কি ফল হবে? "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।" (গীতা, ৩/৩৩) এই স্বভাবকে আশ্রয় করাই শ্রেয় ("শ্রেয়ান্ স্বধর্মো"—গীতা, ৩/৩৫), স্বভাবের অনুকূল নয় এমন আচরণে ধর্ম নেই, তা ভয়ানক ("পরধর্মো ভয়াবহ"—গীতা, ৩/৩৫), মানুষের এই স্বভাবই অধ্যাত্ম—"স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" (গীতা, ৮/৩)। মানুষের যা "স্বধর্ম" তাই তার "স্বভাবনিয়তং কর্ম" (গীতা, ১৮/৪৭) আর একেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন "সহজং কর্ম" (গীতা, ১৮/৪৮)।

এইভাবে মানুষের গুণত্রয়বিভাগ করে (গীতা, ১৪ অধ্যায়) তার "প্রকৃতি" "স্বভাব" এবং "স্বধর্মকে" এক সহজ ধর্ম হিসাবে বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীকৃষ্ণ। বেদ, মনুসংহিতা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, এসবের মূল প্রেরণাকে সমন্বিত করে ধর্ম সম্বন্ধে এক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিলেন তাঁর নিষ্কাম কর্মে; বললেন, "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি" (গীতা, ২/৪৮)। সকল কর্মের ভিত্তি হল এই নিষ্কাম ধর্ম। মহাভারতে "যোগ" ও "সন্ন্যাস" সম্বন্ধে যে চলতি ধারণা ছিল শ্রীকৃষ্ণ তাকেও নতুন অর্থে নতুন সংজ্ঞায় লোকায়ত করে তুললেন। তিনি বললেন, সন্ন্যাস মানে কর্মত্যাগ নয়, কর্মের আসক্তি, কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা, "আমি কাজ করছি" এই অহংবোধ ত্যাগ করা। কর্ম ভগবানের শক্তি থেকে জাগছে—"কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" (গীতা, ৩/১৫), কর্মকে তাই বাইরের থেকে ত্যাগ করা নয়, মনে-মনে কর্মের সকল আসক্তি ত্যাগ করা ("সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য"—গীতা, ৫/১৩), এই হল প্রকৃত সন্ন্যাস ও যোগ।

কর্ম অপেক্ষা কর্মত্যাগকে যে সন্ন্যাস বলে জানে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সে ব্যক্তি দুর্বল। তার জ্ঞান গভীরে পৌঁছায়নি। তার জ্ঞান ভাসা-ভাসা। "তত্র যোঽন্যং কর্মণঃ সাধু মন্যেন্মোঘং তস্যালপিতং দুর্বলস্য" (উদ্যোগপর্ব, ২৯/৮)। জীবনবিমুখ আকাশচারী কমলভুক জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত

নয়। তিনি বলছেন, পণ্ডিতের জ্ঞানীরও আহার দরকার আছে—"বিদ্যানপীহ বিহিতং ব্রাহ্মণানাম্‌" (উদ্যোগপর্ব, ২৯/৬)।

জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হবে কর্মে এবং কর্ম স্ফুরিত হবে ভক্তিতে। জ্ঞানই ভক্তি, ভক্তিই কর্ম। এমনি করে তিন পথকে এক পথে এনে গীতার দীর্ঘ আঠারটি অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন ধর্মের গুহ্যতম রহস্য—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬
(গীতা, ১৮ অধ্যায়)

(আমাতে মন দাও, আমাকে ভক্তি কর, আমাকেই প্রণাম কর, পূজা কর। তুমি যে আমার প্রিয়, তাই তোমাকে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি আমাকে পাবে। সকল ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাতেই শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ ও অশুভ থেকে মুক্ত করব। দুঃখ ক'রো না।)

এক কথায় আত্মসমর্পণ। এই সমর্পণের ভিতর দিয়ে ভগবানের শক্তি আমাদের জীবনে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রীকৃষ্ণের মূল ধর্মতত্ত্ব হল এই সমতা, অনাশক্তি, কর্মফলত্যাগ, নিষ্কাম কর্ম, গুণাতীতত্ব, স্বধর্ম সেবা এবং আত্মসমর্পণ। এই শিক্ষাকেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের গূঢ়তম রহস্য বলে কীর্তন করেছেন। আর এই ধর্ম সকলের জন্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, পাপযোনি, সকলেরই জন্য। মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের এই নবধর্ম ভারতবর্ষে এক সময় সার্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের পূজা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। হরিবংশ ও পুরাণ-গুলির বর্ণিত উপাখ্যানে এই সত্যই ইঙ্গিত করে। এইভাবে ঋগ্বেদের শুনঃশেপ ঋষির প্রার্থনা পূর্ণ করে, আমাদের মাথার বুকের পায়ের যত আসক্তির বাঁধন খুলে দিয়ে, অবাধ মুক্তির মধ্যে এনে, শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে ধর্মের এক বিপ্লব নিয়ে এলেন। তাই নারদ করজোড়ে বিষ্ণুকে বলছেন, "তুমিই ভারতবর্ষের কার্যানুষ্ঠানের গুরু—ত্বং ভারতে কার্যগুরুস্ত্বং।" (হরিবংশ, প্রথমপর্ব, ৫৪ অধ্যায়)।

[ষোল]

পতঙ্গের পাখা ওঠে

পাপ কখনো একা থাকে না।

অজ্ঞাত কোন্ গন্ধর্বের হাতে সেনাপতি কীচক নিহত হয়েছে। তাই শুনে সেনাবিভাগে কীচকের অনুগামী যত দুর্ধর্ষ সৈনিক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চারিদিক থেকে কাতারে-কাতারে মশাল হাতে নিয়ে ছুটে আসতে লাগল।

রাজা নিজেও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

এত কাণ্ডের মূলে ওই সৈরন্ধ্রী। জনতার সব রাগ গিয়ে পড়ল তাঁর উপর।

হঠাৎ তারা দেখল অন্তঃপুরে একটা থামে হেলান দিয়ে কম্পিত বনলতার মত ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সৈরন্ধ্রী।

সমস্বরে তারা চিৎকার করে উঠল "ধর, ওই কুলটাকে। কীচকের সঙ্গে এক চিতায় ওকেও আমরা পুড়িয়ে মারব। দেখি, কোন গন্ধর্বস্বামী ওকে রক্ষা করে।"

সবাই মিলে জোর করে সৈরন্ধ্রীকে ধরে কীচকের শবাধারের সঙ্গে বেঁধে রাজাকে বলল, "আমরা এই কুহকিনী নারীকে কীচকের চিতায় পুড়িয়ে মারব।"

সৈন্যদের উন্মত্ত ক্রোধের সামনে অসহায় রাজা ভীত হয়ে সম্মতি দিলেন।

গুণ্ডার দল তখন চিৎকার করতে-করতে শবযাত্রা করে চলল শ্মশানের পথে।

সৈরন্ধ্রী নিরুপায়। করুণ আর্তকণ্ঠে পাণ্ডবদের গুপ্ত নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, "জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন, জয়দ্বল, তোমরা কোথায়? দেখ, তোমাদের পত্নীকে বেঁধে নিয়ে চলেছে।"

গুণ্ডাদের অট্টহাসি আর চিৎকারের মধ্যে সেই আর্তনাদ আর শোনা গেল না।

কিন্তু পাচকবেশী ভীম শুনেছেন সেই করুণ কণ্ঠ।

যেন ক্রোধে কালান্তক যম জিঘাংসায় স্ফীত হয়ে রাজপ্রাসাদের প্রাচীর টপ্‌কে শ্মশানের দিকে ছুটে চললেন দাবাগ্নির মত ভীম।...

শ্মশানে তখন সবে চিতা জ্বালান হচ্ছে। হাত-পা-বাঁধা সৈরন্ধ্রীকে নিয়ে গুণ্ডার দল কোলাহল করছে। এমন সময় প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ উৎপাটন করে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত হুঙ্কার দিয়ে এসে দাঁড়ালেন ভীম।

দুবৃত্তরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপতে লাগল। কিন্তু পালাবার পথ পেল না। ভীমের হাতে সকলেই নিহত হল।

ভীম অশ্রুমুখী সৈরন্ধ্রীকে বন্ধন মুক্ত করে বললেন, "ভয় নেই। তুমি রাজবাড়ীতে ফিরে যাও। আমি অন্য পথ দিয়ে রাজার রন্ধনশালায় ফিরছি।"...

এমন চাঞ্চল্যকর খবরে নগরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। আশঙ্কায় জল্পনা-কল্পনায় চারিদিকে সোরগোল উঠল। একি কাণ্ড! একটা সুন্দরী নারীকে নিয়ে দুদিন ধরে রাজধানীতে একি হত্যাকাণ্ড চলেছে! আততায়ী কে তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু পরপর নিহত হয়ে চলেছে রাজ্যের যত দুর্ধর্ষ সেনা ও সেনাপতি।

নগরবাসীরা এসে রাজাকে বলল, "মহারাজ, আপনার রাজত্বে বিপদ উপস্থিত। একটি রমণীর জন্য যাতে এই নগর ধ্বংস না হয় তার উপায় বিধান করুন।"

রাজা নিজেও আকস্মিক ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। বললেন, "আগে সেনাপতি কীচক ও তার নিহত অনুচরবর্গের সৎকারের ব্যবস্থা কর। তারপর আমি দেখছি কি করা যায়।"

রাণীকে ডেকে রাজা বললেন, "সুদেষ্ণা, শুনেছ তো সব? ওরা বলে গেল, সৈরন্ধ্রী শ্মশান থেকে স্নান করে একা-একা রাজবাড়ীতে ফিরে আসছে। পথে তাকে যে দেখছে সেই ভয়ে পালাচ্ছে। না-জানি তার গন্ধর্বপতিরা ক্রুদ্ধ হয়ে আরো কি কাণ্ড করে। সৈরন্ধ্রী এলে তুমি তাকে বলে দিও, সে যেন এক্ষুনি এই রাজ্য ছেড়ে চলে যায়।"

শঙ্কিতা হরিণীর মত সৈরন্ধ্রী রাজবাড়ীতে প্রবেশ করছেন। সকলে ভয়ে-ভয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কোন কথা বলছে না। দাসদাসীরা এত ভয় পেয়েছে যে, তাঁকে দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেলছে।

রন্ধনশালার দ্বারে দাঁড়িয়ে বলগর্বিত পাচকবেশী ভীম। সাদর দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে। সৈরন্ধ্রী একটু মৃদু হেসে প্রণয়নম্র চোখে ভীমের দিকে তাকিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বললেন, "গন্ধর্বরাজকে প্রণাম। তিনি আজ আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন।"

ভীম বললেন, "যে গন্ধর্বপুরুষেরা তোমার বশবর্তী হয়ে আছেন, তোমার কথা শুনে তাঁরা নিশ্চয়ই ঋণমুক্ত হলেন।"

কেউ কিছু বুঝল না, অথচ দুজনের কথা হয়ে গেল। হৃদয়ের গভীর প্রেম ও কৃতজ্ঞতা জানান হল। এমন তির্যক্ সাংকেতিক ভাষায় সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে হৃদয়ের কথা যে এত গভীর করে বলা যায়, তা এই দুটি ছোট্ট সংলাপ না পড়লে বোঝা যায় না। যে কোন শক্তিমান্ ঔপন্যাসিকের লেখনী বেদব্যাসের এই প্রতিভার কাছে বিস্ময় মানবে।

রন্ধনশালার দ্বার পেরিয়ে এবার সৈরন্ধ্রী চললেন অন্তঃপুরের নৃত্যশালার সামনে দিয়ে। ঘটনা সন্নিবেশ লক্ষ্য করবার মত। সেখানে যুবতী রাজ-কন্যাদের নিয়ে নৃত্যগীত শিক্ষা দিচ্ছেন বৃহন্নলাবেশী অর্জুন। নাচে গানে সুরে সংগীতে মূর্ছনামুখর সেই পরিবেশ।

হঠাৎ লাঞ্ছিতা অশ্রুবিধুরা ম্লানমুখী করুণদৃষ্টি সৈরন্ধ্রীকে দেখে গান থেমে গেল, বীণার ঝঙ্কার নূপুরের শিঞ্জন স্তব্ধ হল। হতবাক হয়ে অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সৈরন্ধ্রী, তুমি কেমন করে মুক্ত হলে? সেই দুর্বৃত্তরাই-বা কেমন করে নিহত হল? তোমার কাছে শুনতে চাই।"

অর্জুনের কথা শুনে অভিমানে ব্যথায় তাঁর চোখ ফেটে জল এল, "বৃহন্নলে, তুমি তো মেয়েদের নিয়ে অন্তঃপুরে বেশ সুখেই আছ। আজ আর তোমার সৈরন্ধ্রীর কথায় কাজ কি? সৈরন্ধ্রীর দুঃখ তুমি কি বুঝবে? তাই তো এমন হাসতে-হাসতে দুঃখিনীকে এমন করে জিজ্ঞাসা করতে পারছ।"

> বৃহন্নলে কি নু তব সৈরন্ধ্র্যা কার্যমদ্য বৈ।
> যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্ ॥ ২১
> ন হি দুঃখং সমাপ্নোসি সৈরন্ধ্রী যদুপাশ্নুতে।
> তেন মাং দুঃখিতামেকং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব ॥ ২২
>
> (বিরাটপর্ব, ২৪ অধ্যায়)

নারীর অন্তরের তীব্র দুঃখ বক্ষ ভেদ করে ক্ষোভে অভিমানে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ফেটে পড়ছে। দ্রৌপদীর এই দৃষ্টি এই কণ্ঠস্বর আমরা বারবার পেয়েছি, দেখেছি সেই বহ্নিশিখার রৌদ্রপ্রভা।

অর্জুনের কণ্ঠে তখন অনুতাপ, "কল্যাণি, তুমি তো জান না ক্লীব হয়ে থাকার কি দুঃখ! তুমি দুঃখ পেলে কার না দুঃখ হয়! কার বুকে যে কত ব্যথা তা কেউ বুঝতে পারে না। আমাকে তাই তুমিও বুঝতে পারছ না—বেদিতুং শক্যতে নূনং তেন মাং নাববুধ্যসে।"

সৈরন্ধ্রীকে ফিরে পেয়ে রাজকন্যারা খুব খুশি। তারা তাঁকে অন্তঃপুরে রাণীর কাছে নিয়ে গেল।

রাণী সুদেষ্ণা একেই তো ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকাহত, তার উপর একের পর এক এই যত অঘটন, মনটা তাঁর বিরূপ হয়ে আছে। সৈরন্ধ্রীকে দেখা মাত্র সুদেষ্ণা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "বাছা, তুমি এক্ষুনি যেখানে খুশি চলে যাও। তুমি থাকলে এ রাজ্যের অমঙ্গল হবে। তুমি যুবতী, তুমি অতুলনীয়া সুন্দরী, আর পুরুষেরাও বড় লোভী, তোমার গন্ধর্বপতিরাও অত্যন্ত ক্রোধী। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। রাজা নিজেও ভয় পাচ্ছেন। তুমি এখনই চলে যাও।"

সৈরন্ধ্রী বললেন, "রাজ্ঞি, আর মাত্র তেরটা দিন আমাকে আশ্রয় দিন। আমি আপনার কাছে মিনতি করে ভিক্ষা চাইছি। তের দিন পরে আমার গন্ধর্বপতিরা আমাকে নিয়ে যাবেন। তাঁরা যদিও বলগর্বিত, কিন্তু তাঁরা সাধু, তাঁরা কৃতজ্ঞ, তাঁরা আপনাদের মঙ্গলই করবেন।"

সুদেষ্ণা তখন বললেন, "দেখ বাছা, যা ভাল হয় তাই কর। আমার স্বামী পুত্রদের তুমি রক্ষা ক'রো।"

এদিকে হস্তিনাপুর রাজসভা।
মন্ত্রণায় বসেছে দুর্যোধন।
তাকে ঘিরে বসে আছে, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি।
আর আছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ।

দুর্যোধন উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত। ললাটে তার ক্রূর রেখা ফুটে উঠেছে। অস্থির হয়ে বারবার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করছে, "পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হতে তো আর মাত্র কিছুদিন বাকী। গুপ্তচরেরা এখনো তাদের কোন সন্ধান আনতে পারল না। আশ্চর্য..."

গুপ্তচরদের শেষ দলটি ফিরে এল।

হতাশ হয়ে তারা দুর্যোধনকে বলল, "রাজন্, আমরা তন্নতন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখছি। গ্রাম, নগর, অরণ্য, পর্বত, পান্থশালা, মন্দির, গুহা, শ্মশান কোথাও বাদ দিইনি। কিন্তু পাণ্ডবদের কোন সন্ধানই আমরা পাইনি।"

—"সে কি ? তারা তবে গেল কোথায় ?"

—"পাণ্ডবদের সারথিদের সংবাদ পেয়েছি। তারা সবাই দ্বারকায় আছে। কিন্তু দ্বারকাতে দ্রৌপদীও নেই, পঞ্চপাণ্ডবও নেই। তাদের দেখা তো দূরের

কথা, তাদের কোন হদিশই আমরা পাইনি। মহারাজ, আমাদের মনে হয়, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী কেউই আর জীবিত নেই।

"তবে উপস্থিত এখানে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার জন্য একটা সুসংবাদ আছে। আমরা অনুসন্ধান করতে-করতে দক্ষিণে তাঁর শত্রুদেশ মৎস্য রাজ্যে গিয়েছিলাম। সেখানে আজ কদিন হল দারুণ গোলমাল। মৎস্য রাজার সেনাপতি কীচক একটা নারীঘটিত ব্যাপারে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর অনুগামী দুর্ধর্ষ যত সৈনিক বীর তারাও নিহত হয়েছে। মৎস্য রাজ্য এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত এবং বিশৃঙ্খল।"

দুর্যোধন চিন্তিত। গভীরভাবে কি যেন ভাবছে।

দুঃশাসন বলল, "বৃথা ভেবে কোন লাভ নেই। গুপ্তচরদের অনুমানই সত্য। আমারও তাই মনে হয়, পাণ্ডবেরা আর কেউই বেঁচে নেই। বনে জঙ্গলে হয় তাদের বাঘে ভাল্লুকে খেয়েছে, না-হয় তারা সমুদ্র পার হয়ে চলে গেছে, অথবা অন্য কোন বিপদে পড়ে নিহত হয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত দেখা যাক। ততদিন বরং অগ্রিম কিছু অর্থ দিয়ে আবার নতুন করে গুপ্তচর নিয়োগ করা হোক।"

—"হ্যাঁ, তাই করা উচিত। গুপ্তচরদের অনুসন্ধান শেষদিন পর্যন্ত চলুক।" বলল কর্ণ।

তখন দ্রোণ বললেন, "দেখ, আমি যা বুঝি তাতে মনে হয়, পাণ্ডবদের কখনো বিনাশ হতে পারে না। তারা বীর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। তারা উদারহৃদয় ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ অনুগত। সকলে তারা আসন্ন অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় আছে। তারা তপোবলে আবৃত এবং সুরক্ষিত। তাই তাদের সন্ধান পাওয়া কঠিন। যুধিষ্ঠির শুদ্ধাত্মা, তেজস্বরূপ। সে শুধু দৃষ্টি দিয়েই সকলকে বশীভূত করতে পারে—

......দুরাপাস্তপসা বৃতাঃ ॥ ৮
শুদ্ধাত্মা গুণবান্ পার্থঃ সত্যবান্ নীতিমান শুচিঃ।
তেজোরাশিরসংখ্যেয়ো গৃহ্ণীয়াদপি চক্ষুষা ॥ ৯

(বিরাটপর্ব, ২৭ অধ্যায়)

সুতরাং বিশেষভাবে বিবেচনা করে তোমাদের কাজ করা উচিত। তোমাদের ওই সব বেতনভুক গুপ্তচরদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। এমন চর দিয়ে অনুসন্ধান কর যাঁরা ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ, যাঁরা তাদের জানেন।"

দ্রোণের কথা শেষ হতে ভীষ্ম বললেন, "দ্রোণাচার্যের সঙ্গে আমিও একমত। পাণ্ডবেরা ধর্মবলে বীর্যবলে সুরক্ষিত। তারা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত।

তাদের কখনো বিনাশ হতে পারে না। তারা কেবল প্রতিশ্রুতি পালন করে সময়ের অপেক্ষা করছে। তাদের অবস্থান অতি দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত। জানবে, রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে অবস্থান করবে, সে দেশের মানুষ ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী হবে। সে দেশ শব্দে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে নির্মল হবে। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সত্য, ধৈর্য, দান, পরম শান্তি, অচলা ক্ষমা, শ্রী, কীর্তি, লজ্জা, তেজস্বিতা, দয়া, সরলতা বিদ্যমান। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণেরাও সম্যক্ জানতে পারেন না, সাধারণ লোকের তো কথাই নেই।

> রসাঃ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চাপি গুণান্বিতাঃ।
> দৃশ্যানি চ প্রসন্নানি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ॥ ২৪
>
> ... ...
>
> হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ পরং তেজ আনৃশংস্যমথার্জবম্।
> তস্মাৎ তত্র নিবাসং তু ছন্নং যত্নেন ধীমতঃ॥ ৩২
>
> (বিরাটপর্ব, ২৮ অধ্যায়)

"তাই বলছিলাম, দুর্যোধন, তুমি যদি আমাকে শ্রদ্ধা কর, তাহলে এই সব ভেবেচিন্তে যা ভাল হয় তাই কর।"

দুর্যোধন যথেষ্ট কূটনীতিজ্ঞ। এতক্ষণ ধরে ভীষ্ম দ্রোণ পাণ্ডবদের এত যে প্রশংসা করলেন সে তা নীরবে সহ্য করল। কারণ সে জানে, এই বিপদের সময় কৌরব প্রবীণদের সমর্থন হারান তার চলবে না। তাই সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কৃপাচার্য, আপনি কি বলেন ?"

কৃপাচার্য তখন সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য জানালেন। তিনি কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণের মত পাণ্ডবদের অত প্রশংসা করলেন না। তিনি কয়েকটি কূটনৈতিক পরামর্শ দিলেন দুর্যোধনকে। স্পষ্টই দেখছি কৃপাচার্যের মন অনেকখানি দুর্যোধনের অনুকূলে। কিন্তু প্রকাশ্যে পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারছেন না। তিনি বললেন, "পিতামহ ভীষ্ম যথার্থই বলেছেন। পাণ্ডবেরা অমিততেজা, অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন। সুতরাং পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের আগেই আমাদের উচিত, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের সৈন্য কোষ ও নীতির পর্যালোচনা করে দেখা। শত্রুদের অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না—নাবজ্ঞেয়ো রিপুস্তাত। আমাদের মিত্র রাজাদের কতটা শক্তি ও কতখানি বল তাও নিরূপণ করে দেখা দরকার। পাণ্ডবদের এখন আর কোন সেনাবাহিনী নেই, যুদ্ধাস্ত্র বা বাহন সম্পদও কিছু নেই, তবু তারা যদি সহায়

সংগ্রহ করে আমাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা যেন যুদ্ধ করতে পারি—”

যোৎস্যসে চাপি বলিভিররিভিঃ প্রত্যুপস্থিতৈঃ।
অন্যোন্তং পাণ্ডবৈর্বাপি হীনৈঃ স্ববলবাহনৈঃ ॥ ১৩
(বিরাটপর্ব, ২৯ অধ্যায়)

দুর্যোধন লক্ষ্য করল মন্ত্রণাসভার হাওয়া এখন ক্রমশ তার অনুকূলে বইছে। সে তো এই চায়। পাণ্ডবেরা যদি ফিরেও আসে তাহলে ভাল মানুষের মত সে কিছুতেই তাদের হাতে রাজ্য তুলে দেবে না। তারা এখন নিঃসম্বল ভিক্ষুক। যুদ্ধে তাদের পরাজিত করা এমন কি কঠিন কাজ? কিন্তু কঠিন হল, শান্তিপ্রিয় পাণ্ডবহিতৈষী ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্বমতে আনা। তাই সে খুব সাবধানে ভেবে চিন্তে সভার সকলের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগল, “আপনারা তো শুনলেন, গুপ্তচরের দল এইমাত্র আমাদের যে সংবাদ এনে দিল, তাতে আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে (মনস্যাভিনিবিষ্টং মে বাক্তং), আমি বুঝতে পেরেছি পাণ্ডবেরা এখন কোথায় আছে (তেনাহমব-গচ্ছামি)।”

সভার সকলেই দুর্যোধনের দিকে উদ্গ্রীব হয়ে তাকাল।

দুর্যোধন বলে চলল, “পূর্বে জনসভায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদের আলোচনা শুনেছিলাম, তাঁদের মতে দৈহিক বল বাহুবল প্রাণশক্তি ও ধৈর্যে ভারতবর্ষে মাত্র চার জন বীর আছেন। তাঁরা হলেন, বলরাম, ভীম, শল্য ও কীচক। সেই লৌহবীর কীচককে কোন্ ব্যক্তি একা এমন করে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, কেবল বাহুবলে, মথিত পিষ্ট বিকৃত করে নিহত করতে পারে? কে সেই বলশালী? বলরাম নন, শল্য নন, তবে কে সে? আমার বিশ্বাস, এ সেই ছদ্মবেশী ভীম। এ কার্য ভীম ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়। আর সৈরন্ধ্রী বলে যে সুন্দরী রমণীর কথা গুপ্তচরেরা বলল, যার রূপে লুব্ধ হয়ে কীচক নিহত হয়েছে, সে আর কেউ নয়, দ্রৌপদী। কোন সন্দেহ নেই, দ্রৌপদীকে রক্ষা করার জন্যই ভীম কীচককে ও সূতসেনাগণকে হত্যা করেছে।”

একটু থেমে দুর্যোধন আবার বলতে শুরু করল, “তাছাড়া, পিতামহ ভীষ্ম যেকথা বললেন, যুধিষ্ঠির যেখানে অবস্থান করবেন, সেই দেশ সেই দেশের জনগণের যেসব গুণমাহাত্ম্য থাকার কথা, তা সবই মৎস্য রাজ্যে আছে বলে আমরা বহুবার শুনেছি। নিশ্চয় পাণ্ডবেরা বিরাট নগরেই লুকিয়ে আছে।

সুতরাং বিলম্ব না করে আমাদের এখনই মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করা উচিত। মৎস্য রাজ্য এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আমরা অনায়াসেই তা জয় করে সে রাজ্যের অতুলনীয় ধন ঐশ্বর্য নিয়ে এসে রাজকোষ স্ফীত করতে পারব। মৎস্যরাজ চিরকালই কৌরবদের প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করেছে। অতএব তার সেই ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার এই তো সুযোগ। অবশ্য আমার প্রস্তাব যদি সকলের মনঃপূত হয় (সর্বেষাং যদি রোচতে)। তাছাড়া অজ্ঞাতবাসে থাকতেই যদি পাণ্ডবেরা মৎস্য রাজ্য রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে, আবার তাদের বার বছরের জন্য বনে যেতে হবে। সেক্ষেত্রেও আমাদের লাভ। আর আমাদের বন্ধু ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা, বহুবার বহুভাবে মৎস্যরাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন, তারও একটা প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা, আপনি কি বলেন ?"

বাক্‌পটু চতুর দুর্যোধন সুকৌশলে তার ভাষণে একই সঙ্গে সুশর্মার আহত পৌরুষকে এবং ভীষ্মের আহত কুলগৌরবকে উত্তেজিত করে তুলল।

সুশর্মা ইতিমধ্যেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অধৈর্য হয়ে সে তখন বলতে লাগল (বাক্যমুবাচ ত্বরিতো), "হে প্রভাবশালী উৎসাহবান্ সম্রাট দুর্যোধন, আপনি জানেন, বিরাট রাজা বারবার আমাকে, আমার রাজ্যকে উৎপীড়িত করেছে। তার সেনাপতি কীচক ছিল আরো দুরাত্মা, ক্রূর, ক্রোধী। তাই আমি মনে করি, যদি আপনারা সকলে অনুমোদন করেন, এই হল সুযোগ, অরক্ষিত হৃতদর্প মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করে আমরা সে রাজ্যের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নেব। তাদের সমরশক্তিকে চূর্ণ করে চিরকালের জন্য কৌরবদের বশীভূত করব।"

কর্ণ তখন সোৎসাহে বলল, "সুশর্মার প্রস্তাব অতি উত্তম। পিতামহ প্রাজ্ঞ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং শরদ্বানপুত্র কৃপ যদি অনুমোদন করেন, তাহলে আমাদের মিলিত বাহিনী নিয়ে অবিলম্বে আমরা মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করি।"

দুর্যোধন খুশি হয়ে সভায় সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "উত্তম দুঃশাসন, যাও, যুদ্ধের আয়োজন কর, সৈন্য প্রস্তুত কর।"

[সতের]

অশনিসম্পাত

উচিত শিক্ষা পেল দুর্যোধন।

কেবল চালাকি কূটবুদ্ধি আর কৌশল বেশি দূর যায় না। সত্য তেজ আর তপোবলের কাছে দুর্যোধনের চতুর কৌশল একটা ধোঁয়ার রেখার মত নিরর্থক হয়ে গেল। ছিন্নমুকুট আহত দেহ, মৃতপ্রায় অবস্থায় রক্ত বমন করতে-করতে, কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল পরাজিত দুর্যোধন। প্রাণটুকু যে রক্ষা পেল তাও অর্জুনের কৃপায়। কেননা, যুধিষ্ঠিরের বিনা অনুমতিতে অর্জুন যুদ্ধে কাওকে নিহত করেন না। দুর্যোধনের তবু শিক্ষা হয় না। পরপর দুইবার পাণ্ডবদের দয়ায় প্রাণ পেল সে। বনপর্বে ঘোষ-যাত্রায় গন্ধর্বদের হাতে সপরিবারে ধৃত ও লাঞ্ছিত দুর্যোধন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছিল, তখন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাতে অর্জুন তাকে উদ্ধার করেন। যুধিষ্ঠির তাকে মুক্ত করে দেন। তবু তার কোন কৃতজ্ঞতা নেই। কলির অংশে জন্ম তার, বিদ্বেষ আর কলহই তার স্বভাব। যার অন্তরে ধর্ম নেই, আত্মা যার সংকীর্ণ, হীনচেতা যে, তার আবার কৃতজ্ঞতা থাকবে কেমন করে?

যদিও সামরিক বিচারে দুর্যোধনের কোন ভুল হয়নি। স্থান কাল পাত্র বুঝে রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির দিক দিয়ে তার এই মৎস্যরাজ্য আক্রমণ বেশ বিচক্ষণতার পরিচয়। কিন্তু অধর্মের, ভগবদ্‌বিরোধী অসুরের সকল চাতুর্য সকল বীরত্বের তলায় সূক্ষ্মভাবে থাকে যে ভুল, যে গোপন রন্ধ্র দিয়ে পরিণামে আসে তার পতন, দুর্যোধন সে সম্বন্ধে অবহিত নয়। ছল বল আর কৌশল ছাড়া সে আর কিছু জানে না। সে হিসাব করে দেখেনি, অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হয়েও আরো বার দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ভেবে দেখেনি, সত্যের ও তপস্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবদের বিশেষ করে অর্জুনের তেজ কি ভয়ঙ্কর হতে পারে। যে অহংকারী যে গর্বিত সে কখনো অন্যের শক্তির ওজন বোঝে না।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে সুশর্মা সসৈন্যে মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অতর্কিতে আক্রমণ করল। নিমেষের মধ্যে ভেঙে পড়ল বিরাট রাজার ভঙ্গুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সুশর্মার সেনাবাহিনী লুণ্ঠন করতে লাগল রাজ্যের যত ধনসম্পদ।

বিপদের বার্তা এল রাজধানীতে।

হতবল রাজা শেষ সৈন্যবলটুকু সংগ্রহ করে ছুটলেন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। তখন কঙ্ক রাজাকে বললেন, "রাজা, এক সময় আমি এক ঋষির কাছে চারি মার্গের অস্ত্রশিক্ষা করেছি। এই যুদ্ধে আমি আপনার সঙ্গে গেলে সাহায্য হবে। আপনার পাচক বল্লব, সেও একজন বীর, তাঁকেও সঙ্গে নিন।" কঙ্কের পরামর্শে তখন রাজার সঙ্গে বর্মাবৃত রথারূঢ় হয়ে চললেন কঙ্ক, বল্লব, তন্তিপাল আর গ্রন্থিক। কিন্তু রাজধানী এবং রাজপুরী হইল অরক্ষিত।

এমন পরিস্থিতিতে পরদিন কৃষ্ণ-অষ্টমীতে দুর্যোধন কৌরব সেনা নিয়ে হানা দিল রাজ্যের উত্তর দ্বারে।

রাজধানীতে ক্রন্দনরোল উঠল।

ভয়ে ত্রাসে আতঙ্কিত হয়ে উঠল রাজপুরী।

এখন কি উপায়? কে রক্ষা করবে? রাজবাড়ীতে পুরুষ বলতে কেবল রাজার বালক-পুত্র উত্তর। বালক আস্ফালন করে বলতে লাগল, "আমি একাই যুদ্ধ করতে পারি যদি একজন সারথি পাই।"

সৈরন্ধ্রী পরামর্শ দিলেন, "সারথি হিসাবে বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

—"বৃহন্নলা? ও তো ক্লীব, ও আবার রথ চালাবে কি।"

সৈরন্ধ্রী বললেন, "বৃহন্নলা একসময় অর্জুনের সারথ্য করেছে। ক্লীব হলেও সে দক্ষ বীর। তাঁকে সঙ্গে নিলে তোমার আর কোন ভয় নেই।"

বৃহন্নলা তখন মাথার বেণী, হাতের বলয় কঙ্কণ বেঁধে রাজকুমার উত্তরকে রথে নিয়ে ছুটলেন কৌরব সেনার দিকে।...

কিন্তু রাজপুরীতে বসে নারীদের সামনে আস্ফালন করা এক কথা আর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ প্রমুখ কৌরব সেনার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া আর এক কথা। ভয়ে রাজকুমারের গলা শুকিয়ে গেল। হাত-পা কাঁপতে লাগল, বলল, "বৃহন্নলা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পালিয়ে যাই, আমি যুদ্ধ করতে পারব না। আমার ভীষণ ভয় করছে।"

বৃহন্নলা তখন রথ ছুটিয়ে নিয়ে এলেন শ্মশানের ধারে সেই শমীবৃক্ষের তলায়। বললেন, "তোমার ভয় নেই। তোমাকে যুদ্ধ করতেও হবে না। তুমি শুধু রথের বল্গা ধরে থাক। আমিই যুদ্ধ করব।"

এই বলে শমীবৃক্ষ থেকে নামিয়ে আনলেন তাঁর বিখ্যাত গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ আর কণকমুষ্টি খড়্গ। রাজকুমারকে দিলেন তাঁর আত্ম-পরিচয়।

তুমি এখন যেতে পার। আর কখনো এমন কাজ ক'রো না। গচ্ছ মূঢ়োঽসি মৈবং কার্ষীঃ কদাচন।"...

ওদিকে উত্তরদ্বারে কালবৈশাখী মেঘের মত ব্যূহবদ্ধ কৌরবসেনা সন্নিবেশিত।

হঠাৎ তারা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল, শ্মশানের ধার থেকে একটা রথ মাঠের উপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। রথের মধ্যে বসে ও কে? নারী না পুরুষ? এ তো দেখছি বীরাকৃতি এক নপুংসক! একাকী কৌরব সেনার সম্মুখীন হবার সাহস রাখে কে সে? অর্জুন ছাড়া এমন সাহস তো কারো নেই। তবে কি ও অর্জুন? ক্লীবের ছদ্মবেশে আসছে যুদ্ধ করতে?

দ্রোণ তখন বললেন, "ওই গাণ্ডীব টঙ্কার, ওই দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি, ওই কপিধ্বজ রথনির্ঘোষে কম্পিত মেদিনী—এসব আমার পরিচিত। অর্জুন ছাড়া আর কেউ নয়—নসোঽন্য সব্যসাচিনঃ।"

তা শুনে অসহিষ্ণু দুর্যোধন বলল, "কে না কে এক নপুংসককে দেখেই আপনারা অর্জুন বলে ভয় পাচ্ছেন কেন? আর যদি অর্জুনই হয়, তাহলে আমি আর কর্ণ যে কথা বারবার বলছি, অজ্ঞাতবাস শেষ হবার আগেই তারা আত্মপ্রকাশ করছে, অতএব প্রতিজ্ঞা অনুসারে আবার তাদের বার বছরের জন্য বনে যেতে হবে। রাজ্যলোভে হয়তো পাণ্ডবেরা সময়ের হিসাব রাখেনি। কিংবা আমাদেরই হয়তো ভুল হচ্ছে। জ্যোতিষ ও কাল গণনায় সিদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম বোধ করি সঠিক বলতে পারেন।"

ভীষ্ম তখন জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে কাল গণনা করে বললেন, "গ্রহগতির ব্যতিক্রম অনুসারে প্রতি পাঁচ বৎসরে দুই মাস করে উপজাত হয়। পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে এইভাবে পাঁচ মাস বার দিন যোগ হয়েছে।* এই

---

* "সূর্য ও চন্দ্রের গতির তারতম্যবশত প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুইটি চান্দ্রমাস অধিক হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে একটি মাস বৃদ্ধি হয়। সেই মাসকেই 'অধিমাস' বা 'মলমাস' বলে।" (শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, 'মহাভারতের সমাজ', বিশ্বভারতী, ১৩৫৩, পৃ. ৪২৬)

এই প্রসঙ্গে বন্ধুবর ড. অনন্তলাল ঠাকুর গ্রন্থকারকে জানিয়েছেন, "এই হিসাব পাণ্ডবপক্ষপাতী ভীষ্মের, যুধিষ্ঠিরের নয়। তিনি 'ব্যাজেন' ধর্ম অনুষ্ঠান করেন না। একথা ভীষ্মের কূট হিসাব অনুসরণ করিয়া। যুধিষ্ঠির দ্যূতসভায় প্রচলিত অর্থে

হিসাবে তাদের প্রতিশ্রুতির কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই অর্জুন আত্মপ্রকাশ করছে।

তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপজায়তে ॥ ৩
এষামভ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষানামিতি মে বর্ততে মতিঃ ॥ ৪

...

এবমেতদ্ ধ্রুবং জ্ঞাত্বা ততো বীভৎসুরাগতঃ ॥ ৫

(বিরাটপর্ব, ৫২ অধ্যায়)

আমি জানি, পাণ্ডবেরা বরং মৃত্যুবরণ করবে তবু সত্যভ্রষ্ট হবে না। যুধিষ্ঠির যাদের রাজা তারা ধর্মে অপরাধী হবে কেন? এবার স্থির কর, দুর্যোধন, আমরা যুদ্ধ করব, না ধর্মসঙ্গত কার্য করব? কেননা তুমি রাজা, সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। যা করবে, তাড়াতাড়ি স্থির কর, ওই অর্জুন এসে পড়ল—ক্রিয়তামাশু রাজেন্দ্র সম্প্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ। অর্জুন একাই পৃথিবী দগ্ধ করতে পারে, পঞ্চপাণ্ডবের তো কথাই নেই। অতএব যদি চাও, এখনই অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। তস্মাৎ সন্ধিং কুরুষ যদি মন্যসে।”

উদ্ধত দুর্যোধন তখন গর্বিত মস্তক তুলে বলল, “পিতামহ, আমি কিছুতেই পাণ্ডবদের রাজত্ব ফিরিয়ে দেব না। আমি চাই যুদ্ধ।

নাহং রাজ্যং প্রদাস্যামি পাণ্ডবানাং পিতামহ।
যুদ্ধোপচারিকং যৎ তু তচ্ছীঘ্রং প্রবিধীয়তাম্ ॥”১৫

(বিরাটপর্ব, ৫২ অধ্যায়)

—“তাহলে আমার একটা পরামর্শ অন্তত শোন। আমরা এখানে ব্যূহরক্ষা করে যুদ্ধ করি। তুমি কিছু সৈন্য নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে যাও। অর্জুনের সঙ্গে এখন তোমার যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।” বললেন ভীষ্ম।

দুর্যোধন তখন রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে লাগল।...

এমন সময় বাতাসে নিঃস্বন তুলে দুইটি তীর একত্রে এসে দ্রোণের চরণ-সমীপে ভূমিবিদ্ধ করল। আর দুইটি তীর তাঁর কানের পাশ দিয়ে শাঁ-করে বেরিয়ে গেল।

বার বছর বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহা পূর্ণ করিয়াই তিনি বিরাটরাজসভায় আত্মপ্রকাশ করেন। দ্রৌপদী কীচক বধের পরেও তের দিন সুদেষ্ণার আশ্রয় কামনা করিয়াছিলেন। গোগ্রহের সমাপ্তিতে উত্তর বিরাটরাজকে বলেন, ‘স তু শ্বো বা পরশ্বো বা প্রাদুর্ভবিষ্যতি’। আসলে তৃতীয় দিবসে পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ।”

উৎফুল্ল কণ্ঠে দ্রোণাচার্য বললেন, "সাধু, অর্জুন, সাধু! বনবাস নির্বাসন শেষ করে তুমি তোমার অভ্রান্ত রীতিতে তীর নিক্ষেপ করে আমার চরণে প্রণাম জানাচ্ছ, আমার কর্ণে কুশল প্রশ্ন করছ? অর্জুন, কতকাল পরে আজ তোমাকে দেখলাম! চিরদৃষ্টোঽয়মস্মাভিঃ লক্ষ্যা পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।"

ভীষ্ম এবং দ্রোণ, কৌরব প্রবীণ দুই বীরের মনের ভাব তো স্পষ্ট। অর্জুনের প্রতি স্নেহ ও শুভেচ্ছা নিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই প্রতিপক্ষ যোদ্ধা হিসাবে। ঘটনাচক্র, ক্ষাত্রিয় ধর্ম, কুলগত স্বার্থ ও কর্তব্যবুদ্ধিতে তাঁদের মন বলছে এক রকম, আর স্নেহে বাৎসল্যে অন্তরাত্মার টানে তাঁদের হৃদয় বলছে অন্য রকম। এই বিষম বিমনা অবস্থায় কর্ণের কটুবাক্য আর মূঢ় আস্ফালন তাঁদের আরও উদাসীন করে তুলল।

কর্ণ বলতে শুরু করল, "দ্রোণাচার্য চিরকালই অর্জুনের পক্ষপাতী। আমাদের তিনি দুচক্ষেও দেখতে পারেন না। তাই দূর থেকে কেবল অশ্বের হ্রেষাধ্বনি আর মেঘের গর্জন শুনে অর্জুনের প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছেন। এমনি করে তিনি আমাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছেন। শুধু শত্রুর গুণ-কীর্তন আর নিজেদের দোষ দেখেন যিনি, এমন সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করা কি নিরাপদ? আরে, অশ্ব তো যেখানে-সেখানেই হ্রেষাধ্বনি করে, মেঘও তো যখন-তখন গর্জন করে, এতে অর্জুনের কৃতিত্বের কি আছে? আপনারা এত ভীত হয়ে পড়ছেন কেন?"

দুর্বিনীত কর্ণের এই কথা শুনে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য পর্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। কৃপাচার্য বললেন, "কর্ণ, তুমি দুঃসাহস ক'রো না। দেশ কাল বুঝে সাহস দেখাতে হয়। কর্ণ মা সাহসং কৃথাঃ।"

অশ্বত্থামা বললেন, "কর্ণ এত যে আস্ফালন করছ, আজ পর্যন্ত কোন্ যুদ্ধে তুমি অর্জুনকে জয় করেছ? তোমার বীরত্ব তো কেবল কপট পাশা খেলায় শঠতা ও বঞ্চনা করা। একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে অপমান করা। দুর্যোধন আর তুমি, নির্দয় নৃশংস পরস্বাপহারী। ছল চাতুরিতে রাজত্ব পেয়ে তুষ্ট হয়ে আছ। আজ তাহলে তুমি আর শকুনি তোমাদের বীরত্ব দেখাও। আমি অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না—নাহং যোৎস্যে ধনঞ্জয়ম্।"

কৌরব শিবিরে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিভেদ কেবল আকস্মিক আজকের ঘটনা নয়। এই হল তাদের আসল চেহারা। দ্বন্দ্ব আর বিরোধ, বিভেদ আর মতানৈক্য, অপরাধবোধ আর ধিক্কার, গ্লানি আর অনুশোচনা, তাদের মধ্যে বারবার দেখা দিয়েছে। তাদের অপরিমেয় বল ও শক্তিকে ভিতরে-ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।

ব্যাপার দেখে ভীষ্ম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যুদ্ধশিবিরে সেনাপতিদের মধ্যে এই আত্মকলহ থামান দরকার। নিজেদের মধ্যে সংহতি না থাকলে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তিনি অশ্বত্থামাকে বললেন, "আচার্যপুত্রঃ ক্ষমতাং নায়ং কালো বিভেদনে। আচার্যপুত্র, ক্ষমা করুন। এখন বিভেদের সময় নয়। কর্ণ যা বলেছে তা আমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যই, নিন্দা বা অপমান করার জন্য নয়। দ্রোণাচার্য এবং আপনি, একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং বীর। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মাস্ত্র, চতুর্বেদ এবং ধনুর্বেদ এক সঙ্গে লাভ করার সৌভাগ্য কেবল আপনাদেরই হয়েছে। আপনারাই কৌরবের জয়তিলক।"

ভীষ্মের কথায় দ্রোণ এবং অশ্বত্থামা প্রসন্ন হলেন। কর্ণও সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। ব্যাপারটা আপাতত এখানেই মিটে গেল।…

দুর্যোধন রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছে দেখে অর্জুন প্রচণ্ড বিক্রমে তাকে আক্রমণ করলেন। বাণাঘাতে তার মুকুট ছেদন করে, শরজালে আচ্ছন্ন করে তাকে পরাজিত করলেন। মুকুটহীন আহত হতদর্প দুর্যোধন রক্ত বমন করতে-করতে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হল। কৃপাচার্যের রথ অশ্ব কবচ ধনু বিনষ্ট হল। অর্জুন তাঁকেও পালাবার সুযোগ দিলেন।

এবার অর্জুনের সম্মুখে দ্রোণাচার্য।

অর্জুন দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

মহাভারতে গুরু-শিষ্য এমনি করে বারবার সংগ্রামে মুখোমুখি হয়েছেন। গুরু দাঁড়িয়েছেন বুকভরা স্নেহ আর আশীর্বাদ নিয়ে, শিষ্যও এসেছেন অন্তরের ভক্তি বিনীত প্রণাম নিয়ে। অথচ দুইজনে কি ভয়ঙ্কর বিষদৃশ বিষম প্রতিপক্ষ। সংগ্রাম করতে হবে, তথাপি সেখানে জয়ী হওয়ার চেয়ে দুঃখকর আর কিছু নেই। পরাজয়ই যেখানে পরম আনন্দের। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

অর্জুনের বাণে দ্রোণাচার্য আচ্ছন্ন হলেন।…

এবার অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন ভীষ্ম।

পাণ্ডবদের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী, অর্জুনবৎসল, স্নেহাতুর পিতামহ ভীষ্ম।

যুদ্ধ, না, এ মর্মান্তিক করুণ নাটক?

দুজনেই শর নিক্ষেপ করছেন, কিন্তু দুজনের চোখেই জল।

ভীষ্ম অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।…

জয়শঙ্খ বাজিয়ে অর্জুন রাজধানীতে ফিরে এলেন পুনরায় বৃহন্নলার বেশে।…

সুশর্মাকে পরাজিত করে বিরাট রাজা ফিরে এসে শুনলেন, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করে কৌরব সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে।

রাজা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

কঙ্ক বললেন, "বৃহন্নলা সঙ্গে আছে অতএব কুমারের কোন ভয় নেই।"

এমন সময় দূত এসে খবর দিল, কুমার জয়ী হয়ে ফিরে আসছেন। উল্লসিত রাজা মহা সমারোহে কুমারের অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। খুশি মনে কঙ্কের সঙ্গে বসলেন পাশা খেলতে।

রাজা গর্বের সঙ্গে বারবার রাজকুমারের বীরত্বের প্রশংসা করছেন। তা শুনে কঙ্ক বলছেন, "বৃহন্নলা যেখানে, জয় সেখানে সুনিশ্চিত।"

কুমারকে প্রশংসা না করে কঙ্ক বারবার কেবল ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা করছে শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "নৈবং ইত্যেব,—চুপ করো ব্রাহ্মণ। তোমাকে অনেকবার বারণ করেছি। আসকারা পেয়ে-পেয়ে তুমি সীমা ছাড়িয়ে গেছ।"

ক্রুদ্ধ রাজা হাতের পাশা ছুঁড়ে মারলেন কঙ্ককে। কঙ্কের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত পড়তে লাগল। রক্তধারা যাতে মাটিতে না পড়ে তাই তিনি হাতের গণ্ডূষে সেই রক্ত ধরে রাখতে লাগলেন। পাশে ছিলেন সৈরন্ধ্রীবেশী দ্রৌপদী, তিনি তাড়াতাড়ি একটা জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র এনে যুধিষ্ঠিরের রক্তধারা মোক্ষণ করলেন। কেননা তিনি জানতেন, যুদ্ধ ছাড়া যদি কেউ যুধিষ্ঠিরের দেহে রক্তপাত ঘটায় তাহলে তার মৃত্যু হবে।

এমন সময় দ্বারপাল এসে রাজাকে সংবাদ দিল, বৃহন্নলাসহ বিজয়ী কুমার দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

—"নিয়ে এস তাদের। বল, রাজা সানন্দে তাদের আগমন প্রতীক্ষা করছেন।"

—"যে আজ্ঞে।"

কঙ্ক দ্বারপালকে ইঙ্গিত করলেন, বৃহন্নলা যেন এখানে প্রবেশ না করে। কেননা, যুধিষ্ঠিরকে কেউ প্রহার করেছে, তাঁর দেহে কেউ রক্তপাত ঘটিয়েছে, এ যদি অর্জুন দেখেন, তাহলে পরন্তপ অর্জুন তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বিরাট রাজাকে সবংশে নিধন করবেন।

রাজকুমার উত্তর রাজাকে প্রণাম করে তাকিয়ে দেখেন, এক পাশে ভূমিতে প্রহারক্লিষ্ট রক্তাক্ত যুধিষ্ঠির বসে আছেন। তাঁকে শুশ্রূষা করছেন দ্রৌপদী।

আতঙ্কিত কণ্ঠে উত্তর বলল, "কে এঁকে প্রহার করেছে? এমন মহাপাপ কে করেছে?"

—"এই ক্রূরটাকে আমিই প্রহার করেছি। এর আরো শাস্তি হওয়া উচিত। তোমার বীরত্বের প্রশংসা না করে ও কেবল সেই ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা করছিল।"

—"মহারাজ, আপনি অকার্য করেছেন। শীঘ্র এঁকে প্রসন্ন করুন। নইলে ঘোর ব্রহ্মবিষ আমাদের সবংশে ধ্বংস করবে"—

অকার্যং তে কৃতং রাজন ক্ষিপ্রমেব প্রসাদ্যতাম্।
মা ত্বাং ব্রহ্মবিষং ঘোরং সমূলমিহ নির্দহেৎ॥ ৬১
(বিরাটপর্ব, ৬৮ অধ্যায়)

পুত্রের কথায় অনুতপ্ত রাজা তখন কঙ্কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কঙ্ক বললেন, "রাজন্, আমি তো আপনাকে আগেই ক্ষমা করেছি। ক্রোধ আমাতে নেই—ন মন্যুর্বিদ্যতে মম।"

পরদিন পঞ্চপাণ্ডব স্নানান্তে শুক্লবসন পরে রাজ-আভরণে ভূষিত হয়ে রাজসভায় রাজাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। সালঙ্কারা দ্রৌপদী বসলেন যুধিষ্ঠিরের বামে।

সভায় এসে রাজা বিলক্ষণ বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন।

—"কঙ্ক, তুমি সামান্য সভাসদ হয়ে রাজাদের আসনে গিয়ে বসেছ কেন?"

অর্জুন তখন একটু পরিহাস করতে ছাড়লেন না। সহাস্যে রাজাকে বললেন, "ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। আপনার রাজসভা তো তুচ্ছ।"

রাজপুত্র উত্তর তখন এগিয়ে এসে সকলের পরিচয় দিলেন, "ওই যে সিংহবিক্রম কনকজ্যোতি আয়তনেত্র ধর্মাত্মা সিংহাসনে বসে আছেন, উনিই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। আর গজেন্দ্রের ন্যায় যাঁর গতি, মহাবাহু বৃষস্কন্ধ তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ ওই উনি হলেন বৃকোদর। আর শ্যামবর্ণ সিংহস্কন্ধ মহাধনুর্ধর এই হলেন অর্জুন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দুই পাশে বিষ্ণু ও ইন্দ্রতুল্য অতুলনীয় রূপবান্ যে দুজনকে দেখছেন ওঁরা নকুল এবং সহদেব। আর স্বর্ণালঙ্কারা নীলোৎপল-কান্তি ওই যে মূর্তিমতী লক্ষ্মী, যিনি ধর্মরাজের পার্শ্বে বসে আছেন, ইনিই কৃষ্ণা।"

পরিচয় পেয়ে রাজা ভয়ে লজ্জায় বিস্ময়ে আনন্দে অবাক। সভাসদ বলে দাস বলে এতদিন কত-না তাচ্ছিল্য করেছেন, দুর্ব্যবহার করেছেন এঁদের সঙ্গে। তিনি তাই সানন্দে সসম্ভ্রমে তাঁদের সম্ভাষণ করে বললেন, "আমার কি সৌভাগ্য! এই রাজ্য, এই রাজধানী, এই ধনাগার সবই আপনাদের! আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করতে চাই। আমার কন্যা উত্তরাকে আমি অর্জুনের হাতে সম্প্রদান করব।"

অর্জুন বললেন, "উত্তরা আমার শিষ্যা, কন্যাস্থানীয়া। সে আমার কাছে পিতৃজ্ঞানে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা করেছে। আমার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, অভিমন্যু তার যোগ্য পাত্র।"

অর্জুনের এই প্রস্তাব যুধিষ্ঠির ও রাজা বিরাট অনুমোদন করলেন।

উপপ্লব্য নগরে বিবাহের আয়োজনের ধুমধাম পড়ে গেল। দ্বারকা থেকে এলেন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সাত্যকি কৃতবর্মা ও সুভদ্রা। সারথি ইন্দ্রসেন পাণ্ডবদের সুসজ্জিত রথ ও মাঙ্গল্য নিয়ে এলেন দ্বারকা থেকে। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে মহাসমারোহে বিবাহ উৎসবে যোগ দিলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। যুধিষ্ঠিরের অনুগত দুই রাজা কাশীরাজ ও শৈব্য এলেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে। গায়ক কথক নট ও বৈতালিকের আসর বসে গেল। রাজভবনে ভেরী শঙ্খ জলজ মুরজ নান্দী বেজে উঠল।

(আঠার)

রাজনীতি—কূটনীতি

ভারতবর্ষের কুটিল রাজনীতি এবার কাহিনীর গতিকে জটিল ও ক্ষিপ্র করে তুলল। যা ছিল একটা পারিবারিক বিবাদ তাই দশচক্রে এবার জাতীয় ধ্বংসের আকার নিতে লাগল। ব্যক্তিগত আক্রোশের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থ যুক্ত হয়ে একটা বিবাক্ত স্ফুটমুখ নিল এই উদ্যোগপর্বে। এই পর্বের ৬,৬৯৮টি শ্লোকে যে ঘটনাজাল সৃষ্টি হল তারই শোচনীয় পরিণাম পরবর্তী পাঁচটি পর্বে, ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিকপর্ব পর্যন্ত, সেই আঠার দিনের উষ্ণ রুধিরধারা।

রাজনীতির প্রধান যে ছয়টি অঙ্গ বা "ষড়গুণ"—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধী ও সমাশ্রয়—তার সব কয়টি এই পর্বে সক্রিয়। শত্রুকে প্রথমেই দিতে হবে সন্ধিপ্রস্তাব, তারপর ক্ষমতা বুঝে যুদ্ধ, যুদ্ধের অভিযান, উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করাকে তখন বলা হ'ত "আসন"; এছাড়া, মুখে বলব এক, করব আর-এক রকম, অথবা একটি নীতি অনুসরণ করবার সময় তার পাশাপাশি আরো দুই-একটি নীতি ও কার্য প্রণালী গোপনে স্থির করে রাখা, এই হল দুমুখো দ্বৈধী নীতি; সবশেষে সমাশ্রয়, অর্থাৎ শক্তিশালী অন্যান্য রাজাদের সাহায্য লাভ—

> সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
> দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষাড়্‌গুণ্যং চিন্তয়েৎ সদা॥ ৭
>
> (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৩৯ অধ্যায়)

সকলেই যে-যার দিকটা দেখছেন। নিজের নিজের দাবি ও অধিকারের কথাই ভাবছেন। কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতিকে তার পরিণামকে কেউ সার্বভৌম দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন না। অবশ্য সে-দৃষ্টি কারো ছিল না। এমনকি পাণ্ডবদের নয়, যুধিষ্ঠিরেরও নয়। সেই দিব্যদৃষ্টি আছে কেবল একজনেরই। তিনি স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। তাই পাণ্ডবদের এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে, রাজসভায় রাজন্যদের মধ্যে বসে শ্রীকৃষ্ণ এমন উদাসীন হয়ে আছেন। সমবেত রাজবর্গ পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ করছেন। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তাঁরা কেমন বিমনা হয়ে পড়লেন। তাঁদের কথাবার্তা থেমে গেল।

> তস্থুর্মুহূর্তং পরিচিন্তয়ন্তঃ
> কৃষ্ণং নৃপাস্তে সমুদীক্ষমাণাঃ॥ ৮
>
> (উদ্যোগপর্ব, প্রথম অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণের কেন এই ভাবান্তর ?

কতকাল পরে আজ তিনি তাঁর প্রিয় পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তাঁর একান্ত স্নেহের ভাগিনেয় অভিমন্যুর বিবাহের আনন্দে যোগ দিয়েছেন। পাণ্ডবদের বনবাস অজ্ঞাতবাসের দুর্দিনের অবসান হয়েছে। তাঁদের অভ্যুদয় আসন্ন। আজ তো শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে আনন্দের দিন। কিন্তু তবু তাঁর দৃষ্টি এত বিষণ্ণ কেন ? তাঁর কণ্ঠ এত উদাস কেন ?

চোখের সামনে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ পরিণাম। তাঁর মনে পড়ছে, অনেক দিন আগের কথা, যখন তিনি জরাসন্ধের আক্রমণ এড়িয়ে মথুরা ত্যাগ করে ছদ্মবেশে পাহাড়ে-পাহাড়ে আত্মগোপন করে ফিরছেন, রৈবতক পর্বতে ঘুরতে-ঘুরতে পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন এক ভবিষ্যদ্বাণী। কুরু-পাণ্ডবের কলহকে কেন্দ্র করে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ঘটবে এক মহা সংগ্রাম। তার ঘোর পরিণতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন, একবেণীধরা শোকাতুরা পৃথিবী বৈধব্যবেশে করুণ দৃষ্টিতে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন।

---বৈধব্যোনাধিবাসিতা।
একবেণীধরা চেয়ং বসুধা ত্বাং প্রতীক্ষতে ॥ ৪৩
(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৪০ অধ্যায়)

বীরশূন্য পৃথিবীর সেই করুণ বৈধব্যমূর্তি তিনি কোনদিন ভুলতে পারেন-নি। আজ রাজসভার এই আনন্দ সমাগমে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে পৃথিবীর সেই ম্লান মূর্তি বারবার যেন বিষণ্ণ ছায়া ফেলে যাচ্ছে।

অভিমন্যুর এই বিবাহে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য আবার নতুন করে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আগে জানলে হয়তো তিনি এই বিবাহে সম্মতি দিতেন না। পাণ্ডবেরা আনন্দের আতিশয্যে এই শুভকর্মের পিছনে কোন অশুভ আছে কিনা তা ভেবে দেখেননি। শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নেওয়ারও কোন দরকার মনে করেননি।

কিন্তু আগে তো আমরা দেখেছি, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি ছাড়া এক পাও অগ্রসর হন না। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানীর পরিকল্পনা কি হবে, কে কি করবে, রাজসূয় যজ্ঞ করা হবে কিনা, ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তাঁরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। দরকার হলে সুদূর দ্বারকা থেকে রথ পাঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে এনেছেন।

কিন্তু এবার ?

পুত্রের অধিক যাকে স্নেহ করেন, যাকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে বিদ্যায় শিক্ষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর করে তুলেছেন, সেই স্নেহের সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুর বিবাহে তাঁর কোন মতামত নেওয়া হল না ? এ তাঁর ব্যক্তিগত আত্মসম্মান-বোধের কথা নয়, এ হল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ পরিণামের কথা।

এই বিবাহের ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাবার ছক আবার পালটে গেল। বৈরীতার আগুন এবার দুই জ্ঞাতিপক্ষ থেকে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে।

পরিস্থিতি তাহলে কি দাঁড়াল ?

মৎস্য রাজ্য চিরদিন কৌরবদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করে এসেছে। সেকথা দুর্যোধন ক্ষোভের সঙ্গে বারবার উল্লেখ করেছে। কৌরবদের কুলগৌরব রক্ষা করা যাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও অধিক, সেই ভীষ্ম তাই দুর্যোধনের মৎস্য রাজ্য আক্রমণ সমর্থন করেছিলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে মৎস্য রাজ্যের মিত্রতা হওয়ার অর্থ ভীষ্মকে অনেকখানি বিরূপ করে তোলা। এখন ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের পক্ষে সহজ হল শান্তিপ্রিয় ভীষ্মকে তাদের মতের অনুকূলে আনা, অন্তত নিরপেক্ষ করে রাখা। আবার মৎস্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিবেশী মদ্র দেশের চিরশত্রুতা। সামরিক শক্তি ও বলের দিক থেকে পশ্চিম-ভারতে মদ্র দেশ হল প্রধান। মদ্রাধিপতি শল্য পাণ্ডবদের মাতুল, তাঁদের হিতৈষী। আবার পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হলেন শল্যের জামাতা। তাঁর কন্যা বিজয়ার সঙ্গে সহদেবের বিবাহ হয়েছিল। স্বভাবতই মৎস্য রাজ্যের সঙ্গে এই মিত্রতা তিনি ভাল চোখে দেখবেন না। শল্যকে অকারণে শত্রু করে তোলা হল। তার ফলে দুর্যোধনের পক্ষে সহজ হয়েছিল শল্যকে নিজের দলে পাওয়া।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদও আবার কৌরবদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। ফলে দ্রুপদের শত্রু দ্রোণ পাণ্ডবদের শুভার্থী হয়েও চিরকালের জন্য কৌরব শিবিরে থেকে গেলেন। পাণ্ডবদের উপলক্ষ্য করে এখন কৌরব, পাঞ্চাল এবং মৎস্য এই তিনটি প্রধান শক্তির এক রাজনৈতিক ত্রিকোণ সৃষ্টি হল। এই ত্রিকোণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তথা বৃষ্ণি ভোজ ও যাদবগণ বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন। কেননা, এই বিরাটরাজা এবং এই দ্রুপদ অতীতে জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোট আঠার বার মথুরা আক্রমণ করেছে। যাদবদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৩৫ অধ্যায়)। গোমন্ত পর্বতে পলাতক আত্মগোপনকারী কৃষ্ণ বলরামকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৪২ অধ্যায়)। আবার শ্রীকৃষ্ণের পিতার বন্ধু ও সহপাঠী ব্রহ্মদত্তকে ষট্‌পুরে যজ্ঞরত অবস্থায় থাকাকালীন, এই বিরাট রাজা নিকুম্ভ ও জরাসন্ধের সঙ্গে

মিলিত হয়ে তীব্র আক্রমণ করে, সকল যাদব বীরগণকে গুহার মধ্যে বন্দী করে রাখে (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৮৪ অধ্যায়)। অতএব যাদব ও বৃষ্ণিবীরগণ অভিমন্যুর এই বিবাহকে কি প্রসন্ন মনে নেবেন ? শ্রীকৃষ্ণ বিমনা হয়ে এই কথাই হয়তো ভাবছেন। শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে আর কি তাঁরা তেমন করে পাণ্ডবদের পক্ষে এগিয়ে আসবেন ? শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা আলাদা। তিনি স্বয়ং বাসুদেব। তাঁর শত্রুও নেই, মিত্রও নেই ; তিনি নিজেই বললেন, "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" (গীতা, ৯/২৯) ; আমার মধ্যে শত্রুতা থাকতে পারে না—"ন মে বৈরং প্রবর্ততি" ; ক্ষমা করাই আমার প্রিয় কর্ম—"ক্ষন্তব্যং রোচতেঽস্মাকং" (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৫০ অধ্যায়)।

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তো কোন উপায় নেই। এখন যে সর্বনাশ ঘনঘটা করে আসছে তা নিবারণ করা যায় কি করে ? শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাই ভাবছেন। সমস্যার মূল কৌরব পাণ্ডবদের শত্রুতা। অতএব যেমন করে হোক, পাণ্ডবদের পক্ষে ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করেও যদি এই বিরোধের একটা নিষ্পত্তি করা যায়, তাহলে হয়তো এই দুর্যোগ এড়ান যেতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সামনীতির আশ্রয় নিলেন। তাঁর এতখানি শান্তিপ্রিয় ভূমিকা সকলকেই বিস্মিত করল। এমনকি পাণ্ডবদেরও। যে কোন ঝুঁকি নিয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে, তিনি সন্ধির পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। সভার সকল রাজাদের কাছে তিনি শান্ত ও ধীর কণ্ঠে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন, "আপনারা সকলেই পাণ্ডবদের শুভানুধ্যায়ী। আপনারা তো সবই জানেন, কেমন করে শকুনি কপটতার সাহায্যে পাশাখেলায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে পাণ্ডবদের বনবাস অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করেছিল। পাণ্ডবেরা সত্যাশ্রয়ী, তাই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বহুকষ্ট সহ্য করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। এখন তাঁরা যাতে ন্যায্য ব্যবহার পান, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও রাজা দুর্যোধনেরও যাতে হিত হয় (দুর্যোধনস্যাপি চ যদ্ধিতং স্যাৎ) আপনারা তার একটা উপায় বিধান করুন। যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা। ধর্মবিরুদ্ধ উপায়ে তিনি স্বর্গরাজ্যও পেতে চান না। এমনকি তাঁর ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য যে নিজের রাজ্য তাও তিনি চান না। যদি একটি মাত্র ক্ষুদ্র গ্রাম তাঁকে দেওয়া হয় তাহলে তাই তিনি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করবেন—"ধর্মার্থযুক্তং তু মহীপতিত্বং গ্রামেঽপি কস্মিংশ্চিদয়ং বুভূষেৎ" (উদ্যোগপর্ব, ১/১৫)। এখন দুর্যোধনের অভিপ্রায় কি তা আমাদের জানা দরকার।"

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই সকলকে বিস্মিত করে তিনি তাঁদের দাবিকে ন্যূনতম করে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র চাইলেন। তাঁর আশা

যদি দুর্যোধন এই সামান্যতম দাবিটুকুও মেনে নেয়, তাহলে পাণ্ডবদের পক্ষে তবু কিছুটা সম্মানজনক হয়। তিনি তাহলে পাণ্ডবদের যুদ্ধ থেকে বিরত করতে পারবেন।

আমাদের সাধারণ ধারণা, শান্তিস্থাপনের জন্য যুধিষ্ঠিরই প্রথমে নিজের প্রাপ্য রাজ্যের পরিবর্তে কেবল পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সঞ্জয়কে। সেজন্য মনে-মনে আমরা যুধিষ্ঠিরকে ভীরু কাপুরুষ দুর্বল এক শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে ভেবে আসছি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাবের বহু আগেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একখানি মাত্র গ্রাম চেয়ে সন্ধি করতে রাজী হয়েছিলেন, এবং কেন হয়েছিলেন, তা আর কেউ না বুঝুক অন্তত যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন। আমরা পরে দেখব, সঞ্জয় যখন দূত হয়ে এল তখন যুধিষ্ঠির বরং অনেক বেশি দৃঢ়তা, কূটনৈতিক বুদ্ধি ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। স্পষ্ট তিনি বলেছিলেন "সঞ্জয়, তুমি দুর্যোধনকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলবে, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ আমরা নেব ('স্বকং ভাগং লভেমহি')। হয় সে ইন্দ্রপ্রস্থ আমাকে ফিরিয়ে দেবে, নয় যুদ্ধ করবে ("দদস্ব বা শক্রপুরীং মমৈব যুদ্ধস্ব বা"—উদ্যোগপর্ব, ৩০/৪৯)। আমি সন্ধিও জানি, যুদ্ধও জানি। সময় অনুসারে আমি কোমল হতে পারি আবার কঠোরও হতে পারি—"

অলমেব শমায়াস্মি তথা যুদ্ধায় সঞ্জয়।
ধর্মার্থয়োরলং চাহং মৃদবে দারুণায় চ ॥২৩
(উদ্যোগপর্ব, ৩১ অধ্যায়)

তবু শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির যে তাঁর দাবি ছেড়ে দিয়ে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিলেন, সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব জানেন বলেই।

তখনকার দিনের রাজনীতি ও রাজাদের আচার-আচরণ, মনের গতি-প্রকৃতির অন্ধি-সন্ধি বেদব্যাস খুব ভালভাবেই জানতেন। যেজন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেছেন, রাজসভার কবি—"a court poet"। সে তুলনায় বাল্মীকিকে বলা যেতে পারে, শান্তরসাস্পদ আশ্রম-কবি। সমগ্র রামায়ণে যদিও অশ্রু আছে, বেদনা আছে, স্বার্থপরতা দ্বন্দ্ব আছে, আছে যুদ্ধ ও হানাহানি; কিন্তু তবু সব কিছু ছাপিয়ে সেখানে বিরাজ করছে এক শান্ত তপোবনের শান্তি। শান্তরসই রামায়ণের স্থায়ী আশ্রয়। অন্যদিকে মহাভারতে পাই রাজনীতির ঝড়ো ঘূর্ণি, ইতিহাসের সংক্ষুব্ধ আবর্ত-সংঘাত, কালাগ্নির বহ্নি-উচ্ছ্বাস। করুণ রসের উপর দিয়ে বীর ও রৌদ্র রসের দুর্বার খরস্রোত। তাই বেদব্যাস অরণ্যচারী তপস্বী হলেও তাঁর জীবনে ও কাব্যে তিনি একটি বলিষ্ঠ রাজবংশের জন্মদাতা।

কবি বিরাট রাজার সভায় উপবিষ্ট এক একজন রাজার মুখের উপরে আলো ফেলেছেন, দেখাচ্ছেন কেমন করে ভারতের আকাশকে কালো করে অগ্নিকোণে মেঘ জমছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্রখচিত আকাশের মত সেই সভাভবন। মণিমাণিক্য হীরারত্নের ঝালর দুলছে। সুবাসিত পুষ্পমাল্য এবং সুগন্ধী ধূপে আমোদিত। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পাশে বসে আছেন শিনিবীর সাত্যকি ও কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম। ওপাশে মৎস্যরাজের পাশে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির। বিরাটের পুত্রগণের সঙ্গে আসীন শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদী এবং অভিমন্যু।

শ্রীকৃষ্ণের জলদগম্ভীর কণ্ঠ তাঁরা সাগ্রহে শুনলেন।

তখন বলরাম বললেন, "আপনারা সকলে কৃষ্ণের ভাষণ শুনলেন। তাঁর প্রস্তাব যেমন যুধিষ্ঠিরের তেমনি দুর্যোধনের পক্ষেও হিতকর। আমি মনে করি, যুধিষ্ঠিরের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব নিয়ে দুর্যোধনের কাছে কোন দূত প্রেরণ করা উচিত। দুর্যোধনকে কোন মতেই রুষ্ট বা কুপিত করা উচিত হবে না। মিষ্ট বাক্যে তাকে প্রসন্ন করা উচিত।

"তাছাড়া আমি তো দুর্যোধনের অথবা শকুনির কোন দোষ দেখি না ("তত্রাপরাধঃ শকুনের্ন কশ্চিৎ")। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়া জানেন না, কুরুপ্রবীর সকল সুহৃদ্‌গণ তাঁকে নিষেধও করেছিলেন ("নিবার্যমাণশ্চ কুরুপ্রবীরঃ সর্বৈঃ সুহৃদ্ভির্হ্যয়মপ্যতজ্‌জ্ঞঃ")। গান্ধারপুত্র শকুনি অক্ষনিপুণ, তা জেনেও যুধিষ্ঠির অন্যদের অগ্রাহ্য করে হঠকারীতাপূর্বক ক্রোধবশে তারই সঙ্গে পাশা খেলতে লাগলেন ("স দিব্যমানঃ প্রতিদীব্য চৈনং গান্ধাররাজস্য সুতং মতাক্ষম্‌" —উদ্যোগপর্ব, ২/৯)। অতএব, আমার প্রস্তাব, সন্ধি ও সামনীতির দ্বারা দুর্যোধনকে আপ্যায়িত করুন।"

প্রকাশ্য সভায় সকল আত্মীয়-স্বজনের সামনে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম এমনিভাবে যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করছেন, দুর্যোধন ও শকুনিকে সমর্থন করছেন, এতে সকলেই কেমন হতচকিত হয়ে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মনে-মনে এই আশঙ্কাই করছিলেন।

যাদবদের মধ্যে এক অংশ হয়তো বলরামের অনুবর্তী হয়ে তলে-তলে দুর্যোধনের সমর্থক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আরও কারণ আছে, যে-কথা মহাভারতে বলা হয়নি, কিন্তু উল্লেখ আছে হরিবংশে ও ভাগবতে। শ্রীকৃষ্ণের নিকটতম বন্ধু আহুক, অক্রূর এবং শতধন্বা পরস্পরে ক্রমশ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তারা প্রত্যেকে ছিল সত্রাজিৎ-কন্যা সত্যভামার প্রণয়প্রার্থী। সত্রাজিৎ যখন

তাঁর কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ দিলেন তখন শতধন্বা হিংসায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সত্রাজিৎকে হত্যা করে। আহুক ও অক্রূর এই নীচ হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত ছিল।

এছাড়া স্যমন্তক মণি নিয়েও যাদবদের মধ্যে একটা ঈর্ষা ও রেষারেষি চলতে থাকে। সকলে, এমনকি বলরামও, সন্দেহ করতেন শ্রীকৃষ্ণই সেই স্যমন্তক মণি চুরি করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। মনোমালিন্য এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, বলরাম শেষ পর্যন্ত মথুরা ত্যাগ করে মিথিলাতে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

সেই মণি কিন্তু ছিল অক্রূরের কাছেই। একদিন যাদব-সভায় অক্রূর সে-কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এমনিভাবে ভিতরে-ভিতরে চলছিল যদুবংশের আত্মকলহ। যদুবংশের ধ্বংসের বীজ তারা তাদের আপন রক্তেই বহন করে চলছিল। গান্ধারীর অভিশাপ তো বাহ্যিক কারণ মাত্র। দুর্যোধন গুপ্তচরের মারফত সব খবরই রাখত। এবং যাদবদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির নানা চেষ্টা করত।

এমন সময় ঘটল আর এক কাণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার প্রতি আকৃষ্ট হল। হয়তো চলছিল তাদের গোপন প্রণয়। জানতে পেরে কুরুরাজ দুর্যোধন শাম্বকে বন্দী করে ধরে রাখে হস্তিনাপুরে। পাণ্ডবহিতৈষী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিছুটা প্রতিশোধ নিতে, কিছুটা-বা চাপ সৃষ্টি করে সুযোগ আদায় করতে। বলতে লাগল, শাম্ব লক্ষ্মণাকে অপহরণ করতে চেষ্টা করেছিল তাই তাকে বন্দী করা হয়েছে। মনোমালিন্য সত্ত্বেও বলরাম গেলেন হস্তিনাপুরে। কেননা শাম্বকে বলরাম পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। তিনি প্রিয়তম শিষ্য হিসাবে তাকে যাবতীয় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে শাম্বকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। দুর্যোধন রাজী হল না। বলরাম তখন তাঁর হল দিয়ে হস্তিনাপুর উৎপাটন করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। ব্রহ্মবলে অভিমন্ত্রিত সেই হলের আঘাতে হস্তিনাপুর ঘূর্ণিত হয়ে গঙ্গার দিকে আনত হয়ে পড়ল। আজো পর্যন্ত হস্তিনাপুর গঙ্গার দিকে ঢালু হয়ে আছে, তার পিছনে এই হল পৌরাণিক গল্প। দুর্যোধন ভয় পেয়ে বলরামের পায়ে পড়ল। শাম্বের সঙ্গে লক্ষ্মণার বিবাহ দিল। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৬২ অধ্যায়)

দুর্যোধন নিজেও বলরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মিথিলাতে গিয়ে তাঁর কাছে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করতে লাগল। (হরিবংশ, প্রথমপর্ব, ৩৯ অধ্যায়) দুর্যোধনের উদ্দেশ্য তিন রকম। প্রথমত, দুর্ধর্ষ বীর বলরামকে মিত্ররূপে লাভ

করা। দ্বিতীয়ত, বলরামের কাছে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করে নিজেকে ভীমের সমকক্ষ করে তোলা। এবং তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে তাঁকে পাণ্ডবদের থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। চতুর দুর্যোধন চলেছে তার ক্ষুদ্র চাতুরীকে আশ্রয় করে। কিন্তু সে জানে না চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে, তিনি যে "দ্যূতং ছলয়তামস্মি" (গীতা ১০/৩৬)।

যাইহোক, তখন বলরামের কথা শুনে স্তম্ভিত রাজসভায় উত্তেজিত সাত্যকি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কঠোর ভাষায় শাণিত বিদ্রূপে বলরামকে প্রতিবাদ করে বললেন, "লাঙ্গলধ্বজ মধুবংশধর, যার যেমন স্বভাব সে তো তেমন কথাই বলে। আপনার অন্তঃকরণ যেমন আপনি তেমন ভাষণই দিলেন বটে। একই বংশে অনেক সময় দুইরকম সন্তান জন্মে, কেউ বলবান্, কেউ নপুংসক ("একস্মিন্নেব জায়েতে কুলে ক্লীব-মহাবলৌ")। কিন্তু আপনার কথায় আমি কোন দোষ দিচ্ছি না, আমি দোষ দিচ্ছি তাঁদের যাঁরা নিঃশব্দে আপনার এইসব কথা শুনছেন। আমি ভাবতেও পারি না, এমন মানুষ কে আছে যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সামান্যতম দোষও দেখতে পান, এবং তা জনসমক্ষে বলতে পারেন। একথা সবাই জানে, তাঁকে ছল করে, কপট ধূর্ত অধর্ম উপায়ে দ্যূতে পরাজিত করা হয়েছে। তবু পাণ্ডবেরা অশেষ কষ্ট সহ্য করে প্রতিজ্ঞাপালন করেছেন। এখন ধর্মত ন্যায়ত তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য তাঁরা দাবি করছেন। কিন্তু দুর্যোধন তা দিতে অস্বীকার করছে। এমনকি ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের অনুনয় সত্ত্বেও। সুতরাং পাণ্ডবেরা কি দোষ করেছেন? কেন যুধিষ্ঠির জোড় হাতে নত মস্তকে দুর্যোধনের কাছে হীনতা স্বীকার করতে যাবেন? যদি দুর্যোধন পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে না দেয় তাহলে যুদ্ধে তারা নিহত হয়ে যমালয়ে যাবে। শত্রুকে বধ করলে কোন অধর্ম হয় না। বরং শত্রুর কাছে ভিক্ষা করাই অধর্ম।"

সাত্যকিকে সমর্থন করে রাজা দ্রুপদ তখন বললেন, "বলদেবের কথা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয়, ভাল কথায় দুর্যোধন রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রের বশ। ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্বলতাবশত এবং কর্ণ ও শকুনি মূর্খতাবশত দুর্যোধনেরই পক্ষ নেবে। পাপী দুর্যোধন মৃদুভাষীকে দুর্বল মনে করে। সুতরাং এখনই আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সমস্ত রাজাদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠান হোক। শল্য ধৃষ্টকেতু জয়ৎসেন কেকয়রাজগণ একলব্য ভূরিতেজা ক্ষেমধূর্তি দন্তবক্র প্রমুখ সকল রাজা ও বীরদের কাছে দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করা হোক।"

শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত বারুদের স্তূপ হয়ে উঠছে। তিনি

তাই বললেন, "সোম বংশের বীর পাঞ্চালরাজ তাঁর যোগ্য কথাই বলেছেন। কিন্তু বিপরীত আচরণ না করে সর্বাগ্রে আমাদের সুনীতির পক্ষপাতী হওয়াই উচিত। কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্বন্ধ। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে অনুকূল ব্যবহার করেন। তাছাড়া আমরা তো এখানে বিবাহ উৎসবে এসেছি। শুভকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা যে-যার গৃহে ফিরে যাব। আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধ, দ্রোণ ও কৃপের সখা, ধৃতরাষ্ট্র নিজেও আপনাকে যথেষ্ট মান্য করেন, সুতরাং আপনি দেখবেন পাণ্ডবদের যাতে হিত হয়। কৌরবদের কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠান হোক। যদি তারা সম্মত হয় ভাল, না-হয় যা ভাল মনে করেন আমাদের জানাবেন।"

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় চলে গেলেন।

দ্রুপদ তখন তাঁর পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে পাঠালেন দূত হিসেবে। কিন্তু *এই শান্তির প্রস্তাব কেবল কালহরণ মাত্র।* তাঁকে মন্ত্রণা দেওয়া হল, তিনি হস্তিনাপুরে গিয়ে কৌশলে কুরুবৃদ্ধদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করবেন। হয়তো দ্রোণ তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। সন্ধির অছিলা করে কোন রকমে দুর্যোধনকে আরো কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা, আর সেই অবসরে পাণ্ডবেরা সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে।

কিন্তু দেখা গেল, দুর্যোধন অত বোকা নয়। তার রাজনৈতিক বুদ্ধির কোন অভাব নেই। তার প্রশাসনিক দক্ষতাও যথেষ্ট। কিন্তু তার যেটা অভাব, যা তার পতনের কারণ, তা হল সততা, ধর্ম, সত্য ও উদারতার অভাব। সে ইতিমধ্যেই সৈন্য সংগ্রহ ও সমর উপকরণ প্রস্তুত করে তুলেছে। শক্তিধর সব রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এগার অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করেছে। আর পাণ্ডবেরা যাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন রাজশক্তির সাহায্য না পায় তার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছে। পাণ্ডবদের দূত পৌঁছাবার আগেই সেখানে দুর্যোধন গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তার এই রাজনৈতিক ক্ষিপ্রতা অসাধারণ।

দ্রুপদের পুরোহিত হস্তিনাপুরে গিয়ে কেবল তাতে ইন্ধনই জুগিয়ে এলেন। দূত হিসাবে এমন ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার পরিচয় আর কেউ দেয়নি। এমনকি শকুনির পুত্র উলূকও নয়। কিংবা দ্রুপদ হয়তো তাঁকে এমন মন্ত্রণাই দিয়েছিলেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা যে সন্ধির প্রস্তাব তা ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এবং তাই হল।

কোন শিষ্টাচারের অপেক্ষা না-রেখে পুরোহিত প্রথমেই রূঢ় ভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে দোষী বলে তিরস্কার করতে শুরু করলেন। বললেন, আপনি

স্বার্থপর, লোভী, পরস্বাপহারী, পাণ্ডবদের চিরকাল বঞ্চনা করে আসছেন। আপনারই প্ররোচনায় পাশাখেলা হয়েছিল, সবকিছুর মূলে আপনি।

তারপর পাণ্ডবদের সেনাবল বাহুবলের উল্লেখ করে ভয় দেখিয়ে শাসাতে লাগলেন। বললেন, অর্জুন একাই সমস্ত কৌরবদের বিনাশ করতে পারবেন। অতএব যদি রাজ্য ফিরিয়ে না-দেওয়া হয় তাহলে যুদ্ধে কৌরবদের সমূলে বিনাশ হবে।

তিনি একবারও উল্লেখ করলেন না, শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব মত একখানি গ্রামের বিনিময়ে সন্ধির কথা।

পুরোহিতের এই সব রূঢ় ভাষণ চতুর ধৃতরাষ্ট্র নীরবে শুনতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে ভীষ্ম পর্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। ভীষ্ম বললেন, "ব্রাহ্মণ, আপনার কথাগুলি বড় কর্কশ—'অতিতীক্ষ্ণং তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ' (উদ্যোগপর্ব, ২১/৪)। মনে হয় আপনার ব্রাহ্মণ স্বভাবের জন্যই এমন হয়েছে। (অর্থাৎ আপনি রাজসভার আদবকায়দা জানেন না)।"

কর্ণ তখন দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "ধর্মানুসারে দুর্যোধন শত্রুকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন, কিন্তু এমন করে তাঁকে ভয় দেখালে তিনি একপাদ ভূমিও দেবেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র লক্ষ্য করলেন, পুরোহিতের উপর ভীষ্ম অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠেছেন। অতএব দূতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অনুকূল অবস্থা। এখন পাছে কর্ণের এই আস্ফালন ভীষ্মকে বিরক্ত করে, তাই তিনি কর্ণকে ভর্ৎসনা করে চুপ করতে বললেন।

ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে বললেন, "ব্রাহ্মণ, আপনার কথা তো আমরা শুনলাম। আপনি আর এখানে বৃথা বিলম্ব না করে ফিরে যান। আমি এ বিষয়ে চিন্তা করে পাণ্ডবদের কাছে সঞ্জয়কে পাঠাব।"

পুরোহিত তখন বিদায় নিলেন।

[উনিশ]

মুখোশপরা রাজনীতি



পুরোহিতকে বিদায় দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজসভায় সঞ্জয়কে ডেকে পাঠালেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিচক্ষণ, তিনি ভালভাবেই জানেন, কার কি যোগ্যতা, কাকে দিয়ে কোন্ কাজ হবে। বস্তুত মনুষ্যচরিত্র তিনি বিলক্ষণ বোঝেন। তাঁর দৃষ্টি নেই, কিন্তু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। এই বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর অন্ধ দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেন, অনেকে চোখ থাকতেও তা দেখতে পায় না। কিন্তু হলে কি হবে, তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোথায় রয়েছে এক অন্ধকার। যা তাঁকে দেখেও দেখায় না, জেনেও জানায় না। ভাগ্যের এই অন্ধকার বিড়ম্বনাও তিনি জানেন। নিজের মনকে নিজেই বিশ্লেষণ করে তিনি বিদুরকে বলেছিলেন, "বিদুর, আমি সব জানি, সব দেখি, কিন্তু দুর্যোধন সামনে এলেই আমার বুদ্ধি সব কেমন বিপরীত হয়ে যায় (পুনর্বিপরিবর্ততে)।" (উদ্যোগপর্ব, ৪০ অধ্যায়)

তিনি সঞ্জয়কে ডেকে পাঠালেন।

এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেই একমাত্র উপযুক্ত।

এক চুল ক্ষতি স্বীকার না-করে, পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে না-দিয়ে, কেবল কৌরবদের স্বার্থ রক্ষা করা ; অথচ আসন্ন যুদ্ধে কৌরবদের অনিবার্য ধ্বংস জেনে যুদ্ধকেও এড়িয়ে যাওয়া ; এমনই একটি কুটিল রাজনৈতিক অভিসন্ধি সফল করতে হলে এমন ব্যক্তির প্রয়োজন যাঁকে পাণ্ডবেরা ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন, যাঁর সততায় ও সৌজন্যে কোন প্রশ্ন উঠবে না। যিনি ধীর স্থির মিষ্ট কথায় শত্রুর মন জয় করতে পারেন, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ, এমন ব্যক্তি সঞ্জয় ছাড়া আর কে ?

তাছাড়া সঞ্জয় অর্জুনের বাল্যবন্ধু। অর্জুন তাঁকে প্রাণতুল্য সখার মত ভালবাসেন—"ধনঞ্জয়স্যাত্মসমঃ সখাসি" (উদ্যোগপর্ব, ৩০ অধ্যায়), তিনি কখনো কর্কশ কথা বলেন না। নীরস অপ্রাসঙ্গিক কথার বাচালতা করেন না। সর্বদা শান্ত অর্থপূর্ণ ধর্মসঙ্গত কথা বলেন। কটু কথা শুনেও কখনো ক্রুদ্ধ হন না। তাঁর মনে কোন হিংসা নেই।

...ন চ ক্রুদ্ধ্যেরুচ্যমানো দুরুক্তৈঃ ॥ ৪
ন মর্মগাং জাতু বক্তাসি রূক্ষাং
নোপশ্রুতিং কটুকাং নোত মুক্তাম্।

ধর্মারামামর্থবতীমহিংস্রা-
মেতাং বাচং তব জানীম সূত ॥ ৫
(উদ্যোগপর্ব, ৩০ অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র জানেন, এই সঞ্জয় পাণ্ডবদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তাই কৌরবদের দূত হিসাবে তিনি এলে যুধিষ্ঠির স্বাগত জানিয়ে বললেন, "তুমি আমাদের সকলের অতি প্রিয়। তুমি যেন দ্বিতীয় বিদুর হয়ে আমাদের কাছে এসেছ। ত্বমেব নঃ প্রিয়তমোঽসি দূত ইহাগচ্ছেদ্ বিদুরো বা দ্বিতীয়ঃ।"

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে খুব ভাল করে বুঝিয়ে গোপনে মন্ত্রণা দিয়ে পাঠালেন। দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডবদের প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। গুপ্তচর মারফত তিনি যাবতীয় গুপ্ত সংবাদ জেনে নিয়েছেন। কোন্ কোন্ রাজা, কার কতটা শক্তি, কত সৈন্য, কি কি অস্ত্র তাঁরা সংগ্রহ করেছেন সব তাঁর নখদর্পণে। এবং তিনি এও জানেন, নিজের পক্ষের কোথায় এবং কতখানি দুর্বলতা। তিনি যে কত মন্ত্রণাকুশল তা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, "সঞ্জয়, তোমার কাজ অত্যন্ত কঠিন। প্রথমেই তুমি মিষ্ট কথায় কুশল প্রশ্নে শান্ত আচরণে পাণ্ডবদের ক্রোধ প্রশমন করবে। খুব বিবেচনা করে কথা বলবে। তাদের মনে ক্রোধ উদ্রেক করে এমন কোন কথা বলবে না। কৃষ্ণকে খুব সমাদর করে সম্মান প্রদর্শন করবে। আমি তো অহরহ অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাণ্ডবদের নিন্দা করতে পারি এমন একটুও দোষ দেখিনি। তারা ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ। তারা বিনাদোষে এতদিন এত কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু তবু আমাদের উপর তাদের কোন রাগ নেই। শুধু দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন আর নীচমতি কর্ণের প্রতি তারা রুষ্ট। দুর্যোধন কালের বশীভূত। তার মন দূষিত হয়ে গেছে। সে মূর্খ, চিরকাল সে রাজসুখে পালিত, তাই অপরিণামদর্শী। পাণ্ডবদের বঞ্চিত করে সে তেজ প্রকাশ করছে। কিন্তু আমি জানি, শেষ পর্যন্ত তার এই তেজ থাকবে না। সে ভাবছে, কাজটি খুব সহজ এবং ন্যায্য কাজ করছে। যদিও সৈন্যবলে অস্ত্রবলে আমরা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যুদ্ধের সম্মুখীন হলে সেসব তুচ্ছ হয়ে যাবে। তুমি জান না, সঞ্জয়, আমি কৃষ্ণ অর্জুন নকুল সহদেব কাউকেই তেমন ভয় করি না, কেবল ভয় করি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধকে। যুধিষ্ঠির মহাতপা, ব্রহ্মচারী, যোগী, সে জিতক্রোধ অজাতশত্রু, তার মনে যে সঙ্কল্প ওঠে তাই সত্য হয়। আমি তাই সর্বদা ভয়ে-ভয়ে আছি। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে যদি একবার আমার পুত্রদের দিকে তাকায় তাহলে সেই হতভাগ্যরা তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যাবে। তস্য ক্রোধং সঞ্জয়াহং সমীক্ষ্য স্থানে জানন্ ভৃশমস্ম্যদ্য ভীতঃ।" (উদ্যোগপর্ব, ২২/৩৬)

ধৃতরাষ্ট্রের এই আশঙ্কা কিন্তু মিথ্যা নয়। যুধিষ্ঠিরের এই অদ্ভুত দৃষ্টি-শক্তির কথা দ্রোণাচার্য জানতেন, তিনি তাই দুর্যোধনকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "যুধিষ্ঠির তেজস্বরূপ। সে দৃষ্টি দিয়েই সকলকে বশীভূত করতে পারে—"গৃহ্নীয়াদপি চক্ষুষা" (বিরাটপর্ব, ২৭/৯)। সঞ্জয়ও দুর্যোধনকে সাবধান করে বলেছিলেন, "যুধিষ্ঠির ইচ্ছামাত্র পৃথিবী ও স্বর্গলোক ভস্ম করে দিতে পারেন—"যুধিষ্ঠিরেণেন্দ্রকল্পেন চৈব যোঽপধ্যানান্নির্দহেদ্ গাং দিবঞ্চ।" (উদ্যোগপর্ব, ৪৮/৯) যুধিষ্ঠির নিজেও তা জানতেন, তাই বনবাসে যাওয়ার সময় বস্ত্র দিয়ে তিনি চক্ষু আবৃত করে নিয়েছিলেন, পাছে তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি কৌরবদের উপর পতিত হয়ে তাদের ভস্ম করে দেয়। শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি দৃষ্টি দিয়ে অপরকে ভস্ম করে দিতে পারেন—ত্বাং তু চক্ষুর্হণং প্রাপ্য দগ্ধো ঘোরেণ চক্ষুষা। (ভীষ্মপর্ব, ১২০/৬৮) রণক্ষেত্রে ভীষ্ম যে নিহত হয়েছেন সে শিখণ্ডীর জন্য নয়, অর্জুনের জন্যও নয়, ভীষ্ম নিহত হয়েছেন আপনারই দৃষ্টির অগ্নিতে।"

উত্তরে তখন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "মধুসূদন, আপনার কৃপাতেই আমরা রক্ষিত। আমাদের যা-কিছু শক্তি সবই আপনার করুণার দান।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "এই উক্তি আপনারই যোগ্য বটে। তবৈবৈতদ্ যুক্তরূপং বচনং পার্থিবোত্তম।" (ভীষ্মপর্ব, ১২০/৭১)

বিস্মিত হতে হয় ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্তর্দৃষ্টি দেখে। তিনি আরো বললেন, "শোন সঞ্জয়, তুমি গিয়ে প্রথমেই যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণকে সমাদর করে বলবে, সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের প্রতি অনুরক্ত। তিনি এই যুদ্ধ চান না। তিনি শান্তি চান। যদি তুমি কৃষ্ণকে ভাল করে এই কথা বোঝাতে পার তাহলে কৃষ্ণের কথা যুধিষ্ঠির অমান্য করতে পারবে না। আমার কি মনে হয় জান, সঞ্জয় ? এই কৃষ্ণ হলেন সনাতন বিষ্ণু—সনাতনো বৃষ্ণবীরশ্চ বিষ্ণুঃ।" (উদ্যোগপর্ব, ২২/৩৩)

ধৃতরাষ্ট্র এ কি বলছেন ? খল যাঁর বুদ্ধি, অধার্মিক যাঁর হৃদয়, অন্ধ যাঁর দৃষ্টি তিনি কেমন করে বুঝলেন ? কোন্ সুকৃতির বলে জানলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার ? ভগবান বিষ্ণু ? পঙ্কিল জলে কি সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে ? আর জানলেন যদি, তবে কেন তাঁর শরণাগত হলেন না ? স্বভাবের বাধা কি তাঁর এতখানি ?

এই প্রশ্ন কেবল আমাদের নয়।

ধৃতরাষ্ট্র নিজেও এ প্রশ্ন করছেন।

সর্বদা তাঁর আত্মবিশ্লেষণ আত্মসমীক্ষা মনোবিজ্ঞানীর পর্যায়ের। তাই

সারা জীবন তিনি কাউকে কখনো দোষারোপ করেননি। কেবল বিলাপ করেছেন। নিজের দোষ সম্বন্ধে এতখানি সজ্ঞানতা মহাভারতের আর কোন চরিত্রে আমরা দেখি না। পাপও যেমন তাঁর নিজের, অনুতাপও তেমনি তাঁর নিজের। সেই আত্মদাহ তিনি অহরহ গোপনে নিজের মধ্যে বহন করেছেন। এমনকি গান্ধারীকেও সব বলেননি। যুদ্ধের পরে অনুশোচনায় দীর্ঘ পনর বছর তিনি অনাহারে অল্পাহারে থেকেছেন। মৃগচর্ম পরে ভূমি শয্যায় দিন কাটিয়েছেন। অথচ সেকথা কাওকে বলেননি।

সঞ্জয়কে প্রশ্ন করছেন, "তুমি কেমন করে জানলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান?" (উদ্যোগপর্ব, ৬৯ অধ্যায়)

—"আমি জানি, মহারাজ। কেননা আমার জ্ঞানদৃষ্টি কখনো লুপ্ত হয় না। মম বিদ্যা ন হীয়তে।"

ধৃতরাষ্ট্র আবার প্রশ্ন করছেন, "তাহলে আমিই-বা কেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানতে পারছি না ? কথমেনং ন বেদাহং ?"

—"মহারাজ, শুনুন, আপনি তত্ত্বজ্ঞানহীন, তমো অন্ধকারে আপনার বুদ্ধি আচ্ছন্ন।"

যে মন্দমতি, অশুদ্ধ যার হৃদয়, সে কখনো ভগবানকে জানতে পারে না। আর জানলেও জীবনে তাঁকে পায় না—"দুর্বিদো মন্দপ্রজ্ঞৈর্বিশেষতঃ" (দ্রোণপর্ব, ৭৯ অধ্যায়) সঞ্জয় যেন ধৃতরাষ্ট্রের মর্মের অন্ধকারে আলো নিক্ষেপ করলেন। বললেন, "মহারাজ, আমি কখনো ছল কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করি না। ধর্মের নামে পাষণ্ডতা করি না। শাস্ত্রবচনে আমার শ্রদ্ধা আছে, হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাই আমি জনার্দন শ্রীকৃষ্ণকে জানি।"

শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলে, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বলে ধৃতরাষ্ট্র আমাদের অবাক করে দিয়েছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিস্ময় এখনো আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। এবার আমরা বিস্মিত বিমূঢ় হতবাক হয়ে যাব।

ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, "পুত্র দুর্যোধন, সঞ্জয় আমাদের সকলের বিশ্বাসের পাত্র। তুমি সঞ্জয়ের কথায় শ্রদ্ধা রাখ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁর শরণাগত হও।"

শুনে দুর্যোধন বলল, "পিতা, আমিও জানি, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ইচ্ছা করলে পলকে সকল সৃষ্টি সংহার করতে পারেন। কিন্তু তবুও পিতা, আমি কখনই তাঁর শরণাগত হব না। যেহেতু তিনি অর্জুনকে তাঁর সখা মনে করেন।"

ভগবান্ দেবকীপুত্রো লোকাংশ্চৈনিহনিষ্যতি।
প্রবদন্নর্জুনে সখ্যং নাহং গচ্ছেহদ্য কেশবম্ ॥ ৭

(উদ্যোগপর্ব, ৬৯ অধ্যায়)

এ কি অন্ধকার! এ কি পর্বতপ্রমাণ বিদ্রোহ!

স্বয়ং ভগবান জেনেও, সর্বসংহারকর্তা জেনেও অর্জুনের প্রতি ঈর্ষা দুর্যোধনকে এতখানি বিদ্রোহী করে তুলেছে? সকল নরক সকল অসুর একত্রিত হলেও বোধহয় এতখানি নিরেট অন্ধকার হয় না। মহাভারতের যে অনিবার্য পরিণাম, পৃথিবীর বুক-শূন্য-করা যে হাহাকার, তাই যেন পাতাল থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে দুর্যোধনের এই উদ্ধত বাক্যে।

শুনে কেঁপে উঠেছিল ধৃতরাষ্ট্রের বুক। অসহায় পিতৃহৃদয় নিয়ে তিনি আর্তনাদ করে বলেছিলেন, "গান্ধারী, দেখ, তোমার নির্বোধ অভিমানী পুত্র নরকের দিকে ধেয়ে চলেছে।"

গান্ধারী কেঁদে বললেন, "ওরে মূর্খ পুত্র, তোর এই রাজত্ব, ঐশ্বর্য, তোর পিতা মাতা, সব ত্যাগ করে এমনি করে মরণের দিকে ছুটে যাসনে।"

কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। ভবিতব্য রোধ করবে কে? ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রস্নেহ, গান্ধারীর সকল ধর্মের পুণ্য, সঞ্জয়ের কল্যাণ বুদ্ধি, সব নিষ্ফল হল।

ধৃতরাষ্ট্র তখন আকুল হয়ে বললেন, "সঞ্জয়, তুমি আমাকে সেই অভয়-পথের কথা বল, যে পথে গেলে আমি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারি।"

—"মহারাজ, যে নিজের মনকে বশীভূত করে না, সে কখনো শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না।"

অবশেষে সঞ্জয় এলেন পাণ্ডবদের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে। কিন্তু এলেন শূন্য হাতে। কেবল প্রীতি শুভেচ্ছা মধুর বাক্য আর কিছু ধর্মের উপদেশ ছাড়া তাঁর প্রস্তাবে কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। বক্তব্য ধৃতরাষ্ট্রের। সঞ্জয় দূত মাত্র। যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রাণ উদার হৃদয়ের কাছে, তাঁর ত্যাগবৈরাগ্যময় অন্তরের কাছে, আবেদন করে রাজ্য প্রত্যর্পণ না-করেই সন্ধিস্থাপন করা হল আসল উদ্দেশ্য।

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন, "হে অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির, আপনি ধার্মিক, আপনার ধর্মের যশোগৌরব ভুবনবিখ্যাত। আপনি ত্যাগী, দেবভক্ত, যজ্ঞপরায়ণ, ঐশ্বর্য ও বিষয়তৃষ্ণা আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু

কেবল মানুষকে বদ্ধ করে। আপনি জানেন, জ্ঞাতিবিরোধ কুলক্ষয় সর্বনাশ ডেকে আনে। অতএব কৌরব ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করুন। কৌরবেরা যদি আপনাকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে না-চায় সেও ভাল, তবুও আপনি যুদ্ধের ন্যায় পাপ কাজে লিপ্ত হবেন না। যুদ্ধই যদি চাইতেন তাহলে তো অনেক আগেই আপনি তা করতেন। আপনি ধর্মকে সত্যকে বড় বলে জেনেছেন তাই যুদ্ধ না-করে বনবাসের দুঃখ বরণ করেছিলেন। আপনি মহান্‌, আপনি ত্যাগী, সুতরাং আর যে-যাই করুক, আপনাকেই তো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দুর্যোধন যদি আপনাকে রাজ্য ফিরিয়ে না-দিতে চায়, আপনি নেবেন না; আপনি বরং ভিক্ষা করে খাবেন তবুও যুদ্ধ করবেন না। কি ছার রাজত্ব! বিত্তবৈভব সবই তো অনিত্য। কিছুই চিরকাল থাকে না। তবে কেন বৃথা আপনার কীর্তি নষ্ট করতে যাবেন? আপনি তো কখনো অধর্ম করেননি। এতদিন যখন সহ্য করেছেন, এখনই-বা সহ্য করবেন না কেন? আপনি শান্ত হোন। এই ক্রোধকে আপনি পান করে ফেলুন—মন্যুং মহারাজ পিব প্রশাম্য।"

যুধিষ্ঠির নীরবে সব শুনলেন। দেখা যাচ্ছে, যুধিষ্ঠির আর আগের যুধিষ্ঠির নেই। অনেক ঝড় জল তাঁর মাথার উপর দিয়ে গেছে। অনেক দুঃখ কষ্ট অপমান সয়ে তিনি এখন শক্ত দৃঢ় তেজস্বী হয়ে উঠেছেন। দুঃখের তপস্যায় তিনি এখন সিদ্ধ তপোস্তপ্ত। তাই সঞ্জয়ের এই সব ভাল ভাল কথা তাঁর মনে আবেদন আনলেও বিচলিত করতে পারল না। তিনি কুশলী রাজনীতিকের ন্যায় শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে কথা বলতে লাগলেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের ভিতর দিয়ে মৃদু এবং পরোক্ষ ভাষায় নিজেদের অপরাজেয় বীরত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।

পাশে বসে শ্রীকৃষ্ণ নীরবে তাঁকে দেখছেন।

যুধিষ্ঠির একবার দেখছেন সঞ্জয়কে, একবার তাকাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দিকে। তাঁর স্বভাবের দুই বিপরীত মেরুতে যেন তাঁরা দুই জন। একদিকে ক্ষমা ত্যাগ বৈরাগ্য ও শান্তি; অপর দিকে ওজঃ বীর্য ন্যায় ও দণ্ড। একদিকে উদাসীনতা, অন্যদিকে পৌরুষ। সঞ্জয় যেন তাঁকে বলছেন, "আপনি স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।" আবার শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁকে বলছেন, "আপনি ধর্মরাজ। আপনি ক্ষত্রিয় বীর। লাঞ্ছিতা সতীর স্বামী।" উদ্যত খড়্গের মত দুইটি বিপরীত প্রশ্ন-চিহ্ন যেন তাঁর সম্মুখে: হৃদয়ের দৌর্বল্য? না, ধর্মের সত্যের বীর্য?

শ্রীকৃষ্ণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

না, যুধিষ্ঠির এবার আর ভুল করলেন না। কিংবা বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের নীরব উপস্থিতির শক্তি তাঁকে ভুল করতে দিল না।

যুধিষ্ঠির বললেন, "সঞ্জয়, আমি যে অধর্ম করতে যাচ্ছি একথা তোমাকে কে বলল ? ধর্ম কি তুমি জান ? আমি নাস্তিক নই। ধর্মকে লঙ্ঘন করে আমি স্বর্গরাজ্যও চাই না। তুমি দুর্যোধনকে ভাল করে বুঝিয়ে বলবে, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ আমরা অবশ্যই নেব। আমাদের ধর্মত প্রাপ্য যে সম্পদ তার উপর থেকে সে যেন তার লোভের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয় সে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আমাদের ফিরিয়ে দেবে, না হলে, যুদ্ধ করবে। আমি সন্ধিও জানি, যুদ্ধও জানি। সময় মত কোমল হতে পারি, আবার কঠোরও হতে পারি। তুমি বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কোন অধর্ম করছি কি না।"

এবার শ্রীকৃষ্ণ আলোচনার সূত্র তুলে নিলেন, "সঞ্জয়, তুমি একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ও ধর্মজ্ঞ হয়ে, সব জেনেও, নিছক কৌরবদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেবল বাগ্‌জাল বিস্তার করছ—ত্বং জানতাঃ জ্ঞানবান্ সন্ ব্যাযচ্ছসে সঞ্জয় কৌরবার্থে। তুমি ভাল করেই জান, দুর্যোধন কপট দ্যূতে মিথ্যা ছলনার দ্বারা পাণ্ডবদের রাজ্য অপহরণ করেছে। প্রকাশ্য রাজসভায় অন্যায় ও অশ্লীলভাবে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করেছে। একে-একে স্মরণ কর, দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের সেই কুৎসিত ইঙ্গিত ; দুঃশাসনের দ্বারা পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ : দুর্যোধনের জঘন্যসব অপমানকর উক্তি। কত আর বলব ? তবু পাণ্ডবেরা তাদের সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করে বনবাস অজ্ঞাতবাসের দুঃখ সহ্য করেছেন। আজ যদি তাঁরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য ফিরে পেতে চান, তাতে অধর্ম কোথায় ? তুমিই বল, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন আর তস্কর দস্যুর মধ্যে পার্থক্য কি ? পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করতে চায়। তবে দরকার হলে তাঁরা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। তাঁরা শান্তিস্থাপনে উদ্যোগী কিন্তু যুদ্ধ করতেও সমর্থ। এখন ধৃতরাষ্ট্র যা কর্তব্য মনে করবেন তাই করবেন। আমি পাণ্ডবদের যেমন মঙ্গল কামনা করি তেমনি কৌরবদেরও হিতাকাঙ্ক্ষী। শান্তি ও সম্প্রীতি ছাড়া আমি পাণ্ডবদের অন্য উপদেশ দিই না। যুধিষ্ঠিরও শান্তি চান। উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য দরকার হলে আমি নিজে গিয়ে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বলতে চাই। যদি আমার সন্ধির প্রস্তাব তারা গ্রহণ না করে তাহলে জানবে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। নিজের পাপে তারা নিজেরাই দগ্ধ হয়ে যাবে।"

সঞ্জয় আর কোন কথা বলতে পারলেন না। তখন পরস্পর প্রীতি-

বিনিময় করে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে চললেন।

ধৃতরাষ্ট্র ভুল বুঝেছিলেন। ভেবেছিলেন পাণ্ডবেরা সরল বোকা মানুষ। তাঁর এই কূট চালে তারা রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু পাণ্ডবদের দেব স্বভাব। দেবতারা সরল কিন্তু তাঁরা মূর্খও নয় গর্বিতও নয়—"নাবলিপ্তা নঃ বালিশাঃ" (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ১২১/৫০)।

হস্তিনাপুরে পৌঁছেই সঞ্জয় সেই গভীর রাত্রে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাজভবনে এলেন। প্রহরীকে বললেন, "দ্বারপাল, সম্রাটকে খবর দাও, পাণ্ডবদের কাছ থেকে সঞ্জয় ফিরে এসেছে। তিনি যদি এখনও জেগে থাকেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাই।"

ধৃতরাষ্ট্রের চোখে ঘুম নেই। তিনি জেগেই ছিলেন। সঞ্জয়কে তাঁর অন্তঃপুরে শয়নকক্ষে ডেকে পাঠালেন।

—"কি সংবাদ, সঞ্জয় ? সব কুশল তো ?"

—"হাঁ মহারাজ। পাণ্ডবেরা কুশলে আছেন। তাঁরা আপনাকে এবং সকল কৌরবপ্রধানকে প্রণাম জানিয়েছেন।" সঞ্জয়ের কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, কিছুটা বা ক্ষুব্ধ।

—"তারপর ?" ধৃতরাষ্ট্রের মনে উৎকণ্ঠা সংশয় প্রশ্ন।

—"মহারাজ এখনও সময় আছে। সাবধান হোন। আপনার পুত্রদের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাইছেন, এতে আপনার অধর্ম হচ্ছে। সর্বত্র আপনি নিন্দাভাগী হয়ে পড়ছেন। এ কাজ আপনার যোগ্য নয় (নেদং কর্ম ত্বৎসমং)। আপনি ভরত বংশে বিরোধের সৃষ্টি করছেন। তাই আমিও আপনার নিন্দা না-করে পারছি না (নো চেদিদং তব কর্মপরাধাৎ)। আপনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান, ধর্মার্থপ্রয়োগকুশল, আপনি কেমন করে এই কাজ করছেন ?"

চতুর ধৃতরাষ্ট্র বুঝে নিয়েছেন, সঞ্জয়ের দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে পাণ্ডবের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে। তাই তাড়াতাড়ি তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা ! তুমি এখন যাও। অনেক রাত হয়েছে। পথশ্রমে ক্লান্ত। তোমার বিশ্রাম দরকার। এখন গিয়ে বিশ্রাম করগে। কাল সকালে রাজসভায় তোমার কথা শুনব।"

ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে সঞ্জয় প্রস্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হয়ে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন। তারপর অস্থির কণ্ঠে ডাকলেন, "প্রতিহারি—"

[কুড়ি]

ভগ্ন হল সুধাপাত্র

সেই সারারাত ধরে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন। সে কি দুর্যোগের রাত! বাইরে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত। বাতাসের উন্মত্ত গর্জন। গাছপালা উপড়ে পড়ছে। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের ঝলক হানছে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজপ্রাসাদ কাঁপছে। সমস্ত হস্তিনাপুর যেন লণ্ডভণ্ড করে দেবে। "আরুজন্ গণশে বৃক্ষান্ পরুষোঽশনিনিস্বনঃ। প্রামথ্নাদ্ধান্তিনপুরং।" (উদ্যোগ-পর্ব, ৮৪ অধ্যায়) প্রবল বেগে ঝড় আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে—বুঝি পাণ্ডবদের উপপ্লব্য নগর থেকে ("বাতো দক্ষিণ-পশ্চিমোঃ")। এমনি ঘোর অশনিঝঞ্ঝা দিয়ে বেদব্যাস আসন্ন মহাযুদ্ধের পটভূমি ও মঞ্চ প্রস্তুত করছেন। যে সর্বনাশ মহাভারতে ঘনিয়ে আসছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বুঝি তারই প্রতীক।

ধৃতরাষ্ট্রের বুক কাঁপছে। তাঁর অন্ধ চক্ষুতে গভীরতর অন্ধকার!

"মহারাজ আপনি ধর্মকে অবলম্বন করুন। পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের মত। তারা আপনাকে পিতার তুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আপনি তাদের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিন। তাহলে আপনিও সুখী হবেন। আপনার অখ্যাতি দূর হবে। আপনি আপনার মর্যাদা অনুসারে কাজ করুন। মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না।" বিদুর তাঁর হৃদয় দিয়ে অন্তরের বিবেক মন্থন করে, সত্যের ধর্মের মঙ্গলের উপদেশ দিচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। হয়তো শেষ চেষ্টা করছেন। যদি ভরতবংশকে রক্ষা করা যায়। সারা রাত ধরে অনেক বোঝালেন। অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরে নানা উপাখ্যান ও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, ভারতবর্ষের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে। বললেন, যেমন করে প্রহ্লাদ তাঁর স্বীয় পুত্র বিরোচনের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার করেছিলেন, পুত্রের প্রাণের কথাও চিন্তা করেননি, আপনি তাই করুন, পুত্রের বশবর্তী হবেন না।

তারপর বিদুরের অনুরোধে এলেন ঋষি সনৎসুজাত।

তিনিও ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন সমস্ত বেদ ও ধর্মের যাবতীয় তত্ত্ব। এইভাবে তাঁদের সারারাত কেটে গেল—"সা ব্যতীয়ায় শর্বরী"। জ্ঞানের এতখানি আলো বোধহয় মহাভারতে আর কারো উপরে বর্ষিত হয়নি। কিন্তু তবু ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের অন্ধকার ঘুচলো না। তাঁর দৃষ্টির আঁধার কাটল না।

মনে কোন দাগ রাখল না। সব যেন জলের আলপনা। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের স্বভাব জানেন। আগেও তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন, পদ্মের পাতায় যেমন জল দাঁড়ায় না ধৃতরাষ্ট্রের মনেও তেমনি ধর্ম বেশিক্ষণ স্থান পায় না—"যথা চ পর্ণে পুষ্করস্যাবসিক্তং জলং ন তিষ্ঠেৎ" (বনপর্ব, ৫/১৬)। অন্তরটা তাঁর অবশ। শিথিল তাঁর বিবেক। তিনি ধর্মকে চান, কিন্তু ধরতে পারেন না। নিজেই বলেন, "আমি আমার বশে নই—ন ত্বহং স্ববশঃ। যা করা হয় তা করতে চাই না—ক্রিয়মাণং ন মে প্রিয়ম্।" কেবল দুর্যোধনই যে তাঁর কথা শোনে না তাই নয়, তিনি নিজেও নিজের কথা শোনেন না। এমন একটি জটিল দ্বৈধ-চরিত্র মহাভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

পরদিন সকালে রাজসভায় তিনি সঞ্জয়ের কাছে শুনলেন পাণ্ডবদের প্রস্তাব। ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর তাঁকে বারবার বোঝালেন, "মহারাজ, এ যুদ্ধ বন্ধ করুন। পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিন। না-দিলে অন্যায় হবে। বঞ্চনা করা হবে। অধর্ম হবে। এর পরিণাম ভাল হবে না।"

ধৃতরাষ্ট্র যেন সেসব শুনতেই পেলেন না। তিনি দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পুত্র, তুমি কি বল?"

দুর্যোধন বলল, "মহারাজ, আপনি বৃথাই শঙ্কিত হচ্ছেন। আমাদের রয়েছে বিপুল সেনা, অপরিমিত রাজশক্তি। সে তুলনায় পাণ্ডবদের সৈন্য নগণ্য। দেবগুরু বৃহস্পতি বলেছেন, নিজেদের চেয়ে শত্রুর সৈন্য যদি এক-তৃতীয়াংশ কম হয় তাহলে শত্রুর সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত। সেই হিসাবে পাণ্ডবদের চেয়ে আমাদের চার অক্ষৌহিণী সৈন্য বেশি। আমাদের সামনে তারা তৃণের মত ভেসে যাবে। আপনি ভীমকে ভয় পাচ্ছেন? কিন্তু স্বয়ং বলরাম আমাকে বলেছেন, গদাযুদ্ধে আমি অপরাজেয়। তুলনায় ভীম আমার চেয়ে নিকৃষ্ট। আপনি অর্জুনকে ভয় পাচ্ছেন? আমাদের পক্ষেও রয়েছেন মহারথ কর্ণ। কর্ণের হাতে আছে ইন্দ্রদত্ত একাঘ্নি বাণ। অমোঘ তার শক্তি। দেবতাদেরও সাধ্য নেই তা প্রতিরোধ করে। কর্ণ সেই বাণ রেখে দিয়েছেন কেবল অর্জুনকে বধ করবেন বলে। তাছাড়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের রাজা ভগদত্ত, তাঁরও হাতে রয়েছে বৈষ্ণবাস্ত্র। দেবতাদের পক্ষেও অমোঘ সেই শক্তি। সেই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হবে অর্জুনের বিরুদ্ধে। এছাড়া রয়েছেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ভূরিশ্রবা অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—এঁদের এক এক জনই সমস্ত পাণ্ডবদের নিহত করতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের দুর্বল ভাবছেন কেন? আর দেখছেন না, আমাদের শক্তি দেখে পাণ্ডবেরা

কত ভয় পেয়েছে ? এখন তারা আর রাজ্য চাইছে না। চাইছে কেবল পাঁচখানা গ্রাম।" (উদোগপর্ব, ৫৫ অধ্যায়)

—"কিন্তু পুত্র, আমি মনে করি, পাণ্ডবদের তুলনায় তোমার শক্তি দুর্বল। এই যুদ্ধ আমি চাই না। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা এ'রাও যুদ্ধের বিরোধী। তুমি কার উপরে ভরসা করে যুদ্ধ করবে ? আমি জানি, তুমিও নিজের ইচ্ছাতে এই যুদ্ধ চাইছ না। তোমাকে উত্তেজিত করছে দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি।"

ক্রুদ্ধ সর্পের মত দুর্যোধন তখন বলে উঠল "বেশ, তবে তাই। কৌরব-প্রধানগণ যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন তাহলেও ভ্রূক্ষেপ করি না। আমি, কর্ণ আর দুঃশাসন, তিনজনেই আমরা পাণ্ডবদের পরাজিত করব। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিও তাদের দেব না"—

যাবদ্ধি সূচ্যাস্তীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১৮
(উদ্যোগপর্ব, ৫৮ অধ্যায়)

এই হল দুর্যোধন। তার স্বভাবের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন কবি। শুধু স্বভাবই নয়, তার চাল-চলন হাব-ভাব অঙ্গভঙ্গি, তার চোখের বক্র দৃষ্টি, তার ঠোঁটের ক্রূর হাসি, তার কর্কশ কণ্ঠ, তার চিন্তাকুল ভ্রূকুটি, তার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস, তার মস্তকাবিক্ষেপ, তার ঊরুতাড়না, প্রভৃতি মুদ্রাদোষটি পর্যন্ত অতি নিখুঁত নিপুণ যত্নে এঁকেছেন বেদব্যাস। চরিত্র হিসাবে এমন জীবন্ত মহাভারতেও অল্প আছে। তাই তার সকল দোষ সত্ত্বেও কেমন যেন মমতাবোধ হয়। সে অসহনশীল ক্রোধী অহঙ্কারী। হৃদয় তার দস্যুর মত ক্রূর (তুল্যচেতাস্তু দস্যুভিঃ)। কর্কশভাষী পরনিন্দুক। মনে-মনে সর্বদা ক্রোধ ও শত্রুতা পুষে রাখে (দীর্ঘমন্যুরনেয়শ্চ)। সে প্রাণ দেবে তবু মাথা নত করবে না। (ম্রিয়েতাপি ন ভজ্যেত), সে যেন তৃণাচ্ছাদিত সর্প (তৃণাচ্ছন্ন ইবোরগঃ)। যুধিষ্ঠিরও তাঁর এই দাম্ভিক ভাইটিকে চিনেছিলেন, তিনি রূঢ় কথার মানুষ নন, তবু বলেছিলেন, দুর্যোধন "মোঘদর্পিতম্"। এমনকি ধৃতরাষ্ট্রও বলেছিলেন, "দুর্যোধন পাপমতি ক্রূর হৃদয়হীন। স ত্বং পাপমতিং ক্রূরং পাপচিত্তমচেতনম্"। (উদ্যোগপর্ব, ১২৪/৬)।...

সংবাদ এল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসছেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের দূত হয়ে। ধৃতরাষ্ট্র মনে-মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ

করলেন না। বরং অত্যন্ত উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দেখিয়ে বিদুরকে ডেকে বললেন, "শুনেছ বিদুর? বৃষ্ণিপ্রধান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসছেন হস্তিনাপুরে দূত হয়ে। তিনি আমাদের রাজঅতিথি। তাঁর সসম্মান অভ্যর্থনার আয়োজন কর। রাজপথে অসংখ্য বিশ্রামাগার সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ কর। নগরের সকল হর্ম্যাবলী ধ্বজ পতাকা গন্ধে মাল্যে শোভিত কর। তাঁর আগমন-পথের দুই ধারে সহস্র সহস্র সুন্দরী বারাঙ্গনা দাঁড়িয়ে তাঁকে বরণ করবে। দুর্যোধন ছাড়া আমার সকল পুত্রেরা তাঁকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে সোনার রথে। আর শোন, তাঁর আবাসের ব্যবস্থা কর আমাদের সবচেয়ে বিলাসবহুল দুঃশাসনের রাজভবনে।

"উপপ্লব্য থেকে তিনি আজ বৃকস্থল গ্রামে এসে পৌঁছেছেন। আগামীকাল হস্তিনাপুরে আসবেন। দেখ, যেন তাঁর সমাদরের ত্রুটি না হয়। আমি স্থির করেছি, দশার্হকুলমণি কৃষ্ণকে আমি রাজোচিত উপঢৌকনে আপ্যায়িত করব। তাঁকে উপহার দেব ষোলটি স্বর্ণরথ, আটটি মদমত্ত হস্তী, একশত যুবতী কান্তি-মতী সুন্দরী দাসী। যে দ্রুতগামী রথ আমি নিজে ব্যবহার করি, সেই রথখানিও তাঁকে দেব। সূর্যদ্যুতিমান আমার যে শ্রেষ্ঠ মণিরত্নখানি তাও তাঁকে দেব। আমার ও দুর্যোধনের সমস্ত রত্নভাণ্ডার তুলে দেব শ্রীকৃষ্ণের হাতে।"

শুনে বিদুর একটু মৃদু হাসলেন। বললেন, "মহারাজ, আপনার প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি, আপনার এই উৎসাহ আন্তরিক নয়। আপনার মনের গুপ্ত অভিপ্রায় আমি জানি। এসবই আপনার প্রবঞ্চনা (মায়ৈষা ছদ্মৈতদ্)। উৎকোচে ভুলিয়ে আপনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনতে চাইছেন। কিন্তু শুনুন, শ্রীকৃষ্ণকে ওভাবে ভোলান যায় না। এইসব বৃথা চেষ্টা না করে, তাঁকে শুধু পুণ্যকলসে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে স্বাগত করুন।"

ভীষ্ম তখন বললেন, "ঐশ্বর্য আড়ম্বরে তাঁকে আপ্যায়ন করা হোক আর নাই হোক, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। তবে তিনি অবহেলার যোগ্য নন। তাঁর অভীপ্সিত কাজ করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করুন, তাহলেই তিনি প্রীত হবেন।"

শুনে অবাধ্য দুর্যোধন প্রতিবাদ করে বলল, "পিতামহ, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি অসম্ভব। কৌরব আর পাণ্ডবে সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। পিতা যে ধন ঐশ্বর্য দিয়ে কৃষ্ণকে আপ্যায়িত করতে চাইছেন, তাতেও আমার আপত্তি। কেননা তাহলে কৃষ্ণ মনে করবেন আমরা ভয় পেয়েছি। বরং আমি স্থির করেছি, আগামীকাল হস্তিনাপুরে এলে আমি তাঁকে বন্দী করব—(নিযচ্ছামি

জনার্দনম্)। তাঁকে বন্দী করলেই পাণ্ডবেরা হতবল হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান, আমার এই কথা কৃষ্ণ যেন আগে থাকতে জানতে না পারেন।"

দুর্যোধনের এই অভিসন্ধির কথা শুনে ভীষ্ম স্তম্ভিত, বিদুর হতবাক্, ধৃতরাষ্ট্র বিহ্বল। উপস্থিত মন্ত্রীবর্গও অত্যন্ত ব্যথিত ও বিমনা হয়ে পড়লেন।

কাতর কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "এ তুমি কি বলছ, দুর্যোধন? শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রিয় আত্মীয়, সম্বন্ধী। তাছাড়া তিনি দূত হয়ে আসছেন। এ অবস্থায় তাঁকে কি বন্দী করা উচিত? এ যে অধর্ম!"

ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "ধৃতরাষ্ট্র, তোমার পুত্রের বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তুমিও আমাদের সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য করে ওই দুর্মতি পুত্রের বশবর্তী হয়েছ। কিন্তু বলে রাখছি, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করলে তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আর এখানে বসে থেকে এই পাপ কথা শুনতে চাই না।" এই বলে ক্রুদ্ধ ভীষ্ম সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।...

শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনায় সারা হস্তিনাপুর উল্লাসে জয়ধ্বনিতে মুখর। অলিন্দে-অলিন্দে পুরনারীদের পুষ্প ও লাজবর্ষণ। ভীষ্ম দ্রোণ ও কৌরব-কুমারগণে সমাবৃত হয়ে রাজপথে শ্রীকৃষ্ণের রথ এগিয়ে চলেছে। হর্ষধ্বনিমুখর জনতার চাপে রথের গতি মন্দীভূত। শঙ্খ ভেরী পটহ দুন্দুভি নিনাদিত হতে লাগল। উদ্বেল জনতার ভিতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রথ এগিয়ে চলেছে প্রভাতের কনকসূর্যের মত।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। তিনি জানেন, একটা হীন ষড়যন্ত্রের জাল পাতা রয়েছে এই অভ্যর্থনার অন্তরালে। তিনি প্রবেশ করেছেন একটা কুটিল শত্রুপুরীতে। যেখানে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ভারতের অসংখ্য রাজারা শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করছে। তাদের আক্রোশ মূলত পাণ্ডবদের একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষাকর্তা শ্রীকৃষ্ণের উপর। তাছাড়া দুর্যোধনের মনের অন্ধকারে যে ক্রুদ্ধ সর্প কুণ্ডলিত হয়ে আছে তাও তিনি জানেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ একা আসেননি। অরক্ষিত হয়েও নয়। তাঁর ঠিক পশ্চাতে দেহরক্ষী হিসাবে রয়েছেন সাত্যকি। আর তাঁকে ঘিরে অসংখ্য ছদ্মবেশী বৃষ্ণিবীর। সঙ্গে রয়েছে দশজন অস্ত্রধারী মহারথী। অনুচর হিসাবে এসেছে এক হাজার ছদ্মবেশী অশ্বারোহী আর এক হাজার পদাতিক। রথের মধ্যে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্তরালে লুকানো রয়েছে পর্যাপ্ত মারণাস্ত্র। প্রয়োজন হলে তা ব্যবহার করা চলবে। কেবল সাত্যকির ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

প্রথম দিন সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সৌজন্য বিনিময়ে কাটল।

দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, ভীষ্ম দ্রোণের আতিথ্য সবিনয়ে এড়িয়ে, শেষে অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ এসে অতিথি হলেন বিদুরের ভবনে।

শ্রীকৃষ্ণ তো রাজঅতিথি। সমস্ত রাজকীয় সমাদর বিলাস আড়ম্বর উপেক্ষা করে তিনি অপরাহ্নে অনাহূত অতিথি হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বিদুরের ভবনে। বিদুরের পক্ষে এ আশাতীত। তিনি বিস্মিত এবং ধন্য। বাসুদেব যে দীনবন্ধু!

আহারান্তে দুজনের কথায়-কথায় অনেক রাত হল। বিদুর তাঁকে বললেন, "বাসুদেব, আপনার এইভাবে শত্রুপুরীতে আসা উচিত হয়নি। দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে অগণিত রাজারা ক্রুদ্ধ আক্রোশে অপেক্ষা করছে। তাদের রাগ আপনার উপরে। আর দুর্যোধন বিবেকহীন বুদ্ধিহীন। সে অশিষ্ট দুষ্টচিত্ত। গুরুজনদের সম্মান দিতে জানে না। হয়তো সে আপনাকে অপমান করে বসবে। তারা আপনাকে সন্দেহ করে। আপনার কথা দুর্যোধন কখনই গ্রাহ্য করবে না। আপনার এই শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, পাছে আপনার কোন বিপদ হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আপনি প্রাজ্ঞ, বন্ধু এবং সুহৃদ। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও জানি, আমার এই সন্ধির প্রয়াস ব্যর্থ হবে। সেকথা আমি এখানে আসার আগে যুধিষ্ঠিরকে বলে এসেছি। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। যদি কুরুকুলকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান যায়। লোকে জানবে, আমি নিজেও বুঝব, আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি।"...

সকালে বিদুরভবনে এল দুর্যোধন আর শকুনি। শ্রীকৃষ্ণকে তারা রাজসভায় নিয়ে যেতে এসেছে।

সুসজ্জিত রথে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের হাত ধরে। পিছনে সাত্যকি ও কৃতবর্মা। আশ্চর্য, কৃতবর্মাও এসেছে শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাতে? সে তো ইতিমধ্যেই তার এক অক্ষৌহিণী ভোজ বংশীয় সৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছে। হোক সে শত্রু, তবু যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অতিথি হয়ে এসেছেন, সে কি অভ্যর্থনা করতে না এসে পারে? শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করে চলেছেন বৃষ্ণিবীর রথীগণ। শ্রীকৃষ্ণকে তারা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করে চলেছেন ("কৃষ্ণো বৃষ্ণিভিশ্চাভিরক্ষিতঃ")। তাঁর রথকে ঘিরে রেখেছেন তারা ("পরিবার্য রথং")।

তাঁদের পশ্চাতে দুর্যোধনের ও শকুনির রথ।

রথ এসে থামল রাজসভার দ্বারে।

শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় প্রবেশ করলেন প্রদীপ্ত সূর্যের মত।

ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ ও উপস্থিত রাজমণ্ডলী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য করলেন, তাঁকে দর্শন করবার জন্য সেই রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন বহু মুনি ঋষি তপস্বী।

দাঁড়িয়ে আছেন ঋষি নারদ, কণ্বমুনি ও আরো অনেক মহাতপা ঋষি। কিন্তু কেউ তাঁদের অভ্যর্থনা করছে না। আসন দিচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন, কৌরবেরা কতখানি অভদ্র আভিজাত্যবর্জিত ইতরমনা হয়ে পড়েছে। এদের বাঁচাবে কে?

শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ না করে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে সভায় গুঞ্জন উঠল।

শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন, "আগে মুনি ঋষিগণকে পূজা করুন। তাঁদের আসন দান করুন। নইলে আমরা বসি কেমন করে?"

তখন ভীষ্ম শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কর্মচারীদের আদেশ দিলেন, "পাদ্য আন, অর্ঘ্য আন, আসন আন।"

কর্মচারীদের মধ্যে ছোটাছুটি পড়ে গেল।

ঋষিগণ অর্চিত হয়ে উপবেশন করলে শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করলেন।

এই একটি ছোট্ট ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি আলোর মতই স্পষ্ট করে দিয়েছেন কৌরবেরা কতখানি শ্রদ্ধাহীন, ধর্মভ্রষ্ট, হীনরুচির মানুষ। এমন হীন ও সংকীর্ণ মন নিয়ে তারা ভারতবর্ষের শাসনভার দাবি করে?

শ্রীকৃষ্ণ আরো অনুভব করলেন সভার মধ্যে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। প্রত্যেকের হাবভাব, চোখের দৃষ্টি, কে কোথায় কি ভাবে বসে আছে সমস্তই বেদব্যাস এখানে দেখিয়ে দিচ্ছেন, যেন রহস্যরোমাঞ্চিত এক চিত্রনাট্যের দৃশ্য।

পরস্পর মন্ত্রণা ও পরামর্শের সুবিধার জন্য দুর্যোধন আর কর্ণ উভয়ে একই আসনে বসেছে শ্রীকৃষ্ণের পাশে। স্বতন্ত্র একটি আসনে শকুনি ও তার পুত্র উলুক। তাদের ঘিরে সশস্ত্র গান্ধার সেনারক্ষী। কূট শকুনি নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ অটুট রেখেছে। ধীরে-ধীরে সাত্যকি ছায়ার মত শ্রীকৃষ্ণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সৌজন্য দেখিয়ে তখন দুঃশাসন তাঁকে বসবার আসন দিল।

বিদুর বসেছেন শ্রীকৃষ্ণের আসনের সংলগ্ন একটা নীচু বেদীতে শুভ্র অজিন আসন পেতে। বিনয় নম্রতা ও প্রজ্ঞার এক মৌন জ্যোতি।

আর অদূরে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট অগণিত রাজমণ্ডলী। সুবর্ণপাত্রের কেন্দ্রে রক্ষিত নীলকান্তমণির মত সভায় বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণ।

সকলের মৌন প্রণত দৃষ্টি তাঁরই দিকে।...

উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে, ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "ভরতবংশধর, আমি আপনার কাছে একটি ভিক্ষা একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। কুরুবংশের সততা ও গৌরব জগদ্বিখ্যাত। আপনি তার রক্ষাকর্তা। আপনার বংশে কোথাও যদি কোন মিথ্যা অন্যায় আচরণ হয়, আপনি তার প্রতিকার করবেন। সৎপথে চালনা করবেন। আমি বিশ্বাস করি, কুরু-পাণ্ডবের এই বিবাদ মিটিয়ে শান্তি ও সৌহার্দস্থাপন সম্ভব। আপনি আপনার পুত্রদের শাসন করুন; আমি পাণ্ডবদের শান্ত রাখব। জানবেন, এই বিরোধের পরিণাম ভয়ঙ্কর। কৌরব পাণ্ডব ও ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল এই বিরোধের আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই মহাভয় থেকে আপনি জগৎকে রক্ষা করুন। পাণ্ডবেরা বাল্যকাল থেকে পিতৃহীন। আপনি তাদের পিতা। তাদের রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আপনার আদেশ ও আশ্বাসের উপর নির্ভর করেই সত্যপ্রতিজ্ঞ পাণ্ডবেরা অশেষ কষ্ট সহ্য করেছে। এখন তারা আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাদের প্রাপ্য রাজ্য তারা ফিরে চাইছে। তাদের এই দাবি ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত। এখানে এই সভায় যত রাজমণ্ডলী আছেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করি, তাঁরাই বিচার করে বলুন, আমি ন্যায় বলছি, না অন্যায় বলছি ?

কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনার তো অবিদিত নয়, ষড়যন্ত্র করে পাণ্ডবদের একবার জতুগৃহে দগ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল, হস্তিনাপুর থেকে ইন্দ্রপ্রস্থে আপনিই তাদের নির্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তারা আপন শৌর্যবলে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করে আপনারই অধীন করে দিয়েছে। তারা কখনই আপনাকে অমান্য করেনি। শেষে কপট দ্যূতে শকুনি তাদের রাজত্ব হরণ করে। তবুও যুধিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হননি। এখনও তারা আপনারই অধীনে শিষ্যের মত বাস করতে চায়। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি পাণ্ডবদের প্রতি প্রসন্ন হন। তারা আপনার আশ্রিত। তাদের আপনি বঞ্চিত করবেন না।"

সভার সকলেই মনে-মনে শ্রীকৃষ্ণের ভাষণের প্রশংসা করলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বললেন না।

তখন জামদগ্ন্য পরশুরাম বললেন, "কৃষ্ণ ও অর্জুন নর ও নারায়ণ। মহারাজ, আপনি সন্ধি করুন। যুদ্ধ হতে দেবেন না।"

ঋষি নারদ বললেন, "দুর্যোধন, সুহৃদ্‌গণের উপদেশ শোন। বেশি জিদ্ ক'রো না। অতি দর্প ভাল নয়। ক্রোধ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।"

মহর্ষি কণ্ব বললেন, দুর্যোধন, নিজের বলের গর্ব ক'রো না। বলবানের চেয়েও বলবান্ আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু। তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও।"

মহর্ষি কণ্বের কথায় দুর্যোধন ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। একবার বক্রভাবে কর্ণের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসল। তারপর ঋষিকে তাচ্ছিল্য করে ঊরু চাপড়ে বিদ্রূপ করে বলল, "ঈশ্বর আমাকে যেমন করেছেন আমি তেমনি চলছি। আপনি বৃথা এত প্রলাপ বকছেন কেন?"

সভাকক্ষ তখন উত্তপ্ত।

সকলকে প্রশমিত করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "হে নারদ, আপনি যথার্থ বলেছেন। আমিও সন্ধি করতে চাই। কিন্তু আমি অসহায় অক্ষম। হে জনার্দন, আপনি ওই মূর্খ দুর্যোধনকে বুঝিয়ে সৎপথে আনুন। সে আমার ও গান্ধারীর কথা শোনে না। ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের কথাও গ্রাহ্য করে না। সে পাপমতি বিবেকহীন।"

শ্রীকৃষ্ণ শান্ত কণ্ঠে বোঝাতে লাগলেন, "দুর্যোধন, উচ্চবংশে তোমার জন্ম। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান কর্মকুশল। পিতামাতার আদেশ মান্য কর। পাণ্ডবেরা তোমার ভাই, তাঁরা তোমাকে ভালবাসেন। তাঁরা তোমাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। আর তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজ পদে বরণ করে তাঁরই আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। "ত্বামেব স্থাপয়িষ্যন্তি যৌবরাজ্যে··· মহারাজ্যেঽপি পিতরং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্" (উদ্যোগপর্ব, ১২৪/৬০)। তারা সহায় থাকলে কৌরববংশ হবে অজেয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে অবহেলা ক'রো না।"

ভীষ্ম তাকে স্নেহের কণ্ঠে বললেন, "বৎস, মন থেকে শত্রুতা মুছে ফেল। তুমি যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম কর। যুধিষ্ঠির তোমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুন। কুরু-পাণ্ডবের এই স্নেহের মিলন দেখে রাজারা আনন্দাশ্রু মোচন করুন।"

শুনে উষ্মা ও বিরক্তি নিয়ে দুর্যোধন বলল, "কেশব, আপনার বিবেচনা করে কথা বলা উচিত। আপনারা তো কেবল আমারই দোষ দেখছেন। কিন্তু বলুন আমার দোষ কোথায়? পাণ্ডবেরা পাশা খেলায় অনুরক্ত। তারা নিজেরাই খেলতে এসেছিল। যদি মাতুল শকুনির কাছে পরাজিত হয়ে রাজ্য হারায় তাতে আমার দোষ কোথায় দেখলেন? বরং আমরা তাদের সব ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আবার যদি তারা পাশা খেলতে বসে এবং হেরে গিয়ে বনবাসে যায়, তাতে আমার অপরাধ কি?

"কেশব, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের কোন্ অপরাধে তারা প্রকাশ্যে

কুরুবংশের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আত্মীয়তা করছে ? শত্রুর সঙ্গে মিলে আমাদের বধ করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে ? আমরা তাদের কি করেছি—কিমস্মাভিঃ কৃতং তেষাং ? কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা বীর, আমরা প্রাণ দেব তবু কারো হুমকিতে মাথা নত করব না ।

"আর ন্যায়ত সম্পূর্ণ রাজ্যের উত্তরাধিকারী আমি । অর্ধেক রাজত্ব পাণ্ডবদের দেওয়া উচিত হয়নি । আমি তখন বালক ও পরাধীন ছিলাম । কিন্তু এখন আর আমি তাদের রাজত্বের অধিকার স্বীকার করি না । আমার স্পষ্ট কথা শুনে রাখুন, আমাকে যুদ্ধে জয় না করে পাণ্ডবেরা সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিও পাবে না ।"

দুর্যোধনের এই দাম্ভিক উক্তি শুনে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল, "দুর্যোধন, তোমার যুদ্ধের সাধ হয়েছে । রণক্ষেত্রে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে অচিরেই তোমার সেই সাধ মিটবে । জিজ্ঞাসা করছিলে তোমার দোষ কোথায় ? তবে শোন, সমবেত রাজমণ্ডলী, আপনারাও শুনুন, পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি দেখে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে শকুনির সঙ্গে পাশাখেলার কুমন্ত্রণা করেছিল কে ? সরল শুদ্ধাত্মা যুধিষ্ঠিরকে অন্যায় ও কপট দ্যূতে প্রবৃত্ত করেছিল কে ? তুমি ছাড়া এমন অধম কে আছে, যে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীকে সভার মধ্যে টেনে নিয়ে আসে ? কে সেদিন দ্রৌপদীর উপর অমন অকথ্য অশ্লীল বর্বর আচরণ করেছিল ? মাতা কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে । তুমিই ভীমকে বিষ খাইয়েছিলে । সর্পদংশনে হত্যা করতে গিয়েছিলে । জলে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করেছিলে । আজ তুমি এখানে বসে ভাল মানুষের মত কথা বলছ ?"

শ্রীকৃষ্ণের প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল থেকে যেন অগ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে ।

তখন সহসা দুঃশাসন উঠে দাঁড়িয়ে দুর্যোধনকে বলল, "রাজন্, আমার আশঙ্কা, এঁরা আমাদের বন্দী করে পাণ্ডবদের হাতে তুলে দিতে চান । সুতরাং আর বিলম্ব নয় ।"

দুর্যোধন তখন ক্রুদ্ধ সর্পের মত কর্ণ ও দুঃশাসনের হাত ধরে সরোষে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল ।

শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সম্বোধন করে বললেন, "আপনারা দুর্যোধনের মত একটা অশিষ্ট মূর্খের হাতে রাজ্যভার দিয়ে অন্যায় করেছেন । যদি মঙ্গল চান তবে এখনই তাকে বন্দী করুন ।"

ধৃতরাষ্ট্র আর একবার অসহায় ব্যর্থ চেষ্টা করলেন । গান্ধারীকে দিয়ে অনুরোধ করালেন । কিন্তু দুর্যোধন মায়ের অনুরোধ অনাদর করে চলে

গেল। অদূরে দাঁড়িয়ে কর্ণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার ইঙ্গিত করল।

কিন্তু সাত্যকির দৃষ্টি এড়াল না।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার আগেই সাত্যকি ছদ্মবেশী বৃষ্ণিবীরদের আদেশ দিলেন, "শীঘ্র এই সভাকক্ষ ব্যূহবদ্ধ করে ঘিরে ফেল। যেন দুর্যোধনের লোক সভায় প্রবেশ করতে না পারে।"

সাত্যকির ছদ্মবেশী যোদ্ধারা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা এক রক্ষাব্যূহ তৈরী করল। সভাকক্ষের সব কটি প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল কৃতবর্মা ও তাঁর যোদ্ধারা। কৃতবর্মা দুর্যোধনের মিত্র কিন্তু যেখানে শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ, সেখানে সে স্থির থাকবে কেমন করে? কৃতবর্মা তাই এখন সাত্যকির পাশে।

দুর্যোধন ভীত ও বিমূঢ়। সাত্যকির এই ক্ষিপ্রতা তাকে হতচকিত করে দিয়েছে।

তখন সভায় ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবপ্রবীণদের কাছে সাত্যকি এসে দুর্যোধনের কুমতলব ফাঁস করে দিলেন।

শুনে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "রাজন্, দুর্যোধন আমাকে বন্দী অথবা বধ করতে চায়। বেশ তো, তাকে অনুমতি করুন, সে এসে আমাকে বন্দী করুক। সাত্যকি, সভাকক্ষের প্রবেশদ্বার থেকে তোমার রক্ষীদের সরিয়ে নাও। দুর্যোধন ও তার রথীদের আসতে দাও। তারা এসে আমাকে বন্দী করুক। দেখি, তাদের কত শক্তি।"

সমস্ত সভাকক্ষ ভয়ে আশঙ্কায় থম্‌থম্ করছে। একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে, সকলে সেই উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত। একটা ধ্বংস একটা প্রলয় বুঝি এসে পড়ল।

ঋষিগণ স্বস্তিমন্ত্র জপ করতে লাগলেন।...

[একুশ]

অনলগর্ভা কুন্তী

স্তব্ধ আতঙ্কিত সভাকক্ষ।

একটা অঘটন ঘটতে গিয়েও ঘটল না।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অন্তরের সকল পাপ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এই প্রথম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কণ্ঠে গর্জে উঠল রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ও তেজ। তিনি দুর্যোধনকে ধমক দিয়ে বললেন, "নৃশংস, পাপিষ্ঠ, তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি পাপাত্মাদের সাহায্যে পাপ করতে যাচ্ছ। তুমি কুলাঙ্গার। তুমি মূর্খ। ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম সহ্য করতে পারে। তুমি সেই দেবেন্দ্রবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করতে চাও? বালক হয়ে চাঁদ ধরতে চাও?"

তখন সহসা সকলে দেখল শ্রীকৃষ্ণের ঘোর করাল ভয়ঙ্কর মূর্তি। তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে অগ্নি এবং সর্বাঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ব্রহ্মাণ্ডতাপন তেজে আবির্ভূত। শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি দিব্য প্রহরণ থেকে শক্তির ছটা বিকীর্ণ হচ্ছে।

সমস্ত রাজারা ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

ঋষিগণ স্তব করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্র দিব্যদৃষ্টি পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম রূপ দর্শন করলেন।

দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিগণ প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, "প্রভু, প্রসন্ন হও। তোমার এই ঘোর রূপ সংবরণ কর। নইলে সৃষ্টি বিনষ্ট হবে।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন আত্মসংবরণ করে পূর্বরূপ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু দুর্যোধন নীরব। তার মনে কোন প্রভাব পড়ল না। তার কাছে এসব মায়া কুহক ভেল্কি। সে ভাবল, এসব শ্রীকৃষ্ণের যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল। পরে সে উলূকের মারফত বলেছিল, "সভায় যেসব ভেল্কি দেখিয়েছিলে যুদ্ধের সময় তাই দেখিও। তোমার ওইসব মায়া যাদুবিদ্যা আমাদের শুধু ক্রোধই বাড়িয়ে তুলেছে।"

> সভামধ্যে চ যদ্ রূপং মায়য়া কৃতবানসি।
> তৎ তথৈব পুনঃ কৃত্বা সার্জুনো মামভিদ্রব॥ ৫৪
> ইন্দ্রজালঞ্চ মায়া বৈ কুহকা বাপি ভীষণা।
> আত্তশস্ত্রস্য সংগ্রামে বহন্তি প্রতিগর্জনাঃ॥"৫৫

(উদ্যোগপর্ব, ১৬০ অধ্যায়)

এ পর্যন্ত আমরা মহাভারতে নানা চরিত্রের মুখে নানাভাবে শুনে আসছি, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। সৃষ্টির আদি, শাশ্বত সনাতন দিব্য পরমপুরুষ। ব্যাসদেব বলেছেন, মার্কণ্ডেয় নারদ কণ্ব প্রমুখ ঋষিগণ বলছেন, ভীষ্ম বলছেন, ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, এমনকি দুর্যোধনও স্বীকার করছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই দাবি করছেন না। বরং আচারে আচরণে তিনি আর পাঁচজন মানুষের মতই আত্মীয় বন্ধু সখা। তিনি ভাবুক প্রেমিক যোদ্ধা। "মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ঈড্য।" (ঋগ্বেদ, ১-৭৫-৪) তিনি বন্ধু, তিনি প্রিয়, তিনি সখাগণের প্রীতিভাজন সখা।

অর্জুনও তাঁকে মানবসখা বলেই জানতেন। তাঁর মহিমা সম্যক্ জানতে পারেননি—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং...... (গীতা, ১১/৪১)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণের এই অতিপ্রাকৃত অনৈসর্গিক আত্মপ্রকাশকে বিশ্বাস করেও করেননি। তিনি বলেছেন, "যাহা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।" কিন্তু পরেই বলছেন, "ইহাও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না।" (বঙ্কিম রচনাবলী, মৌসুমী, ১৯৮৩, পৃ. ৬০১)

শুধু শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারেই নয়, মহাভারতের আরো অনেক অনেক ক্ষেত্রে, আমাদের আধুনিক মনের কাছে যা অদ্ভুত উদ্ভট আজগুবি, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ড"। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রের' জন্য মহাভারতে ঐতিহাসিক বাস্তব তথ্য খুঁজছিলেন, তাই তাঁকে সাবধান হয়ে এত বাদবিচার করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা মহাভারতের সাহিত্য পাঠক আমাদের সে গরজ নেই। আমরা জানি, সাহিত্যের সত্য আর বাস্তবের সত্য এক নয়, তারা সর্বদা একসাথে চলে না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি, "ঘটে যা তা সব সত্য নয়।"

এই প্রসঙ্গে রাজশেখর বসু বড় সুন্দর বলেছেন, "যিনি কথাগ্রন্থ হিসাবেই মহাভারত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবার কারণ নেই। তিনি প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রন্থে বহু লোকের হাত আছে, তার ফলে উত্তম মধ্যম ও

অধম রচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসঙ্গে পড়তে হবে। কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে কোন বাধা হয় না। সহৃদয় পাঠক এই জগদ্‌বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে পড়তে পারবেন। তিনি এর শ্রেষ্ঠ প্রসঙ্গসমূহ মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করবেন এবং কুরচিত বা উৎকট যা পাবেন তা সকৌতুকে উপেক্ষা করবেন।" ('মহাভারত' সারানুবাদ, ভূমিকা)

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, এবং তার ভিতর দিয়ে ধাপে-ধাপে যে নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে তা চূড়ান্ত হয়ে সপ্তমে উঠেছে কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে। সহৃদয় রসিক পাঠকের কাছে তা মোটেই আজগুবি বলে উপেক্ষার নয়। বরং এখানে বেদব্যাসের প্রতিভার পৌরুষ, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "masculine genius", বলিষ্ঠভাবে প্রতিভাত।

যা বাস্তব ও স্বাভাবিক তারই শিশির বিন্দু দিয়ে গড়া যে মন্দমধুর কবিকল্পনা, তা বেদব্যাসের নয়। বাস্তবের মাটির মধ্যে অধিবাসিত যে অগ্নি সেই বহ্নিপ্রাণ হল বেদব্যাসের কবিকল্পনা। তিনি তাঁর আয়সকঠোর কবি-প্রতিভা নিয়ে প্রকৃতির গোপন সত্যকে এক বিপুল পৌরুষে উন্মোচিত করে ধরেন। সম্ভাব্যতার স্বাভাবিকতার যে সলজ্জ কুণ্ঠা তাকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি বলে যান তাঁর অন্তরের ভাবকে। বহির্বিষয়ের সঙ্গতিসুষমা, তার বিশদ বর্ণনা তাঁর কাছে ততটা প্রয়োজনীয় নয়। বরং তিনি তা বাহুল্য বলে মনে করেন। তাঁর কাছে প্রধান ও একমাত্র হল ঘটনার অন্তরের সত্যের, তাঁর যোগলব্ধ দৃষ্টির অভ্রান্ত সামর্থ্যের প্রকাশ। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "He takes the kingdom of Nature by violence।" সেসব ক্ষেত্রে তাঁর শ্লোকগুলি যেন অগ্নিচ্ছটা বিকীর্ণ করে—

> নেত্রাভ্যাং নস্তশ্চৈব শ্রোত্রাভ্যাঞ্চ সমন্ততঃ।
> প্রাদুরাসন্‌ মহারৌদ্রাঃ সধূমাঃ পাবকার্চিষঃ॥ ২
> রোমকূপেষু চ তথা সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ।
> তং দৃষ্ট্বা ঘোরমাত্মানং কেশবস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩
>
> (উদ্যোগপর্ব, ১৩১ অধ্যায়)

(তাঁর নেত্রদ্বয় নাশাপুট ও কর্ণমণ্ডল থেকে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হতে লাগল। শরীরের সকল রোমকূপ দিয়ে সূর্যকিরণের ছটা বিকিরণ হতে লাগল। তাঁর সেই ঘোর ভয়ঙ্কর রূপ ···)

এই রূপ এই মূর্তি আমাদের আধুনিকের কাছে বাস্তবের সত্য না হতে পারে কিন্তু এ সাহিত্যের সত্য। বাস্তবের চেয়েও যা আমরা বড় বলে জানি। এবং দুর্যোধন যে একে "ইন্দ্রজালঞ্চ মায়া বৈ কুহকা" বলে উপহাস করল, এতেই কবি বাস্তবের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ধরে রাখলেন।

ঘটনার বিবরণ আবার মাটি ছুঁয়ে চলতে লাগল।

সকলের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি ও বিদুরের হাত ধরে শ্রীকৃষ্ণ সভা থেকে বেরিয়ে এলেন।

দারুক রথ নিয়ে এল।

ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, "জনার্দন, আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। আমি শান্তি চেয়েছি। দুর্যোধনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা আমার অবাধ্য।"

যেতে-যেতে কৌরবপ্রধানদের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "সভায় যা ঘটল তা আপনারা দেখলেন। দুর্যোধন যে আমাকে বন্দী করতে চেয়েছিল তাও জানলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দিন, আমি যুধিষ্ঠিরের কাছে যাব।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্বেতবর্ণ রথে করে এলেন বিদুরভবনে কুন্তীর কাছে বিদায় নিতে।...

ঘটনার দুর্বার গতি এবার বাঁক নিল অনিবার্যভাবে।

সবাই বুঝতে পারছে কি ঘটতে চলেছে। একটা আসন্ন ধ্বংস ক্রমশ করাল ছায়া বিস্তার করছে। মহাকাল তাঁর নিষ্ঠুর করে ভয়ঙ্কর এক উদ্দাম সংগীতের মীড় বেঁধে ধরছেন সপ্তম স্বরে। কবি দেখাচ্ছেন, সেই ধ্বংসের আগুন চাপা রয়েছে কোথায়। কুরুক্ষেত্রের সমর সম্ভারের মধ্যে নয়। উভয় পক্ষের মরণপণ রণহুঙ্কারের মধ্যেও নয়। দুর্যোধনের ঈর্ষায় কিংবা ভীমের আক্রোশেও নয়। সেই আগুন এতকাল সবার অলক্ষ্যে জ্বলছে বিধবা মায়ের বুকে। চিরবঞ্চিতা পরাশ্রিতা পাণ্ডবজননী কুন্তীর বক্ষে।

এতকাল সকল সংঘাত থেকে দূরে সরে থেকে কুন্তী এক ক্ষীণ অগ্নিশিখার মত নিভৃতে জ্বলছিলেন। আজ সেই নির্জন শিখার আলোকে পদ্মাসনা ভারতের ললাট হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরের হৃদয় মহাভারতের মর্মতন্ত্রী। আমরা বলেছি—সে যেন এক আলোর তট। সেখানে সকলের দুঃখের তরঙ্গাঘাত এসে আছড়ে পড়ছে। শুধু নিজের অথবা আপনজনের দুঃখই নয়, শত্রুর দুঃখও তাঁকে সমানভাবে ব্যথিত করে। কুন্তীর হৃদয়ের

ব্যথাও করুণ বেহাগে বেজে ওঠে যুধিষ্ঠিরের একটি দীর্ঘশ্বাসে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "আমাদের মাতা বিবাহের পর থেকে জীবনে একদিনও শান্তি পাননি, সুখী হননি—

> উঢ়াৎ প্রভৃতি দুঃখানি শ্বশুরাণামরিন্দম।
> নিকারানতদর্হা চ পশ্যন্তী দুঃখমশ্নুতে ॥ ৪২
>
> (উদ্যোগপর্ব, ৮৩ অধ্যায়)

এমনকি দুর্যোধনও স্বীকার করেছে, তোমাদের মাতা বহুদিন ধরে অশেষ কষ্ট সহ্য করছেন—"ক্লিষ্টায়া বর্ষপূগাংশ্চ মাতুর্মাতৃহিতে স্থিতঃ"। (উদ্যোগ-পর্ব, ১৬০/৪৬)

শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রণাম করে বিদায় নিতে এলেন, তখন কুন্তীর করুণ দৃষ্টিতে ফুটে উঠল বজ্রাগ্নির শিখা। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন মুক্ত কৃপাণ। বললেন, "কেশব, তুমি যুধিষ্ঠিরকে আমার কথা ব'লো। পুত্র, তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার রাজধর্ম অবহেলা করছ। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত কেবল বেদপাঠ করছ কিন্তু বেদের নিহিত অর্থ বুঝতে পারছ না। তোমার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে। তুমি সন্ন্যাসী *নও, রাজর্ষির পথে চল। পিতৃপিতামহের রাজধর্ম পালন কর। সাম দান* দণ্ড ভেদে পিতৃরাজ্য উদ্ধার কর। তোমার জননী হয়েও আমি পরের আশ্রয়ে পরের দয়ার দান অন্নপিণ্ডের প্রত্যাশায় দিন কাটাচ্ছি, এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে? ইতো দুঃখতরং কিং নু যদহং হীনবান্ধবা। পরপিণ্ডমুদীক্ষে বৈ... ?" (উদ্যোগপর্ব, ১৩২/৩৩)

এই বলে কুন্তী শোনালেন বিদুলার উপাখ্যান। রাজ্যহারা নিশ্চেষ্ট হতাশ পুত্রকে বিদুলা কি ভাবে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়েছিলেন, তারই তেজদৃপ্ত কাহিনী। বিদুলা বলেছিলেন, পুত্র, তুমি কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে শুয়ে আছ কেন? শত্রুনির্জিত হয়ে মৃতের মত থেক না। উঠে বস। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সিংহনাদ কর। তুষের আগুনের মত নির্জীব ভাবে ধূমায়িত হয়ে ধিকধিক করে জ্ব'লো না; তিন্দুক কাঠের মত মুহূর্তে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠ।

> উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা শ্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জিতঃ ॥ ১২
> ...ত্বং মাধ্যে ভূমিষ্ঠ গর্জিতঃ ॥ ১৩
> অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি বিজ্বল।
> মা তুষাগ্নিরিবানর্চির্ধূমায়স্ব জিজীবিষুঃ ॥ ১৪
>
> (উদ্যোগপর্ব, ১৩৩ অধ্যায়)

কুন্তীর এই কণ্ঠ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যঘোষ—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

(গীতা, ২/৩)

(হে পার্থ, ক্লীবের মত হয়ো না; তোমার তা সাজে না। হে শত্রুবিজয়ী বীর, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও।)

সেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠের ধ্বনি যেন রুদ্রের তাণ্ডব ডমরুনিনাদ—মহাভারতের সারা আকাশকে প্রকম্পিত করে তুলল। দুঃখক্লিষ্টা কুন্তীর ব্যথিত মাতৃত্ব এখানে তেজস্বিনী প্রভায় ভাস্বর। প্রথম যৌবনেই তিনি যে সূর্যের তেজ ধারণ করেছিলেন। দুঃখের আগুনে কুন্তী তাই আজ অনলগর্ভা।

কাহিনীর এক মর্মন্তুদ গর্ভাঙ্কে ওই একই মাতৃত্বের টানে একদিন তিনি লজ্জার অবগুণ্ঠন টেনে উপস্থিত হলেন নির্জন ভাগীরথীর তীরে। যেখানে জলে দাঁড়িয়ে পূর্বাস্য হয়ে সূর্যপূজায় প্রার্থনায় রত কর্ণ। কুন্তী পদ্মমালার ন্যায় শুষ্কশীর্ণ (পদ্মমালেব শুষ্যাতি) ম্লান মুখে এসে দাঁড়ালেন আরাধনারত পুত্রের উত্তরীয়-ছায়ায় (কর্ণস্যোত্তরবাসসি)।

পূজা শেষ করে কর্ণ সবিস্ময়ে দেখে প্রার্থীর মত মলিন মুখে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাণ্ডবজননী।

—"আমি কর্ণ, অধিরথ সূত রাধার নন্দন। দেবি, আপনাকে প্রণাম করি। আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করতে হবে।"

বাষ্পাকুল কণ্ঠে কুন্তী বললেন, "বৎস, তুমি রাধার পুত্র নও। কুন্তীপুত্র তুমি। আমি তোমার জননী। জগৎ-প্রকাশক সূর্য তোমার পিতা। তুমি নিজের ভ্রাতাদের না চিনে দুর্যোধনের সেবা করছ, তা তোমার যোগ্য নয়। তোমার উত্তরাধিকার রাজত্ব কৌরবেরা হরণ করেছে। তুমি তা পুনরুদ্ধার করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভোগ কর। তুমি আমার প্রথম সন্তান। তোমাকে যেন কেউ আর সূতপুত্র না বলে।"

লজ্জাতুরা মাতার সেই করুণ কণ্ঠ শুনে আকাশ কেঁপে উঠল। সূর্যমণ্ডল থেকে পিতৃস্নেহবিগলিত কণ্ঠের দৈববাণী শুনতে পেল কর্ণ, "বৎস, তোমার জননী কুন্তী সত্য বলছেন। তুমি তাঁর কথা শোন। তোমার মঙ্গল হবে।"

শুনে কর্ণ অবাক হল না। সে তো তার জন্মের বৃত্তান্ত আগেই শুনেছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে। কুন্তীর মত একই অনুরোধ তিনিও করেছিলেন। সেদিন

শ্রীকৃষ্ণকে সে যা বলেছে আজো তাই বলল কুন্তীকে। তবে স্নেহাতুর কণ্ঠ তার অশ্রুভারাক্রান্ত হল দুর্জয় অভিমানে। ক্ষোভে বেদনায় নিষ্ঠুর বিদ্রূপে মায়ের বুকে চরম আঘাত দিয়ে বলল, "মা, তুমি আমাকে জন্মের পরে পুত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জলে নিক্ষেপ করেছিলে। নামহীন গোত্রহীন এক লজ্জাকর অন্ধকারে ভাসিয়ে দিয়েছিলে। সেদিন তোমার এই মাতৃস্নেহ কোথায় ছিল? আজ তুমি এসেছ পঞ্চপাণ্ডবের হিতের জন্য আমাকে তাদের পক্ষে নিতে। কিন্তু কেউ তো জানে না আমি পাণ্ডবদের ভ্রাতা। এখন যদি আমি পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিই তাহলে সকল ক্ষত্রিয়েরা কি বলবে? ভাববে ভীরু কর্ণ কৃষ্ণার্জুনের ভয়ে ধার্তরাষ্ট্রগণকে ত্যাগ করেছে। কৌরবেরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন। আজীবন আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমারই ভরসায় তাঁরা শত্রুর সঙ্গে আজ যুদ্ধে উদ্যোগী। আমি তাঁদের কাছে কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না। কিন্তু মা, তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, তখন আমি কথা দিলাম, সমর্থ হলেও আমি তোমার পুত্রদের বধ করব না। কেবল অর্জুনের সঙ্গে হবে আমার যুদ্ধ। আর যশস্বিনী, যাওয়ার সময় আমার শেষ কথা শুনে যাও, তুমি রবে চিরদিন পঞ্চপুত্রের জননী—ন তে জাতু ন শিষ্যন্তি পুত্রাঃ পঞ্চ যশস্বিনি।" (উদ্যোগপর্ব, ১৪৬/২৩)

মাতা পুত্রের অশ্রু দিয়ে সেদিন লেখা হল কুরুক্ষেত্রের ঘোর যুদ্ধফল।

[বাইশ]

বজ্রে বাজে বাঁশি

অন্তরের একটা আলোক রেখা ধরে যারা পথ চলেন, তাঁদের জীবনে ভরাঘট ভেঙে যায়। সাজানো বাগান শুকিয়ে যায়। সংসারের বরণডালা উল্টে যায়। জীবনের ভাল-মন্দ চাওয়া-পাওয়ার মানদণ্ড অস্থিরভাবে কাঁপতে থাকে। বারবার স্রোতের বাঁক ঘুরে যায়। মহাকালের উতরোল তরঙ্গে-তরঙ্গে আজ যে রাজা কাল সে ফকির। কাল যা চেয়েছি আজ সেদিকে ফিরেও তাকাই না।

পাণ্ডবদের জীবনে এই ব্যাপারটা আমরা অতিশয় লক্ষ্য করি। ছিলেন তাঁরা রাজা, হলেন বনবাসী সন্ন্যাসী, তারপর কৃতদাস। কিন্তু যে জন্য এতদিন এত কষ্ট সহ্য করেছেন, সেই অভ্যুদয় যখন আসন্ন, তখন এক অসীম বৈরাগ্যে সব প্রত্যাখ্যান করছেন। বলছেন, আমরা কিছুই চাই না। রাজ্য নয়, ঐশ্বর্য নয়। নির্লিপ্ত নগণ্য গ্রামবাসী হয়ে থাকব আমরা।

দীর্ঘ বনবাস অজ্ঞাতবাসের তপস্যায় পাণ্ডবদের প্রকৃতি চিন্তাধারা স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এমনকি ভীম যে ভীম, প্রতিহিংসায় আক্রোশে যিনি অহরহ দগ্ধ হয়েছেন, উন্মত্ত ক্রোধে উন্মাদের মত যিনি মাটিতে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করেছেন, তিনিও আজ শান্তিকামী সন্ধিপ্রয়াসী। শ্রীকৃষ্ণকে ভীম বলছেন, "আমরা বরং সকলে নতমস্তকে পায়ে হেঁটে গিয়ে দুর্যোধনের অধীনতা স্বীকার করব তবু যুদ্ধ চাই না—সর্বে বয়মধশ্চরাঃ। নীচৈর্ভূত্বানুযাস্যামো মাস্ম নো ভরতা নশন্‌।" (উদ্যোগপর্ব, ৭৪/২০)

শ্রীকৃষ্ণ জানেন মানুষের জীবনে সঙ্কটকালে এমন রতিবৈপরীত্য আসে। চিন্তার গতি বিপরীতমুখী হয়।

নকুলের কথায় তা আরো স্পষ্ট, "যখন আমরা বনবাসী ছিলাম তখন আমাদের বুদ্ধি এক রকম ছিল। তারপর অজ্ঞাতবাসে এসে আমাদের চিন্তাধারা পালটে গেল। অজ্ঞাতবাসের পরে আবার যখন আমরা লোক-সমাজে বেরিয়ে এলাম তখন আমাদের বুদ্ধি চিন্তাধারা আবার নতুন করে পালটে গেল।"

অন্যথা বুদ্ধয়ো হ্যাসন্নস্মাসু বনবাসিষু।
অদৃশ্যেষ্বন্যথা কৃষ্ণ দৃশ্যেষু পুনরন্যথা॥ ৭
(উদ্যোগপর্ব, ৮০ অধ্যায়)

এমনই হয়।

দুঃখ মানুষকে পোড়ায়।

কিন্তু সেই দুঃখের আগুন যখন বৈরাগ্য আশ্রয় করে তখন তা যজ্ঞের হোমাগ্নি হয়ে ওঠে। তার তপ্ত তেজে জীবনকে শুদ্ধ করে। রূপান্তরিত করে। দুঃখ তখন দীক্ষা। বনবাসী পাণ্ডবেরা পেয়েছেন সেই আরণ্যক দীক্ষা।

তাঁদের তো কেউ নেই। না আছে বন্ধু, না আছে সহায় সম্বল। মা তাঁদের পরের আশ্রয়ে পরের অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছেন। নিজেরাও রয়েছেন চরম দারিদ্র্যে। সে যে কি কষ্ট তার আভাস পাই যুধিষ্ঠিরের কথায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "কৃষ্ণ, আমাদের এই দুঃসহ দারিদ্র্য তো মৃত্যুতুল্য ("এতচ্চ মরণং তাত")। কালকের আহার সংস্থান নেই। আজ কি খাব তারও ঠিক নেই। ("যত্র নৈবাদ্য ন প্রাতর্ভোজনং প্রতিদৃশ্যতে")। আমাদের মত এমন দারিদ্র্যদশায় পড়ে লোকে গ্রাম ছাড়ে, বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, ক্রীতদাস হয়, পাগল হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে।"

গ্রামায়েকে বনায়েকে নাশায়েকে প্রবব্রজুঃ ৷৷২৫
উন্মাদমেকে পুষ্যন্তি যান্ত্যন্যে দ্বিষতাং বশম্ ৷২৬
(উদ্যোগপর্ব, ৭২ অধ্যায়)

এই তো জীবন।...

জীবনের ভয়ঙ্কর দিক।

ভগবানের বাম মুখ।

পাণ্ডবেরা দীর্ঘদিন ধরে তা ভাল করেই দেখেছেন। আলোহীন যে অন্ধকার বৈরাগ্যহীন যে দুঃখ, তাকেই তো বলে নরক—"নরকে দুঃখমেবাহুঃ" (শান্তিপর্ব, ১৯০/১৪), "নরকং তম এব চ" (শান্তিপর্ব, ১৯০/৩)। মহাভারতের আদিপর্বে কবি এই জগৎসংসারের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, এই পৃথিবী হল ভৌম নরক—"ইমং ভৌম নরকং" (আদিপর্ব, ৯০/৪)। যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবেরা কেবল স্বর্গে গিয়েই এই নরক ভোগ করেননি ; এখানে, এই জীবনেই, তাঁদের তা দেখতে হয়েছে, পার হয়ে যেতে হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, নরকের ভিতর দিয়ে না গিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না—"None can reach heaven who has not passed through hell"। (*Savitri*, Book 2, Canto 8)

বিদুরও দিচ্ছেন এই ভৌম নরকের এক ছবি। ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, "মহারাজ, এই জীবন এক ঘোর অরণ্য। শুনুন তবে একটা গল্প। কোন এক পথিক পথ ভুলে এক গহন অরণ্যে প্রবেশ করে। সেখানে বাঘ ভাল্লুক যত

হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। কণ্টকজালে আচ্ছাদিত অন্ধকার সেই অরণ্যে লোকটা হঠাৎ এক সময় তৃণলতায় আচ্ছন্ন এক কূপের মধ্যে পড়ে গেল। লতাগুল্মে তার পা জড়িয়ে গেল। তার মাথা নীচের দিকে ঝুলতে লাগল। এই অবস্থায় সে আঁতকে উঠে দেখল, কূপের মধ্যে একটা ভীষণ সর্প গর্জন করছে। আর অতি ঘোর আকৃতির এক নারী দুই হাতে কাঁটাবন ঠেলে সেখানে প্রবেশ করছে। একটা অদ্ভুত হাতী, তার বারখানা পা আর ছয়টি মুণ্ড, সেই কূপের দিকে ভারী পায়ে আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। কূপের ধারে একটা গাছ, গাছের শাখায় একটা প্রকাণ্ড মৌচাক, তা থেকে ফোটায়-ফোটায় মধু ঝরে পড়ছে। লোকটা কূপের মধ্যে সঙ্কটাপন্নভাবে ঝুলছে। গর্তের তলায় অন্ধকারে সাপটা গর্জাচ্ছে। এমন সময় কতকগুলি ইঁদুর এসে একটি-একটি করে তার পায়ের বাঁধন কেটে ফেলতে লাগল। সব বাঁধন কেটে গেলেই পড়তে হবে গিয়ে ওই বিস্তৃতফণা সাপের মাথায়। লোকটার তবু খেয়াল নেই। গাছের শাখা থেকে ক্ষরিত ওই বিন্দু-বিন্দু মধু বিভোর হয়ে পান করতে লাগল।"

বিদুর বলছেন, "মহারাজ, এই সংসার অরণ্যে আমরা সকলেই ওই পথিক, বনের হিংস্র জন্তুগুলি ব্যাধি। ওই ঘোর আকৃতি নারী-মূর্তি জরা। ওই অন্ধকার কূপটি মানুষের দেহ। কূপের মধ্যে ওই মহাসর্প সাক্ষাৎ কাল। বনের লতাগুল্ম মানুষের বাঁচবার আশা। ছয় মুণ্ড ওই অদ্ভুত হাতীটি সম্বৎসর। ইঁদুরগুলি রাত্রিদিন। আর বৃক্ষশাখা থেকে ক্ষরিত বিন্দু-বিন্দু মধু মানুষের জীবনের কামরস। বিবেকী মানুষ ওই বিন্দু-বিন্দু মধুর লোভে সঙ্কটে পড়তে চায় না। সে মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল হয়।" (স্ত্রীপর্ব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়)

মহাভারতের আবহসংগীতে একটা তারে অহরহ এমনি এক উদাস বৈরাগ্যের সুর বেজে চলেছে। বেদব্যাসের গাম্ভীর্যে, বিদুরের কণ্ঠে, শ্রীকৃষ্ণের নীলাঞ্জন দৃষ্টিতে এবং যুধিষ্ঠিরের আত্মমগ্ন তন্ময়তায় সেই সুরের কম্পন।

চোখের জলে বুকের রক্ত দিয়ে পাণ্ডবেরা জীবনকে দেখেছেন। জেনেছেন, মানুষ যখন অনন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অহংসর্বস্ব এই বাসনার কূপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তখন এই জীবন এই জগৎ হয় ভৌম নরক। আবার যখন সে অনন্তের উদাত্ত আলোকের মধ্যে অসীমের বৃহতের সঙ্গে যোগযুক্ত, তখন এই পৃথিবী হয়ে ওঠে "হিরণ্ময় পদ্ম", "পদ্মাসনা দেবী পৃথিবীং তাং প্রচক্ষতে"। (হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব, ১২/৪) এই পৃথিবীর অন্তর থেকে নিঃসারিত দেবতার অমৃতরসধারা—"প্রবতে দেবামৃতরসোপমম্"। সেই সোনার পদ্মের মধ্যভাগে রয়েছে পদ্মনিধি ভারতবর্ষ। যার প্রাচীন নাম জম্বুদ্বীপ—"এতেষামিতরো দেশো জম্বুদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ"। (হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব, ১২/৮)

এই বৃহতের আনন্দের উপলব্ধি যার হয়েছে, সে তখন সকল ভয়ের সীমা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু যে অমনস্বী, যার রয়েছে ভেদজ্ঞান, সে-ই কেবল ভয়ের মধ্যে বাস করে। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/৭)

বনবাসের পর পাণ্ডবদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেছে। তাঁরা জীবনের ভয়ের সীমা পেরিয়ে গেছেন। নকুল তাই বলছেন, আমাদের বুদ্ধি চিন্তাধারা সব পালটে গেছে—"অন্যথা বুদ্ধয়ো"। সে তুলনায় কৌরবেরা হীনবুদ্ধি সংকীর্ণচেতা। বিদুরের বর্ণনায় তারা সেই অন্ধকারের কূপবদ্ধ প্রাণী।

পাণ্ডবদের এই উত্তরণের সহায় শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর তো কেউ ছিল না। হাঁ, ছিল কেবল আর একজন বন্ধু। সর্বস্ব হারালেও সব্বাই ত্যাগ করে গেলেও, সেই বন্ধু তাঁদের কখনো ছেড়ে যায়নি। আপদে-বিপদে নির্বাসনে বনবাসে অজ্ঞাতবাসে তাঁদের নিত্যসঙ্গী সে। মানুষ যখন দেবযানের পথে চলে, স্বর্গের পথে চলে, তখন তার সঙ্গে থাকে এই অকৃত্রিম সহজাত বন্ধু, তার নাম ধৈর্য।

স্বধর্মমনুতিষ্ঠৎসু ধৈর্যাদচলিতেষু চ।
স্বর্গমার্গাভিরামেষু সত্ত্বেষু নিরতা হ্যহম্ ॥ ২৯
(শান্তিপর্ব, ২২৮ অধ্যায়)

ধৈর্যই মানুষের সহজাত মিত্র। তার সঙ্গে বিদ্যা বল ও দক্ষতা।

বিদ্যা শৌর্যঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ বলং ধৈর্যঞ্চ পঞ্চমম্।
মিত্রাণি সহজান্যাহুর্বর্তয়ন্তীহ তৈর্বুধাঃ ॥ ৮৫
(শান্তিপর্ব, ১৩৯ অধ্যায়)

বিদ্যা ও ধৈর্যের বিগ্রহ হলেন যুধিষ্ঠির। ভীম হলেন বল, অর্জুন শৌর্য, আর নকুল সহদেব দক্ষতা। এই পাঁচটি সহজাত গুণই পাণ্ডবদের একমাত্র বন্ধু। দেবযানের পথের সাথী। পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ মাত্রা।

ধৈর্যই সেই জীবন-তরণী যা দিয়ে আমরা জন্মমৃত্যুর কালস্রোত পার হয়ে যাই—"ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সংতর।" (বনপর্ব, ২০৭/৭২)

শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, "সকলের প্রথম ও প্রধান শিক্ষণীয় জিনিস হল ধৈর্য—কিন্তু তার অর্থ ভীরু, সংশয়ীর শ্রান্তের, অলসের, অল্পাকাঙ্ক্ষীর, দুর্বলের স্তিমিত গতিপরাঙ্মুখতা নয়; এ ধৈর্য এমন এক প্রশান্ত ক্রম-সংহত সামর্থ্যে পরিপূর্ণ যা সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় সজাগ রয়েছে। আপনাকে প্রস্তুত করে তুলছে যখন সবেগে তাকে বিপুল আঘাত করতে হবে, সে আঘাত কয়েকটি মাত্র কিন্তু তাতেই ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটে যায়।" ('চিন্তা-কণা দৃষ্টি-নিমেষ', পৃ. ৩৬)

পঞ্চপাণ্ডবের দীর্ঘ দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়ে চলেছে সেই আধ্যাত্মিক ধৈর্যের সাধনা।

ওদিকে দুর্যোধনের আর সবই ছিল, কিন্তু ছিল না তার এই সহজাত বন্ধু। তাদের বুদ্ধি থাকলেও বিদ্যা ছিল না। উৎসাহ থাকলেও দক্ষতা ছিল না। দর্প থাকলেও ছিল না বল ও শৌর্য। সর্বোপরি তারা অস্থির কুটিল অধৈর্য। তাই তারা রাজত্ব পেয়েও নিঃস্ব। কিন্তু পাণ্ডবেরা দরিদ্র হয়েও ধনী।...

হস্তিনাপুর থেকে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এলেন গম্ভীর মুখে।

যুধিষ্ঠির ব্যগ্র হয়ে আছেন।

পঞ্চপাণ্ডব উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণের দিকে।

—"না, রাজা। আমার শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দুর্যোধন আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। পাঁচখানা গ্রাম দিতেও সে রাজী নয়। সে চায় যুদ্ধ। যুদ্ধ ছাড়া সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিও সে ছেড়ে দেবে না। উপরন্তু সে আমাকে বন্দী করতে চেষ্টা করেছিল।" কম্বুকণ্ঠে বললেন শ্রীকৃষ্ণ।

তবুও যুধিষ্ঠির আশাবাদী। শেষ ভরসাটুকু আঁকড়ে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু কৌরবশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র? তিনি কি বললেন? পাণ্ডবহিতৈষী ভীষ্ম? আমাদের গুরু দ্রোণাচার্য? রাজমাতা ধর্মতেজা গান্ধারী? তাঁরাও কি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলেন না? দুর্যোধনকে শাসন করতে পারলেন না?"

—"না, রাজা। গান্ধারীর আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। ভীষ্ম দ্রোণও ন্যায়সঙ্গত কথা বলেননি। একমাত্র বিদুর ছাড়া সকলেই দুর্যোধনের অনুবর্তী।"

ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্বচঃ।
সর্বে তমনুবর্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুত॥ ১১

(উদ্যোগপর্ব, ১৫৪ অধ্যায়)

শুনে যুধিষ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন, "যে অনর্থ নিবারণের জন্য আমি বনবাস স্বীকার করেছি, বহু দুঃখ পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত তা নিবারণ করতে পারলাম না। সেই ঘোর অনর্থই আজ অনিবার্য হয়ে এসেছে। কিন্তু যাঁরা অবধ্য তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব কেমন করে? গুরুজন আত্মীয়স্বজনকে বধ করে আমাদের জয়লাভের স্বার্থকতা কি?"

উত্তরে অর্জুন বললেন, "মহারাজ, কৃষ্ণ কুন্তী বিদুর এঁরা তো আমাদের কখনো অধর্ম করতে বলবেন না। এখন আমাদের যুদ্ধ না করে আর উপায় নেই।"

যুধিষ্ঠির বেদনার্ত মুখে তাকিয়ে রইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন ঠিক কথাই বলেছে। এ অবস্থায় আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় নেই—কৌরবৈঃ শর্মমিচ্ছামন্তরা যুদ্ধমনন্তরম্।" (উদ্যোগপর্ব, ১৫৪/১৫)

শ্রীকৃষ্ণের অভিমত শুনে পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত রাজারা সম্মতিচিত্তে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সকলের অভিপ্রায় বুঝে যুধিষ্ঠির তখন যুদ্ধের আদেশ দিলেন।

সবাই হর্ষে উল্লসিত হয়ে উঠল। "আজ্ঞাপিতে তদাযোগে সমহৃষ্যন্ত সৈনিকাঃ"। সেই সমবেত উল্লাসধ্বনির অন্তরালে চাপা পড়ে গেল যুধিষ্ঠিরের আর্ত কুণ্ঠিত হৃদয়ের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস। ক্ষমা দয়া সত্যের মূর্ত প্রতীক যিনি, সেই যুধিষ্ঠিরকে নিজের মুখেই ঘোষণা করতে হল, অনুমতি দিতে হল, নিষ্ঠুরতম সংগ্রামের কঠোর আদেশ। অপর পাণ্ডব ভ্রাতারা যখন যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হয়ে সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করলেন (তাং রাত্রিং সুখমাবসন্), তখন আমরা অনুমান করতে পারি, একা যুধিষ্ঠির বিনিদ্র হয়ে সেই দুঃসহ রাত্রিতে অসহনীয় মর্মবেদনায় ছট্‌ফট্ করেছেন।

যুদ্ধ আসন্ন জেনে যুধিষ্ঠিরের কাছে ছুটে এলেন বলরাম। সঙ্গে অক্রূর, উদ্ধব, গদ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন। স্পষ্টত তাঁরা সবাই অসন্তুষ্ট। সিংহবিক্রমে প্রবেশ করলেন বলরাম। গৌরকান্তি, অঙ্গে নীল কৌষেয় বসন। হলায়ুধ হস্তে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মদ্যপানে আরক্ত চক্ষু। মুখমণ্ডলে উত্তেজনার রক্তাভা।

বৃষ্ণিবীরগণদ্বারা পরিবেষ্টিত উত্তেজিত বলরামকে দেখে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির, ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও উপস্থিত রাজারা। যুধিষ্ঠির তাঁকে সমাদর করে হাত ধরে বসালেন। সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলরাম বলতে লাগলেন, "আমার মনে হয়, আসন্ন এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সব ছারখার হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি শ্রীকৃষ্ণকে নির্জনে বারবার বলেছি, তুমি উভয় পক্ষের প্রতি সমভাবাপন্ন হও। আমাদের কাছে পাণ্ডবেরাও যেমন, দুর্যোধনও তেমনি। বিশেষত দুর্যোধন যখন বারবার আসছে তোমার কাছে সাহায্যের জন্য, তখন তুমি দুর্যোধনকে সাহায্য কর। কিন্তু কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মুখ চেয়ে আমার সেই অনুরোধ রাখেনি। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। সে দৃঢ়সংকল্প, তাই জানি, পাণ্ডবদেরই জয় হবে। কিন্তু আমি তো কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারব না। ভীম এবং দুর্যোধন দুজনেই আমার শিষ্য। দুজনকেই আমি সমান স্নেহ করি। কুরুবংশের এই ধ্বংস আমি চোখের সামনে দেখে উপেক্ষা করতে পারব না। তাই স্থির করেছি, যুদ্ধ থেকে দূরে সরস্বতী নদীর তীরে আমি তীর্থ ভ্রমণে যাব।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু বলরাম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে বৃষ্ণিবীরদের সঙ্গে নিয়ে সবেগে প্রস্থান করলেন।...

শ্রীকৃষ্ণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আশ্চর্য! বলরামের অনুবর্তী হয়েছে তাঁরই পুত্র শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন? যাদবদের মন্ত্রীপ্রধান অমাত্য অক্রূর উদ্ধব গদ? আহুকের পুত্রও বাদ যায়নি। মুখে তারা অবশ্য একটি কথাও বলেনি। কিন্তু তারাই বলরামের সঙ্গী হয়ে এসেছে। বলরামের প্রকাশ্য অভিযোগের উত্তরে মৌন থেকে সমর্থন করেছে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন, তাঁকে নিয়ে তলে-তলে যাদবদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। কৃতবর্মা তো ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছে কৌরব পক্ষে। আর এই বলরাম যিনি বনপর্বে পাণ্ডবদের বনবাসের দুঃখ দেখে একাই কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; বলেছিলেন, "মহাত্মা যুধিষ্ঠির জটা ও কৌপীন ধারণ করে বনবাসী হয়ে কষ্টভোগ করছেন আর দুরাত্মা দুর্যোধন পৃথিবী শাসন করছে। তার পতন হচ্ছে না? এ দেখে অল্পবুদ্ধি লোক মনে করবে, ধর্ম অপেক্ষা অধর্ম অনুষ্ঠানই ভাল।" (বনপর্ব, ১১৯/৫-৬)

এত সহানুভূতি ছিল যাঁর তিনি আজ পাণ্ডবদের প্রতি এতখানি বিরূপ হয়ে উঠেছেন? চতুর দুর্যোধন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধীরে-ধীরে তাঁকে এমনি বিমুখ করে তুলেছে। সেকথা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল অভিমন্যুর বিবাহ বাসরে। বিরাট রাজার সভায় সকলের সমক্ষে বলরাম দুর্যোধনকে সমর্থন করে যুধিষ্ঠিরকেই দোষী করেছিলেন। বলরাম, কৃতবর্মা ও তাঁদের অনুগামী বৃষ্ণিবীরদের মন বিষিয়ে তুলতে কূট দুর্যোধন সফল হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকেও সে চেষ্টা করেছিল। সেকথা শ্রীকৃষ্ণ একদিন অর্জুনকে বলেওছিলেন, "কুন্তীনন্দন, দুর্যোধন আমার মনে বিভেদ সৃষ্টি করতে বারবার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সেই পাপচেষ্টা সফল হয়নি।"

অসকৃচ্চাপ্যহং তেন ত্বৎকৃতে পার্থ ভেদিতঃ।
ন ময়া তদ্‌ গৃহীতঞ্চ পাপং তস্য চিকীর্ষিতম্‌॥
(উদ্যোগপর্ব, ৭৯ অধ্যায়)

অতএব যা অনিবার্য তাই হল।

শুরু হল যুদ্ধসজ্জা।

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে হিরণ্বতী নদীর তীরে পূর্বমুখী হয়ে পাণ্ডব বাহিনী সন্নিবেশিত হল। বিশাল সমুদ্রের ন্যায় সংক্ষুব্ধ পাণ্ডব সৈন্য বর্মে অস্ত্রে

সজ্জিত হয়ে কোলাহল করতে লাগল। চারিদিকে অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহতি, রথচক্রের ঘর্ঘর আর শঙ্খদুন্দুভি নিনাদ। হিরণ্বতী নদীর ধারে পরিখা খনন, রাজাদের শিবির স্থাপন হতে লাগল। হাজার হাজার শকট বোঝাই হয়ে আসতে লাগল অস্ত্রশস্ত্র মধু ঘৃত রসালচূর্ণ। ধনুক কবচ ঋষ্টি তূণ নারাচ তোমর স্তূপীকৃত হতে লাগল। যুদ্ধাশ্বের জন্য সংরক্ষিত হতে লাগল জল ঘাস তুষ অঙ্গার। এল যন্ত্রায়ুধ কোষ। শত শত চিকিৎসক ও বৈদ্যগণ। ছাউনি পড়ল সূত মাগধ চারণ ও গুপ্তচরদের।

পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনাবিভাগ করা হল। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে সেনাপতি হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন।

অগ্রহায়ণ মাস।

আগামীকাল অমাবস্যার ইন্দ্রাতিথি।

কাল থেকে যুদ্ধ।

[তেইশ]

ঘোর অমাবস্যা

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র।

পঞ্চযোজন বিস্তৃত মণ্ডলাকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র।

পাশ দিয়ে হিরণ্বতী নদী কলকল্লোলে প্রবাহিত। নদীর পশ্চিম তটে উদয়সূর্যের দিকে তাকিয়ে সন্নিবেশিত পাণ্ডব বাহিনী। আর বিপরীতভাগে অস্তরাগমুখী কৌরব সেনা।

দূরে উড্ডীন ধ্বজা নিয়ে ইন্দ্রকেতুর ন্যায় প্রতিভাত কৌরব শিবির। যেন কাঞ্চনময় হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদ। তাদের সুসজ্জিত সেনাসজ্জা। তার মাঝে ভীষ্মের পঞ্চতারামণ্ডিত তালধ্বজা উড়ছে। অদূরে দ্রোণের কমণ্ডলু-শোভিত নিশান। দুর্যোধনের রথপতাকায় মণিময় নাগচিহ্ন।

এদিকে দীপ্যমান যুধিষ্ঠিরের তারকাখচিত সুবর্ণময় চন্দ্রপতাকা। ভীমের সিংহধ্বজ রথ। অভিমন্যুর মণিকাঞ্চনময় ময়ূরকেতন।

চারিদিকে বিশাল সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ সেনামণ্ডলী।...

মেঘলা আকাশ। হেমন্তের কুয়াশায় ঢাকা। হিমেল হাওয়া নিয়ে ঝড়ো বাতাস বইছে। সূর্য নিষ্প্রভ। ত্রিবর্ণমণ্ডলে আচ্ছাদিত সূর্যের চারিদিকে ঘোর অমঙ্গলের কালো কবন্ধ ছায়া।

দেখতে-দেখতে চতুর্দিক আঁধার করে ধূলির ঝড় উঠল। দিবাভাগে যেন রাত্রির অন্ধকার। বৃক্ষের শাখায়-শাখায় শ্যেন শকুনি কাক কঙ্ক পক্ষীদের কর্কশ কলরব শোনা যাচ্ছে। উল্কাপাত ভূমিকম্প হচ্ছে। ধ্বজাগুলি কাঁপছে। চারিদিকে ভীষণ দিগ্‌দাহ দেখা দিচ্ছে।

এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন বেদব্যাস।

মহাভারতের অন্তরের জাগ্রত বিবেক যেন। মূর্তিমান সাক্ষীকালের মত তিনি উভয় পক্ষের সেনা শিবির পরিদর্শন করে এলেন। অন্তর তাঁর আলোড়িত হচ্ছে, কিন্তু তিনি মৌন নির্বিকার।

এদিকে একাকী ধৃতরাষ্ট্র শূন্য রাজপ্রাসাদের নির্জন কক্ষে শোকার্ত মনে বসে ভাবছেন।

—"বৎস, ধৃতরাষ্ট্র !"

চমকে উঠলেন অন্ধ রাজা।

তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ত্রিকালজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শী বেদব্যাস।

—"বৎস, তোমার পুত্রদের মৃত্যুকাল আসন্ন। কালের বশে তারা যুদ্ধে পরস্পরকে বিনাশ করবে। এ ভবিতব্য। তুমি শোক ক'রো না।

রাজন্ পরীতকালাস্তে পুত্রাশ্চান্যে চ পার্থিবাঃ।
তে হিংসন্তীব সংগ্রামে সমাসাদ্যেতরেতরম্॥ ৪
তেষু কালপরীতেষু বিনশ্যৎস্বেব ভারত।
কালপর্যায়মাজ্ঞায় মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ ৫
(ভীষ্মপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)

যদি যুদ্ধ দেখতে ইচ্ছা কর তাহলে তোমাকে আমি দিব্যদৃষ্টি দেব। তুমি এই যুদ্ধ দেখ।"

ক্লিষ্ট কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "না, ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ। ভ্রাতৃবধ জ্ঞাতিবধ দেখতে আমার রুচি নেই। কিন্তু আপনার প্রসাদে আমি এই যুদ্ধের বিবরণ শুনতে চাই।"

—"বেশ, আমার বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করবে। সর্বজ্ঞের মত সে প্রত্যক্ষ করবে যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনা। সে-ই তোমাকে বিবরণ দেবে। সঞ্জয় কখনো অস্ত্রে আহত হবে না, শ্রমে ক্লান্ত হবে না। দিনে রাত্রে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সমস্ত ঘটনা, এমনকি সকলের অন্তরের ভাবনা পর্যন্ত সে জানতে পারবে। যুদ্ধে সে জীবিত থেকেই নিষ্কৃতি পাবে। আর আমি কুরুপাণ্ডবের এই কীর্তিগাথা জগতে প্রচারিত করব। তুমি শোক ক'রো না।"

এই বলে বেদব্যাস উচ্চারণ করলেন সেই মহাবাক্য, মহাভারতের মর্মবাণী, অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিপুল ঘটনা সংঘাতের যা নাভিকেন্দ্র, প্রত্যেকটি শ্লোকের হৃদ্-কন্দরে মন্দ্রিত হয়েছে যে ধ্বনি, যাকে বলা যেতে পারে বেদব্যাসের সিদ্ধমন্ত্র—"যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"। এই বিশাল শতসহস্রসংহিতাকে এক কথায় বলা হয়েছে "জয় শাস্ত্র"। সে জয় ধর্মের জয়। এই একটি কথার উপরে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে হিমবন্ত মহিমা এই মহাভারত। কথাটি আমরা বারবার শুনেছি। স্বয়ং বেদব্যাস বলছেন ধৃতরাষ্ট্রকে (ভীষ্মপর্ব, ২/১৪); ধৃতরাষ্ট্র বলছেন বিদুরকে (উদ্যোগপর্ব, ৩৯/৯); অর্জুন বলছেন যুধিষ্ঠিরকে (ভীষ্মপর্ব, ২১/১১); কর্ণ বলছে শ্রীকৃষ্ণকে (উদ্যোগপর্ব, ১৪৩/৩৬); শ্রীকৃষ্ণ বলছেন গান্ধারীকে (স্ত্রীপর্ব. ১৩/৯); গান্ধারী বলছেন দুর্যোধনকে। আর এই জয়ধর্ম শিখি-পাখাচূড়া হয়ে বিরাজ করছে শ্রীকৃষ্ণের কিরীটে। সেই গুপ্ত কথাটি সঞ্জয় স্পষ্ট করে বলে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। বললেন, "যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম সেখানেই জয়।"

যতঃ সত্যং যতো ধর্মো যতো হ্রীরার্জবং যতঃ।
ততো ভবতি গোবিন্দ যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥ ৯

(উদ্যোগপর্ব, ৬৮ অধ্যায়)

বস্তুত বেদব্যাস মহাভারতের মর্মসত্যকে ব্যক্ত করে উপসংহারে যে শ্লোক রচনা করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র শুকদেবকে পড়িয়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন "ভারত সাবিত্রী" ("ইমাং ভারতসাবিত্রীং"—স্বর্গারোহণপর্ব, ৫/৬৪)। তাতে কবি বলেছেন, "আমি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে উচ্চৈস্বরে এতদিন এই কথা বলে আসছি, কিন্তু কেউ তা শুনল না! আমি বলি, কেবল ধর্ম থেকেই সব হয়। তোমরা কেন ধর্মের সেবা করছ না?"

ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥ ৬২

(স্বর্গারোহণপর্ব, পঞ্চম অধ্যায়)

বাস্তবিকই বেদব্যাসের কথা কেউ শুনল না।

যখনই ধর্ম টলে উঠেছে, তখনই তিনি জাগ্রত বিবেকের মত উপস্থিত হয়েছেন। তিনিই হচ্ছেন মহাভারতের *deus ex machina*। সভাপর্বে সেই প্রথম যখন দ্যূতক্রীড়ায় সর্বনাশের বীজ বপন হল, তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করেছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে যাচ্ছে তখনও তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কাতরকণ্ঠে বারণ করেছিলেন। শুধু স্নেহের টানে নয়। তিনি তো অরণ্যচারী রিক্ত সন্ন্যাসী। ধর্ম ছাড়া তাঁর তো কোন বন্ধন নেই। সেই ধর্ম যেখানে ক্ষুণ্ন হয়, সেখানে তিনি কখনই উদাসীন থাকতে পারেন না। তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, "পাণ্ডবদের বনবাস আমার মনঃপূত নয়। ন মে প্রিয়ং মহাবাহো। যে ধার্মিক এবং যে দুর্বল আমার হৃদয়ের সহানুভূতি তারই দিকে। পাণ্ডবেরা বনবাসে গিয়ে কি করে বাঁচবে, তাদের কি হবে, এই চিন্তাতেই সর্বদা আমার মন পরিতপ্ত হচ্ছে। দীনেষু পার্থেষু মনো মে পরিতপ্যতে।" (বনপর্ব, নবম অধ্যায়)

তাঁরই অনুরোধে এলেন মৈত্রেয় ঋষি। তিনিও ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনকে অনুরোধ করলেন, "আমার কথা শোন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ো না। কুরু মে বচনং রাজন্। মা মন্যুবশমন্বগাঃ।"

কিন্তু কেউ শুনল না সে কথা।

পরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণ এলেন কৌরব সভায়, তখন আবার বেদব্যাস এসে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন, "সর্বনাশ হতে দিও না। শ্রীকৃষ্ণের কথামত সন্ধি কর। তোমাদের মঙ্গল হবে।"

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কথা শুনলেন না। কৈফিয়ত দিলেন, তাঁর পুত্র কথা শোনে না। কিন্তু তিনি নিজে পুত্র হয়ে কোনদিন শুনছেন কি তাঁর পিতার কথা ?

তবু বেদব্যাস আবার এসেছেন।

এই শেষবার।

উভয়পক্ষ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখী। এখনও শঙ্খধ্বনি হয়নি। যুদ্ধ শুরু হতে আর অল্পক্ষণ মাত্র বাকী।

—"ধৃতরাষ্ট্র, এখন একমাত্র তুমিই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পার। জানবে ধর্ম যে নষ্ট করে, ধর্মও তাকে বিনষ্ট করে। তুমি সকলকে ধর্মের পথ দেখাও। আমার অপ্রিয় এই জঘন্য অন্যায় হতে দিও না। মা কুরুষ্ব মমাপ্রিয়ম্। জেনে রাখ, তোমার ধর্ম আজ লোপ পেতে বসেছে। লুপ্তধর্মা পরেণাসি ধর্মং দর্শয় বৈ সুতান্। (ভীষ্মপর্ব, ৩/৬০) চারিদিকে এইসব ঘোর অমঙ্গলের দুর্নিমিত্ত দেখেও বুঝতে পারছ না, কি ঘটতে চলেছে ? মন্দিরে দেবপ্রতিমা সব ঘর্মাক্ত হয়ে কাঁপছে। যজ্ঞাগ্নির শিখা বামাবর্ত হয়েছ। হোমকুণ্ড থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। গরুর বাঁট থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে ? নদীর স্রোতে প্রতিকূল প্রবাহ। গ্রহনক্ষত্রের সন্নিবেশ অমঙ্গলকর। আকাশে সপ্তগ্রহের সমাবেশ ঘটেছে। ত্রয়োদশী তিথিতে চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ লেগেছে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ছাড়া চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ অকল্পনীয়। আমি এমন ঘটনার কথা কোনদিন শুনিনি।

ইমাং তু নাভিজানামি ভূতপূর্বাং ত্রয়োদশীম্ ॥৩৩
চন্দ্র-সূর্যাবুভৌ গ্রস্তাবেকমহ্না হি ত্রয়োদশীম্। ৩৪
(ভীষ্মপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়)

অরুন্ধতী বশিষ্ঠ নক্ষত্রকে পশ্চাতে রেখেছে। শনি রোহিণীকে পীড়ন করছে। ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্রে, মঙ্গল ও শনি বক্রী হয়ে মঘাতে এসেছে। সপ্তর্ষির প্রভা ম্লান হয়েছে। চন্দ্রের কলঙ্ক তিরোহিত হয়ে মহাভয় সূচীত করছে। রাহু চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রকে পীড়ন করছে। কেতু জ্যেষ্ঠাকে আক্রমণ করেছে। এইসব ভৌম দিব্য আন্তরিক্ষ দুর্লক্ষণ দেখে যা করণীয় তাই কর। এই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় নিবারণ কর।"

...জ্যোতির্বিদ্ বেদব্যাস এখানে তাঁর কথায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্র ও চিহ্ন রেখে গেছেন। যা থেকে আমরা আজকের দিনে সঠিকভাবে গণনা করে জানতে পারি মহাভারতের যুগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে। কেননা

সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়, কিন্তু জ্যোতিষের প্রমাণ অখণ্ডনীয়—"চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ"।

আমরা আগেও লক্ষ্য করেছি, সঙ্কটকালে রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণনায় ব্যঞ্জনায় লক্ষণায় অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যেসব ঘোর দুর্নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব হল তারই প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায় রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ও যুদ্ধকাণ্ডে। কুরুক্ষেত্রের মত লঙ্কার যুদ্ধও শুরু হয়েছিল সেই ঘোর অমাবস্যায়—"কৃষ্ণা নির্বাহ্যমাবাস্যাং" (রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৯২/৬৬)। সেই উল্কাপাত ভূমিকম্প দিগ্‌দাহ—"উল্কাশ্চাপি সনির্ঘোষা নিপেতুর্ঘোরদর্শনাঃ। প্রচচাল মহী চাপি সশৈল-বন-কাননা॥" (রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ২৩/১৫) দুর্যোধনের পিতামহ বেদব্যাস ও রাবণের মাতামহ মাল্যবান যুদ্ধের আগে একই অনুরোধ করছেন, "যুদ্ধ ক'রো না। সন্ধি কর।"

একই রকম অমঙ্গল অশুভের লক্ষণ দেখা দিয়েছে—

> খরাভিস্তনিতা ঘোরা মেঘাঃ প্রতিভয়ঙ্করাঃ।
> শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্বতঃ॥ ২৫
> রুদতাং বাহনানাঞ্চ প্রপতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ।
> রজোধ্বস্তা বিবর্ণাশ্চ ন প্রভান্তি যথাপুরম্। ২৬
> ব্যালা গোমায়বো গৃধ্রা বাশ্যন্তি চ সুভৈরবম্।
> প্রবিশ্য লঙ্কামারামে সমবায়াংশ্চ কুর্বতে॥ ২৭
>
> *　　　*　　　*
>
> করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ॥ ৩৩
>
> (রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৩৫ সর্গ)

(ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে লঙ্কার উপরে উষ্ণ শোণিত বর্ষণ হচ্ছে। ধূলির ঝড় চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। যুদ্ধবাহন সব রোদন করছে। শৃগাল শ্যেন শকুনি লঙ্কার উদ্যানে-উদ্যানে বিকট চিৎকার করছে।...কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ করাল কবন্ধ মূর্তি সব বিচরণ করছে।)

> কবন্ধ পরিঘাভাসো দৃশ্যতে ভাস্করান্তিকে॥ ১১
> জগ্রাহ সূর্যং স্বর্ভানুরপর্বাণি মহাগ্রহঃ।
> প্রবাতি মারুতঃ শীঘ্রং নিষ্প্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥ ১২
>
> (রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ২৩ সর্গ)

(কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণের এক বলয় সূর্যকে বেষ্টন করে রয়েছে।
সূর্যের পাশে কবন্ধ ছায়া। অসময়ে রাহু সূর্যকে গ্রাস
করেছে। প্রবল ঝড় বইছে। উদিত সূর্য আজ নিষ্প্রভ
হয়ে গেছে।)

ঠিক এমনি যেসব দুর্লক্ষণের কথা বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, তার আভাস আমরা আগেই পেয়েছি উদ্যোগপর্বে (১৪৩ অধ্যায়ে) কর্ণের সংলাপে। কৌরব সভা থেকে সন্ধিস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন পথে সন্ধ্যায় এক নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কর্ণ বলছে, "কেশব, তুমি যা বললে তা আমিও জানি। আসন্ন যুদ্ধে পৃথিবী রক্তকর্দমে পরিণত হবে। দুর্যোধনের পরাজয় হবে। যুধিষ্ঠিরের হবে জয়। আমি রাত্রে এক দারুণ স্বপ্ন দেখেছি।

স্বপ্নে দেখলাম যুধিষ্ঠিরকে। তার অঙ্গে শ্বেতবস্ত্র। মস্তকে শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ। সে রাজপ্রাসাদে আরোহণ করছে। মানুষের অস্থিস্তূপের উপরে বসে যুধিষ্ঠির প্রসন্ন মুখে স্বর্ণপাত্রে ঘৃতক্ষীর পান করছে। অর্জুন আমার সামনে বসে আছে শ্বেত হস্তীতে। ভীম পর্বত চূড়ায় গদা হস্তে বিজয়ীর মত দাঁড়িয়ে।

দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম আর আমি, আমাদের মাথায় রক্তবর্ণ উষ্ণীষ। উষ্ট্রযোজিত রথে আমরা চলেছি দক্ষিণ দিকে। এর অর্থ তো অতি স্পষ্ট। এ তো মৃত্যুযাত্রা। বিশ্বাস কর, কেশব, কেবল দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি পাণ্ডবদের প্রতি এতদিন এত কটূক্তি করেছি। আজ সেজন্য আমার অনুতাপ হচ্ছে।

যদ্‌ব্রুবমহং কৃষ্ণ কটুকানি স্ম পাণ্ডবান্।
প্রিয়ার্থং ধার্তরাষ্ট্রস্য তেন তপ্যে হ্যকর্মণা॥ ৪৫

(উদ্যোগপর্ব, ১৪১ অধ্যায়)

দুর্যোধন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী। ভৃত্য ও অনুচরদের প্রতিও সে বিরাগ পোষণ করে। সে আজকাল ক্রমাগত অশরীরী ভীতিকর কণ্ঠ শুনছে। কৌরবদের পিছনে সর্বদা কাক শ্যেন শকুন চিৎকার করছে। চন্দ্র কলঙ্কহীন। সূর্যের চারিদিকে কবন্ধ ছায়া। উল্কাপাত ভূমিকম্প দিগ্‌দাহ। রাহু চিত্রা নক্ষত্রকে, শনি রোহিণীকে পীড়ন করছে। মঙ্গল বক্রী। এসব রাজার বিনাশ সূচনা করে।"...

যেকথা সবাই বোঝে, ধৃতরাষ্ট্র তা বুঝলেন না। কিংবা বুঝতে চাইলেন না। তাঁকে যেন কে বেঁধে নিয়ে চলেছে নির্মম ভবিতব্যের দিকে। তাঁর হাত-পা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "পিতা, মানুষ স্বার্থেই মোহগ্রস্ত হয়। আমিও মানুষ। কিন্তু আমার অধর্মে মতি নেই। কি করব, পুত্রেরা আমার বশবর্তী নয়। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন।"

বেদব্যাস বললেন, "সাম দানের দ্বারা যে জয় লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠ। ভেদনীতির দ্বারা জয় মধ্যম। যুদ্ধ করে যে জয় তা অধম। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই গুরুতর দোষ ঘটে থাকে। সেনাবলের উপর যুদ্ধজয় নির্ভর করে না। যুদ্ধজয় নির্ভর করে দৈবের উপরে। আর অল্পসংখ্যক হলেও সৈনাদের মনোবলের উপরে।"

এই বলে বেদব্যাস প্রস্থান করলেন।

যুদ্ধের ঘোর পরিণাম দেখিয়ে তিনি আমাদের মনকে, ঘটনার মঞ্চকে প্রস্তুত করে দিয়ে গেলেন।

আর সেই সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। এখন থেকে কাব্যের বাণীবিন্যাস গেল পালটে। ঘটনার গতির সঙ্গে তাল রেখে বর্ণনা এবার চলবে দ্রুত। সঞ্জয়ের কথাগুলি যেন ধাবমান অশ্বক্ষুরধ্বনি। গোটা যুদ্ধটা আমরা চোখের সামনে দেখব না। সঞ্জয়ের মুখে শুনব তার একটা অতি দ্রুত ধারাবিবরণী। ঘটনার সবখানি তোড় সকল সংঘাত নিয়ে এবার ছায়াবাণীর মত প্রতিফলিত হবে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধকার মানসপটে। যুদ্ধের ঘটনা থেকে এই আপাত দূরত্ব রচনা করে বেদব্যাস কাহিনীর মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। যাতে নির্মম নৃশংস বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিশে যেতে পারে ধৃতরাষ্ট্রের (এবং আমাদের) অন্তরের সকল শোক সন্তাপ আর হাহাকার। চোখের দৃষ্টির তো একটা সীমা আছে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই মন দিয়ে দেখা, তার তো কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যে অপ্রিয় দুঃখের দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দেখতে চাননি, তাই তাঁকে দেখতে হচ্ছে মন দিয়ে। মনের দৃষ্টি যে অতল। পাতালের মত তা গহন।

ধৃতরাষ্ট্র ডাকলেন, "সঞ্জয়।"

—"মহারাজ।"

—"যুদ্ধের বিবরণ বল।"

সঞ্জয় তাঁর বর্ণনার পটভূমি প্রসারিত করে ধরলেন। অনন্তপ্রসারী এক দূরবীক্ষণ দিয়ে তিনি সারা ব্রহ্মাণ্ডজগৎ দেখিয়ে দিচ্ছেন। ভূমি জল বায়ু অগ্নি আকাশ পঞ্চ মহাভূত বর্ণনা করে সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখিয়ে তিনি বললেন, মহারাজ, আমরা যেখানে আছি এই হল সেই ভারতবর্ষ। এখান থেকেই সর্বপ্রকার পুণ্যকর্ম প্রবর্তিত হয়েছে।

ইদং তু ভারতং বর্ষং যত্র বর্তামহে বয়ম্।
পূর্বৈঃ প্রবর্তিতং পুণ্যং তৎ সর্বং শ্রুতিবানসি॥ ৫১

(ভীষ্মপর্ব, ১২ অধ্যায়)

মহারাজ, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তার বিবরণ শুনুন। শোকের দিকে মন দেবেন না। সূর্যোদয় হয়েছে। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। বিশাল সৈন্যবাহিনী কোলাহল করছে। কাক গৃধ্র শকুনি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। কৌরব পক্ষের সেনাপতি হয়েছেন ভীষ্ম। তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। অগণিত রথ অশ্ব হস্তী। সহস্র সহস্র ধ্বজা বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের মত দেখা যাচ্ছে। কাতারে-কাতারে সেনা প্রজ্বলিত অগ্নির মত। স্বর্ণভূষিত মণিচিত্রিত তাদের দেহ। তাদের হাতে ধনু, খরশান তরবারি খড়্গ। সূর্যের আলোতে তা ঝলসে উঠছে। তারা উন্মত্ত রণহুঙ্কার দিচ্ছে। আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছে। মকরাবর্তে সংক্ষুব্ধ যেন প্রলয়কালীন সমুদ্র। ভীষ্ম সেনা বিভাগ করছেন। কর্ণকে তিনি অর্ধরথ বলে উপেক্ষা করলেন। অপমানিত কর্ণ প্রতিজ্ঞা করল, ভীষ্ম জীবিত থাকতে সে যুদ্ধ করবে না। কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করল। ওই দেখা যায় দুর্যোধন, শ্বেতচন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করছে। মাথার উপরে মণিময় নাগধ্বজা তুলে ধরল। কৃপাচার্য মগধসেনার পুরোভাগে দাঁড়ালেন। বৃষলাঞ্ছিত তাঁর পতাকা। ওদিকে আসছে দ্রোণাচার্যের স্বর্ণরথ। কমণ্ডলুশোভিত কেতন উড়ছে। আরো দূরে সুবলপুত্র শকুনি, মদ্ররাজ শল্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ অনুবিন্দ। কোশল কেকয় কম্বোজ কৈকয় শ্রুতায়ুধ জয়ৎসেন কৃতবর্মা—তারা দশ অক্ষৌহিণী সেনা পরিচালনা করছে। পরনে তাদের মুঞ্জমেখলা।

ভীষ্ম সেনাবাহিনীকে আহ্বান করে বলছেন, "ক্ষত্রিয়গণ, এই যুদ্ধ স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটন করে ধরেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যু বরণ করে আমরা ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোকে গমন করব। গৃহকোণে রুগ্ন আতুরের মত মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের আঘাতে যে মৃত্যু তাই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম। আপনারা সেই ধর্ম পালন করুন।"

সৈন্যরা দুন্দুভি বাজিয়ে সেনাপতি ভীষ্মকে সমর্থন জানাল।

ব্যূহবদ্ধ কৌরবসেনা ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পদ্মকান্তি বীর অশ্বত্থামা রথে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর রথের উপরে সিংহলাঙ্গুলচিহ্নিত পতাকা। তারই পশ্চাতে চলেছে ভীষ্মের রজতশুভ্র রথ। রথের শীর্ষে পঞ্চতারামণ্ডিত তালধ্বজা। ভীষ্মের অঙ্গে শ্বেত বর্ম, মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষ, দৃষ্টিতে প্রলয়।

ভীষ্মের রথ এসে থামল যুদ্ধমুখে।

সেখানে বজ্রব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে পাণ্ডবসেনা।

দুর্যোধনের শ্বেত হস্তী ছুটে আসছে এই দিকে। তার অঙ্গে নীল বসন। দীর্ঘ কেশকলাপে মণিমুকুট জ্বলছে। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বলছে, "আচার্য, আমাদের পক্ষের একমাত্র আশ্রয় আপনি, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম এবং কর্ণ। আপনারা সর্বপ্রকারে সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করুন।"

ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করলেন।

কৌরব পক্ষে ভেরী শঙ্খ দুন্দুভি বেজে উঠল।

এমন সময়, আশ্চর্য, ও কি ?

সারথি শ্রীকৃষ্ণ ধীরে-ধীরে অর্জুনের শ্বেতাশ্ববাহিত রথ কৌরবসেনার সম্মুখে এনে থামালেন। বললেন, "পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ।"

[চব্বিশ]

গীতার কথা

সম্মুখে যুদ্ধের সঙ্কট।

কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা আছে মানুষের জীবনে। পরাজয়ের চেয়েও দুঃসহ, মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ, অন্তরাত্মার সঙ্কট। চিত্ত যখন বিভ্রান্ত, মন যখন সংশয়ে ডুবে যায়, হৃদয়ের সহস্র নাড়ী যখন ছিঁড়ে যেতে থাকে, অবসন্ন অস্তিত্বের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। জীবনে কখনো কখনো এমন কালমুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, যা কোন বাহুবলে অস্ত্রবলে জয় করা যায় না। কুরুক্ষেত্রের চেয়ে সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর সেই অন্তরাত্মার কুরুক্ষেত্র।

সেইখানে অর্জুনকে এনে দাঁড় করালেন শ্রীকৃষ্ণ। বললেন, পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ। ওই তোমার ভাই বন্ধু আত্মীয় সখা, পিতামহ পিতৃব্য এবং গুরু।

অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হবে, নিষ্ঠুর মরণ-আঘাত হানতে হবে এঁদেরই বিরুদ্ধে।

যা ভেবেছিলেন তাই হল।

অর্জুন আবিষ্টচিত্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। অসহায় করুণ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থী এইসব আত্মীয়-স্বজনকে দেখে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি। শোকে দয়ায় আমার শরীরে রোমহর্ষ হচ্ছে। সর্বাঙ্গ কাঁপছে। মুখ শুকিয়ে আসছে। হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার এইসব আত্মীয়-স্বজনকে বধ করে কিসের যুদ্ধ জয়? কিসের রাজ্যসুখ? আমি মরতে রাজী আছি তবু আমি এদের মারতে পারব না—এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।" এই বলে অর্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করে রথের মধ্যে বসে পড়লেন।

এক নাটকীয় চরম মুহূর্ত।

দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ আমরা, অর্জুনের মত আমরাও হতবুদ্ধি হয়ে যাই, ভাবি, তাইতো!

তখন মহাভারতের মর্মকন্দর ভেদ করে গর্জে উঠল কম্বুকণ্ঠ। একটা যেন প্রবল বিস্ফোরণ ঘটল ভারতের অধ্যাত্ম-মানসে—যার কম্পন পাঁচ হাজার বছর পেরিয়ে এসে আজো আমাদের জীবনে বিপ্লব নিয়ে আসে। এর চেয়ে

শ্রেষ্ঠতর সত্যের বাণী মানুষ শোনেনি। শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে উদ্‌গাত হল ভগবদ্‌গীতা। সমগ্র মহাভারতের মর্মপুট।

তিনি অর্জুনকে বললেন, "সঙ্কটকালে তোমার এ কি মোহ উপস্থিত হল ? ক্লীব হয়ো না। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও।

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩
(ভীষ্মপর্ব, ২৬ অধ্যায়)

অর্জুন বললেন, "না, বরং ভিক্ষা করে খাব সেও ভাল, তবু ভীষ্ম দ্রোণ, আমার গুরুজন, আমার গুরু, এঁদের বধ করতে পারব না। এঁদের রক্তমাখা যে রাজৈশ্বর্য তা চাই না।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলতে লাগলেন, "তোমার এই বিষাদ, এই মোহ, দুর্বলচিত্ত সংশয়ী মনের কুয়াশা মাত্র। সত্যের দিক থেকে, স্বভাবের দিক থেকে এক বিসদৃশ মূঢ়তা। জীবনে মরণে শোকের কোন স্থান নেই। কার জন্য শোক করছ ? জন্ম-মৃত্যু শুধু ঢেউএর ওঠা-নামা। কৈশোর যৌবন জরা জীবনের যেমন অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যুও তাই। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক অবিনাশী সত্তা—শাশ্বত অব্যয়। যার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। নিত্য অক্ষয় অনাদি। শরীর হত হলেও আত্মা হত হন না। যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে আমরা নতুন বস্ত্র পরিধান করি, আত্মাও তেমনি এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহ ধারণ করেন। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে এই সামান্য সঙ্কীর্ণ পরিসরটুকুই আমরা দেখতে পাই। তার আগে কি আছে জানি না; তার পরে কি আছে তাও জানি না। এরই মধ্যে আমাদের এই যাওয়া-আসা অনিবার্য। সবাই যাবে। কেউ থাকবে না। তবে কিসের জন্য খেদ করছ ? তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। এ তোমার ধর্মযুদ্ধ। আত্মীয় স্বজনের গায়ে আঘাত লাগবে বলে তুমি ধর্ম থেকে বিরত হতে পার না। অতএব কৃতনিশ্চয় হয়ে, হে অর্জুন, যুদ্ধ কর। সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় লাভ-অলাভ সমান জ্ঞান করে যোগস্থ হয়ে যুদ্ধ কর।"...

আঠার অধ্যায় ধরে একের পর এক শ্রীকৃষ্ণ বলে গেলেন, জীবনের রহস্য কি ? কর্মের স্বরূপ কি ? জীবনের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির কোন্ কোন্ গুণ ও শক্তির খেলা চলেছে ? মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল কোথায় ? তফাত কোথায় ? জীবনের লক্ষ্য কি ? মানুষ কোন্ পথ ধরে চলবে ? কি তার সিদ্ধি ও সার্থকতা ? এমন সর্বাঙ্গীনভাবে জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে

সত্য নিরূপণের চেষ্টা আর কোথাও হয়নি। মহাভারতের এই কয়েকটি পৃষ্ঠাতেই পৃথিবীর জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে।

অবশ্য গীতা বলতে আমরা বুঝি শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত ৬২০টি শ্লোক—"ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ" (ভীষ্মপর্ব, ৪৩/৪)। বৈশম্পায়ন বলছেন, এই গীতা "সর্বশাস্ত্রময়ী"।

কিন্তু এছাড়াও মহাভারতে আছে আরো পনরখানি গীতা। যা মূল গীতারই পরিপূরক। যেগুলি একসঙ্গে অনুধাবন করলে আমরা গীতা সম্বন্ধে অনেক তর্কের অনেক শুষ্ক ধূলির ঝড়ো আঁধি পার হয়ে যেতে পারি।

এক শান্তিপর্বেই আছে মোট তেরখানি গীতা—যা মূল গীতারই কোন না কোন বিষয় আরো বিশদ ও বিস্তৃত করা হয়েছে। যেমন, উতথ্যগীতা (৯০ থেকে ৯১ অধ্যায়); বামদেবগীতা (৯২ থেকে ৯৪ অধ্যায়); ঋষভগীতা (১২৪ থেকে ১২৮ অধ্যায়); ব্রহ্মগীতা (১৩৬ অধ্যায়); ষড়জ্‌গীতা (১৬৭ অধ্যায়); শম্পাকগীতা (১৭৬ অধ্যায়); মঙ্কিগীতা (১৭৭ অধ্যায়); বোধ্যগীতা (১৭৮ অধ্যায়); বিচখ্নুগীতা (২৬৫ অধ্যায়); হারীতগীতা (২৭৮ অধ্যায়); বৃত্রগীতা (২৭৯ থেকে ২৮০ অধ্যায়) পরাশর-গীতা (২৯০ থেকে ২৯৮ অধ্যায়); হংসগীতা (২৯৯ অধ্যায়)। আবার আশ্বমেধিকপর্বে আছে অনুগীতা (১৬ থেকে ১৯ অধ্যায়) এবং ব্রাহ্মণগীতা (২০ থেকে ৩৪ অধ্যায়)। এসবই মূল গীতার সূত্র ধরে আলোচনা। অনুগীতা তো গীতারই সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি।

গীতার মর্মকথাটি কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, গীতাকে উল্টো করে নিলে যা হয় তাই। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। ত্যাগধর্মের মাহাত্মাই কীর্তন করা হয়েছে এতে। বাইরে থেকে সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেওয়াই ত্যাগ নয়. শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই ত্যাগ প্রকৃত কি তা বুঝিয়েছেন : অন্তরের আসক্তিত্যাগই ত্যাগ করা, যেন পদ্মপাতায় জল ("পদ্মপত্রমিবাম্ভসা"—গীতা ৫/১০), আছে অথচ লিপ্ত হয়ে নেই ("ন লিপ্যতে"—গীতা ৫/৭)। শম্পাকগীতা বলছে, আসক্তিহীন নিষ্কিঞ্চনই সুখ। ত্যাগের মধ্যেই পরম সুখ—"আকিঞ্চন্যং সুখং"…"ত্যক্ত্বা সর্বং সুখী ভব"। এ তো শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি, "মুক্তসঙ্গঃ সমাচর" (গীতা ৩/৯), "প্রজহাতি যদা কামান্‌" (গীতা ২/৫৫)। মিথিলার রাজা হয়েও জনক বলছেন, "সমস্ত মিথিলা রাজ্য দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হবে না—মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন" (শান্তিপর্ব ১৭৮/২)। এই ভাবকেই আরো সুন্দর কাব্য করে বলেছেন বোধ্যমুনি তাঁর বোধ্যগীতায়,

"আমি কুমারীর হাতের শঙ্খের মত একাকী নির্জন হয়ে বিচরণ করব—একাকী বিচরিষ্যামি কুমারীশঙ্খকো যথা"। (শান্তিপর্ব, ১৭৮/১৩)

ভগবদগীতার বহু বাক্য উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত ছড়িয়ে আছে মহাভারতের অন্যান্য গীতাগুলির মধ্যেও। তার দুইএকটা এখানে সংগ্রহ করা যাক :

"নিত্যতৃপ্তঃ সুসন্তুষ্ট"··· (হারীতগীতা, শান্তিপর্ব, ২৭৮/১৫)
"ন শোচামি ন হৃষ্যামি"··· (বৃত্রগীতা, শান্তিপর্ব, ২৭৯/১৬)
"ছন্দাংসি যস্য রোমাণি"··· (বৃত্রগীতা, শান্তিপর্ব, ২৮০/২৫)
"অলাভে ন বিহন্যেত লাভশ্চৈনং ন হর্ষয়েৎ"···
(হারীতগীতা, শান্তিপর্ব, ২৭৮/১০)
"বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্টকাঞ্চনো"··· (ষড়জগীতা, শান্তিপর্ব, ১৬৭/৪৪)
"প্রিয়াপ্রিয়ে বং বশমানয়ীত"··· (হংসগীতা, শান্তিপর্ব, ২৯৯/৭)
"আত্মন্যাত্মানমাবিশ্য"··· (ব্রাহ্মণগীতা, অশ্বমেধপর্ব, ২৭/২২)

ইত্যাদি, এইগুলি কি গীতারই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া মণিমুক্তা নয় ? এমনি আরো কত সংগ্রহ করা যায় কিন্তু আপাতত আমাদের হাত ভরে গেছে। যদি গীতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে যাই তাহলে দেখব এই সব শব্দ-অলঙ্কার একই জহুরীর হাতের তৈরী। এদের সৌন্দর্য ওজন গড়ন যেন নিক্তিতে মাপা তিল রতি মাষায় সমান। যেমন,

"নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ"··· (গীতা, ৪/২০)
"ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"··· (গীতা, ১২/১৭)
"ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি"··· (গীতা, ১৫/১)
"লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ··· (গীতা, ২/৩৮)
"সমদুঃখসুখঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ"··· (গীতা, ১৪/২৪)
"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্"··· (গীতা, ৫/২০)
"সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা"··· (গীতা, ৩/৪৩)

গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জগৎ উৎপত্তির যে বর্ণনা, ঠিক একই বর্ণনা পাই শান্তিপর্বে ২৩১ অধ্যায়ে।

এসব দেখে মনে হয়, মহাভারতের বিচিত্র মণিরত্ন-হারখানি যেন ভগবদগীতারই সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত—"সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" (গীতা ৭/৭)।

এছাড়া বনপর্বের অষ্টাবক্র-বন্দিসংবাদ, দ্বিজ-ব্যাধসংবাদ, যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ; উদ্যোগপর্বের সনৎসুজাতসংবাদ অধ্যাত্মশাস্ত্র হিসাবে গীতারই অনুরূপ। অগ্নিপুরাণে (৩য় খণ্ড, ৩৮০ অধ্যায়) এবং গরুড়পুরাণেও (পূর্বখণ্ড, ২৪২

অধ্যায়) রয়েছে গীতারই সংক্ষিপ্ত সার। অতএব গীতাকে সরিয়ে নিলে মহাভারতের হৃদয়কেই সরিয়ে নেওয়া হয়। মহাভারতের যে অমৃতধারা তার সর্বসারভূত হল গীতা—"ভারতামৃতসর্বস্বগীতায়াঃ" (ভীষ্মপর্ব ৪৩/৫)। গীতার কথায় ও ভাবে সমগ্র মহাভারত অনুপ্রাণিত। উপক্রমণিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত মহাভারতের সর্বত্র গীতারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। অনেক ক্ষেত্রে গীতারই শ্লোক উদ্ধৃত।

আদিপর্বের গোড়াতেই ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করছেন, "রথারূঢ় অর্জুনকে কৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ দর্শন করালেন সেদিন থেকেই আমি জয়ের আশা করি নাই।" (আদিপর্ব, ১/১৮১) অনুগীতা পর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যোগযুক্ত হয়ে তোমাকে এইসব কথা বলেছিলাম।" আশ্বমেধিকপর্বে গুরুশিষ্য-সংবাদে নারায়ণী প্রকরণেও ভগবদ্গীতার উল্লেখ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমি তোমাকে আগেও বলেছি একথা—পূর্বমপ্যেতদেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে।" (আশ্বমেধিকপর্ব, ৫১/৪৯) শান্তিপর্বের শেষে আবার বৈশম্পায়ন বলছেন, "অর্জুন যুদ্ধে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ দেন।" (শান্তিপর্ব, ৩৪৮/৮) এছাড়া লক্ষ্যণীয়, সারা ভারতবর্ষে এযাবৎ যতগুলি মহাভারতের সংস্করণ পাওয়া গিয়েছে সবগুলিতেই গীতা ভীষ্মপর্বের একই স্থানে সন্নিবেশিত। পর্বসংগ্রহ অধ্যায়েও গীতার উল্লেখ। অতএব গীতা যে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবু অনেকে বলে থাকেন গীতা মহাভারতের অংশ নয়। বেদব্যাসের রচনা নয়। অন্য কোন প্রতিভাধর পণ্ডিত, সম্ভবত শঙ্করাচার্য, গীতা রচনা করে মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষেপ করেছেন।

কিন্তু শঙ্করাচার্যের আগে একটি বোধায়ন-ভাষ্য ছিল। একখানি কীটদষ্ট বোধায়ন-পুঁথি একজনের হাতে দেখে সেই পুঁথি অবলম্বন করে রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্য রচনা করেন। শাঙ্করভাষ্যের মধ্যেও উদ্ধৃত অনেকটা অংশ যে বোধায়ন ভাষ্য এমন কথাও অনেকে অনুমান করে থাকেন। তবে মূল বোধায়ন ভাষ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ শাঙ্করভাষ্যের চেয়ে প্রাচীনতর কোন প্রমাণ স্বীকার করতে চাননি। তবে তিনি জোর দিয়ে বলছেন, "গীতার মত বেদের ভাষ্য আর কোথাও হয় নাই, হইবেও না।" ('স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃ. ১৫৪)

কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যের আরম্ভেই বলেছেন, পূর্ববর্তী টীকাকারদের মত খণ্ডন করে আমি এই নূতন ভাষ্য লিখছি। অতএব শঙ্করাচার্যের আগে যে গীতা ও তার টীকা ছিল তা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয়। বালগঙ্গাধর

তিলক বলেছেন, শঙ্করাচার্যের দুইতিন শত বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। ('গীতারহস্য' ১৩৯০, পৃ. ৪৮৩)

গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এবং অন্যের রচনা এমন সন্দেহ বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ।...গীতা গ্রন্থখানি ভগবৎ প্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা। যে ব্যক্তি গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথন কালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না"...('বঙ্কিম রচনাবলী', মৌসুমী, ১৩৮৯, পৃ. ৭১৭)

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে গীতা রচিত হয়নি। শুধু গীতা কেন, সমগ্র মহাভারতখানিও রচিত হয়েছিল যুদ্ধের অনেক পরে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে। তারপর যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। যুধিষ্ঠিরের পরে পরীক্ষিতের রাজত্বকাল। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে, এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রের কিছু আগে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ৬০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৪১ অব্দে বেদব্যাস মহাভারত রচনা করতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর ধরে তিনি মহাভারত রচনা করেছিলেন। (আদিপর্ব, ৬২/৫২) [এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত মহাভারতের ভূমিকা এবং শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থকৃত 'মহাভারতের সমাজ' গ্রন্থের ভূমিকা, এবং C. V. Vaidya লিখিত *Mahabharata A Criticism*, 1904, গ্রন্থখানি (পৃ. ৫৫-৭৮) দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধের আগে যে মহাভারত রচিত হয়নি ভবিষ্যতে তা রচনা করে জগতে প্রচারিত করবেন এমন আশ্বাস বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে দিচ্ছেন,—

অহং তু কীর্তিমেতেষাং কুরূণাং ভরতর্ষভ।
পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাং প্রথয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(ভীষ্মপর্ব, ২/১৩)

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের যে সন্দেহ, উভয় সেনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গীতার রচনা, সে প্রশ্ন ওঠে না। আর গীতা যেভাবে মহাভারতের মধ্যে ওতপ্রোত, তার ভাবে ভাষায় অনুপ্রাণিত, তাতে অন্য কেউ একজন গীতা প্রণয়ন করে মহাভারতে প্রক্ষেপ করে দিয়েছেন এমন কথা ভাবার পিছনেও কোন প্রবল যুক্তি বা প্রমাণ নেই। ভাবে ভাষায় কাব্যে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এমন অঙ্গাঙ্গী

সম্বন্ধ—মহাভারত ও গীতা যে দুইজন পৃথক কবির রচনা একথা ভাবা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, গীতা যে অন্যের রচনা এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এমন মনে করার পিছনে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের বক্তব্য তেমন জোরালো নয়, তাদের প্রমাণগুলি যৎকিঞ্চিৎ ও অসম্পূর্ণ। "There seem to me to be strong ground against this supposition for which, besides, the evidence, extrinsic or internal, is in the last degree scanty and insufficient." (*Essays on the Gita*, 1937, p. 16)

শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন, "ইতিহাসের যে চারটি প্রধান ঘটনা ট্রয়নগরীর অবরোধ, খ্রীষ্টের জন্ম ও ক্রুশারোহণ, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নির্বাসন আর কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংলাপ। ট্রয়-অবরোধ সৃষ্টি করেছিল গ্রীক সভ্যতা, বৃন্দাবন-বাস সৃষ্টি করেছিল ভক্তিধর্ম (তার পূর্বে ছিল কেবল ধ্যান ও পূজার্চনা), খ্রীষ্ট তাঁর ক্রুশ থেকে ইউরোপকে মানুষী কারুণ্যে পরিপূর্ণ করলেন, আর কুরুক্ষেত্র সংলাপ মানবজাতিকে এখনো মুক্ত করবে। তবুও বলা হয় এ চারটি ঘটনার কোনটাই ঘটে নাই।"···('চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি', পৃ. ৮) "কিন্তু বৃন্দাবন যদি কোথাও না থাকত তবে ভাগবত কখনো লেখা হ'ত না।" (তদেব, পৃ. ৭) ওই একইভাবে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই সংলাপ যদি না ঘটত তাহলে মহাভারত লেখা হ'ত না।

তিলক তাঁর 'গীতারহস্যে' বলেছেন, "মহাভারত ও গীতা যে একই হাতের রচনা একথা না বলিয়া থাকা যায় না।···গীতা মহাভারতের মধ্যে যোগ্য কারণে যোগ্য স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে, প্রক্ষিপ্ত নহে, এই সিদ্ধান্তই শেষে বজায় থাকে।" ('গীতারহস্য', পৃ. ৪৪৭)

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই যুগল ছবিটি স্পষ্টত বেদব্যাস নিয়েছেন পৌরাণিক একটা মিথ্‌ থেকে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র-কুৎস অত্যন্ত পরিচিত একটি ইমেজ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৩ ও ৩৬ সূক্ত, চতুর্থ মণ্ডলের ১৬ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে তার উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য তাঁর টীকায় বলছেন, কুৎস হলেন রুরুর পুত্র। তাঁর মায়ের নাম শ্বিত্রা। তাই তাঁকে শ্বৈত্রেয় বলা হয়। তিনি একজন রাজর্ষি—অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা, "দাস্যুচ্ছৈত্রেয়ো নৃষাহ্যায় তস্থৌ" (ঋগ্বেদ, ১-৩৩-১৪)। এই কুৎস শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে অসমর্থ হলে ইন্দ্রকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করেন। ফলে ইন্দ্র ও কুৎসের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। ইন্দ্র কুৎসকে নিজের আবাসে নিয়ে গেলেন। ইন্দ্রের

স্ত্রী শচী, তাঁদের উভয়কে একই রকম দেখতে বলে, কে ইন্দ্র আর কে কুৎস এ বিষয়ে সংশয়ান্বিত হয়েছিলেন।

আসলে ইন্দ্র ও কুৎস একই। তবে দিব্যসত্তা ও মানবসত্তায় প্রকটিত। যেমন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ, অভিন্ন-আত্মা। ইন্দ্র ও কুৎসকে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন উদ্যোগপর্বে, ৪৯ অধ্যায়ে। যেখানে ব্রহ্মা বলছেন, অর্জুন ও কৃষ্ণ একই—কেবল দুই মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন, "দ্বিধাভূতৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ বিদ্ধি ব্রহ্মন্ পরন্তপৌ" (উদ্যোগপর্ব, ৪৯/৯)। মহাভারতে ইন্দ্রের পুত্র অর্জুন, কিন্তু ঋগ্বেদে সায়ণের মতে ইন্দ্রের আর এক নাম অর্জুন। ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে বেদব্যাসও ইঙ্গিত করছেন, "শক্রসমো ধনঞ্জয়ঃ" (উদ্যোগপর্ব, ২২/৩৩)। কুৎস হলেন আবার অর্জুনেরই পুত্র "আর্জুনেয়" (ঋগ্বেদ ১-১১২-২৩)। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলছেন, ইন্দ্র-কুৎস হল "allegorical", শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন হল "factual"। একটি পুরাকল্প আর একটি ইতিহাস। এই দুটি চিত্রকল্প মিশে গেছে মহাভারতে।...

যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অর্জুন অভিভূত।

অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে শুনছেন শ্রীকৃষ্ণের কথা, "অর্জুন, যদি তুমি অহঙ্কার বশে মনে কর যুদ্ধ করবে না, তবে তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হবে। তোমার স্বভাব তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। তুমি কে? কর্মের কর্তা তুমি নও। ভগবান মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সমস্ত জগৎ চালনা করেন। এইসব যোধীবৃন্দের মৃত্যু আগেই হয়ে গেছে। তুমি না মারলেও তারা মরবে। তুমি নিমিত্তমাত্র। কর্মেই তোমার অধিকার। কর্মের ফল প্রত্যাশা ক'রো না। কর্মত্যাগ করে নিষ্কর্মাও হয়ো না। কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নয়, কর্মযোগই সন্ন্যাস। অতএব যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে, ব্যর্থতা ও সার্থকতাকে সমান জ্ঞান করে নিষ্কামভাবে কর্ম কর। আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর। আমার ভক্ত হও। তুমি আমার প্রিয়। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি আমাকে পাবে। সর্বধর্ম ত্যাগ করে আমাতে শরণ নাও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব। শোক ক'রো না।

> মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
> সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥
>
> (গীতা ১৮/৬৫-৬৬)

[পঁচিশ]

অস্ত্রপাত না প্রণিপাত ?

যুধিষ্ঠির আকুল হয়ে দুই হাতে ভীষ্মের পা জড়িয়ে ধরলেন। শান্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন, "পিতামহ, আমাকে যে আপনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে! আপনি আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিন। আশীর্বাদ করুন।"

যুধিষ্ঠিরের এই ব্যক্তিত্ব বিস্ময়কর। তিনি শান্ত অথচ অটল। পরিস্থিতি মর্মান্তিক, তবু সঙ্কল্পচ্যুত নন। তিনি নম্র কিন্তু দৃঢ়। যে অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুন ভেঙে পড়েছিলেন। মনে হয়েছিল তাঁর বীরত্ব কত অসার। অর্জুনের হাতের তলবার বুঝি পল্‌কা টিনের তৈরী। নৈরাশ্যে বিষাদে চিত্তদৌর্বল্যে পরন্তপ অর্জুন কত অসহায়। তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে দরকার হল শ্রীকৃষ্ণের বজ্রনির্ঘোষ—আঠারো অধ্যায় ধরে গীতার সঞ্জীবনী মন্ত্র।

কিন্তু যুধিষ্ঠির সার্থকনামা। তিনি যুদ্ধে স্থির। তাঁর মধ্যে দ্বিধা আছে, তাঁর মনে দ্বন্দ্ব আছে, উচিত-অনুচিত ধর্ম-অধর্মের বিচারে তাঁর অন্তর সর্বদা ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু একবার যা সত্য বলে ধর্ম বলে বুঝেছেন, কর্তব্য বলে স্থির করেছেন, তা থেকে তিনি এক চুলও নড়েন না। ভীষ্মের পা ধরে তিনি এমন কথা বললেন না যে, মরব সেও ভাল তবু যুদ্ধ করব না। আত্মীয় স্বজনকে বধ করে রাজ্যলাভের চেয়ে বরং ভিক্ষা করে খাব। যুধিষ্ঠির কেবল শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আপনি যুদ্ধের অনুমতি দিন। আশীর্বাদ করুন।" সঙ্কটকালে যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠ এমনি আশ্চর্যভাবে দৃঢ়। তাঁর বুকের মধ্যে কোথায় যেন শক্তির একটা শিলাতট আছে। যেখানে তিনি অটলভাবে দাঁড়াতে পারেন। সকলে যে অবস্থায় টলে যায়, পড়ে যায়, সেখানে তিনি কিন্তু স্থির।

সভাপর্বে দেখেছি, পাণ্ডবদের ভাগ্যের পাশা উল্টে গেল। তাঁরা নিঃস্ব বনবাসী হয়ে চলেছেন। দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হয়ে কাঁদছেন। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব ক্রোধে জ্বলছেন। আক্রোশে অভিশাপ দিচ্ছেন। ভয়ানক সব শপথ করছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির শান্ত। ধীর পদে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসে প্রণাম করে বললেন, "অনুমতি দিন, আমরা ভিক্ষুক হয়ে বনে যাই। আশীর্বাদ করুন, তের বছর পরে আবার যেন দেখা হয়।" ঘটনা যার দোষে যে কারণেই ঘটুক, এই অটল ধৈর্যকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

আবার কাম্যক বনে প্রবেশ করার মুখে নরখাদক ভয়ঙ্কর কির্মীর রাক্ষস

পথ রোধ করে দাঁড়াল। দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন। আর সব ভাই তাঁকে ধরে রইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির নির্ভীক পদে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি ? কি চাও ?"

বনপর্বে দীর্ঘ বার বৎসর তাঁকে অনেক কষ্ট অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে। বিপদ এসেছে পদে-পদে। কিন্তু যুধিষ্ঠির কখনো সত্য থেকে সঙ্কল্প থেকে টলেননি। শেষে একদিন নির্জন হ্রদের ধারে অপরাহ্নে দেখলেন, তাঁর চার ভাই রহস্যজনকভাবে মৃত। তাঁর জীবনের সব আশা ভরসা নিঃশেষ। অন্তর দীর্ণ, হৃদয় মথিত, তবু তিনি বিস্ময়করভাবে অটল। বললেন, "যক্ষ, আপনি প্রশ্ন করুন। আমি সাধ্যমত উত্তর দেব।"

আমরা দেখি সর্বদা তিনি যেন চিন্তিত অন্যমনস্ক। ধর্ম-অধর্মের দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত। পরিস্থিতি অনুযায়ী কি যে করণীয় তা স্থির করতে তাঁর সময় লাগে। তাই মাঝে-মাঝে মনে হতে পারে যুধিষ্ঠির বুঝি শ্লথবুদ্ধি অপটু নিষ্কর্মা। কিন্তু সঙ্কটকালে তাঁর বুদ্ধি বিদ্যুতের মতই প্রত্যুৎপন্ন। তিনি সঞ্জয়কে ঠিকই বলেছিলেন, "সঞ্জয়, আমি কোমল হতে পারি, আবার কঠোরও হতে পারি। আমি শান্তিও জানি, যুদ্ধও জানি।"

অলমেব শময়াস্মি তথা যুদ্ধায় সঞ্জয়।
ধর্মার্থয়োরলং চাহং মৃদবে দারুণায় চ ॥ ২৩

(উদ্যোগপর্ব, ৩১ অধ্যায়)

অনিবার্য বলেই তাঁকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। তাঁর দয়ালু হৃদয় কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে জানে। যদিও সামান্য একটি পিঁপড়ের ব্যথায়ও তিনি কাতর। দূত উলূকের সকল নিন্দার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি একটি পিপীলিকাকেও আঘাত করতে চাই না—ন চাহং কাময়ে পাপমপি কীট-পিপীলয়োঃ। (উদ্যোগপর্ব, ১৬৩/২৬)

এই ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরের ঠিক বিপরীত চরিত্র অর্জুন। অর্জুনের মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অর্জুন ভাবনা-চিন্তার ধার ধারেন না। তিনি কাজের লোক। যুদ্ধ করা উচিত হবে কিনা এই নিয়ে যখন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নানা দিক থেকে আলোচনা করছেন, উপায় নেই জেনেও যুদ্ধের অনুমতি দিতে দ্বিধা করছেন, সেখানে অর্জুন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। অর্জুনের কথা হল, "অত ভাববার কি আছে ? শ্রীকৃষ্ণ, মাতা কুন্তী এবং বিদুর, এঁরা তো অধর্ম করতে বলবেন না। অতএব যুদ্ধ করাই উচিত।" (উদ্যোগপর্ব, ১৫৪/২৪-২৫) কিন্তু অর্জুনের এই সহজ প্রত্যয় যে কত অগভীর, তাঁর চিত্তের তলায় যে কত সংশয় দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত থেকে গেছে, তিনি যে সেদিকে তাকিয়েও দেখেননি,

তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। অর্জুনের চিত্তের অবদমিত কুয়াশাচ্ছন্ন যত সংশয় অকস্মাৎ মনের উপরে উঠে এসে তাঁকে অবসন্ন করে দিল। মনের তলায় এতদিন যে বরফ জমাট হয়ে ছিল, হঠাৎ তারই ধাক্কায় অর্জুনের টাইটানিক ডুবে গেল। ভগবদগীতা না হলে অর্জুনের রক্ষা হ'ত না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের গীতা শোনাবার দরকার হয়নি। অন্তর্মুখী আপন তপস্যায় যুধিষ্ঠির নিজেই দাঁড়াবার ভূমি পেয়েছেন। অর্জুনের যেখানে পা রাখবার জায়গা নেই, যুধিষ্ঠির সেখানে নিজেই দাঁড়াতে পারেন—"অপদে পদধাতবে"। অর্জুনের সকল বীরত্বের পিছনে থেকে যুধিষ্ঠিরই তাঁকে রক্ষা করে এসেছেন, একথা একবার তিনি নিজেই বলেছেন, "অহং পশ্চাদর্জুনমভ্যরক্ষং" (উদ্যোগপর্ব, ২৩/২৭)।

কিন্তু ভগবদগীতা শ্রবণের পর থেকে অর্জুনের চরিত্রের পরিবর্তন হতে লাগল। এই নিঃসঙ্কোচ কাজের মানুষটি ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ছেন। দ্বিধায় তাঁর পা জড়িয়ে আসছে, স্নেহ মমতায় বিহ্বল হৃদয় তাঁর কাঁপছে। অর্থাৎ অর্জুন যেন ক্রমশ যুধিষ্ঠির হয়ে যাচ্ছেন। আর যুধিষ্ঠির হয়ে যাচ্ছেন অর্জুন। এমনকি অর্জুনের চেয়েও বেশি। কেননা অর্জুন রাজনীতি কূট-নীতির ধার ধারেন না। ভেদনীতি জানেন না। দরকার হলে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। অর্জুন ভীমের মত যুদ্ধে কখনো নিষ্ঠুর হন না। অথচ যুধিষ্ঠিরকে আমরা কূটনীতি ভেদনীতির আশ্রয় নিতেও দেখি। শল্যকে যখন নিজেদের পক্ষে পাওয়া গেল না, তখন অসঙ্কোচে তিনি শল্যকে প্রস্তাব দিলেন, একবার নয়, পরপর দুইবার, সেই কুটিল প্রস্তাব দিতে তিনি কুণ্ঠিত হলেন না, বললেন, শত্রুপক্ষে থেকেও আপনি কর্ণের তেজ হরণ করবেন—"তেজোবধঃ কার্যং"..."তেজোবধশ্চ তে কার্যং" (উদ্যোগপর্ব, ৮/৪৪ এবং ১৮/২৩) অথচ যুদ্ধের শুরুতে, ভীষ্মবধের পূর্ব পর্যন্ত অর্জুন অন্যমনস্ক। যুদ্ধে উদাসীন। তিনি সব্যসাচী অথচ তাঁর হাত উঠছে না। তিনি মন দিয়ে যুদ্ধ করছেন না। এদিকে পাণ্ডবপক্ষ ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে। তাই দেখে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনুযোগ করছেন, "কৃষ্ণ, সব্যসাচী অর্জুনকে যুদ্ধে উদাসীন দেখছি। কেবল একা ভীম যুদ্ধ করছে। কিন্তু ভীম একা কি করবে? মধ্যস্থমিব পশ্যামি সমরে সব্যসাচিনম্। একো ভীমঃ পরং শক্ত্যা যুদ্ধতেব..." (ভীষ্মপর্ব, ৫০/১৬-১৭)।

ভীষ্মকে প্রণাম করে যুদ্ধের অনুমতি চাইলেন।

ভীষ্ম বললেন, "তুমি প্রথমে আমার কাছে না এলে অভিশাপ দিতাম। তোমার এই শ্রদ্ধা এই বিনয় দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অনুমতি দিলাম,

তুমি যুদ্ধ কর। আশীর্বাদ করি, তুমি জয়ী হবে। প্রীতোঽহং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি। তুমি আমার কাছে আর কি বর চাও ?”

যুধিষ্ঠির সরল অথচ অসম্ভব এক প্রস্তাব দিলেন। ইতিপূর্বে শল্যকে যেমন বলেছিলেন, তার চেয়েও কঠিন। নিষ্পাপ যুধিষ্ঠিরই পারেন এমন প্রস্তাব দিতে। অন্যের মুখে শুনলে মনে হবে কত খল কত কূট। বললেন, “আপনি কৌরবদের হয়েই যুদ্ধ করুন, কিন্তু আমাদের হিতের জন্য মন্ত্রণা দিন।”

তারপরেই নিষ্ঠুর এক প্রশ্ন, “আপনাকে কি উপায়ে জয় করব ? আপনার বধের উপায় বলুন। বধোপায়ং ব্রবীহি।”

ভীষ্ম বললেন, “আমাকে যুদ্ধে জয় করতে পারে এমন বীর তো দেখি না। আমার মৃত্যুকাল এখনও আসেনি। পরে আবার আমার কাছে তুমি এস।”

ভীষ্মকে প্রণাম করে এবার যুধিষ্ঠির গেলেন দ্রোণাচার্যের রথের কাছে। তাঁকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি অনুমতি দিন কোন উপায়ে আমরা শত্রু জয় করব ?”

দ্রোণও বললেন, “যুদ্ধের আগে তুমি যদি অনুমতি নিতে না-আসতে আমি অভিশাপ দিতাম। তুমি যে এসে আমাকে সম্মান দিলে তাতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি যুদ্ধ কর। বিজয়ী হও। অনুজানামি যুধ্যস্ব বিজয়ং সমবাপ্নুহি। আর কি বর চাও বল ?”

যুধিষ্ঠিরের সেই একই কথা, “আপনি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করুন, কিন্তু আমাদের হিতের জন্য মন্ত্রণা দিন, এই প্রার্থনা।”

দ্রোণাচার্য বললেন, “আমি যদিও দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করব কিন্তু তোমার জন্যই বিজয় প্রার্থনা করি। তোমার পক্ষে রয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম ; যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়।”

আবার সেই নিষ্ঠুর প্রশ্ন। প্রশ্নের আগে আর একবার প্রণাম করে নিলেন, “আপনার বধের উপায় আমাকে বলুন—বধোপায়ং বদাত্মনঃ।”

শ্রীকৃষ্ণ ও অপর পাণ্ডবগণ ততক্ষণে যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছে গেছেন। তাঁরা দ্রোণাচার্যকে ঘিরে মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে। কৌরব সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরের এই শ্রদ্ধা এই বিনয় মুগ্ধ হয়ে দেখছে। একটু আগে তারা নিন্দা করছিল, এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রসংশা করছে।

দ্রোণ বললেন, “যতক্ষণ আমি সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধ করতে থাকব ততক্ষণ আমাকে কেউ বধ করতে পারবে না। কিন্তু যদি অস্ত্র ত্যাগ করি, যুদ্ধ থেকে মন প্রত্যাহার করে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করি, তাহলে আমাকে বধ করা সম্ভব।

যদি কোন বিশ্বস্ত পুরুষ রণক্ষেত্রে আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তাহলেই আমি অস্ত্র ত্যাগ করব।"

এর পরে যুধিষ্ঠির গেলেন কৃপাচার্যের কাছে।

—"দ্রোণাচার্যের মত আপনিও আমাদের অস্ত্রগুরু। আমাদের যাতে অপরাধ না হয়, তাই যুদ্ধে আপনার অনুমতি ভিক্ষা করি।"

কৃপ বললেন, "তুমি না এলে আমিও তোমাকে অভিশাপ দিতাম। অনুমতি দিলাম, তুমি যুদ্ধ কর। জয়ী হও। যুদ্ধে আমি অবধ্য। তবে আমি সত্য বলছি, প্রত্যহ নিদ্রা থেকে উঠে আমি তোমারই জয় কামনা করব।"

এবার গেলেন শল্যের কাছে। শল্য বললেন, "তুমি এসেছ আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি জয়ী হও।"

—"কিন্তু মাতুল, অবস্থাগতিকে আপনি আজ আমাদের বিপক্ষে। আমার প্রার্থনা, আপনি আমাদের হিতের জন্য মন্ত্রণা দিন।"

—"কি করতে হবে বল ?"

—"যুদ্ধে আপনি কর্ণের তেজ হরণ করে তাকে নিরুৎসাহ করবেন। আপনি আমাকে আগেও কথা দিয়েছেন।"

—"তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধ কর। আমি কথা দিলাম।"

শল্যের অনুমতি নিয়ে ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠির কৌরবদের বিশাল সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এলেন।

যুদ্ধ যে কেবল সৈন্যবলের উপর নির্ভর করে না, একথা যুধিষ্ঠির বিলক্ষণ জানেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধা বিনয় আর প্রণতি দিয়ে যুদ্ধের আগেই আসল যুদ্ধ জয় করে নিলেন। শল্যকে শত্রুপক্ষে রেখেও নিজের দলেই পেলেন এবং সেই সঙ্গে কর্ণের পরাক্রমবহ্নিকে প্রচ্ছন্নভাবে নির্বাপিত করার ব্যবস্থা করলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ বধের ছিদ্র জেনে গেলেন। যুদ্ধের চারিটি পর্বের চারজন অধিনায়ক —ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ এবং শল্য—এঁদের পরাজয়ের মন্ত্রগুপ্তিও সংগ্রহ করে নিলেন। আর ততক্ষণ মূঢ় দুর্যোধন আস্ফালন করে ফিরছে রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করে। হতভাগ্য সে, জানতেও পারল না, যুদ্ধ যখন শুরু হয়নি, তখন নগ্নপদে নিরস্ত্র যুধিষ্ঠির যুদ্ধ জয় করে ফিরে যাচ্ছেন, অস্ত্রপাত করে নয়, অস্ত্রের চেয়েও অমোঘ তাঁর ধর্ম তাঁর প্রণিপাত দিয়ে।

পাণ্ডবরা আপন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?

ওই যে শ্রীকৃষ্ণ। অদূরে দাঁড়িয়ে কর্ণের সঙ্গে কথা বলছেন।

—"কর্ণ, আমি শুনেছি, ভীষ্ম জীবিত থাকতে তুমি যুদ্ধ করবে না প্রতিজ্ঞা করেছ। উত্তম, যতদিন ভীষ্ম নিহত না হন ততদিন তুমি আমাদের পক্ষে থাক। ভীষ্ম বধ হলে তখন যদি মনে কর আবার তুমি দুর্যোধনের পক্ষে ফিরে যেও।"

শুনে কর্ণ বললেন, "কেশব, আপনার জানা উচিত, আমি দুর্যোধনের বন্ধু। প্রয়োজন হলে আমি তার জন্য প্রাণ দেব। তবু দুর্যোধনের অপ্রিয় কাজ করতে পারব না।"

শ্রীকৃষ্ণ আর কিছু বললেন না। ফিরে এলেন পাণ্ডবদের কাছে। হয়তো তিনি শেষ চেষ্টা করলেন কর্ণকে বাঁচাতে। ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের একটা গভীর মমতা আমরা বারবার লক্ষ্য করি। কর্ণও তা জানে। তার দুর্ভাগ্যের কাছে ভগবদ্‌করুণাও বুঝি অসহায়। সেকথা একদিন ভীষ্মের শরশয্যার পাশে একাকী দাঁড়িয়ে কর্ণ বলেছিল, "পৌরুষ দিয়ে কে কবে ভাগ্যকে প্রতিহত করতে পারে ? দৈবং পুরুষাকারেণ কো নির্বর্তিতুমুৎসহেৎ।" (ভীষ্মপর্ব, ১২২/২৮)

যুধিষ্ঠির শেষবারের মত কুরুসৈন্যের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করলেন, "ভ্রাতৃগণ, আপনাদের মধ্যে যদি কোন বীর থাকেন, যিনি ধর্মের পক্ষে আমাদের পক্ষে আসতে চান, তাহলে আমরা তাঁকে সাদরে বরণ করে নেব।"

তখন কৌরবপক্ষ থেকে দুর্যোধনের ভ্রাতা যুযুৎসু এগিয়ে এসে বললেন, "নিষ্পাপ মহারাজা, যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করেন তাহলে পাণ্ডবপক্ষে আমি যোগ দান করব।"

যুধিষ্ঠির সোৎসাহে বললেন, "এহ্যেহি। এস, এস, যুযুৎসু। বাসুদেব এবং আমরা সকলে তোমাকে সাদরে বরণ করছি। মনে হচ্ছে একমাত্র তুমিই ধৃতরাষ্ট্রের বংশ রক্ষা করবে।"

যুযুৎসু ডঙ্কা বাজাতে-বাজাতে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলেন।

যুধিষ্ঠির রথে উঠে বর্ম অস্ত্র ধারণ করলেন।

রণবাদ্য বেজে উঠল।

সৈন্যদল রণহুঙ্কার দিতে লাগল।

সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শঙ্খধ্বনি করলেন।

স্থবির পাষাণের মত ধৃতরাষ্ট্র শুনে যাচ্ছেন। সঞ্জয় বলে চলেছেন, "মহারাজ, ভীষ্মকে সামনে রেখে দুর্যোধন এগিয়ে চলেছে। ওদিকে পাণ্ডবেরা ভীমকে অগ্রবর্তী করে ভীষ্মকে আক্রমণ করেছে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সমুদ্র গর্জনের মত সৈন্যদের সিংহনাদে রণভূমি কাঁপছে। থেকে থেকে হস্তীর বৃংহিত,

অশ্বের হ্রেষা, শঙ্খদুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি। ভীম কৌরব সেনাকে দলিত মথিত করে চলেছে।

শরজালে আচ্ছন্ন আকাশ। শত শত সৈন্য আর্তনাদ করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছে। সমস্ত রণভূমি রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। চারিদিকে রক্তাক্ত মৃতদেহ, ছিন্ন-মুণ্ড, ভ্রষ্ট মুকুট, শিথিল অস্ত্র সব মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। রথের চাকায় ধুলো উড়ছে। চারিদিকে বিকট চিৎকার। মুমূর্ষুর আর্তনাদ। কাক কঙ্ক শৃগাল মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে। আকাশে অসংখ্য শকুনি ডানা মেলে উড়ছে। রক্তকর্দমে রথের চাকা বসে যাচ্ছে। বাতাস চিরে শন্‌শন্ করে জ্বালামুখী অসংখ্য বাণ ছুটছে। শুধু ধনুকের টঙ্কার আর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। ওই, ওই দিকে কালদণ্ডের মত ভীষ্ম অর্জুনকে আক্রমণ করেছেন। সাত্যকির সঙ্গে কৃতবর্মা, ভীমের সঙ্গে দুর্যোধন, নকুলের সঙ্গে দুঃশাসন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বীরত্ব বিস্ময়কর। অভিমন্যু হঠাৎ ভীষ্মের রথের ধ্বজা ভেঙে দিল। মহারাজ, শল্য আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর রথের অশ্ব নিহত। শল্য একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। আঃ, মহারাজ, বিরাটের পুত্র উত্তর নিহত হল। এই প্রথম পাণ্ডবদের একজন সেনাপতির মৃত্যু। সমুদ্রতরঙ্গের মত কৌরবসেনা উত্তাল হয়ে এগিয়ে চলেছে।...পাণ্ডব-পক্ষ ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের গতি তাদের প্রতিকূল। মহারাজ, শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন। বিরাটের অপর পুত্র সেনাপতি শ্বেত ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে শল্যের দিকে এগিয়ে আসছে। শল্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। শল্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শল্যের শতশত রক্ষীসেনা নিহত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে। ওই যে ভীষ্ম রথ নিয়ে ছুটে আসছেন শল্যকে রক্ষা করতে। শ্বেত রথ থেকে লাফিয়ে নেমেছে। গদা হাতে ভীষ্মকে আক্রমণ করেছে। এ কি? ভীষ্মের রথ ভগ্ন। তাঁর সারথি ও অশ্ব নিহত। সেনাপতি ভীষ্ম সঙ্কটাপন্ন। তিনি বিচলিত। বিমনা হয়ে পড়েছেন। একটু পরে শ্বেতকে লক্ষ্য করে ভীষ্ম মন্ত্রসিদ্ধ এক বাণ নিক্ষেপ করলেন। আঃ, মহারাজ, শ্বেত নিহত হল। নরশার্দুল শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবেরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। পাণ্ডববাহিনী ক্রমশ হটে যাচ্ছে। এদিকে ঘোর বাদ্যধ্বনি করে দুঃশাসন যুদ্ধভূমিতে আনন্দে নৃত্য করছে।

হিরণ্বতী নদীর পশ্চিমতটে তখন ধীরে-ধীরে সূর্যাস্ত হচ্ছে। রক্তেরাঙা রণভূমিতে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

মহারাজ, প্রথম দিনের যুদ্ধের বিরাম ঘোষিত হল। উভয়পক্ষ শিবিরে ফিরে যাচ্ছে।

[ছাব্বিশ]

রক্তের ঋণ

যুদ্ধের প্রথম দিনেই পাণ্ডববাহিনী পরাজিত ও বিপর্যস্ত। বহু সৈন্য ও সেনাপতি নিহত। অধিকাংশ রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। ভীষ্ম দ্রোণ মধ্যাহ্নসূর্যের মত পাণ্ডবসেনাকে দগ্ধ করতে লাগলেন। বিজয় উল্লাসে ঘোর বাদ্য করে দুঃশাসন রণভূমিতে নৃত্য করতে লাগল।

অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির আতঙ্কিত। রাত্রে শিবিরে বসে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ, এইভাবে সৈন্য ক্ষয় করে লাভ কি? ভীষ্ম দ্রোণ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে আমাদের সেনাবাহিনীকে তৃণের মত দগ্ধ করছেন। অর্জুন সব দেখেও নিশ্চেষ্ট। আমাদের মধ্যে একমাত্র অর্জুনই দিব্যাস্ত্রধারী। কিন্তু সে উদাসীন। ভীষ্ম দ্রোণের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করছে না। আমাদের মিত্রপক্ষের অগণিত সেনা অসহায়ভাবে মরছে। এ হতে দেওয়া যায় না। তার চেয়ে বরং আমি বনে চলে যাই। বনে গিয়ে তপস্যা করব। সেই ভাল। বনং যাস্যামি...তপস্তপ্স্যামি দুশ্চরম্...শ্রেয় মে তত্র।"

শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন, "ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি দুঃখ করবেন না। পাণ্ডবেরা বীর। তাছাড়া আপনার অনুগত আমরা তো রয়েছি। রয়েছেন সাত্যকি বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন। আমি বলছি, শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করবে।"

যুধিষ্ঠির তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে উৎসাহিত করলেন, "সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন, পরাক্রমে আপনি বাসুদেবতুল্য। কার্ত্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপতি, আপনিও তেমনি আমাদের সেনাপতি। আগামীকাল যুদ্ধে আপনি কৌরবসেনাকে উপযুক্ত জবাব দেবেন।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে সকলে জয়ধ্বনি করে উঠল, "সাধু, সাধু! জয়, ধৃষ্টদ্যুম্নের জয়!"

পরদিন ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণে অচিরেই পাণ্ডবব্যূহ ভেঙে পড়ল। কাতারে-কাতারে পাণ্ডব-সেনা নিহত হতে লাগল। ভীষ্ম দ্রোণ শল্য দুর্যোধন বিকর্ণের দুর্ধর্ষ আক্রমণে পাণ্ডবদের পরাজয় হচ্ছে। সৈন্যরা ভয়ে পালাচ্ছে। ভীষ্মের শরবর্ষণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি অভিমন্যু ও ভীম। তাই দেখে ক্রুদ্ধ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "আমাকে ভীষ্মের সম্মুখে নিয়ে চল—যাহি যত্র পিতামহঃ।"

পরন্তপ অর্জুন যেন এবার জেগে উঠেছেন।

বিপুল বিক্রমে কালান্তক অগ্নির মত অর্জুন ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। দেখতে-দেখতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছে দ্রোণ পর্যুদস্ত। ভীমের হাতে নিহত হল কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ও তার দুই পুত্র। ভীম এবার অতর্কিতে আক্রমণ করলেন ভীষ্মকে। এপাশে ভীম ওপাশে অর্জুন, দুই দিক থেকে ভীষ্ম আক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ নিপুণহাতে অর্জুনের রথ চালনা করছেন। ভীমের হাতে ভীষ্মের সারথি নিহত হল। ভীষ্মের সুশিক্ষিত অশ্ব তখন রথ নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

অর্জুনের হাতে অসংখ্য কৌরবসেনা নিহত হচ্ছে, তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, তাই দেখে ভীষ্ম তখন দ্রোণকে বললেন, "অর্জুন আজ দুর্জয় কালান্তক যম। তাকে আজ কিছুতেই জয় করা যাবে না। আমাদের সৈন্যরাও অত্যন্ত ক্লান্ত ও ভীত হয়ে পড়েছে। আজকের মত যুদ্ধ স্থগিত থাক।"

পরদিন আবার যুদ্ধ।

প্রচণ্ড আক্রমণে রণভূমি কাঁপছে।...

দুই পক্ষেরই ব্যূহ ছিন্নভিন্ন।...

ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত ধূলি ও শরজালে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। জিঘাংসায় উন্মত্ত সৈন্যরা মারণযজ্ঞে মেতে উঠেছে। কে যে কোন্‌পক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। যে যাকে সামনে পাচ্ছে বধ করছে।

একসময় ভীমের সামনে পড়ল দুর্যোধন। একটা তীক্ষ্ণ বাণ এসে বিদ্ধ হল দুর্যোধনের বুকে। সঙ্গে-সঙ্গে সে রথের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। কৌরব সৈন্য হাহাকার করে উঠল, রাজা দুর্যোধন আহত না মৃত ? তারা সংশয়াকুল। বিহ্বল। ভয়ার্ত হয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। দাবাগ্নির মত ভীম তাদের পশ্চাতে ধাবমান। ভীষ্ম দ্রোণ চেষ্টা করেও তাদের ফেরাতে পারলেন না।

কৌরবদের মধ্যে অনিশ্চিত বিশৃঙ্খলা।...

হঠাৎ একি হল ?...

দুর্যোধন কি নিহত ?...

যুদ্ধ কি তাহলে শেষ ?...

সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।...

অকস্মাৎ সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল, না, ওই তো, দুর্যোধনের রথ ফিরে

আসছে। মণিময় নাগধ্বজা উড়ছে। কৌরবরাজ দুর্যোধন জীবিত! জয়, রাজা দুর্যোধনের জয়!

পলায়মান সৈন্যরা আবার দুর্যোধনের ডাকে ফিরে এসে ব্যূহবদ্ধ হল।

অদূরে দ্রোণাচার্য ও ভীষ্ম অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে।

দুর্যোধনের ললাটে কুটিল রেখা ফুটে উঠল। ক্রুদ্ধ সর্পের মত নিঃশ্বাস নিতে-নিতে ভীষ্মের সামনে গিয়ে বলল, "পিতামহ, আপনাকে স্পষ্ট কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপনি দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য অশ্বত্থামা, আপনারা সকলে জীবিত থাকতে আপনাদের চোখের সামনে সৈন্যরা পলায়ন করছে, আর আপনারা তাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছেন? এই কি আপনাদের যোগ্য আচরণ? আমি একথা কিছুতেই মানি না, বীরত্বে পাণ্ডবেরা আপনাদের সমকক্ষ। আসলে আপনি পাণ্ডবদের অনুগ্রহ করেন। তারা আপনার স্নেহের পাত্র। তাই আমার সৈন্যরা বিনষ্ট হচ্ছে তবু আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই দুর্দশা দেখছেন। বেশ তো, যদি পাণ্ডবদের প্রতি আপনার এতই দয়া, তাহলে সেকথা আগে কেন বলেননি? কেন বলেননি আমি পাণ্ডুপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না? আপনার মনোভাব আগে জানলে আমি কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু এখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আপনি সেনাপতি, এ অবস্থায় আপনাদের দুজনকে ত্যাগ করা আমার উচিত হবে না। আমি এখনও আশা করি, আপনারা নিজ নিজ পরাক্রম দেখিয়ে যুদ্ধ করবেন।"

কূটবুদ্ধি দুর্যোধন ভীষ্মকে বিশ্বাস করে না। নিজে সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ক্রোধ লোভ আর বিদ্বেষ নিয়েই সে সকল কাজ করে। ভীষ্মের মত কর্তব্য-পরায়ণ মহাপুরুষকে দুর্যোধন বুঝবে কেমন করে? একথা সত্য, পাণ্ডবেরা তাঁর প্রাণপ্রতিম। শুধু যদি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ হ'ত তাহলে তিনি কখনই অস্ত্রধারণ করতেন না। কিন্তু কুরুবংশের প্রাচীন শত্রু এবং সমকক্ষ সাম্রাজ্যলিপ্সু দুই শক্তি পাঞ্চাল এবং বিরাট, পাণ্ডবদের সামনে রেখে কুরুরাজ্য আক্রমণ করেছে। পাণ্ডবেরা উপলক্ষ্য মাত্র। তাই কুরুবংশের প্রধানপুরুষ ভীষ্ম স্বয়ং বাহুবলে স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষ রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প। ভীষ্মের চরিত্রের এই দ্বন্দ্বের দিকটা শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। ('মূল বাংলা রচনাবলী', ১৯৬৯, পৃ. ৯০) কৌরবদের সকল অন্যায় ও অহিত থেকে নিবৃত্ত করতে ভীষ্ম প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু যা অন্যায় এবং অহিত তাই যখন লোকস্বীকৃত হল, তখন নিজের ব্যক্তিগত মত উপেক্ষা করে, অধর্ম যুদ্ধেও স্বজাতিকে রক্ষা

ও শত্রুদমন কর্তব্য বলে মনে করলেন। ভীষ্মের এই উদার স্বাজাত্যবোধ সংকীর্ণমনা দুর্যোধন বুঝবে কেমন করে? কর্তব্যবুদ্ধিতে প্রাণপ্রতিম পাণ্ডবগণকেও যুদ্ধে সংহার করবার মত মনের বল যে এই কঠিন তপস্বীর প্রাণে আছে, দুর্যোধন সেকথা বিশ্বাস করতে পারে না। নিজে মহৎ না হলে মহত্ত্বকে চেনা যায় না।...

ক্রোধে বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে ভীষ্ম বললেন, "রাজা, তোমাকে আমি বহুবার বলেছি, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও অজেয়। আমি বৃদ্ধ, তবু যথাশক্তি যুদ্ধ করব। আজ একাই আমি পাণ্ডবসেনা প্রতিহত করব।"

দিনের পূর্বাহ্ণ তখন অতীত হয়েছে।

ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণে পাণ্ডবসৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। সৈন্য রথী মহারথী সব পালাতে লাগল। অর্জুন চেষ্টা করেও নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবপক্ষে হাহাকার উঠল। সাত্যকি প্রাণপণে ব্যূহ রক্ষা করছেন। চারিদিকে স্তূপীকৃত মৃতদেহ। রক্তের নদী। রক্ত মাংসের কর্দম। মৃত সৈন্য অশ্ব গজে রথের গতি রুদ্ধ। অগণিত ছিন্ন মুণ্ড, ভ্রষ্ট মুকুট, বিক্ষিপ্ত রত্নহার স্বর্ণকবচ মুক্তামাণিক্য, ভূমিতে আকীর্ণ যেন নক্ষত্রমালা।

সেই ঘোর রণভূমিতে একা দাঁড়িয়ে ভীষ্ম ধনুকে মণ্ডলাকার করে কেবল শর নিক্ষেপ করছেন। সামনে যে আসছে মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ছে।

বিপদ বুঝে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ ভীষ্মের সামনে এনে বললেন, "পার্থ, তোমার আকাঙ্ক্ষিত কাল উপস্থিত। যদি মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীষ্মকে আক্রমণ কর।"

অর্জুন তবু নিরুৎসুক হয়ে মৃদুভাবে যুদ্ধ করছেন। ভীষ্মের বাণবর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আহত। তথাপি অর্জুন আঘাত করছেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, এইভাবে যদি চলে তাহলে অচিরেই পাণ্ডববাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সৈন্যরা সব পালাচ্ছে। প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে পড়েছে। চারিদিকে আগুনের হল্কা। দিক্ সব সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ওই যে দ্রোণ জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা কৃতবর্মা অগণিত কৌরবসেনা নিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ফেলেছে। তবু অর্জুন নিশ্চেষ্ট। অর্জুনের বিপদ দেখে সাত্যকি চিৎকার করে সৈন্যদের ডাক দিয়ে বলছেন, "তোমরা পালিও না। ফিরে এস। যুদ্ধ থেকে পলায়ন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।"

শ্রীকৃষ্ণ আর সহ্য করতে পারলেন না। অর্জুনের রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সাত্যকিকে বললেন, "শিনিবীর সাত্যকি, যারা পালিয়ে যাচ্ছে তারা যাক। যারা আছে তারাও চলে যাক। আজ আমি একা ভীষ্ম দ্রোণকে

নিপাতিত করে সকল ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে নিষ্কণ্টক করব।"

ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিয়ে ভীষ্মের দিকে এগিয়ে চলছেন।

ভীষ্ম ধনুর্বাণ ত্যাগ করে জোড় হাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে বললেন, "হে দেবেশ, জগন্নিবাস, মাধব! সর্বশরণ্য লোকনাথ! তোমাকে প্রণাম। হে কৃষ্ণ, তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করে আমি ধন্য হব।"

এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণি ॥ ৯৬
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথোত্তমাৎ সর্বশরণ্য সংখ্যে ॥ ৯৭
(ভীষ্মপর্ব, ৫৯ অধ্যায়)

অর্জুন রথ থেকে নেমে ছুটে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "পাণ্ডবদের আশ্রয় হে কেশব, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। আমি পুত্র ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করে বলছি, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না। কৌরবদের আমি বধ করব।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রসন্ন হয়ে রথে ফিরে এসে তাঁর সারথির আসনে বসলেন।

অর্জুন গাণ্ডীব তুলে অতি ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্র অস্ত্র ত্যাগ করলেন।

নিমেষের মধ্যে কৌরবের প্রতিরোধবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মৃতদেহের স্তুপ পর্বতপ্রাকারের মত, আর তারই ভিতরে প্রবাহিত ফেনিল রক্তের বৈতরণী।

এমন সময় সূর্যাস্ত হল। মৃত্যুর ছায়ার মত অন্ধকার নেমে এল। আহত ভয়ার্ত কৌরবসেনা সব মশাল জ্বেলে ত্রস্ত পদে শিবিরে ফিরে যেতে লাগল।...

এইভাবে জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন যুদ্ধ এগিয়ে চলেছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত ভীম কৌরবদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ দিনে ভীম দুর্যোধনের ভাই সেনাপতির শিরশ্ছেদ করলেন। তাঁর হাতে নিহত হল দুর্যোধনের আরো সাত ভাই, সুসেন, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ, সেনাপতি ও জলসন্ধ। ষষ্ঠ দিনে নিহত হল বিকর্ণ, দুর্মুখ, জয়ৎসেন ও দুষ্কর্ণ। অষ্টম দিনে আরো চোদ্দ জন। উন্মাদ জিঘাংসায় ভীম অরক্ষিত হয়েও বারবার কৌরবব্যূহে প্রবেশ করে এইভাবে নিধন করতে লাগলেন। একবার দুর্যোধন ভীমকে প্রায় বধ করতে উদ্যত, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন

সেখানে এসে ভীমকে রক্ষা করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহন অস্ত্রে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন, সারথি আহত, রথের অশ্ব নিহত, সে নিজেও শরবিদ্ধ হয়ে রথের মধ্যে মূর্ছিত। তখন কৃপাচার্য দুর্যোধনকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান।

রাত্রিকালে ভীষ্মের শিবিরে এসে দুর্যোধন প্রশ্ন করল, "পাণ্ডবেরা জয়ী হচ্ছে কেন? আপনারা কি করছেন?"

—"দুর্যোধন, মনে হয় তুমি কোন মোহগ্রস্ত রাক্ষস। আমি তোমাকে পূর্বে বারবার সাবধান করেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবেরা অজেয়। গান্ধারী বিদুর দ্রোণ এবং আমি তোমাকে কত বলেছি, কিন্তু তুমি তা গ্রাহ্য করনি। দ্রোণ কিংবা আমি পাণ্ডবদের হাত থেকে কাউকেই রক্ষা করতে পারব না।"

দুর্যোধন তখন গেল দ্রোণের কাছে।

—"আচার্য, আমি আপনার ও ভীষ্মের মুখ চেয়ে বসে আছি। আপনারা সঙ্গে থাকলে আমি দেবগণকেও জয় করতে পারি, পাণ্ডবেরা তো তুচ্ছ।"

—"তুমি মূর্খ। তাই পাণ্ডবদের পরাক্রম বুঝতে পারছ না। যুদ্ধে তারা অজেয়। তবু আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

নিরাশ দুর্যোধন তখন ছুটে গেল কর্ণ আর শকুনির কাছে।

—"কর্ণ, আমি বুঝতে পারছি না এর কারণ কি? ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ভূরিশ্রবা এঁরা কেউই পাণ্ডবদের বাধা দিচ্ছেন না। যুদ্ধে তাঁরা যেন কাঠের পুতুল। দ্রোণাচার্যের চোখের সামনে ভীম এসে আমার ভাইদের একে-একে বধ করে গেল। দ্রোণ নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখলেন। এদিকে তুমিও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে আছ। আমার সৈন্যরা দিনের পর দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এই বিপদে এখন আমি কি করি?"

—"রাজা দুর্যোধন, আপনি দুঃখ করবেন না। ভীষ্মকে গিয়ে বলুন, তিনি যেন অস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধ থেকে সরে যান। তিনি পাণ্ডবদের অনুরক্ত। পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। তাই তিনি যুদ্ধজয়ে অসমর্থ। ভীষ্ম অপসৃত হলে আমি একাই পাণ্ডবদের জয় করব।"

—"উত্তম। আমি এখনই ভীষ্মকে সেনাপতি পদ থেকে অপসারিত করে তোমার কাছে ফিরে আসছি। কর্ণ, তোমারই উপরে আমার একমাত্র আশা ভরসা।"

দুর্যোধন তখন এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল ভীষ্মের শিবিরে। কিছু বিশ্বস্ত দেহরক্ষী দুর্যোধনকে ঘিরে রয়েছে। আশ্চর্য,

দুর্যোধন তার আপন সেনাপতির শিবিরে প্রবেশ করছে দেহরক্ষী নিয়ে ? এতখানি অবিশ্বাস করে সে ভীষ্মকে ?

—"পিতামহ আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পাঞ্চাল কেকয় সোমক বাহিনীকে ধ্বংস করবেন। আপনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আর যদি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে আপনি পাণ্ডবদেরই রক্ষা করতে চান, তাহলে আপনি সেনাপতিত্ব ত্যাগ করুন। কর্ণকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। কর্ণই পাণ্ডবদের জয় করবে।"

দুর্যোধনের এই নির্মম বাক্যবাণে ভীষ্ম মর্মে-মর্মে আহত হলেন। নিজেকে তিরস্কৃত মনে করে আত্মগ্লানিতে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। দুঃখিত অন্তরে নীরবে দুর্যোধনের দিকে অনেকক্ষণ করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ক্রুদ্ধ ও কাতর কণ্ঠে বললেন, "সুযোধন, আমাকে এমন করে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন? আমি তো প্রাণপণে যুদ্ধ করছি। তুমি কি জান না অর্জুনের পরাক্রম? খাণ্ডববনদাহ কালে অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিল। ঘোষযাত্রায় গন্ধর্বের হাত থেকে অর্জুনই তোমাকে উদ্ধার করেছিল। তখন কর্ণ কোথায় ছিল? বিরাট নগরের যুদ্ধে অর্জুন আমাদের সকলকে জয় করে। তখন কর্ণ কোথায় ছিল? শঙ্খচক্রগদাধর স্বয়ং বাসুদেব অর্জুনের রক্ষক। সেই অর্জুনকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? হ্যাঁ, আমার প্রতিজ্ঞা সোমক পাঞ্চাল কেকয়গণকে ধ্বংস করব। কিন্তু প্রাণ গেলেও আমি নপুংসক শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যাও, রাত হয়েছে। এখন নিশ্চিন্তে গিয়ে নিদ্রা দাও। কাল প্রভাতে এমন যুদ্ধ করব যা লোকে চিরকাল মনে রাখবে।"...

এদিকে সেই রাত্রে পাণ্ডবশিবিরে মন্ত্রণায় বসেছেন যুধিষ্ঠির। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "আজ যুদ্ধের নবম দিন। হস্তী যেমন নলবন মর্দন করে তেমনি ভীষ্ম আমাদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে চলেছেন। আমাদের সমস্ত সৈন্য হতবল নিরুদ্যম। এইভাবে বৃথা লোকক্ষয় করে যুদ্ধ না করাই শ্রেয়। আমার আর যুদ্ধে রুচি নেই। আমি বনে চলে যাব। ন যুদ্ধং রোচতে কৃষ্ণ। বনং যাস্যামি।"

—"মহারাজ, বিষণ্ণ হবেন না। পঞ্চপাণ্ডব শত্রুহন্তা বীর। অর্জুন ভীষ্মবধে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু অর্জুন যদি অনিচ্ছুক হয় ("যদি নেচ্ছতি ফাল্গুনঃ") তাহলে আমাকে আদেশ করুন, আমিই ভীষ্মকে বধ করব।"

—"না, বাসুদেব। তা হয় না। আপনি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না

বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। আপনাকে আমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে চাই না। পিতামহ আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও আমাদের হিতের জন্য মন্ত্রণা দেবেন। অতএব আমার মনে হয়, আমরা তাঁকেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর বধের উপায় কি? কৃষ্ণ, ভাবলে দুঃখ হয়, আমরা যখন পিতৃহীন নিরাশ্রয় বালক মাত্র, তখন এই পিতামহ আমাদের সস্নেহে প্রতিপালন করেছেন। সেই স্নেহাতুর বৃদ্ধ পিতামহকে আজ আমি নিজেই হত্যা করতে চাইছি। জীবনে ধিক্! ক্ষত্রিয়ধর্মে ধিক্!"

গভীর রাত্রে তাঁরা সকলে গেলেন ভীষ্মের শিবিরে। বিষণ্ণ অর্জুন নীরবে নতমস্তকে তাঁদের অনুসরণ করলেন।

ভীষ্ম বিনিদ্র হয়ে যেন তাঁদেরই অপেক্ষায় ছিলেন। ধিক্কারে খেদে আত্মগ্লানিতে তাঁর অন্তর দগ্ধ হচ্ছিল। পাণ্ডবদের দেখে তিনি উৎসাহে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "এস, এস যুধিষ্ঠির। এস ভীম। এস অর্জুন, নকুল, সহদেব। স্বাগত বাসুদেব। তোমাদের কুশল তো? তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করা ব্যতীত আর কি চাও বল? যা চাইবার আজ চেয়ে নাও। অত্যন্ত দুষ্কর হলেও আমি তা করব।"

অধীর আগ্রহে ভীষ্ম বারবার সেই কথা বলতে লাগলেন—"তথা ব্রুবানাং গাঙ্গেয়ং প্রীতিযুক্তং পুনঃপুনঃ" (ভীষ্মপর্ব, ১০৭/৬১)। যেন তাঁর হাতে আর সময় নেই।

দীন হৃদয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, "পিতামহ, যুদ্ধে আমাদের কেমন করে জয় হবে? আপনি স্বয়ং আপনার বধের উপায় বলুন—"বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ।"

ভীষ্ম বললেন, "আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয়ের কোন আশা নেই। তবে আমি অস্ত্র ত্যাগ করলে আমাকে বধ করতে পারবে। যে নিরস্ত্র, ভূপাতিত, বর্মবিহীন, পলায়মান, ভীত, শরণাপন্ন, স্ত্রী কিংবা স্ত্রীনামধারী, বিকলেন্দ্রিয়, এক পুত্রের পিতা কিংবা নীচ জাতির সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না। তোমাদের সেনাদলে শিখণ্ডী আছেন। তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন তোমরা জান। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন আমাকে বধ করতে পারে। শীঘ্র তোমরা আমার বধের চেষ্টা কর। আমি অনুমতি দিচ্ছি, নিশ্চিন্তে আমাকে অস্ত্র হেনে বধ কর।"

ক্ষিপ্রং ময়ি প্রহরধ্বং যদীচ্ছথ রণে জয়ম্।
অনুজানামি বঃ পার্থাঃ প্রহরধ্বং যথা সুখম্॥
(ভীষ্মপর্ব, ১০৭/৭১-৭২)

তাঁরা প্রণাম করে নিঃশব্দে ফিরে এলেন।

পথে অর্জুন দুঃখসন্তপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "পিতামহ ভীষ্ম আজ আত্মহত্যার ব্রত নিলেন। এই ধীমান শুদ্ধবুদ্ধি কুরুকুলবৃদ্ধ পিতামহকে আমি কেমন করে বধ করব? তুমি তো জান, কৃষ্ণ, ছেলেবেলায় কতদিন খেলা করতে-করতে ধুলোকাদা মেখে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে উঠেছি, আদরে আবদারে কতবার বাবা বলে ডেকেছি. তখন তিনি হেসে বলতেন, আমি তোমার পিতা নই, আমি তোমার পিতার পিতা। সেই স্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহকে আমি কেমন করে বধ করব? তিনি আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন করুন, যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যুও হয় হোক, তবু আমি ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। নিরস্ত্র ভীষ্মের বুকে আমি অস্ত্র হানতে পারব না।" (ভীষ্মপর্ব, ১০৭/৯০-৯৫)

—"পার্থ, তুমি ক্ষত্রিয়। তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি ছাড়া কেউ সক্ষম নয়। ভীষ্ম বধ না হলে পাণ্ডবদের পরাজয় সুনিশ্চিত। দেবগুরু বৃহস্পতি এমন সঙ্কটে ইন্দ্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন শোন, পূজ্যতম গুরুজন, বৃদ্ধ ও সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অস্ত্র তুলে বধ করতে আসেন তাহলে জানবে তিনি আততায়ী। আততায়ীকে বধ করাই ধর্ম।"

জ্যায়াংসমপি চেদ্ বৃদ্ধং গুণৈরপি সমন্বিতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদ্ ঘাতকমাত্মনঃ॥
(ভীষ্মপর্ব, ১০৭/১০১)

অর্জুন তখন বললেন, "ঠিক আছে. শিখণ্ডী সামনে থেকে অস্ত্র হেনে ভীষ্মকে বধ করবে। আমি কেবল শিখণ্ডীকে রক্ষা করব।"

অর্থাৎ সরাসরি তিনি ভীষ্মকে বধ করতে চান না। কিন্তু অর্জুন এখনো জানেন না, যা অনিবার্য যা ভবিতব্য, হৃদয়ের আড়াল দিয়ে তা রোধ করা যায় না।...

পরদিন সূর্যোদয়ে রণভেরী বেজে উঠল।

পাণ্ডবব্যূহের সম্মুখে আজ শিখণ্ডী।

সমস্ত শক্তি দিয়ে পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে রক্ষা করে চলেছে।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে আক্রমণ করেছে।

ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করে বললেন, "না, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।"

—"যুদ্ধ করুন আর নাই করুন, আপনাকে আমি বধ করব।"

দুর্যোধন চিৎকার করে বলল, "পিতামহ, এ কি করছেন? শত্রু আমাদের নিপীড়ন করছে, আপনি রক্ষা করুন।"

উদাসীন কণ্ঠে ভীষ্ম বললেন, "দুর্যোধন, আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি। আজ আমি রণক্ষেত্রে শয়ন করব—অহং বা অদ্য হতঃ।"

পাণ্ডবসেনা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীষ্মের উপরে। নিরস্ত্র নিশ্চেষ্ট ভীষ্মকে বাঁচাবার জন্য দুঃশাসন প্রাণপণ যুদ্ধ করে এগিয়ে আসছে। অর্জুন তাকে প্রতিহত করল।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি নিজের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়েছি। আমি আদেশ করছি, আমাকে বধ কর। শীঘ্র আমাকে বধ করতে চেষ্টা কর।"

"নির্বিণ্ণোঽস্মি ভৃশং তাত দেহেনানেন ভারত।
ঘ্নতশ্চ মে"...
"মদ্বধে ক্রিয়তাং যত্ন"...

(ভীষ্মপর্ব, ১১৫/১৪-১৫)

যুধিষ্ঠির তখন আদেশ দিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপল না, "যুধ্যধ্বং ভীষ্মং জয়ত সংযুগে। আজ আর তোমরা ভীষ্মকে ভয় ক'রো না। আঘাত কর।"

ভীষ্মের স্তুতি করে আকাশে দৈববাণী হল।

দেবদুন্দুভি বেজে উঠল।

দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

সুগন্ধ সুখস্পর্শ মন্দার বায়ু প্রবাহিত হল।

ভীষ্ম সর্বাঙ্গে শরাহত। তিনি দুঃশাসনকে হেসে বললেন, "এই যে বাণগুলি আমাকে বিদ্ধ করছে তা শিখণ্ডীর নয়। এ-বাণ অর্জুনের।"

শরৎকালের রক্তবর্ণ মেঘের মত রণভূমিতে ভগ্ন ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভীষ্ম নিপাতিত হলেন। কিন্তু শরে আবৃত থাকায় ভূমি স্পর্শ করলেন না। ভীষ্মের প তনে পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল, স্বর্গের দেবতারা হাহাকার করে উঠলেন—প্রাকম্পত চ মেদিনী। হা হেতি দিবি দেবানাং...

দুঃসংবাদ শুনে দ্রোণ মূর্ছিত হলেন।

উভয়পক্ষ তখন যুদ্ধ থামিয়ে অস্ত্র আনত করে (সংন্যস্ত বীরা শস্ত্রাণি) শোকাহত হৃদয়ে নতশিরে ভীষ্মের চারিদিকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

তৃষ্ণার্ত ভীষ্ম বললেন, "জল।"

সুবর্ণ ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল আনা হল।

তিনি তা গ্রহণ না করে অর্জুনের দিকে তাকালেন।

সাশ্রুনয়নে অর্জুন গাণ্ডীবে শর যোজনা করে ভূতল ভেদ করে ভোগবতী গঙ্গার পুণ্য শীতল জলধারা এনে ভীষ্মকে দিলেন। ভীষ্ম সেই জল পান করে তৃপ্ত হলেন।

দুর্যোধনকে বললেন, "তুমি অর্জুনকে জয় করতে পারবে না। এখনও বলি, সন্ধি কর। অর্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দিয়ে দাও। আমার মৃত্যুতেই তোমাদের শত্রুতা শেষ হোক। রাজ্যে শান্তি আসুক।"

কিন্তু মুমূর্ষু লোকের যেমন ঔষধে রুচি হয় না, তেমনি ভীষ্মের বাক্যে দুর্যোধনের রুচি হল না।

একে-একে সকলে ভীষ্মকে প্রণাম করে শিবিরে ফিরে গেল।

নির্জন সন্ধ্যায় রণক্ষেত্রে একাকী শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম। হিরণ্বতী নদীর অন্ধকার কূল থেকে মাঝে-মাঝে শৃগালের ডাক ভেসে আসছে। হু-হু করে দিক্‌-শূন্য-করা হাওয়া বইছে। আকাশে গুমরে-গুমরে উঠছে সন্ধ্যার মেঘ।

ভীষ্ম ধ্যানমুদিত চক্ষু মেলে তাকালেন, "কে?"

—"কুরুশ্রেষ্ঠ, যাকে আপনি কোন দিন দেখতে পারতেন না, আমি সেই রাধার নন্দন কর্ণ।"

ভীষ্ম দেখেন, বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে কর্ণ। তার চোখে জল।

ইঙ্গিতে প্রহরীদের দূরে সরিয়ে দিয়ে কর্ণকে কাছে ডেকে পুত্রস্নেহে জড়িয়ে ধরে ভীষ্ম বললেন, "মহাবাহো! তুমি কুন্তীপুত্র। পাণ্ডবদের ভ্রাতা। নারদের মুখে শুনেছি তোমার জন্মকথা। তোমার উপর আমার কোন রাগ নেই। তুমি দুর্যোধনের নীচ সংসর্গে পরশ্রীকাতর হয়ে উঠেছিলে তাই তোমাকে কটুবাক্য বলতাম। আমার অনুরোধ, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হও। সকল শত্রুতার অবসান হোক।"

—"তা আর হয় না, পিতামহ। আমি দুর্যোধনের পক্ষে থেকেই প্রাণ দিতে চাই। এতদিন ক্রোধে উত্তেজনায় কিংবা চপলতাবশত আপনাকে যা বলেছি যা করেছি, আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।"

[সাতাশ]

ব্রাহ্মণবীর

কর্ণের পরামর্শে ও সকলের সম্মতিতে এবার দ্রোণ হলেন সেনাপতি। তবে এর মধ্যে নেপথ্য রাজনীতির কিছু কূটচাল খেলে গেল। দ্রোণ যে ভীষ্মের মতই পাণ্ডবহিতৈষী এবং অর্জুনকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন একথা সবাই জানে। দুর্যোধন তাই দ্রোণাচার্যকে বিশ্বাস করে না। বরং সে চেয়েছিল কর্ণকে সেনাপতি করতে। সেই প্রস্তাব নিয়েই নবম দিনের যুদ্ধে দুর্যোধন অশ্বারোহণে ছুটে গিয়েছিল ভীষ্মের শিবিরে। ভীষ্মের পতনের পর রণাঙ্গনে কর্ণকে রথে আগমন করতে দেখে, উল্লসিত কৌরবসেনা তার জয়ধ্বনি করে স্বাগত জানিয়েছিল। তারাও ধরে নিয়েছিল কর্ণই হবে সেনাপতি। কিন্তু রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে দুর্যোধন ধুরন্ধর। সে জানে, কৃপাচার্য অশ্বত্থামা শল্য ভূরিশ্রবা প্রমুখ কৌরব বীরগণ কর্ণের প্রতি প্রসন্ন নন। কটুভাষী কর্ণকে তাঁরা কথায়-কথায় তাচ্ছিল্য ও অপমান করেন। অতএব দ্রোণাচার্যকে উপেক্ষা করে কর্ণকে সেনাপতি করা হলে তাঁদের সবাইকেই ঈর্ষান্বিত ও বিরূপ করে তোলা হবে। অশ্বত্থামা ও কৃপ শত্রু হয়ে উঠবেন। আবার কর্ণকেও সরাসরি না করা যায় না। তাই চতুর দুর্যোধন সুকৌশলে কর্ণকেই প্রশ্ন করল, "কর্ণ, তুমিই বল, ভীষ্মের স্থলে কে সেনাপতি হবেন? তুমি যাঁকে বলবে তাঁকেই সেনাপতি করব।"

কর্ণ বলল, "এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, বীরত্বে সবাই সেনাপতি হবার যোগ্য। কিন্তু এঁরা পরস্পরকে স্পর্ধা করে থাকেন। কোন একজনকে সেনাপতি করলে অন্য সকলেই অপ্রসন্ন হবেন। অতএব বয়োবৃদ্ধ আচার্য এবং গুরু দ্রোণাচার্যকেই আপনি সেনাপতি করুন।"

দুর্যোধন স্বস্তি পেল। মনে-মনে ভাবল, পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও দ্রোণ তো এতদিন কৌরবদেরই সমর্থন করে আসছেন। তাছাড়া গুরু দ্রোণ সামনে দাঁড়ালে উগ্রধন্বা অর্জুন কিছুতেই তাঁকে আঘাত করবে না—

"ত্বাং তু দৃষ্ট্বা নার্জুনঃ প্রহরিষ্যতি" (দ্রোণপর্ব, ৬/১০)।

অতএব পক্ককেশ শ্মশ্রুমণ্ডিত শ্যামবর্ণ পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য হলেন সেনাপতি। অঙ্গে শ্বেত উত্তরীয়। মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ। ব্যাঘ্রচর্ম আচ্ছাদিত সোনার রথ। রক্তবর্ণ অশ্ব। কমণ্ডলুশোভিত সোনার কেতন।

চতুর্বেদ ও ধনুর্বেদ বিশারদ, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মাস্ত্রধারী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়, সিংহ ও হস্তীতুল্য পরাক্রমী দ্রোণাচার্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হলেন। সূত মাগধ ও বন্দীগণ স্তুতিগান করলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করলেন।

এদিকে এই ঘোর রণভূমির একপাশে পরিখাবেষ্টিত শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম। যুদ্ধের সব কোলাহল দূরে অপসৃত। সকল হিংসা সকল দ্বন্দ্বের অতীত ধ্যানস্থির এক ভূমি। কুরুক্ষেত্রের মৌন পরিণামের কালাতীত নিস্তব্ধ প্রতীক। যেখানে আজও নেই, কালও নেই—"ন নূনমস্তি নো শ্বঃ" (ঋগ্বেদ, ১-১৭০-১) অথবা সেখানে আজও যা কালও তাই—"স এবাদ্য স উ শ্বঃ" (কঠোপনিষদ, ২-১-১৩)। যুদ্ধের বুকের মধ্যে এমনি এক মৌন অটল ভূমি রচনা করে মহাকবি মহাভারতে এক নতুন মাত্রা—নতুন dimension সৃষ্টি করলেন। সকল উন্মত্ত হিংসা হত্যা ধ্বংস অনন্তের তুরীয় শান্তির বৈরাগ্যের উপরে মিথ্যা ছায়ার মত ভাসতে লাগল।…

অদূরে পাণ্ডবসেনা ব্যূহবদ্ধ।

চন্দ্রতারামণ্ডিত যুধিষ্ঠিরের রথ। দুগ্ধধবল অশ্বগুলি কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ নিয়ে হ্রেষাধ্বনি করছে। পাশে লাল ঘোড়ায় সজ্জিত দ্রুপদ। বন্য ভল্লুকের মত ধূসরবর্ণ অশ্ব ভীমের। সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্ব শ্বেতবর্ণ। লাল নীল শাদা রঙের ঘোড়ায় যুধামন্যু। পদ্মপাতার মত সবুজ ওই শিখণ্ডীর অশ্ব। নকুলের অশ্ব শুকপাখির গায়ের রঙের মত। কেকয় রাজপুত্রের ঘোড়া পলাশ-রাঙা। শাদা কালো লাল নীল সবুজে পলাশে রণভূমি বিচিত্রবর্ণ মেঘের মত। (দ্রোণপর্ব, ২৩ অধ্যায়)

যোদ্ধাদের মুকুট হার অলংকার কবচ ও শাণিত অস্ত্রে সূর্যের আলো পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। উড্ডীন পতাকা শ্রেণী যেন মেঘের বুকে বলাকা। রণহস্তী সব ছিন্নাভ্রের মত ভাসছে।

> চূড়ামণিষু নিষ্কেষু ভূষণেষ্বপি বর্মসু।
> তেসামাদিত্যবর্ণাভা রশ্ময়ঃ প্রচকাশিরে ॥৩৪
> তৎপ্রকীর্ণপতাকানাং রথবারণবাজিনাম্।
> বলাকাশবলাভ্রাভং দদৃশে রূপমাহবে ॥৩৫
>
> *
>
> ছিন্নাভ্রাণীব সম্পেতুঃ ॥৪৬
>
> (দ্রোণপর্ব, ২০ অধ্যায়)

যুদ্ধের এমন বিচিত্র বর্ণাঢ্য বাক্‌প্রতিমা কবিত্বের পরাকাষ্ঠা রামায়ণেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেদব্যাস এখানে বাল্মীকির প্রতিভার আলোকে হরণ করে নিয়েছেন।

দ্রোণ কৌরববীর পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর বামপার্শ্বে কৃপ কৃত-বর্মা চিত্রসেন দুঃশাসন। দক্ষিণে জয়দ্রথ বিকর্ণ শকুনি। অগ্রে কর্ণ ও দুর্যোধন।

দ্রোণ দুর্যোধনকে বললেন, "রাজা, গাঙ্গেয় ভীষ্মের পরে তুমি আমাকে সেনাপতি করে সম্মানিত করেছ। আমার কাছে অভীষ্ট বর চাও। তোমার কোন্ ইচ্ছা আজ আমি পূর্ণ করব?"

—"আপনি যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করুন।"

—"শুধু জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে চাও? বধ করতে চাও না? যুধিষ্ঠির ধন্য। সত্যই সে অজাতশত্রু। নইলে, দুর্যোধন, তুমিও তাকে বধ করতে চাও না? তবে কি যুদ্ধে জয়ী হয়ে তুমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবে? ভ্রাতৃভাবের আদর্শ স্থাপন করবে? দুর্যোধন, তুমি পাণ্ডবদের এত স্নেহ কর?" উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশ্ন করেন দ্রোণ।

কিন্তু মানুষের মনের ভাব তো গোপন থাকে না। দুর্যোধন বলল, "না, আচার্য, যুধিষ্ঠিরকে বধ করলে আমাদের জয়ের কোন আশা নেই। যদি পাণ্ডবদের একজনও জীবিত থাকে তাহলে সে আমাদের নিঃশেষ করবে। তার চেয়ে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আবার পাশাখেলায় হারিয়ে তাদের বনবাসে পাঠাব। সেই হবে আমাদের নিরাপদ জয়। তাই যুধিষ্ঠির নিহত হোক তা চাই না।"

দ্রোণ বুদ্ধিমান। তিনি দুর্যোধনের কুটিল অভিসন্ধি বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিজের অভিপ্রায় অন্তরে রেখে ("সান্তরং তস্মৈ দদৌ সঞ্চিন্ত্য") দুর্যোধনের কাছে বরদানে প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যে ফাঁক ছিল—"সান্তরং তু প্রতিজ্ঞাতে" (দ্রোণপর্ব, ১২/১৯, ১৩/১, ১৩/৫)—বললেন, "অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে তাহলে আমি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করব।"

গুপ্তচর মারফত এই খবর পৌঁছে গেল পাণ্ডব-শিবিরে। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, "শুনেছ তো দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা? তাঁর প্রতিজ্ঞায় ছিদ্র আছে। আর সেই ছিদ্র তিনি তোমাকে দিয়েই রেখেছেন।"

—"মহারাজ, যদি আকাশ নক্ষত্রমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ডখণ্ড হয়, যদি বজ্রধারী ইন্দ্র ও ভগবান বিষ্ণু দুর্যোধনের সহায়তা করেন, তাহলেও অর্জুন বেঁচে থাকতে দ্রোণাচার্য আপনাকে বন্দী করতে পারবেন না।"

শিবিরে-শিবিরে যুদ্ধভেরী বেজে উঠল।…

শঙ্খে মৃদঙ্গে আকাশ কাঁপতে লাগল।…

তুমুল যুদ্ধ শুরু হল।…

দ্রোণের রক্তবর্ণ অশ্ব শত্রুর রক্তে স্নান করে ঝড়ের বেগে ছুটছে। প্রবল-বাহিনী গঙ্গা সাগরসঙ্গমে এসে যেমন লোহিত আবর্তে সংক্ষুব্ধ হয় তেমনি উভয়পক্ষের সেনা সংঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠল। যোদ্ধাদের বসন সব রক্তসিক্ত। তাদের পতাকা কবচ বর্ম পর্যন্ত রক্তস্নাত। সব লালে লাল। রক্তাক্ত যোদ্ধারা যেন পুষ্পিত পলাশবৃক্ষ।

আসীদ্ গাঙ্গ ইবাবর্তো মুহূর্তমুদধাবিব। (দ্রোণপর্ব, ৩৬/১৩)
শোণিতৈঃ সিচ্যমানানি বস্ত্রাণি কবচানি চ।
ছত্রাণি চ পতাকাশ্চ সর্বং রক্তমদৃশ্যত॥
(দ্রোণপর্ব, ২০/৫৮)
অশোভন্ত রণে যোধাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ॥
(দ্রোণপর্ব, ১৯/১৪)

মরণ নদী তরঙ্গ উথল। পদ্মের মত ভাসছে যত ছিন্ন মস্তক। তাদের কেশকলাপ সব শেওলার মত। মেদ মজ্জা অস্থি উষ্ণীষ তার ফেনা। কবন্ধ দেহগুলি যেন সেই নদীর সোপানশিলা।

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণ যেন দাবাগ্নির মত জ্বলছেন। তাঁর সম্মুখে বাল্যবন্ধু চিরশত্রু দ্রুপদ। ওদিকে শকুনির সঙ্গে সহদেব, বিবিংশতির সঙ্গে ভীম, শল্যের সঙ্গে নকুল, বৃহদ্বলের সঙ্গে অভিমন্যু, কৃপের সঙ্গে সাত্যকি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছে। অভিমন্যুর খড়্গাঘাতে বৃহদ্বল নিহত। জয়দ্রথ পরাস্ত। শল্য গদাহস্তে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। ভীম ছুটে এলেন। ভীমের আক্রমণে শল্য অচৈতন্য। মুমূর্ষু শল্যকে নিয়ে কৃতবর্মা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। কৌরবসেনা পাণ্ডবদের হাতে মর্দিত হচ্ছে। দ্রোণ তখন সারথিকে আদেশ দিলেন, "রথ ধাবিত কর, যেখানে রয়েছেন রাজা যুধিষ্ঠির—যাহি যত্রৈব রাজা তিষ্ঠতি ধর্মরাট্।"

যুধিষ্ঠিরের দিকে দ্রোণের রথ ছুটে আসছে জ্বলন্ত উল্কার মত। দ্রোণকে প্রতিহত করতে এগিয়ে গেলেন ব্যাঘ্রদত্ত। শরাঘাতে মুহূর্তে লুটিয়ে পড়লেন পাঞ্চালবীর। ছুটে এলেন সিংহসেন। তিনিও দ্রোণের হস্তে নিহত হলেন।

দ্রোণের রথ বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে।…

একেবারে যুধিষ্ঠিরের সামনে।

বাধা দেওয়ার কেউ নেই। যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ অরক্ষিত।
তিনি বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু দ্রোণ অপ্রতিরোধ্য। যুধিষ্ঠিরের ধনু ছিন্ন স্খলিত হয়ে পড়ল। পাণ্ডবসেনা হাহাকার করে উঠল, "হায়, রাজা বুঝি নিহত হলেন! হতো রাজেতি।"

কৌরবসৈন্যরা উল্লাসে চিৎকার করছে, "যুধিষ্ঠির বন্দী হয়েছেন। বন্দী যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের কাছে নিয়ে আসছেন দ্রোণ।"

সহসা সকল ভয় ও কোলাহলকে স্তব্ধ করে বজ্রের মত ছুটে এলেন অর্জুন। উগ্রধন্বা অর্জুনের শরাঘাতে দ্রোণ পীড়িত হয়ে পশ্চাদ অপসরণ করলেন।

সূর্যাস্ত হতে রণভূমি অন্ধকার হয়ে এল। যুদ্ধ স্থগিত হলে অর্জুনের বিজয় রথ বেষ্টন করে পাণ্ডবেরা আনন্দ করতে লাগল। ইন্দ্রনীল বজ্রপ্রবাল স্ফটিক রত্নে ভূষিত অর্জুনের রথ সেই অন্ধকার রণক্ষেত্রে ঝল্‌মল্‌ করতে লাগল।...

শিবিরে ফিরে এসে দ্রোণ দুর্যোধনের প্রতি লজ্জিত দৃষ্টি নিয়ে বললেন, "আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, অর্জুন থাকতে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা দেবতাদেরও অসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আমার পক্ষে অজেয়।"

দ্রোণ আবার প্রতিজ্ঞা করলেন। এবারেও তাঁর প্রতিজ্ঞাতে একটু ফাঁক—একটা "যদি" যোগ করে দিলেন। বললেন, "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদি অর্জুনকে দূরে রাখতে পার এবং যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করেন ("যদি নোৎসৃজতে রণম্‌"), তাহলে ধরে নাও, যুধিষ্ঠির আমার হাতে বন্দী হয়েছেন।"

দ্রোণের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা দুর্যোধনের সঙ্গে পরামর্শ করল। স্থির হল তারা অর্জুনকে যুদ্ধে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ করবে। সুশর্মা তার পাঁচ ভাই ও অযুত সৈন্য মরণপণ সংশপ্তক ব্রত করে প্রতিজ্ঞা করল, অর্জুনকে বধ না করে তারা প্রাণ নিয়ে ফিরবে না। সকলে পৃথক-পৃথক ভাবে অগ্নিতে হোম করে নিজেদের শ্রাদ্ধ ও দানক্রিয়া সম্পন্ন করল। কুশনির্মিত কৌপীন, কবচ ও মৌর্বী মেখলা ধারণ করে, অগ্নিস্পর্শ করে উচ্চস্বরে প্রতিজ্ঞা করল, "ধনঞ্জয়কে বধ না করে যদি জীবিত থাকি তাহলে আমরা যেন গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা গুরুদারগামী ইত্যাদি যাবতীয় ঘোরতম পাপে নরকগামী হই।"

যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে দূরে কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে সুশর্মার সংশপ্তক বাহিনী অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করল। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, কেউ যুদ্ধে আহ্বান করলে তিনি বিরত হন না। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার দায়িত্ব সত্যজিৎকে দিয়ে অর্জুন সংশপ্তকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন।

দ্রোণ এক ভয়ঙ্কর গরুড় ব্যূহ রচনা করে সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। পাঞ্চাল কেকয় মৎস্য যোদ্ধারা দ্রোণকে বাধা দিতে লাগল। প্রচণ্ড যুদ্ধে সাত্যকি চেকিতান ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রোণের হাতে পরাস্ত।

দুর্জয় বিক্রমে আবার দ্রোণ এগিয়ে আসছেন যুধিষ্ঠিরের দিকে।...

দুর্যোধন হৃষ্টচিত্তে সহাস্যে কর্ণকে বলছে, "কর্ণ, ওই দেখ, পরাজিত পাণ্ডবসৈন্য ভয়ে পালাচ্ছে। যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও ভীত হরিণের মত কাঁপছে। দ্রোণাচার্য ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। চতুর্দিকে আক্রান্ত হয়ে ভীম দিশাহারা। তার বাঁচার কোন আশা নেই। যুদ্ধের সাধ এবার তার ঘুচে যাবে। আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে!"

কর্ণ বলল, "রাজন্, ভীম জীবিত থাকতে রণস্থল ত্যাগ করবে না। পাণ্ডবেরা প্রতিহিংসায় জ্বলছে। আপনার প্রদত্ত বিষ, অগ্নিদাহ, পাশাখেলার লাঞ্ছনা, বনবাসের দুঃখ তারা কখনো ভুলতে পারে না। ওই দেখুন, উন্মত্ত বিক্রমে ভীম দ্রোণের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পিছনে সাত্যকি আর অগণিত পাঞ্চাল সেনা। ওরা দ্রোণকে ঘিরে ফেলেছে। ক্রুদ্ধ নেকড়ের দল যেমন হস্তীকে সংহার করে ওরাও তেমনি দ্রোণকে নিহত করবে। পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নিপুণ, তাদের সহায় স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, আপনি তাদের বীরত্বকে অবহেলা করবেন না। এখন আমাদের উচিত দ্রোণকে রক্ষা করা।"

দ্রোণকে ঘিরে পাণ্ডবসৈন্যের উন্মত্ত কোলাহল শোনা যাচ্ছে। দুর্যোধন তখন সসৈন্যে ছুটল দ্রোণকে রক্ষা করতে।···

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের সখা বৃদ্ধ ভগদত্ত বিশাল হস্তীসেনা নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন। পাঞ্চাল সেনা নিয়ে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভগদত্তের হাতে পাঞ্চাল বাহিনী মর্দিত হতে লাগল। ভগদত্তের বাহন ইন্দ্রের ঐরাবত অতি দুর্ধর্ষ। অস্ত্র তাকে আঘাত করে না, অগ্নি তাকে স্পর্শ করে না। এই দুর্জয় হস্তীতে আরোহণ করেই ইন্দ্র অসুর ও দানবদের ধ্বংস করেছিলেন. সেই ভয়ঙ্কর সুশিক্ষিত হস্তী এসে এবার ভীমকে আক্রমণ করল। ভীমকে আর দেখা যাচ্ছে না। সকলে মনে করল ভগদত্তের হস্তী ভীমকে নিহত করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে রব উঠল, ভীম নিহত, ভীম নিহত।···

যুধিষ্ঠির দিশাহারা।

সকল পাণ্ডববীরদের পাঠালেন ভগদত্তের বিরুদ্ধে।

দূরে সংশপ্তক বাহিনীর সঙ্গে অর্জুনের ঘোর যুদ্ধ। গাণ্ডীবে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করে মৃত্যুবর্ষণ করে চলেছেন অর্জুন। এবার নিক্ষেপ করলেন ত্বাষ্ট্র অস্ত্র। সঙ্গে-সঙ্গে চতুর্দিক অন্ধকার। অর্জুনের রথ ও ধ্বজা অন্ধকারে ঢেকে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখতে পাচ্ছেন না। সংশয়ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধনঞ্জয়, তুমি কি জীবিত আছ?"···

ভগদত্তের হস্তী গর্জন করছে। চারিদিকে রব উঠেছে, ভীম নিহত, ভীম নিহত।

অর্জুন বললেন, "হে কৃষ্ণ, আমি জীবিত আছি। কিন্তু ওই শোন ভগদত্তের হস্তীর গর্জন। মনে হয় পাণ্ডবদের কোন বিপদ হয়েছে। আমাকে শীঘ্র ভগদত্তের কাছে নিয়ে চল।"

পাণ্ডবেরা আশ্বস্ত হল। যাক্, ভীম জীবিত। ভীম শুধু অদ্বিতীয় মল্লবীর নন, হস্তীযুদ্ধেও কৌশলী। হস্তীর কুক্ষিতে গোপন এক মর্মস্থান তিনি জানতেন। সেখানে মৃদু হস্তধাবন করলে উন্মত্ত হস্তীও শান্ত হয়ে যায়। মাহুতকে হত্যা করলেও তখন সে আর কিছু করে না। হস্তীযুদ্ধের এই গূঢ়-বিদ্যাকে বলে "অঞ্জলিকাবেধ" (দ্রোণপর্ব, ২৬/২৩)। ভগদত্তের হস্তী যখন আক্রমণ করল তখন ভীম সেই বিশাল হস্তীর কুক্ষিদেশে আত্মগোপন করে অঞ্জলিকাবেধের দ্বারা আত্মরক্ষা করতে থাকেন। অর্জুন এসে সেই হস্তীকে বধ করলেন।

তখন অর্জুনকে লক্ষ্য করে ভগদত্ত ধনুতে যোজনা করলেন মন্ত্রাহূত ভয়ঙ্কর বৈষ্ণব অস্ত্র। যার কাছে সকল দিব্যাস্ত্র নিষ্ফল।

করাল অগ্নি নিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে ছুটে আসছে সেই বাণ। শ্রীকৃষ্ণ চকিতে রথ ঘুরিয়ে অর্জুনকে আড়াল করে বুক পেতে দিলেন। সেই বাণ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বৈজয়ন্তী মালা হয়ে দুলতে লাগল।

অর্জুন ক্ষুণ্ন হলেন। তাঁর বীরত্বে আঘাত লাগল। বললেন, "কৃষ্ণ, এ তুমি কেন করলে? আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়ে আমি যুদ্ধ করছি। আমাকে আড়াল করে শত্রুর বাণ বুক পেতে নিলে কেন? তুমি যুদ্ধ করবে না বলেছিলে, কিন্তু তোমার সে প্রতিজ্ঞা রাখলে না।"

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, "পার্থ, এই বৈষ্ণব অস্ত্র প্রতিহত করা তোমার অসাধ্য। ও বাণ তোমার পক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত। তুমি জান না, একদা যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হলে পৃথিবীর প্রার্থনায় তার পুত্র নরককে আমি ওই অস্ত্র দিয়েছিলাম। তারপর নরকাসুরের কাছ থেকে ভগদত্ত পেয়েছিল। ওই অস্ত্র অমোঘ। জগতের কিছুই ওর কাছে অবধ্য নয়। তাই তোমার রক্ষার জন্য ওই অস্ত্রকে বৈজয়ন্তী মালায় রূপান্তরিত করেছি।"

ভগবান এমনি করেই ভক্তের উপর নিক্ষিপ্ত সকল আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করেন। যন্ত্রণাকে মৃত্যুকে আনন্দের বৈজয়ন্তী করে তোলেন। মৃত্যু ভগবানের বুকে ফিরে আসে ফুলহার আনন্দ হয়ে। জগতে ভগবানের প্রতিভূ

হলেন গুরু। তিনিও শিষ্যকে আড়াল করে তার সকল দুঃখের বাণ বুক পেতে গ্রহণ করেন। ভগবান ছাড়া মানুষের সাধ্য কি তার সকল দুঃখ যাতনা মৃত্যুকে রূপান্তরিত করে তোলে? তাই কৃষ্ণ বলছেন, "ত্বৎকৃতে চৈতদন্যথা ব্যপনায়িতম্ (দ্রোণপর্ব, ২৯/৩৭)—তোমারই জন্য আমি এই সব অন্য রকম করে দিলাম।" শ্রীকৃষ্ণের এই কণ্ঠস্বর মহাভারতের পর্বে-পর্বে আমাদের হৃদয়-দহরে মন্দ্রিত হতে থাকে।…

বৈষ্ণব অস্ত্র নিষ্ফল হলে অর্জুনের হাতে ভগদত্ত নিহত হলেন।

দিনান্তে যুদ্ধের অবসান হল।

অর্জুনের আক্রমণে তাড়িত কৌরব সৈন্য ছিন্নকবচ ধূলিমলিন রক্তাক্ত দেহে ভয়ে উদ্বিগ্ন চোখে চারিদিক তাকাতে-তাকাতে শিবিরে ফিরে যেতে লাগল। রাজা মহারথীরা লজ্জিত হতমান। শিবিরে বসে মশালের আলোতে তারা ক্ষুব্ধচিত্তে চিন্তামগ্ন।

এমন সময় অস্থির দুর্যোধন দ্রোণের সামনে এসে অনুযোগে অভিমানে ফেটে পড়ল, "আচার্য, আপনি বারবার যুধিষ্ঠিরকে হাতে পেয়েও বন্দী করছেন না। অথচ আপনি কথা দিয়েছিলেন। এখন বিপরীত আচরণ করছেন। সজ্জন ব্যক্তি কখনো কথা দিয়ে আশাভঙ্গ করেন না। নিশ্চয়ই আপনার চোখে আমরা আজ শত্রু হয়ে উঠেছি।"

দ্রোণ লজ্জিত। বললেন, "অর্জুনরক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা আমার কেন দেবতাদেরও অসাধ্য। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আগামীকাল পাণ্ডবদের কোন এক মহারথকে বধ করব। এমন ব্যূহ রচনা করব যা দেবতাদেরও দুর্ভেদ্য। তবে তোমরা অর্জুনকে দূরে রাখ।"

পরদিন সংশপ্তকগণ পুনর্বার অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র থেকে দূরে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে রাখল।

দ্রোণ এক ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহ রচনা করলেন। রক্ত পতাকায় শোভিত, রক্তবসন রক্তভূষণ, অগুরু চন্দন চর্চিত, মাল্যভূষিত দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ জয়দ্রথ দুঃশাসন ও দুর্যোধন এই সপ্তরথী অভিমন্যুকে আক্রমণ করল।

সিংহশাবকের মত অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। ব্যূহমুখে জয়দ্রথ পাণ্ডবদের প্রতিহত করে রাখল। তার পাশে শকুনি শল্য ভূরিশ্রবা। শল্যের পুত্র রুক্মরথ, দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ নিহত হল। কর্ণের ভ্রাতাকে শিরশ্ছেদ করে শরাঘাতে কর্ণকে পীড়িত করে তুললেন অভিমন্যু।

কোশলরাজ বৃহদ্বল নিহত হল। দুঃশাসন আহত ও মূর্ছিত। সারথি তাকে রথে নিয়ে পলায়ন করল।

কর্ণ দ্রোণকে বলল, "আমি অত্যন্ত আহত। রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, তাই কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছি। অভিমন্যুর বাণে আমার বক্ষ বিদীর্ণ।"

দ্রোণ বললেন, "কর্ণ, অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। এই বিদ্যা আমি অর্জুনকে শিখিয়েছিলাম। যতক্ষণ অর্জুনপুত্রের হস্তে ধনু আছে ততক্ষণ তাকে জয় করা অসম্ভব। এক কাজ কর, অভিমন্যুকে পিছন থেকে আক্রমণ করে তার ধনু ছেদন কর। বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু।" (দ্রোণপর্ব, ৪৮/৩০)

দ্রোণের পরামর্শে কর্ণ পিছন থেকে গিয়ে অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করল। কৃতবর্মা অশ্ব ও সারথিকে, কৃপাচার্য পার্শ্বরক্ষককে বধ করল। দ্রোণ এক বাণে তাঁর হাতের তলোয়ার ভেঙে দিলেন। নিরস্ত্র অভিমন্যু তখন মাটিতে দাঁড়িয়ে রথের চাকা তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। যেন সুদর্শন চক্র হাতে দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ। অশ্বত্থামা ভয়ে তিন-পা পিছিয়ে গেলেন। বন্য ব্যাধের মত সকলে তাঁকে ঘিরে ধরল। তখন দুঃশাসনের পুত্র এসে অভিমন্যুর শিরে গদার আঘাত করল। আকাশ থেকে স্খলিত চন্দ্রের মত অভিমন্যু ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। অন্তরিক্ষ থেকে নিন্দা ও ধিক্কার উঠল, এ ধর্ম নয়, এ ধর্ম নয়— "অন্তরিক্ষে চ ভূতানি প্রাক্রোশন্ত বিশাম্পতে।...নৈষ ধর্মো মতো হি নঃ।" (দ্রোণপর্ব, ৪৯/২১-২২)

শুনে ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত আর্তনাদ করে উঠলেন। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "সে কি সঞ্জয়? কোমল বালকের উপরে এমনি করে অস্ত্রাঘাত? বালে শস্ত্রমপাতয়ন্?" (দ্রোণপর্ব, ৩৩/২৩)

ত্রয়োদশ দিনের এই যুদ্ধ এক কলঙ্কিত মসীলিপ্ত অধ্যায়। কৌরবপক্ষ যে কতখানি হীন ও কাপুরুষ হতে পারে এ তারই এক উলঙ্গ বিভৎস চিত্র। ব্রাহ্মণবীর দ্রোণ এখানে চরম অধর্মের পঙ্কিল অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছেন। যুদ্ধের সকল ন্যায় নীতি ধর্ম বিসর্জন দিয়ে সপ্তরথী মিলে চক্রব্যূহ ঘিরে নিহত করলেন নিরস্ত্র এক বালককে। আবার দ্রোণ ঘৃণ্য পরামর্শ দিলেন কর্ণকে অভিমন্যুর পিছন থেকে আক্রমণ করতে। কর্ণ একজন অতবড় বীর হয়ে শেষে কাপুরুষের মত অভিমন্যুকে পিছন থেকে আক্রমণ করে ধনু ছিন্ন করল? বস্তুত দ্রোণ সেনাপতি হবার পর কৌরবেরা যুদ্ধে অতি ঘৃণ্য রূপ নিতে লাগল। ভীষ্মের সেনাপতিত্বে এমন হয়নি। যুদ্ধ শুরু হবার আগে ধর্মযুদ্ধের রীতি

অনুসারে স্থির হয়েছিল, একজনের সঙ্গে কেবল একজনই যুদ্ধ করবে। রথীর সঙ্গে রথী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী, পদাতির সঙ্গে পদাতি। রথ বর্ম কিংবা অস্ত্রহীনকে আঘাত করা চলবে না। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত থাকলে অপরে তাকে আঘাত করবে না। বিপক্ষকে আগে সতর্ক করে তারপরে অস্ত্র হানতে হবে। যুদ্ধের এই সবগুলি সত্যই দ্রোণ ভঙ্গ করেছেন। তাছাড়া দুর্বল ভীত বা ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্ নয় এমন ব্যক্তির উপরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অধর্ম। দ্রোণ নির্বিচারে তাও করেছেন। দ্রোণের পিতা ভরদ্বাজ ও দেবতারা আকাশ মার্গ থেকে দ্রোণকে বারবার বলেছেন, তুমি অধর্ম যুদ্ধ করছ। অন্যায় ভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করছ।

অভিমন্যুকে নিহত করে কৌরবেরা যখন উৎকট আনন্দ করছিল তখন ধর্মপ্রাণ যুযুৎসু তাদের ধিক্কার দিয়ে বললেন, "তোমরা ধর্মহীন। তোমাদের এই ঘোর পাপ কর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। আগমিষ্যতি বঃ ক্ষিপ্রং ফলং পাপস্য কর্মণঃ।" (দ্রোণপর্ব, ৭২/৬৩)

দিনের শেষে সংশপ্তক বাহিনী বিনাশ করে অর্জুন ফিরে আসছেন। অশুভ আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, "পাণ্ডবশিবির এমন অন্ধকার কেন? ভেরী মৃদঙ্গের মাঙ্গল্যবাদ্য শুনছি না। সব যেন শোকে মুহ্যমান। সৈনিকেরা অধোমুখে দাঁড়িয়ে। আমাকে অভিবাদন করছে না। যুধিষ্ঠির ক্রন্দন করছেন। তাঁকে ঘিরে রাজন্যবর্গ অস্ত্র আনত করে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

দুঃসংবাদ শুনে অর্জুন পুত্রশোকে কাতর হয়ে শোক করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "পার্থ, ক্ষান্ত হও। সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে অভিমন্যু বীরের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে গমন করেছে। তার জন্য শোক ক'রো না। দেখ, সকলেই কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন। এঁদের তুমি আশ্বস্ত কর।"

ক্রুদ্ধ অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, "অভিমন্যুর বধের কারণ জয়দ্রথ। আগামীকাল সূর্যাস্তের আগে আমি জয়দ্রথকে বধ করব। যদি না পারি তাহলে জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিব।"

> পাপং বালবধে হেতুং শ্বোঽস্মি হন্তা জয়দ্রথম্।
>
> *
>
> যদ্যস্মিন্নহতে পাপে সূর্যোঽস্তমুপযাস্যতি।
> ইহৈব সম্প্রবেষ্টাহং জ্বলিতং জাতবেদসম্॥
>
> (দ্রোণপর্ব, ৭৩/২২, ৪৭)

অর্জুনের এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা শুনে শ্রীকৃষ্ণ মনে-মনে শঙ্কিত হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

পাণ্ডবেরাও উন্মনা হয়ে সে রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্ত তৎপর। তিনি কুশাসন বিছিয়ে পূজার উপকরণ আনিয়ে অর্জুনকে বললেন, "এই আসনে বসে এক মনে শিবের আরাধনা কর।"

নিশীথ রাত্রে অর্জুন শিবের পূজায় নিরত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সারথি দারুককে অন্তরালে ডেকে বললেন, "দারুক, অর্জুন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। কিন্তু সে এক অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করেছে। আগামীকাল সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথকে বধ করবে। অন্যথায় অগ্নিপ্রবেশ করবে। কিন্তু আমি জানি, দুর্যোধন আগামীকাল তার সমস্ত অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে জয়দ্রথকে ঘিরে রাখবে। দ্রোণ ব্যূহ রক্ষা করবেন। এ অবস্থায় জয়দ্রথকে বধ করা ইন্দ্রেরও অসাধ্য। তাই অর্জুন অসমর্থ হলে আমাকেই জয়দ্রথ বধ করতে হবে। তুমি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার রথ প্রস্তুত রেখ। আমি পাঞ্চজন্যের সঙ্কেত করলে তৎক্ষণাৎ আমার কাছে রথ নিয়ে এস।"

[আটাশ]

অধর্মের আর্তনাদ

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন ও জয়দ্রথ ভয় পেয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে এল। দ্রোণ আশ্বাস দিয়ে বললেন, "জয়দ্রথের কোন ভয় নেই। আমি এমন ব্যূহ রচনা করব যাতে অর্জুন সারাদিন চেষ্টা করলেও জয়দ্রথের কাছে পৌঁছাতে পারবে না।"

দ্রোণ শকট ব্যূহ রচনা করলেন।

সমস্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যকে সামনে রেখে রচিত হল সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ। পশ্চাতে ছয় ক্রোশ দূরে পদ্মের আকারে আরো একটি গর্ভব্যূহ। সেখানে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে ভূরিশ্রবা কর্ণ অশ্বত্থামা ও কৃপ। তারও ভিতরে সূচীমুখ তৃতীয় একটি ব্যূহ তৈরী হল। সেখানে জয়দ্রথকে সুরক্ষিত করে দাঁড়াল কৃতবর্মা। আর ওই সমগ্র মহাব্যূহের সম্মুখে স্বয়ং দ্রোণাচার্য।

কৌরবসেনাকে বিত্রাসিত করে মৃত্যুপ্রতিজ্ঞ অর্জুন এলেন দ্রোণের ব্যূহমুখে। শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে দ্রোণকে বললেন, "ভগবন্, আপনি আমার পিতা, অগ্রজ ও বাসুদেবের মতই পূজনীয়। আমি আপনার পুত্রতুল্য। আপনার কৃপায় এই ব্যূহে প্রবেশ করে জয়দ্রথকে বধ করতে চাই। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করুন।"

দ্রোণের মুখে রহস্যজনক হাসি, "অর্জুন, তুমি আমাকে পরাজিত না করে জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না।" এই বলে দ্রোণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দ্রোণ অস্ত্র নিক্ষেপ করলে অর্জুনকেও তার প্রত্যুত্তরে অস্ত্রনিক্ষেপ করতে হবে; শিক্ষা শেষ করে দ্রোণ অর্জুনকে এই বলে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। এ তাঁর অন্যতম গুরুদক্ষিণা—"যুদ্ধেঽহং প্রতিযোদ্ধব্যো যুধ্যমানস্ত্বয়ানঘ।" (আদিপর্ব, ১৩৯/১৪)

তাই গুরুভক্ত দ্রোণকে আক্রমণ না করে কেবল তাঁর চরণ লক্ষ্য করে শর নিক্ষেপ করলেন—"বিব্যাধ চরণে দ্রোণমনুমান্য বিশাম্পতে।" (দ্রোণপর্ব, ৯১/১০)

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন, এখানে বৃথা কালক্ষেপ ক'রো না। দ্রোণকে ত্যাগ করে চল জয়দ্রথের সন্ধানে।"

অর্জুন প্রদক্ষিণ করে চলে যাচ্ছেন দেখে দ্রোণ বললেন, "অর্জুন, তুমি তো শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত না করে ফিরে যাও না !"

—"ভগবন্, আপনি আমার গুরু। শত্রু নন। গুরুর্ভবান্ ন মে শত্রুঃ।" বললেন অর্জুন।

অর্জুন ব্যূহ ভেদ করেছেন দেখে দুর্যোধন কুপিত হয়ে ছুটে এল, "আচার্য, আমি ভাবতেও পারি না, অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করে ব্যূহ ভেদ করবে। আমি জানি, আপনি পাণ্ডবদেরই হিতে রত আছেন। আপনাকে তো আমি উত্তম বৃত্তি দিয়ে থাকি ('বর্তয়ে বৃত্তিমুত্তমাম্')। যথাসাধ্য তুষ্ট করে চলি। আমার কাছ থেকেই আপনার জীবিকা চলছে ('অস্মানেবোপজীবং')। কিন্তু সেকথা আপনি মনে রাখেন না। বরং আমাদের ক্ষতি হয় এমন কাজই করে চলেছেন। আপনি যে এমন একখানি মিছরির ছুরি ('মধুদিগ্ধমিব ক্ষুরম্') তা আগে জানতাম না। মূর্খ আমি, আপনার কথায় বিশ্বাস করে জয়দ্রথকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি।"

দুর্যোধন অশিষ্ট, কর্কশভাষী, গুরুজন বিদ্বেষী, ক্রোধী। সে বিষকুম্ভ। তার চিন্তায় কথায় কেবল তীক্ষ্ণ কটু বিষ। সেই বিষে সে নিজে জ্বলে, অপরকে জ্বালায়। তবে সে কূটবুদ্ধি। মুহূর্তেই বুঝতে পারল, দ্রোণকে এমনি করে অপমান করলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি সুর পাল্টে বলল, "আচার্য, আমি নিতান্ত আর্ত হয়ে এই সব প্রলাপ বকছি। আপনি রাগ করবেন না। দয়া করে জয়দ্রথকে আপনি রক্ষা করুন।"

—"রাজন্, আমার কাছে তুমি এবং অশ্বত্থামা সমান। তাই তোমার কথায় রাগ করছি না। কিন্তু আসল কথা হল, আমি বৃদ্ধ অসমর্থ, আর অর্জুন অতি দুর্ধর্ষ। তার সারথি শ্রীকৃষ্ণ অতি ক্ষিপ্র। দেখছ না, আমার নিক্ষিপ্ত বাণ তাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছায় না ? আমি বরং যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে চেষ্টা করি। তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার অঙ্গে এই অক্ষয় দুর্ভেদ্য স্বর্ণকবচ বেঁধে দিলাম। কৃষ্ণ অর্জুন কিংবা অন্য কোন বীর এই কবচ ভেদ করতে পারবে না। স্বয়ং মহাদেব এই কবচ ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে অঙ্গিরা, তাঁর থেকে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির থেকে ঋষি অগ্নিবেশ্য এবং শেষে আমি এই দিব্য কবচ লাভ করি।"

দিন শেষ হয়ে আসছে।

সূর্যাস্তের আগেই জয়দ্রথকে বধ করবার দারুণ সঙ্কল্প করেছেন অর্জুন। সময়ের এই অসম্ভব সংকীর্ণ গণ্ডি টেনে গত তের দিনের যুদ্ধের বিশৃঙ্খল

বিভৎসতার মধ্যে একটা নতুন বেগ ও তীব্রতা সঞ্চারিত হল। এখন আমরা সারাটা দিন বুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায় বারবার আকাশের দিকে তাকাতে থাকব। দিন যে শেষ হয়ে এল !…অতএব…তাহলে…?

নাটকীয় তীব্রতা সঞ্চারের এই কাব্যকৌশলটি আমরা রামায়ণেও লক্ষ্য করি। সীতাহরণের পরে দীর্ঘকাল ধরে রামের বিলাপ ও অনিশ্চিত প্রস্তুতির মধ্যে আমরা অধীর (এবং কিছুটা ক্লান্ত) হয়ে উঠি। এমন সময় সুন্দরকাণ্ডে শুনলাম সীতার অশ্রুসজল প্রতিজ্ঞা। হনুমানকে বলছেন, "আমি আর একমাস মাত্র বেঁচে থাকব। একমাস পরে আর বাঁচব না। তুমি দাশরথী রামকে ব'লো আমাকে যেন তিনি এর মধ্যে উদ্ধার করেন।"

> জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।
> ঊর্ধ্বং মাসান্ন জীবেয়ং সত্যেনাহং ব্রবীমি তে।
> রাবণেনোপরুদ্ধাং মাং…
>
> (রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ৩৮/৬৪-৬৫)

এই সংকীর্ণ সময়সীমার মধ্যেই রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড সমরহুতাসনে বহ্নিমান হয়ে উঠল।

সূর্য অস্তাচলগামী। এখনও জয়দ্রথ জীবিত। অর্জুনের হাতে আর সময় নেই। অর্জুন জয়দ্রথের দিকে ধাবমান দেখে দুর্যোধন সসৈন্যে এসে বাধা দিল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ধনঞ্জয়. ভাগ্যক্রমে দুর্যোধন তোমার সম্মুখে। ওকে বধ কর।"

অর্জুন বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু অর্জুনের সকল বাণ দুর্যোধনের বুকে লেগে নিষ্ফল হয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত, "অর্জুন, এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! তোমার বাণ নিষ্ফল হচ্ছে ? তোমার গাণ্ডীবের শক্তি তোমার বাহুবল ঠিক আছে তো ?"

—"বাসুদেব, মনে হয় দুর্যোধনের দেহে দ্রোণ তাঁর অক্ষয় কবচ বেঁধে দিয়েছেন। ওই কবচবন্ধনের বিদ্যা ও কৌশল আমি ইন্দ্রের কাছে শিখেছিলাম। কিন্তু দুর্যোধন এ বিদ্যা জানে না। কেবল স্ত্রীলোকের মত অলঙ্কার হিসাবে বৃথা ওই কবচ ধারণ করেছে।"

দুর্যোধনের রক্ষাকবচ বিদীর্ণ করতে অর্জুন মন্ত্রপূত মানবাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। অর্জুনের সেই বাণ অশ্বত্থামা দূর থেকে ছিন্ন করে দিলেন। হতাশ কণ্ঠে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "অশ্বত্থামা আমার মানবাস্ত্র ব্যর্থ করে

দিল। দ্বিতীয়বার এই বাণ আর প্রয়াগ করা যায় না। তাহলে তা আমাকে ও আমার সৈন্যকে বিনাশ করবে।”

অর্জুন তখন দুর্যোধনের ধনু, অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনের বিপদ বুঝে ভূরিশ্রবা, কর্ণ শল্য অর্জুনকে ঘিরে ফেললেন। শত্রুবেষ্টিত অর্জুনকে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজিয়ে পাণ্ডবদের বিপদ সঙ্কেত পাঠালেন।

শুনে যুধিষ্ঠির চঞ্চল উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, “সাত্যকি, নিশ্চয় অর্জুনের বিপদ হয়েছে। তুমি শীঘ্র যাও। অর্জুনকে রক্ষা কর।”

—“কিন্তু অর্জুনের আদেশ, এখানে থেকে আপনাকে রক্ষা করা। আমি চলে গেলে দ্রোণ আপনাকে বন্দী করবেন।”

—“আমার কথা পরে। এখানে ভীম রয়েছেন। তুমি যাও। আগে অর্জুনকে রক্ষা কর।”

দিন শেষ হয়ে আসছে।...

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।...

এখনও জয়দ্রথ জীবিত।...

অর্জুন বিপদাপন্ন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজাচ্ছেন।...

সাত্যকি প্রাণপণে কৌরবসৈন্য বিদারণ করতে-করতে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সামনে ব্যূহমুখে দ্রোণ।

দ্রোণ সহাস্যে বললেন, “কি? তোমার গুরু অর্জুন আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করে চলে গেল। তুমিও আমাকে প্রদক্ষিণ করে চলে যাচ্ছ? যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হলে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করি না।”

—“ব্রাহ্মণ, আপনার মঙ্গল হোক। যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমি গুরু অর্জুনের কাছে যাচ্ছি। অর্জুন বিপদাপন্ন। আপনি আমাকে বিলম্ব করিয়ে দেবেন না।”

কৌরবসৈন্য সাত্যকিকে বাধা দিল। নিহত হল রাজা জলসন্ধ ও সুদর্শন। দুঃশাসন পরাজিত হয়ে দ্রোণের কাছে পালিয়ে এল। দ্রোণ তাকে ব্যঙ্গ করে বললেন, “দ্যূতসভায় তুমি দ্রৌপদীকে বলেছিলে, পাণ্ডবেরা নপুংসক ষণ্ডতিল। এখন তবে পালিয়ে এলে কেন? তোমার সেই দম্ভ বীরত্ব কোথায় গেল?”

আকাশ কাঁপিয়ে ওই আবার পাঞ্চজন্য ধ্বনি।...

শ্রীকৃষ্ণের বিপদ সঙ্কেত।...

যুধিষ্ঠির অস্থির হয়ে ভীমকে বললেন, “বৃকোদর, মনে হয় অর্জুনের বিপদ হয়েছে। হয়তো সে আর জীবিত নেই। শ্রীকৃষ্ণ একাই যুদ্ধ

করছেন। ওই শোন পাঞ্চজন্য-ঘোষ। তুমি শীঘ্র যাও। অর্জুন ও সাত্যকিকে রক্ষা কর।”

আজ্ঞা পেয়ে ভীম ছুটে চললেন।

ব্যূহমুখে দ্রোণ বাধা দিয়ে বললেন, “ভীমসেন, আজ তুমি আমার শত্রু। আমাকে পরাজিত না করে এই ব্যূহে প্রবেশ করতে পারবে না। অর্জুন এবং সাত্যকি আমার অনুমতি নিয়েই এই ব্যূহ ভেদ করেছে। ইচ্ছা হলে তুমিও তাই করতে পার।” (দ্রোণপর্ব, ১২৭/৪৫-৪৬)

ক্রুদ্ধ ভীম রক্তচক্ষু নিয়ে গর্জন করে বললেন, “নীচ ব্রাহ্মণ, আমি আপনার শত্রু ভীম। জানবেন, অর্জুনের মত আমি দয়ালু নই। তার মত আপনাকে আমি সম্মানও করি না। নার্জুনোঽহং ঘৃণী দ্রোণ ভীমসেনোঽস্মি তে রিপুঃ।”

এই বলে ভীম গদাঘাতে দ্রোণের রথ চূর্ণ করে অশ্ব ও সারথিকে বধ করলেন। দ্রোণ অন্য রথে উঠে ব্যূহদ্বারে চলে গেলেন।

ভীম ছুটে চলেছেন।...

দূরে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন।

ভীম ও অর্জুনের সিংহনাদ শুনে যুধিষ্ঠির আশ্বস্ত হলেন।

এবার ভীমকে প্রতিরোধ করে দাঁড়াল কর্ণ।

দুজনের তুমুল যুদ্ধ হল।

ভীমের ধনু ছিন্ন, অশ্ব নিহত।

বিরথ ভীম তখন কর্ণের দিকে খড়্গ নিক্ষেপ করলেন। নিরস্ত্র ভীম মৃত হস্তীস্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

কর্ণকে সাহায্য করতে ছুটে এল দুর্যোধনের সাত ভাই। ভীম একে একে তাদের সকলকে নিহত করলেন।

রণক্লান্ত ভীম কর্ণের শরাঘাতে মূর্ছিত প্রায়। তখন অস্ত্র উদ্যত করে ছুটে এল কর্ণ। সামান্য একটি আঘাতেই এখন ভীমকে নিহত করা যায়। কিন্তু কর্ণ থমকে দাঁড়াল। তার হাত উঠল না। তার মনে ব্যথাভরা আকুলতা নিয়ে জেগে উঠল মাতা কুন্তীর অশ্রুসজল করুণ মুখখানি। মনে পড়ল সেদিনের সেই নির্জন ভাগীরথী তীরে বিশীর্ণ পদ্মমালার মত কুন্তী দাঁড়িয়ে আছেন। কর্ণ ভীমের দিকে তাকাল। নিরস্ত্র মূর্ছিতপ্রায় ভীমকে সে বধ করল না। শুধু ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করল। ক্রুদ্ধ অপমানিত ভীম কর্ণের হাতের ধনুক কেড়ে নিয়ে তাকে প্রহার করলেন। কর্ণ শুধু মৃদু হাসল (“বিহসন্নিব রাধেয়ো”)। কর্ণের এই একটুখানি হাসির মধ্য দিয়ে বেদব্যাস চকিতে আমাদের দেখিয়ে দিলেন, মায়ের প্রতি স্নেহাতুর কর্ণের কি যে

ক্ষুব্ধ অভিমান, তার ভ্রাতৃত্বের গভীর স্নেহ আর তার নিজের ভবিতব্যের প্রতি সকরুণ উদাস এক বৈরাগ্য। কর্ণের কর্কশ কণ্ঠ রূঢ় বাক্যের অন্তরালে আমরা অনুভব করি তার হৃদয়ের ফল্গুধারা, "পেটুক মূর্খ অজ্ঞান বালক কোথাকার! যুদ্ধ করতে জান না? যাও, যেখানে ভূরি-ভূরি খাবার-দাবার আছে সেখানে যাও। কিংবা মৎস্যরাজের ভৃত্য পাচক হয়ে রান্না কর গিয়ে যাও। অথবা মুনি হয়ে বনে-বনে ফলমূল কুড়িয়ে খাওগে। আমার সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে এস না। তুমি বালক, যুদ্ধের কি বোঝ? কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও কিংবা বাড়ী চলে যাও।" (দ্রোণপর্ব, ১৩৯/৯৪-১০৫)

এমন সময় অর্জুন এসে কর্ণকে আক্রমণ করলেন। ভীমকে ত্যাগ করে কর্ণ দুর্যোধনের কাছে চলে গেল।...

এদিকে দ্বিতীয় ব্যূহের সম্মুখে সাত্যকির গতিরোধ করে দাঁড়ালেন ভূরিশ্রবা। তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। ভূরিশ্রবা পদাঘাতে সাত্যকিকে মাটিতে ফেলে দিলেন। তাঁর বুকের উপরে বসে চুলের মুঠি ধরে খড়্গ তুলে শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত। দেখে শ্রীকৃষ্ণ চিৎকার করে অর্জুনকে বললেন, "পার্থ, ওই দেখ, ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ করতে যাচ্ছে। শীঘ্র সাত্যকিকে রক্ষা কর—পালয় সাত্যকিম্।"

অর্জুন তীক্ষ্ণ শরে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করলেন।

ক্রুদ্ধ ভূরিশ্রবা বললেন, "অর্জুন, আমি সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম। তুমি আমাকে আক্রমণ করলে কেন? এ অন্যায় যুদ্ধ। নৃশংস কর্ম। এই পাপ যুদ্ধ তোমায় কে শিখিয়েছে? ইন্দ্র দ্রোণ না কৃপ? তুমি তো ব্রতধারী শীলবান্ ক্ষত্রিয়। এমন হীন কার্য করলে কি করে? নিশ্চয় এ তোমার নীচ কৃষ্ণের পরামর্শে। বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের লোকেরা তো ব্রাত্য, সংস্কারহীন, ধর্মলঙ্ঘনকারী, নিন্দিত, হেয়। ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্টকর্মাণঃ প্রকৃত্যৈব চ গর্হিতাঃ বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ।"

—"ভূরিশ্রবা, যুদ্ধে স্বজন ও মিত্র রক্ষা ধর্ম। আমার প্রিয় শিষ্য সাত্যকির প্রাণ রক্ষা করে আমি কোন অধর্ম করিনি। তুমি তো দ্বৈরথ যুদ্ধ করছিলে না। তোমাকে আক্রমণ করে আমি তাই কোন অন্যায় করিনি। তুমি নিরস্ত্র সাত্যকিকে বধ করতে গিয়েছিলে। নিরস্ত্র বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে তোমরাই বধ করেছ। কোন্ ধর্ম তার প্রশংসা করে?"

ভূরিশ্রবা তখন বাম হস্তে কুশ বিছিয়ে নিজের কর্তিত দক্ষিণ হস্ত অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করলেন।

অর্জুন বললেন, "ভূরিশ্রবা, আমি তোমাকে ভাইয়ের মত স্নেহ করি।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "যজ্ঞশীল ভূরিশ্রবা, তুমি দেবগণের বাঞ্ছিত অমরলোকে গমন কর।"

এমন সময় মুক্ত কৃপাণ হাতে সাত্যকি ভূরিশ্রবার দিকে ছুটে যাচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তাঁকে চিৎকার করে নিষেধ করছেন…("বার্যমানঃ স কৃষ্ণেণ পার্থেন"…)। তথাপি সাত্যকি ছুটে গিয়ে ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করলেন। সবাই সাত্যকির নিন্দা করতে লাগল। অস্ত্রের তেজে পবিত্র ("সতেজসা শস্ত্রকৃতেন পূতো"…) ভূরিশ্রবার ছিন্নশির অশ্বমেধ যজ্ঞের পবিত্র অশ্বের ছিন্ন মুণ্ডের মত যেন অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল।

অশ্বস্য মেধস্য শিরো নিকৃত্তং
নাস্তং হবির্ধানমিবান্তরেণ ॥
(দ্রোণপর্ব, ১৪৩/৭১)

সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নেই।

অর্জুন উদ্বিগ্ন।

—"কৃষ্ণ, শীঘ্র চল, যেখানে রয়েছে দুরাত্মা জয়দ্রথ।"

অর্জুনকে আসতে দেখে ছয়জন মহারথ জয়দ্রথকে বেষ্টন করে দাঁড়াল। কিন্তু অর্জুনের প্রচণ্ড আক্রমণে তারা পিছিয়ে গেল। জয়দ্রথের সারথি নিহত হল। তার ধ্বজা ভেঙে পড়ল। ছয় মহারথ তখন আবার জয়দ্রথকে ঘিরে দাঁড়াল।

সূর্য অস্তাচলগামী…

পশ্চিম আকাশে অস্তমান সূর্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। একটু পরেই সূর্যাস্ত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "পার্থ, ভয়ে জয়দ্রথ লুকিয়ে পড়েছে। ছয় মহারথ তাকে ঘিরে আছে। তাদের পরাজিত না করে জয়দ্রথকে বধ করা অসম্ভব। এদিকে সূর্যাস্ত আসন্ন। অতএব এখন মায়া–কৌশল ("নির্ব্যাজম্") ছাড়া উপায় নেই। আমি যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব। সূর্যাস্ত হয়েছে ভেবে জয়দ্রথ আর আত্মগোপন করে থাকবে না। সেই অবসরে তুমি জয়দ্রথকে বধ করবে।"

সহসা আকাশ অন্ধকার করে এল।

কৌরবেরা উল্লসিত। সূর্যাস্ত হয়েছে। আর ভয় নেই। এবার অর্জুন অগ্নিপ্রবেশ করবে। জয়দ্রথ ভয়মুক্ত। সে বেরিয়ে নির্ভয়ে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অর্জুন, ওই দেখ, জয়দ্রথ নিশ্চিন্ত চিত্তে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। এই সুযোগ, দুরাত্মাকে এখনই বধ কর।"

অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণে জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন হল।

শ্রীকৃষ্ণ চিৎকার করে বললেন, "অর্জুন, সাবধান, জয়দ্রথের ছিন্নমস্তক যেন ভূমিতে না পড়ে। তার পিতার অভিশাপ আছে, জয়দ্রথের মস্তক যে ভূপাতিত করবে তার মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হবে। অতএব তুমি তার ছিন্ন মস্তক বাণে-বাণে উৎক্ষিপ্ত করে তার তপস্যারত পিতার অঙ্কে নিক্ষেপ কর।"

অর্জুনের বাণ বাজপাখীর মত জয়দ্রথের ছিন্নশির শূন্যে তুলে নিয়ে সমন্তপঞ্চকে তার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের অঙ্কে নিক্ষেপ করল।

সন্ধ্যাপূজায় রত পিতার অঙ্কে পতিত হল পুত্রের ছিন্নশির। ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধক্ষত্র। ছিন্নমুণ্ড ছিটকে পড়ল মাটিতে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তক বিদীর্ণ হল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন আকাশ থেকে তাঁর মায়া অন্ধকার অপসারিত করলেন। সকলে বিস্ময়ে দেখল সূর্য তখনও অস্তাচল পথে বিলগ্ন।

পাণ্ডবেরা বিজয়শঙ্খ বাজিয়ে শিবিরে ফিরে চললেন।…

হতাশ অবসন্ন দুর্যোধনের চোখে অন্ধকার। জয়ের সকল আশা তার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রক্তাক্ত আহত দেহে স্খলিত পদে চলেছে সে দ্রোণের কাছে। তার পায়ের তলে যেন নিয়তির পাতালশঙ্খ বাজছে।

বিষদাঁত-ভাঙা সাপের মত ("ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ") নিঃশ্বাস ছেড়ে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে দুর্যোধন বলল, "আচার্য, জয়দ্রথ নিহত! আমার সাত অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট! মহাবীর জলসন্ধ, মহাবল ভূরিশ্রবা, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ সকলেই আজ নিহত। আমার সৈন্যরা দলে-দলে পাণ্ডবপক্ষে চলে যাচ্ছে। শূরসেন শিবি বসাতিগণ যুদ্ধে বিমুখ। ভীষ্ম নিজেই নিজের বধের উপায় বলে দিলেন। অর্জুন আপনার প্রিয় শিষ্য, তাই আপনিও যুদ্ধে উদাসীন। আমারই জন্য শত-শত বীর মৃত্যুবরণ করল। আমি অতি নীচ। আমি পাপাত্মা। আমি হতভাগ্য।"

একটা সময় আসে, হয়তো শেষ সময়, যখন অত্যন্ত পাপীরও অন্তরে অনুশোচনা হয়, আত্মগ্লানি হয়। দুর্যোধন কান্নায় ভেঙে পড়ল, "আমারই অধর্মাচরণে আজ কৌরবদের সকল বীর নিহত হল। আমি আচারভ্রষ্ট। আমি মিত্রদ্রোহী। যাদের আমি বন্ধু বলে জেনে এসেছি, তারা সবাই অর্থলুব্ধ, কুটিল।

আমার সকল চেষ্টাকে তারা বিফল করে দিয়েছে। আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই। পাণ্ডবদের আচার্য, আপনি আমাকে মরণের অনুমতি দিন।" (দ্রোণপর্ব, ১৫০/১৮-৩৬)

দুর্যোধনের কণ্ঠে এখন পাপের শেষ আর্তনাদ, "আমি কাপুরুষ। আমিই আমার সকল আত্মীয় বধের কারণ। হাজার-হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেও আমি কোনদিন পবিত্র হব না।"

সোঽহং কাপুরুষঃ কৃত্বা মিত্রাণাং কদনমিদম্।
অশ্বমেধসহস্রেণ পাবিতুং ন সমুৎসহে ॥
(দ্রোণপর্ব, ১৫০/২৭)

দুর্যোধনের কণ্ঠে আমরা যেন শুনছি সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের মতন আর্তনাদ—

"Will all great Naptune's ocean
wash this blood
from my hand ? No ; this my hand
will rather
The multitudinous seas incarnadine."
(*Macbeth*, Act 2, Scene II)

[ঊনত্রিশ]

দুই হাতে রক্ত—দুই চোখে জল

দুর্যোধনের সকল অভিযোগ আক্ষেপ তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত দ্রোণকে বিদ্ধ করতে লাগল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমাকে তুমি এমন করে অপমান করছ কেন? আমি তো বারবার বলেছি অর্জুন দুর্জয়। কিন্তু তোমরা কি করছিলে? তুমি কর্ণ শল্য কৃপ অশ্বত্থামা সকলে জয়দ্রথকে বেষ্টন করে ছিলে, তোমরা জীবিত থাকতে জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা নিহত হল কেন? আমি দেখতে পাচ্ছি, ঘোর সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে ('ঘোরমাগতং বৈশসং মহৎ')। কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না। দুর্যোধন, আর বৃথা জয়ের আশা কেন করছ ('কথমাশংসসে জয়ম্')? কার উপরে কিসের উপরে ভরসা করছ? আমারও আর বেঁচে থাকার কোন অবসর নেই—'ন কিঞ্চিদনুপশ্যামি জীবিত-স্থানমাত্মনঃ' (দ্রোণপর্ব, ১৫১/২৫)। তুমি অশ্বত্থামাকে ব'লো সে জীবিত থাকতে পাঞ্চাল ও সোমকগণ যেন নিস্তার না পায়। আমি স্থির করলাম, আজ রাত্রেও যুদ্ধ হবে। আমি পাণ্ডবসেনার মধ্যে প্রবেশ করছি।"

দুর্যোধন ছুটে গেল কর্ণের কাছে।

—"শোন কর্ণ, দ্রোণাচার্য নিশ্চেষ্ট থেকে বিনা বাধায় অর্জুনকে ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। বিনা যুদ্ধে তাকে পথ ছেড়ে দিয়েছেন। দেবেনই তো, অর্জুন যে তাঁর প্রিয় শিষ্য! কিন্তু তিনি নিজেই জয়দ্রথকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি, আমার সৈন্যদের বিনাশ করার জন্যই এই ব্রাহ্মণ জয়দ্রথকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন।"

কর্ণ বলল, "তুমি আচার্যের নিন্দা ক'রো না। এই ব্রাহ্মণ তো সাধ্যমত প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু মনে রেখ, তিনি আজ বৃদ্ধ স্থবির। তাঁর সেই ক্ষিপ্রতা নেই, বাহুতেও শক্তি নেই। তিনি অস্ত্রজ্ঞ হলেও বার্ধক্যে অসমর্থ। তাই অর্জুন যদি তাঁকে অতিক্রম করে ব্যূহ ভেদ করে থাকে তাতে তাঁর কোন দোষ দেখি না।

"দুর্যোধন, আসলে সবই দৈবের বিধান। নইলে আমরা তো পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করছিলাম, তবে কেন জয়দ্রথ নিহত হল? দৈব যাকে ত্যাগ করেন তার সকল চেষ্টা এমনি করেই নষ্ট হয়ে যায়। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি, ফলাফল দৈবের অধীন। আমরা কপটতা করে পাণ্ডবদের প্রতারিত করেছি।

জতুগৃহে তাদের অগ্নিদগ্ধ করে মারতে চেয়েছি। পাশা খেলায় তাদের সঙ্গে শঠতা করেছি। রাজনীতির কূটচালে তাদের বনবাসী করেছি। কিন্তু পরিণাম কি হল ? আমাদের সকল প্রয়াস দৈবের হাতে নষ্ট হয়েছে। এসবই দৈবের বিধান। কৃতকর্মের ফল অমোঘ। মানুষ ঘুমিয়ে থাকলেও দৈব সদা জাগ্রত। 'অনন্যকর্ম দৈবং হি জাগর্তি স্বপতামপি'।" (দ্রোণপর্ব, ১৫২/৩২)

কর্ণ নিজের চক্ষে দেখছে ঘোর যুদ্ধফল। কর্ণের এই অনুতাপদগ্ধ উপলব্ধি আমাদের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। যুদ্ধক্ষেত্রে দুইবার সে দুর্যোধনের দুষ্কৃতি বিবৃত করেছে। যদিও দুর্যোধনের বন্ধু সে, তার সকল পাপকর্মের সহায়ও সে, তবু তার বিচারে ভুল হয়নি। পাপীর অন্তর দগ্ধ অঙ্গারের মত, কিন্তু যখন তার মধ্যে অনুতাপ আসে অনুশোচনা আসে, তখন সেই অঙ্গারের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে কালো হীরা তার পরঃকৃষ্ণ দ্যুতি নিয়ে। কর্ণের অন্তরখানিও তাই। আর মাত্র দুদিন পরে কর্ণের মৃত্যু। আজ সে এক মহাপথে এসে দাঁড়িয়েছে, যে পথ—এপার-ওপার দূর-নিকট উভয় লোকের ভিতর দিয়ে চলে গেছে—"তদ্ যদা মহাপথ আততে উভৌ গ্রামৌ…" (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮-৬-২)। এক সূর্যরশ্মি তার অন্তরে এসে পড়েছে—সেই আলোতে কর্ণ পরিষ্কার দেখছে সমগ্র মহাভারতের অনিবার্য গতি ও পরিণতি। দেখছেন দ্রোণও। কিন্তু দুর্যোধন দেখতে পাচ্ছে না। কিংবা দেখেও দেখতে চাইছে না। সত্যের রশ্মি তার অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার অন্ধকার হৃদয়ের কাছে সেই মহাপথের দ্বার রুদ্ধ—"নিরোধোঽবিদুষাম্"।

দ্রোণ আবার যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে ঘোষণা করলেন, রাত্রেও যুদ্ধ চলবে। পাণ্ডবসৈন্যকে ধ্বংস না করে তিনি বর্ম খুলবেন না।

ঘোর রজনী। অন্ধকার রণক্ষেত্র। কোনদিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু শৃগাল আর পিশাচের চিৎকার। কবন্ধ প্রেতের ছায়া। তাদের ব্যাদিত মুখে আগুনের হল্কা। যুদ্ধরত সৈনিকদের মণিমাণিক্য দিব্যাস্ত্রের দ্যুতি। তরবারির আঘাতে-আঘাতে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠছে। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না—যে যার নাম ঘোষণা করে যুদ্ধ করছে। থেকে-থেকে অশ্বের হ্রেষা আর মুমূর্ষুর আর্তনাদ।

দুর্যোধন পদাতি সৈনাদের বলল, "তোমরা মশাল জ্বেলে ধর।"

তখন মশালের আলোতে অন্ধকার রণক্ষেত্র রহস্যময় রূপ ধারণ করল। দেবতা গন্ধর্ব ঋষিগণ আকাশ মার্গে নক্ষত্রমালার মত দীপামান হলেন। সৈনিকদের স্বর্ণভূষণে, অস্ত্রে ঢালে ধনুতে, প্রদীপ্ত অগ্নির আভা। চারিদিক ঝকমক্ করছে। মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য প্রদীপ বারবার জ্বলছে আর নিভছে

—"প্রতিপ্রভারশ্মিভিঃ পুনঃপুনঃ সঞ্জনয়ন্তি দীপান্" (দ্রোণপর্ব, ১৬৩/২১)। সৈনিকদের রক্তমাখা অস্ত্রে, তাদের হাতের কম্পিত ঢালে মশালের আলো বিদ্যুতের মত ঠিক্‌রে পড়ছে।

ধ্বজিনী প্রদীপ্তা
মহাভয়া ভারত ভীমরূপা ॥
(দ্রোণপর্ব, ১৬৩/২৬)

কবিত্বের এ এক বিস্ময়কর বাক্‌প্রতিমা। ছন্দের ঘাট বাঁধা মন্ত্রের ধ্বনি-কম্পনে।...

কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণে পাণ্ডবসৈন্য বিপর্যস্ত হতে লাগল।

তা দেখে ক্রুদ্ধ অর্জুন বললেন, "আজ আমি কর্ণকে বিনাশ করব।"

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বললেন, "না, তুমি নও। আজ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ।"

শ্রীকৃষ্ণ জানেন, জয়দ্রথ বধ হলেও, ভগদত্তের বৈষ্ণব অস্ত্র নিষ্ফল হলেও, এখনও কর্ণের হাতে রয়েছে ইন্দ্রপ্রদত্ত ভয়ঙ্কর একাগ্নি বাণ, অর্জুনের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অতএব কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ আজ নয়, এখন নয়।

ন তু তাবদহং মন্যে প্রাপ্তকালং তবানঘ।
সমাগমং মহাবাহো সূতপুত্রেণ সংযুগে॥
(দ্রোণপর্ব, ১৭৩/৩৭)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে কর্ণকে আক্রমণ করল নীলকান্তি মেঘবর্ণ বিশালকায় ঘটোৎকচ। করাল দন্ত, আকর্ণবিস্তৃত মুখ, পিঙ্গল শ্মশ্রু, লোহিত চক্ষু, দীপ্ত কুণ্ডলধারী হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ। বিশাল তার মস্তক। বিকট ধূসর তার কেশচূড়া। তার ধ্বজায় বসে চিৎকার করছে মৃতের মাংসভুক্ জীবন্ত গৃধিনী।

ঘটোৎকচ যুদ্ধ করছে। দুর্যোধনের প্রধান রক্ষী অলায়ুধের মাথা কেটে সেই ছিন্নমস্তক ঘটোৎকচ দুর্যোধনের দিকে নিক্ষেপ করল। অসংখ্য রাক্ষস বাহিনী কৌরবসৈন্য বিনাশ করতে লাগল। তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতে-করতে চিৎকার করে বলতে লাগল, "পালাও, পালাও তোমরা। আর আমাদের নিস্তার নেই।"...

কৌরবেরা তখন নিরুপায় হয়ে প্রাণভয়ে কর্ণকে অনুরোধ করল "তুমি শীঘ্র তোমার ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র দিয়ে এই রাক্ষসকে বধ কর। নইলে আজ আমরা সসৈন্যে বিনষ্ট হব।"

কর্ণ তখন তার একমাত্র ইন্দ্র-অস্ত্র, যা সে এতদিন রক্ষা করে আসছিল অর্জুনের জন্য, সেই বৈজয়ন্তী শক্তি, যমরাজের লোলিহান জিহ্বার মত, ভীষণ্য-মৃত্যুর সহোদরার মত, প্রজ্বলন্ত মহোল্কার মত ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করল।

ঘটোৎকচ বিন্ধ্যপর্বতের মত মেঘাকার বিরাট দেহ নিয়ে ভূমিতে পতিত হল। তার বিশাল দেহের ভারে কৌরবসৈন্যের এক অংশ নিষ্পেষিত হয়ে গেল।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবেরা যখন শোকাহত তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের উপরে উল্লসিত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, "আজ বড় আনন্দের দিন। বড় সৌভাগ্যের দিন।"

শ্রীকৃষ্ণের এই বিষম আচরণে অর্জুন অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, "কৃষ্ণ, এ তুমি কি করছ? আমরা যখন শোকাহত তখন তুমি এমন করে আনন্দ করছ কেন?"

—"পার্থ, সৌভাগ্যক্রমে কর্ণ আজ ইন্দ্র-অস্ত্র হারাল। তোমার জীবন সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হল।"

ওদিকে রাজপ্রাসাদে ধৃতরাষ্ট্র খবর শুনে আঁতকে উঠলেন, "সঞ্জয়, দুর্যোধন মূর্খ! ঘটোৎকচের মৃত্যুতে সে মূঢ়ের মত আনন্দ করছে। পরামর্শদাতারা তাকে প্রতারণা করেছে। তোমরা কি করছিলে? কর্ণ এত বড় ভুল কেন করল? তার ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়ে এতদিন অর্জুনকে বধ না-করে সে বৃথা অপব্যয় করল একটা রাক্ষসের উপরে? অর্জুন জীবন পেল, আর কর্ণ ডেকে আনল তার মৃত্যু আর সেই সঙ্গে কৌরবদের ধ্বংস। শ্রীকৃষ্ণ এমনি করে চতুর কৌশলে কর্ণের ইন্দ্র-অস্ত্র তৃণের মত তুচ্ছ করে দিলেন।"

—"মহারাজ, আমরা প্রতিদিন রাত্রে কর্ণকে বলেছি, আগামীকাল তুমি তোমার ইন্দ্র অস্ত্র দিয়ে অর্জুনকে আগে নিহত কর। কিংবা পাণ্ডবদের মূল আশ্রয় কৃষ্ণকেই বধ কর। তাহলে এক দণ্ডেই আমাদের যুদ্ধ জয় হয়ে যাবে। কিন্তু প্রতিদিন যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণকে দেখে কর্ণ কেমন যেন মোহিত হয়ে পড়তেন। শ্রীকৃষ্ণও সর্বদা অর্জুনকে কর্ণের সামনে যেতে দিতেন না। সাত্যকির প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমিই কর্ণকে মোহিত করে রাখতাম। কর্ণের ইন্দ্র-অস্ত্র অর্জুনের মৃত্যুস্বরূপ ছিল—এই চিন্তায় আমি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতাম। আমার মনে আনন্দ ছিল না। রাত্রে ঘুম হ'ত না'।"

…চিন্তয়তোঽনিশম্।
ন নিদ্রা ন চ মে হর্ষো মনসোঽস্তি যুধাং বর॥
(দ্রোণপর্ব, ১৮২/৪১)

আজ তাই শ্রীকৃষ্ণ এত উৎফুল্ল। তাঁর বুক থেকে যেন দুশ্চিন্তার পাথর নেমে গেল।

যুদ্ধ চলছে। রাত ভোর হল। আজ যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবস। এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামের তবু বিরাম নেই।

দুর্যোধনের সম্মুখে সাত্যকি।

ভাগ্যের পরিহাস, দুই বাল্যবন্ধু আজ চরম সংগ্রামে মুখোমুখী। যুদ্ধের রক্তরাঙা পটভূমির উপরে কবি এঁকে দিচ্ছেন মানব হৃদয়ের ইন্দ্রধনুচ্ছটা। লোভ হিংসা মৃত্যুর বুকে দুলিয়ে দিচ্ছেন প্রেম প্রীতি ভালবাসার বৈজয়ন্তী। সমগ্র মহাভারতে এমন সুন্দর দৃশ্য বড় অল্পই আছে। কবি দেখাচ্ছেন মানব হৃদয়ের সেই পবিত্র মহিমা। সব চাইতে হেয় নিন্দিত ঘৃণিত যে মানুষ, সেই দুর্যোধনের হৃদয়। এখন, এই মুহূর্তে, দুর্যোধনকে দেখে আমাদের মনে হবে, মানুষের হৃদয় বড় রহস্যময়, বড় দুর্জ্ঞেয়। মানুষকে জানা তার হৃদয়ে প্রবেশ করা বড় সহজ নয়। দুর্ভেদ্য সে যেন এক দুর্গ। "সর্ব দুর্গেষু মন্যন্তে নরদুর্গং সুদুস্তরম্" (শান্তিপর্ব, ৫৬/৩৫)। তাই স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন, মানুষ যেমনই হোক "মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই—ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ" (শান্তিপর্ব, ২৯৯/২০)। এই মানুষ সর্বভূতের মধু—"ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধু" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২-৫-১৩)! এই মনুষ্য জন্ম, বিশেষ করে যাঁরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা ধন্য, দেবতার চেয়েও অধিক, এই বলে দেবতারা তাঁদের স্তুতিগান করেন।

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি।
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, ৩/২৪)

দুর্যোধন তার বাল্যবন্ধু সাত্যকিকে দেখছে। ছোটবেলার কত সুখস্মৃতি ভেসে উঠছে তার মনে। প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে দুর্যোধন বলছে, "ভাই সাত্যকি, মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কথা? আমরা একসঙ্গে লেখাপড়া করেছি, একসঙ্গে খেলা করেছি। আজ মনে হয় সে যেন কোন্ দূরের স্বপ্ন। কোথা থেকে এল এই সর্বনাশা যুদ্ধ? আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব মুছে নিয়ে গেল! শুধু লোভ আর ক্রোধ ডেকে এনেছে

এই যুদ্ধ। নিষ্ঠুর লোভের বশে আজ তুমি আর আমি সামনাসামনি যুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। কি হবে আমাদের এই যুদ্ধে? কি হবে আমার রাজ্যে আর ঐশ্বর্যে?"

সাত্যকির কণ্ঠও স্নেহকোমল, "রাজকুমার, ভুলে যাও সে কথা। একসঙ্গে আমরা যেখানে পড়েছি খেলেছি গল্প করেছি এ সেই আচার্যের ভবন নয়, রাজসভাও নয়।"

দুর্যোধন বলল, "বন্ধু, ধিক্ তবে এই লোভ এই ক্রোধ এই মোহ এই ক্ষত্রিয় আচার। একদিন তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলে। আমিও তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম। সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত। আমাদের সেই বন্ধুত্ব এমনি করে হারিয়ে গেল কেন? মনে হয় কালের গতি অতিক্রম করা যায় না—ভূয়ঃ কালো হি দুরতিক্রমঃ।"

সাত্যকি বললেন, "রাজা, ক্ষত্রিয় বীরের এই হল ভাগ্য। তাকে গুরুজন প্রিয়জনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। যদি আমি তোমার প্রিয় হই তাহলে আর বিলম্ব ক'রো না, এখনই আমাকে সংহার কর। বন্ধু, তোমার হাতে মৃত্যু বরণ করে পুণ্যলোকে গমন করব। তোমার হাতে যত শক্তি আছে, তোমার কাছে যত অস্ত্র আছে, তাই দিয়ে আমাকে শীঘ্র আঘাত কর। আমি আর দুই মিত্রপক্ষের সঙ্কট দেখতে চাই না। যদি তেঽহং প্রিয়ো রাজন্ জহি মাং মা চির কৃথাঃ।" (দ্রোণপর্ব, ১৮৯/৩১)

সাত্যকি নির্ভয়ে এগিয়ে এসে বুক পেতে দিল তার প্রিয়সখা বাল্যবন্ধু দুর্যোধনের সামনে। নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে দুই বন্ধুর উদ্বেল হৃদয়ের এই গৌরব দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই।...

ওদিকে দ্রোণ সাক্ষাৎ কৃতান্তের মত পাণ্ডবসেনা সংহার করে চলেছেন। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে সব ছারখার করে দিচ্ছেন।

আকাশমার্গে তখন সপ্ত ঋষি আবির্ভূত হয়ে দ্রোণকে বললেন, "তুমি অন্যায় যুদ্ধ করছ। এই ক্রূর কর্ম তোমার যোগ্য নয়। তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর। আর এমন করে পাপ ক'রো না। কৃতং কর্ম ন সাধু তৎ। মা পাপিষ্ঠতরং কর্ম করিষ্যসি পুনর্দ্বিজ। ন্যস্যায়ুধং রণে বিপ্র।"

এমন সময় মালব রাজের 'অশ্বত্থামা' নামে এক হস্তীকে নিহত করে ভীম এসে দ্রোণকে বললেন, "শোন ব্রাহ্মণ, অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে।"

কিন্তু ভীমের কথা দ্রোণ বিশ্বাস করলেন না। সপ্তর্ষির নিষেধ বাক্যে উন্মনা হয়ে তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন। কেননা দ্রোণ

বিশ্বাস করতেন ত্রিলোকের অধীশ্বর হবার জন্যও যুধিষ্ঠির কখনো মিথ্যা বলবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "দ্রোণ যদি আর অর্ধদিবস এইভাবে যুদ্ধ করেন তাহলে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আপনি দ্রোণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন! প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বললে তাতে পাপ স্পর্শ করে না। জীবিতস্যার্থে বদন্ন স্পৃশ্যতেঽনৃতৈঃ।" (দ্রোণপর্ব, ১৯০/৪৭)

তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে প্রেরিত হয়ে কালের বশবর্তী রাজা যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলবার জন্য উদ্যোগী হলেন।

তিনি উচ্চস্বরে বললেন, "অশ্বত্থামা হত," তারপর মৃদু অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত।" (ওই নামে একটা হাতী মরেছে)

এতদিন সত্যের বলে যুধিষ্ঠিরের রথ মাটি থেকে চার আঙুল উপরে থাকত। কিন্তু এই মিথ্যা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রথ নেমে এসে মাটি স্পর্শ করল।

দ্রোণ অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন অস্ত্র তাঁর স্মরণে এল না। তবু তাঁর আঙ্গিরস ধনু আর ব্রহ্মদণ্ড বাণ নিয়ে শিথিল হস্তে দুর্বল শোকার্ত অন্তরে যুদ্ধ করে চলেছেন।

তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন না। ভীম গিয়ে তাঁকে মৃদুস্বরে বললেন, "আপনার লজ্জা করে না? আপনি ব্রতচ্যুত ব্রাহ্মণ। অব্রাহ্মণের মত নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ সংহার করছেন? যার জন্য আপনি অস্ত্র ধারণ করে আছেন, যার অপেক্ষায় বেঁচে আছেন, আপনার সেই পুত্র আজ রণভূমিতে শায়িত। ধর্মরাজের বাক্যে আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়।"

শরাসন ত্যাগ করে তখন দ্রোণাচার্য বললেন, "কর্ণ কৃপ দুর্যোধন, তোমরা যুদ্ধ কর। আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম।"

কয়েকবার বুকফাটা স্বরে অশ্বত্থামার নাম ধরে ডেকে দ্রোণ হাতের অস্ত্র ফেলে দিলেন। রথের মধ্যে যোগস্থ হয়ে বসে ব্রহ্মমন্ত্র জপ ও বিষ্ণুর ধ্যান করতে লাগলেন। তাঁর দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করল। দ্রোণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির এই আধ্যাত্মিক দৃশ্য দেখতে পেলেন মাত্র পাঁচ জন—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কৃপ যুধিষ্ঠির ও সঞ্জয়।

দ্রোণ ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন।...

উদ্যত খড়্গ নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ছুটে যাচ্ছেন।...

অর্জুন দূর থেকে দেখে চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসছেন, "দ্রুপদপুত্র,

আচার্যকে বধ ক'রো না। বধ ক'রো না। তাঁকে জীবিত বন্দী কর। জীবন্তমানয়াচার্যং মা বধীর্দ্রুপদাত্মজ।"...

সৈন্যগণও বারবার বলতে লাগল, "বধ ক'রো না, বধ ক'রো না। ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ"...

তথাপি ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের কেশ গ্রহণ করে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। তারপর হাতের রক্তাক্ত খড়্গ ঘুরিয়ে সিংহনাদ করতে লাগলেন। দ্রোণের ছিন্নমুণ্ড তুলে নিয়ে কৌরব সৈন্যের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন।

ভীম ছুটে এসে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে পৃথিবী কাঁপিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

[ত্রিশ]

কর্ণের যুদ্ধ না আত্মহত্যা ?

দ্রোণ বধের পর পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে এক নিদারুণ নৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। এতখানি সঙ্কট তাঁদের জীবনে আর কখনো আসেনি। এতদিন চরম দুর্ভাগ্য অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যেও তাঁরা অন্তরে অটল ছিলেন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, আমরা কখনও অধর্ম করিনি, করব না। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ। ধর্ম ও সত্যের জন্য তিনি সব ত্যাগ করেন ; কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্য ও ধর্মকে ত্যাগ করেন না। অর্জুনের সকল বীরত্ব দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ন্যায় সততা ও অকৃত্রিম গুরুভক্তির উপরে। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব—স্বভাবে প্রকৃতিতে তাঁরা ভিন্ন হলেও, একপ্রাণ হয়ে বাঁধা আছেন সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের অকলঙ্ক চরিত্রমহিমায়।

কিন্তু ঠিক সেইখানেই এল আঘাত। তাঁদের মর্মস্থানটিকেই কে যেন ছিন্ন উৎপাটন করে দিয়ে গেল। কবি অত্যন্ত নিপুণভাবে পাণ্ডবদের এই চরম সংকট আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। যুদ্ধের সংক্ষুব্ধ ঘটনাতরঙ্গের মধ্যে অন্তর বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নেই। তবু তিনি তা উপেক্ষা করলেন না। বরং এই নৈতিক সংঘাত দেখিয়ে ঘটনার নাটকীয়তাকেই তীব্র করে তুললেন। বেদব্যাস কেবল কাহিনীকার নন, তিনি অন্তর্যামী হৃদয়সংবাদী মহাকবি।

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দ্রোণাচার্যের নিধনের পরে কৌরবেরা ভয়ে রণস্থল থেকে পলায়ন করেছিল। কিন্তু কার উৎসাহে আবার তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এমন ভয়ঙ্কর নিনাদ করছে ?"

অর্জুন উত্তর দিলেন। কিন্তু এ কোন্ অর্জুন ? উদ্ধত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এমন তীক্ষ্ণ বাণের মত মর্মবিদ্ধ করে অর্জুন তো কোনদিন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলেননি ? পিতার মত যাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, যখন সবাই তাঁকে নিন্দা করেছে ধিক্কার দিয়েছে, তখনও অর্জুন বিনীত প্রণত হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, মুখ তুলে কোনদিন প্রতিবাদ করেননি। আজ তাঁর একি হল ?

—"রাজন্, অশ্বত্থামা প্রতিহিংসায় সিংহনাদ করছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার গুরুদেবের কেশাকর্ষণ করেছিল, অশ্বত্থামা সে অপমান ক্ষমা করবে না। ধর্মজ্ঞ হয়েও আপনি রাজ্যের লোভে মিথ্যা কথা বলে গুরুকে প্রতারণা করেছেন।

আপনি ঘোর অধর্ম করেছেন। আপনার উপরে দ্রোণাচার্যের এই বিশ্বাস ছিল যে, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, আমার শিষ্য, সে কখনো মিথ্যা বলবে না। কিন্তু আপনি তাঁকে মিথ্যা কথা বলেছেন। অস্ত্রত্যাগী গুরুকে অধর্ম অনুসারে হত্যা করিয়েছেন। বালীবধের জন্য রামচন্দ্রের যেমন অকীর্তি হয়েছে, দ্রোণ বধের জন্য আপনারও তেমনি ত্রিলোকে চিরস্থায়ী কলঙ্ক থেকে যাবে। আমাদের জীবনের বেশিরভাগই তো অতীত হয়েছে, আর অল্পকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে ; আমরা এই শেষ জীবনে অধর্ম করে বিকারগ্রস্ত হলাম। গুরু পিতৃ-তুল্য। তিনি আমাদের পিতার মতই স্নেহ করতেন। আমাকে তিনি পুত্রের অধিক ভালবাসতেন। তিনি শুধু আপনাকে এবং আমাকে দেখেই অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন। নইলে যুদ্ধে তাঁকে ইন্দ্রও বধ করতে পারতেন না। আমার গুরু মনে-মনে জানতেন, অর্জুন প্রয়োজন হলে তার গুরুর জন্য পিতা পুত্র ভ্রাতা স্ত্রী এমনকি জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। সেই আমি তাঁর মৃত্যু দেখেও চুপ করে বসে আছি। ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমি চিৎকার করে নিষেধ করতে-করতে ছুটে আসছিলাম, কিন্তু সে শুনল না। শিষ্য হয়ে গুরুকে বধ করল। ওঃ, আমরা মহাপাপ করেছি। আমরা লোভী। আমরা নীচ।"

অর্জুন সাশ্রুনয়নে বাষ্পাকুল কণ্ঠে কথা বলছেন। অর্জুনের অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেই বীরত্ব তাঁর চরিত্রের আর একটি সুকোমল দিক্ ঢেকে রেখেছে। অর্জুন শুধু বীর নন, অর্জুন হৃদয়বান্, অর্জুন শিল্পী, অর্জুন প্রেমিক। স্বর্গে অস্ত্রশিক্ষা করতে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে চিত্রসেনের কাছে গন্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা দেন (বনপর্ব, ৪৪ অধ্যায়)। রূপবান্ অর্জুনকে দেবতারা শিল্পসৌন্দর্যবোধে হৃদয়বান্ করে তোলেন। তাই অর্জুনের বীরত্বের মধ্যে আমরা পাই একটা দিব্যশ্রীমণ্ডিত গাম্ভীর্য, একটা আভিজাত্য, যা তাঁর বীরত্বকে দিয়েছে বিশেষ এক দৈব মহত্ত্ব। অর্জুন যতবড় বীর ততবড় প্রেমিক। তাই স্বাভাবিক কারণেই মহাভারতে আমরা দেখি, একাধিক নারী তাঁর প্রতি প্রণয়ব্যাকুল। এমনকি দ্রৌপদীও তাঁর হৃদয়ের নিভৃত প্রেমের অর্ঘ্য সঙ্গোপনে সাজিয়ে রাখেন, নীলগিরির মত সুঠাম শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় ("শ্যামো যুবা নীল ইবোচ্চশৃঙ্গ"—বনপর্ব, ৯০/৪৯) এই তৃতীয় পাণ্ডবের জন্য। দেখে চমৎকৃত হই, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সুধর্ম সভায় নারদের পাশে বসে বীণা বাজাচ্ছেন, নৃত্যগীতে মাতিয়ে তুলছেন এই গাণ্ডীব-ধন্বা বীর অর্জুন (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৯০/৬৮-৬৯)। ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্ব যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি তাঁর চোখের জল।

হৃদয়ের এই ভাবশীলতার অভাবে বীরত্ব যে কি ভয়ানক হতে পারে তার

দৃষ্টান্ত ভীম—একটা নিরেট জমাট হিংসা ও বিক্রমের প্রতিমূর্তি। ভীমের হৃদয়ের কোন বালাই নেই। ভীম নিজেই বলেছেন, "আমি অর্জুন নই—নার্জুনোঽহং" (দ্রোণপর্ব, ১২৭/৪৯)। তাঁর অমানুষিক বীরত্ব ও উন্মাদ জিঘাংসা মনে শ্রদ্ধা জাগায় না, পরিবর্তে জাগে ভয়। দুঃশাসন ও দুর্যোধনের হত্যার দৃশ্যে ক্রূরকর্মা ভীমের বীরত্বে তাই কেউ প্রশংসা করতে পারে না। এমনকি পাণ্ডবেরাও অনুমোদন না করে মৌন হয়ে থাকেন। যুধিষ্ঠির ভীমের নিষ্ঠুরতা দেখে থাকতে না-পেরে শেষে ধমক দিয়ে ওঠেন, "ভীম, ক্ষান্ত হও।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাই ভীমকে এক রক্তপ রাক্ষস ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি।

ভীমের স্বভাবের চরিত্রের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (উদ্যোগপর্ব, ৭৫ অধ্যায়)। ভীম যেন ক্রোধের এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড—ধূমে তাপে উত্তপ্ত। প্রতিহিংসার জ্বালায় রাত্রে শয়ন না-করে ছটফট করেন। মাটিতে পা আছড়ান—"নিঘ্নন পদ্ভিঃ ক্ষিতিং"। দিনে রাতে কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না। নির্জনে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চোখ বুজে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, কখনো-বা উন্মত্তের মত একলা বসে ক্রন্দন করেন। ওষ্ঠ দংশন করে ভ্রূকুটি করে তাকান। পরিচিত লোক তাঁকে দেখে উন্মাদ মনে করত।

ধৃতরাষ্ট্রও বলছেন (উদ্যোগপর্ব, ৫১ অধ্যায়), "ভীমের কথা মনে হলে আমার হৃদয় উদ্বেগে কেঁপে ওঠে। সে অত্যন্ত ক্রূর এবং ক্রোধী। ভাঙবে তবু নত হবে না। তার ঘন কালো ভ্রূ নিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। তার চক্ষু আরক্ত পিঙ্গলবর্ণ। তাল বৃক্ষের চেয়েও উন্নত শরীর। অশ্বের চেয়েও বেগবান্, হস্তীর চেয়েও বলবান্। তার কণ্ঠস্বর উদ্ধত, কিন্তু সে স্পর্ষ্ট করে কথা বলে না।"

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ তিনি ভীমকে চোখে দেখেননি। কিন্তু ভীমের এই আকৃতি ও স্বভাবের বর্ণনা শুনেছেন ব্যাসদেবের কাছে (উদ্যোগপর্ব, ৫১/২১)। সেই থেকে তিনি মনে করে রেখেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণ চক্ষুর মত কাজ করে।…

দ্রোণ বধের পরে অর্জুন যখন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে অভিযোগ করছেন, ক্রোধন স্বভাব ভীম তখন এগিয়ে এসে উত্তর দিলেন, "অর্জুন, তুমি মূর্খের মত কথা বলছ। অবিপশ্চিদ্ যথা বাচম্। এমন কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। তুমি অরণ্যবাসী মুনির ন্যায় ধর্মকথা বলছ, ভুলে যেও না, তুমি ক্ষত্রিয়। ভুলে যেও না, অধর্ম করে কৌরবেরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করেছে। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে অতি জঘন্যভাবে অপমান করেছে। আমাদের তের

বৎসর নির্বাসিত করেছে। আমরা এখন একে-একে তার প্রতিশোধ নিচ্ছি। তুমি ক্ষাত্রিয়ধর্ম জান না। তোমার এসব কথা আজ মিথ্যা—স্বধর্মং নেচ্ছসে জ্ঞাতুং মিথ্যাবচনমেব তে। তোমার এইসব কথা আমাদের অন্তরে ক্ষতের উপরে ক্ষার ছিটিয়ে দিচ্ছে। যদি চাও তোমরা চার ভাই যুদ্ধ ক'রো না। আমি একাই যুদ্ধ করব।"

ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন বললেন, "অর্জুন, আমি কেবল ভগ্নী দ্রৌপদী ও তার সন্তানদের মুখ চেয়ে তোমার এই সব বিপরীত কথা সহ্য করছি। পিতামহ ভীষ্মকে বধ করে যদি তোমার পাপ না হয়ে থাকে, তাহলে দ্রোণকে বধ করে আমিও কোন পাপ করিনি। দ্রোণ ব্রাহ্মণধর্মচ্যুত নৃশংস ক্রূর। বিশেষ করে পাঞ্চাল শত্রু। দ্রোণ বধের জন্যই আমার জন্ম। যুধিষ্ঠিরও মিথ্যাবাদী নন, আমিও অধার্মিক নই। আমরা শিষ্যদ্রোহী পাপীকে নিহত করেছি।"

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যে উপস্থিত সকলে নীরব। যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত মুখে নীরবে বসে রইলেন ("আসন্ সুব্রীড়িতা")।

কেবল অর্জুনের চোখে জল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ধিক্, ধিক্।"

সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, "এখানে কি এমন কেউ নেই যে এই নরাধম অকল্যাণভাষী ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করতে পারে? তোমার কথা শুনে সকল পাণ্ডবেরা তোমাকে চণ্ডালের মত ঘৃণা করছেন। কুলাঙ্গার, গুরুবধ করে তুমি মহাপাতকের কাজ করেছ। অর্জুন ভীষ্মকে বধ করেননি। ভীষ্ম নিজেই নিজের বধের উপায় বলে দিয়েছেন। তাঁকে বধ করেছে তোমারই ভাই শিখণ্ডী। তোমাদের মুখ দেখলেও পাপ হয়। আর একবার যদি আমার গুরু অর্জুনকে, আমার গুরুর গুরু দ্রোণাচার্যকে নিন্দা কর, তাহলে এই গদার আঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করব।"

এই বলে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে চোখের ইঙ্গিত করলেন। ভীম গিয়ে সাত্যকিকে নিবারণ করলেন। পাণ্ডবশিবিরে এই সঙ্কট মোচনের জন্য শেষ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং বেদব্যাস।...

অনুশোচনায় পরিতাপে ভয়ে বিনিদ্র হয়ে সেই রাত্রি দুর্যোধনের বড় কষ্টে অতিবাহিত হল। সান্ত্বনা দেবার জন্য তার শিবিরে উপস্থিত ছিল দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনি। তাদের অতীতের সমস্ত কৃতকর্ম—সেই পাশাখেলা, সেই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, সেই হিংসা ষড়যন্ত্র হত্যা—নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মত তাদের নিদ্রাহীন আতঙ্কিত করে রাখল।

পরদিন প্রভাতে কৌরবদের সেনাপতি হল কর্ণ। সুবর্ণনির্মিত বিজয়-

ধনুতে টংকার দিয়ে মকর ব্যূহ রচনা করে কর্ণ যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিল। তার রথে উড়ছে শ্বেত পতাকা—ধ্বজাচিহ্ন হস্তীবন্ধনরজ্জু। শ্বেত পতাকা কেন? তবে কি কর্ণ যুদ্ধ চায় না? কিংবা যুদ্ধ চায় শুধু শৌর্য ও পরাক্রম প্রকাশের জন্য? কর্ণের অন্তরই জানে এর উত্তর। মাতা কুন্তীকে সে যে কথা দিয়েছে, চিরদিন কুন্তী থাকবেন পঞ্চপুত্রের জননী। সেদিন সেই নির্জন ভাগীরথী তীরে জননীর আশীর্বাদরূপে কর্ণ শিরে তুলে নিয়েছে আপনার মৃত্যু। কেউ জানে না। কেবল সাক্ষী তার অন্তর, আর সাক্ষী দেব দিবাকর। ধ্বজার বন্ধনরজ্জু চিহ্ন কি তার নিজেরই নিয়তির বন্ধনপাশ? আমাদের এই অনুমান মিথ্যা নয়; স্বয়ং বেদব্যাস বলছেন, কর্ণের ধ্বজায় এই বন্ধনরজ্জুচিহ্ন তার ভাগ্যের কালপাশের মত দেখাচ্ছে—"কালপাশোপমাহয়সী" (কর্ণপর্ব, ৮৭/৯৭)। তাই কি কর্ণ বারবার বলে দুর্লঙ্ঘ্য ভাগ্যের দৈবের কথা? "শঙ্কে দৈবস্য তৎকর্ম পৌরুষং যেন নাশিতম্ (দ্রোণপর্ব, ১৫২/৩৪)—আমার আশংকা হয়, এসব দৈবের কার্য। দৈব আমার সকল পুরুষার্থ নষ্ট করে দিয়েছে।"

কর্ণ তো ভীমকে পরাস্ত করেছিল। অনায়াসে তাঁকে নিহত করতেও পারত। আর ভীম নিহত হলে যুদ্ধের গতিই পাল্‌টে যেত। কিন্তু তবু কর্ণ করুণ একটু হেসে ভীমকে নিহত না করে ছেড়ে দিয়েছিল।

অর্জুনকে বধ করবার জন্য যে ইন্দ্র-অস্ত্র তার ছিল, যে আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের পর্যন্ত মনে হর্ষ ছিল না, রাত্রে ঘুম হ'ত না,—চোদ্দ দিন ধরে যুদ্ধ চলল, তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, তবু কর্ণ অর্জুনের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র ব্যবহার করল না। দিনের পর দিন সে ভুলে গেল। এ ভুল এ বিস্মরণ কি শ্রীকৃষ্ণের মায়া? নাকি তার নিজেরই ইচ্ছাকৃত? দুর্যোধনের চাপে পড়ে পাছে তাকে শেষপর্যন্ত অর্জুনের উপরেই সেই বাণ নিক্ষেপ করতে হয়, তাই সামান্য অজুহাতে তা সে প্রয়োগ করল ঘটোৎকচের উপরে? শুনে ধৃতরাষ্ট্র মন্তব্য করেছিলেন, "এইভাবে কর্ণ নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনল।" কর্ণ কি তা ভাবেনি? তাছাড়া অর্জুনের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে তক্ষক নাগ কর্ণকে বলল, "তুমি আবার বাণ নিক্ষেপ কর। আমি তোমার বাণের মধ্যে যোগবলে প্রবেশ করে অর্জুনকে বধ করব।"

অর্জুনকে বধ করার এই শেষ সুযোগও সে গ্রহণ করল না। বলল, "আমি অন্যের সাহায্য নিয়ে শত্রুকে বধ করব না।"

আমাদের মনে হয়, মুখে সে যাই বলুক, অর্জুনকে বধ করা কর্ণের অভিপ্রেত ছিল না। অর্জুনের সামনে রথ স্থাপিত করে কর্ণ শল্যকে ম্লান

হেসে প্রশ্ন করল, "শল্য, তুমি সত্য করে বল, আজ যদি অর্জুন আমাকে নিহত করে, তাহলে তুমি কি করবে ?"

অথাব্রবীৎ সূতপুত্র শল্যমাভাষ্য সস্মিতম্ ॥
যদি পার্থো রণে হন্যাদদ্য মামিহ কর্হিচিৎ।
কিং করিষ্যসি সংগ্রামে শল্য সত্যমথোচ্যতাম্ ॥
(কর্ণপর্ব, ৮৭/১০১-০২)

এই কথা বলে কর্ণ প্রকারান্তরে তার নিজের মৃত্যুই জানিয়ে দিল। বস্তুত কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের কাওকেই বধ করতে চায়নি। একের পর এক সুযোগ এসেছে তার। কিন্তু সে গ্রহণ করেনি।

কর্ণের বিরুদ্ধে একবার সসৈন্যে আস্ফালন করতে-করতে এগিয়ে এলেন নকুল, "পাপী, তুমিই সমস্ত শত্রুতা ও কলহের মূল। আজ তোমাকে বধ করব।"

কিন্তু কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণে নকুল পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। তখন কর্ণ ছুটে গিয়ে নকুলের গলায় ধনুকের ছিলা জড়িয়ে টানতে-টানতে বলল, "ওহে বীর, এবার তোমার বীরত্ব দেখাও। মাদ্রীপুত্র, আমার কাছে পরাজিত হয়েছ বলে লজ্জিত হয়ো না। যাও, এখন গৃহে ফিরে যাও, কিংবা কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও।"

কর্ণ নকুলকে বধ করল না।

তারপর যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির কর্ণকে আক্রমণ করলেন, "কর্ণ, তোমার যত বীরত্ব আর পাণ্ডবদের প্রতি যত বিদ্বেষ আছে আজ তা দেখাও"—

দুজনের ভীষণ যুদ্ধ হল। যুধিষ্ঠিরের কবচ বিদীর্ণ। তিনি আহত রক্তাপ্লুত। তাঁর পিঠের দুইটি তূণ ছিন্ন হয়ে পড়ল। রথ ও ধ্বজা ভঙ্গ। বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির অন্য একটি রথে উঠে পলায়ন করছেন। কর্ণ ছুটে গিয়ে দৃঢ় হস্তে তাঁর স্কন্ধ স্পর্শ করে বলল, "যুধিষ্ঠির, ক্ষত্রিয় কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না। তুমি যাগযজ্ঞ বেদপাঠ কর, ব্রাহ্মবলে কুশল, তাই বলে কখনো যুদ্ধ করতে এস না। আমাকে আর কোনদিন অপ্রিয় বাক্য ব'লো না। শোন রাজা, কর্ণ কখনো তোমাকে বধ করবে না—ন হি ত্বাং সমরে রাজন্ হন্যাৎ কর্ণঃ কথঞ্চন।" (কর্ণপর্ব, ৪৯/৫৯)

কেননা কর্ণ মনে-মনে চেয়েছে, জয়ী হোক রাজা হোক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। তাই সে উদ্যোগপর্বের শেষে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছে, তার পরিচয় যেন যুধিষ্ঠির না জানে। জানলে সে আর রাজা হতে চাইবে না।…

সেইদিন রণক্ষেত্রের আর এক প্রান্তে ঘটে গেল এক পৈশাচিক ঘটনা।

দুঃশাসনের সঙ্গে ভীমের ঘোর যুদ্ধ হচ্ছে।

প্রচণ্ড আক্রমণে ভীমের সারথি নিহত। তাঁর ধনু ছিন্ন। ভীম শরাঘাতে জর্জরিত। ভীম তখন ক্রোধে জ্বলন্ত আগুন, "দুরাত্মা, আজ তোর বক্ষরক্ত পান করব—পাস্যামি তে শোণিত।" এই বলে গদা ঘূর্ণিত করে দুঃশাসনের মস্তকে আঘাত করলেন। দুঃশাসন আর্তনাদ করে ছিটকে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করতে-করতে ভীম দুঃশাসনের গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন। দুঃশাসনের দেহ থরথর করে কাঁপছে। সকলকে চিৎকার করে শুনিয়ে ভীম বললেন, "আমি আজ পাপী দুঃশাসনকে বধ করছি। সাধ্য থাকে তোমরা তাকে রক্ষা কর।"

দুঃশাসনের গলায় পা দিয়ে বললেন, "রে দুরাত্মা, মনে পড়ে দ্যূত সভায় তুই আমাকে 'গরু' 'গরু' বলে উপহাস করেছিলি? মহারাণী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলি? জিজ্ঞাসা করছি, বল্, কোন্ হাতে তুই দ্রৌপদীর কেশ স্পর্শ করেছিলি?"

পদদলিত দুঃশাসন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "এই আমার বলিষ্ঠ হস্ত, এই হস্তে সহস্র গো-দান করেছি, অজস্র ক্ষত্রিয় নিধন করেছি; ভীমসেন, এই হস্তে কৌরবসমক্ষে আমি যাজ্ঞসেনীর কেশাকর্ষণ করেছিলাম।"

—"কি? এত স্পর্ধা?"

জিঘাংসায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন ভীম। দুঃশাসনের সেই কঠিন হস্ত উৎপাটন করে তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। দুঃশাসনের বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। সেই তপ্ত রক্ত পান করতে-করতে ভীম বললেন, "মাতার স্তন্যদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তম মাধ্বীক মদ্য, দিব্য জল, মথিত দধি, অমৃততুল্য যত পানীয় আছে, তার চেয়েও সুস্বাদু এই শত্রুর বুকের রক্ত।"

রক্তমাখা দুই হাত তুলে রক্তাক্ত মুখে বিকট অট্টহাস্য করে ভীম বললেন, "আর তোকে আমি কি করব? এখন মৃত্যু এসে তোকে রক্ষা করেছে।"

ভীমের এই রক্তপানরত উন্মত্ত অট্টহাসি আর ভয়ঙ্কর নৃত্য দেখে সবাই ভয়ে চোখ বন্ধ করে বলতে লাগল, "ভীম মানুষ নয়, ভীম রাক্ষস। ন বৈ মনুষ্যোহয়মিতি ভীমং রক্ষো।" (কর্ণপর্ব, ৮৩/৩৫-৩৬)

আজ যুদ্ধের সপ্তদশ দিবস।

ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র নিহত। কেবল দুর্যোধন জীবিত।

কর্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করল অর্জুনকে।

আর তো কর্ণের অপেক্ষা করার সময় নেই। দুর্যোধন তার চোখের সামনে নিহত হবে তা সে দেখবে কেমন করে? দুর্যোধনকে কর্ণ বলল, "কেবল শৌর্য আর পৌরুষ ছাড়া আজ আর আমার কিছু নেই। আমি নিঃস্ব অরক্ষিত। সহজাত কবচকুণ্ডল চলে গেছে। শেষ হয়েছে ইন্দ্রের একাগ্নি বাণ। আছে শুধু পরশুরাম প্রদত্ত আমার এই বিজয় ধনু আর মৃত্যুভয়হীন বীরের হৃদয়।"

কর্ণ মনে-মনে নিজের মৃত্যু চিন্তাই করছে। তবু তার মুখে সেই করুণ হাসিটুকু লেগে আছে। তার কথায় নয়, আচরণেও নয়, কর্ণের ওই ম্লান হাসির মধ্যেই রয়েছে তার প্রকৃত আত্মপরিচয়। কবি বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কর্ণের ওই করুণ হাসির দিকে।...

প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার ভাগ্যফল অন্তিমে যজ্ঞের হোম শিখার মত ঊর্ধ্বে উঠে যায়, ধর্ম অধর্মের গতি অনুসারে সেই আঁচশিখা ঊর্ধ্বলোকে গিয়ে দুই দিকে পৃথক হয়ে পড়ে—একটা চলে যায় চাঁদের জ্যোৎস্নাধোয়া শুভ্র দেব-যানের পথে; আর একটি ধূম্রজালে আচ্ছন্ন অন্ধকার পিতৃযানের পথে (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫-১০-২/৪)। একপক্ষে দাঁড়িয়ে দেবলোক ব্রহ্মলোক, অপরপক্ষে মনুষ্যলোকের পিতৃলোকের যক্ষ রক্ষ অসুর পিশাচ।

কর্ণ অর্জুনের এই যুদ্ধেও দুই পক্ষ দুই দিকে। ব্রহ্মা তাই বললেন, "কর্ণ দানব পক্ষ, আর অর্জুন দেবপক্ষ। তাই অর্জুনের জয় হবে।" (কর্ণপর্ব, ৮৭/৭০) ব্রহ্মা মহেশ্বর ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরিক্ষ থেকে এই যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। আমরা এখন বুঝতে পারছি শ্রীকৃষ্ণ কেন বারবার চেষ্টা করেছেন কর্ণকে কৌরবপক্ষ থেকে পাণ্ডবপক্ষে নিয়ে আসতে। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন, কর্ণ উঠে আসুক তার পিতৃযান থেকে দেবযানের পথে।

ঊর্ধ্বলোকে অর্জুনের পক্ষে পৃথিবী নদনদী বেদ-উপনিষদ দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি সিদ্ধচারণগণ—তাঁদের ওজঃ তেজ সিদ্ধি হর্ষ সত্য বিজয় ও আনন্দ—দেবতাদের পবিত্র সুগন্ধ ("পুণ্যগন্ধা মনোরমা")।

আর কর্ণের পক্ষে নক্ষত্র আকাশ, অসুর, রাক্ষস, প্রেত পিশাচ, বৈশ্য শূদ্র ও সঙ্কর জাতি—অপ্রীতিকর যত পূতি গন্ধ ("বিপরীতানারিষ্টানি অমনোজ্ঞাশ্চ যে গন্ধাঃ")।

উপনিষদের ঋষিও এই দুই গন্ধের কথা বলেছেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫-১০-৭), একটি শোভনকর্ম সুগন্ধ—"রমণীয়চরণা"। আর একটি অশোভন-কর্ম দুর্গন্ধ—"কপূয়চরণাঃ"। দিব্যগন্ধ যত দেবতার আর অপ্রিয় গন্ধ যত

অসুরের পাপের—"কল্যাণং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১-৩-৩)।

অর্জুন ও কর্ণ এই দুই বিপরীত গন্ধ জলে সিক্ত হলেন।

অর্জুনের অগ্নিরথ কর্ণের রথের অগ্রভাগে প্রতিহত হল। উভয়ের শ্বেত অশ্বের গ্রীবায়-গ্রীবায় সংঘর্ষ ঘটল। অর্জুনের ধ্বজা থেকে মহাকপি সবেগে লম্ফ দিয়ে আক্রমণ করল কর্ণের ধ্বজালাঙ্গুনা।

ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল।

তখন অশ্বত্থামা দুর্যোধনের হাত দুটি ধরে মিনতি করে বললেন, "দুর্যোধন, প্রসন্ন হও, এখনও সময় আছে, এই যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধি কর। রাজ্যের ও প্রজাদের মঙ্গল হবে। দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, ভীষ্মের পতন হয়েছে। কেবল যুদ্ধে অবধ্য বলেই কৃপাচার্য এবং আমি এখনও জীবিত আছি। অতএব বৃথা এই যুদ্ধ করে তোমার কোন লাভ হবে না। আমার কথা শোন, অন্যথায় ঘোর বিনাশ উপস্থিত হবে। আমি যদি এখনও নিষেধ করি অর্জুন যুদ্ধে নিবৃত্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ চান না। আর যুধিষ্ঠির সকলের মঙ্গলকামী, তিনি শত্রুতা কামনা করেন না। আমার অনুরোধ তিনি নিশ্চয় রাখবেন। যুধিষ্ঠির ধর্মত তোমার যতটা রাজ্য প্রাপ্য তা তিনি অবশ্যই তোমাকে দেবেন। তুমি যদি সম্মত হও, আমি কর্ণকে নিরস্ত করি।"

দুর্যোধন দুঃখিত মনে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সখা, তোমার কথা সত্য। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে দুর্মতি ভীম দুঃশাসনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে যে সব কথা বলেছে তা তো তুমি শুনেছ। সন্তাপে আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আর সন্ধি কেমন করে সম্ভব ? আমার সব শত্রুতার কথা স্মরণ করে পাণ্ডবেরা আর আমাকে বিশ্বাস করবে না। অতএব তুমি কর্ণকে নিষেধ ক'রো না। আমার মনে হয় অর্জুন যুদ্ধশ্রান্ত, কর্ণ তাকে বধ করতে পারবে।"

দুর্যোধন অনুনয় বিনয় করে অশ্বত্থামাকে প্রসন্ন করে সৈন্যদের আদেশ দিল, "তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? শত্রুকে আক্রমণ করে যুদ্ধ কর। বিনাশ কর।"

অর্জুন ভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হয়ে আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নিতে প্রজ্বলিত সৈন্যগণ আর্তনাদ করতে লাগল।

কর্ণ তৎক্ষণাৎ বরুণ অস্ত্র দিয়ে অর্জুনের আগ্নেয় অস্ত্র ব্যর্থ করে দিল।

অর্জুন ইন্দ্রের বজ্র মহেন্দ্র অস্ত্র ত্যাগ করলেন। কর্ণের ভার্গব অস্ত্রে তা নিষ্ফল হল।

শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পার্থ, তোমার দিব্যাস্ত্র নিষ্ফল হচ্ছে কেন ? আবার কি তোমার মোহ উপস্থিত হয়েছে ?"

ভীম হতাশ উত্তেজিত, "অর্জুন, তোমার অস্ত্র সব নিবারিত হচ্ছে। শত্রুরা হর্ষধ্বনি করছে। যদি তুমি না পার, ছেড়ে দাও, আমি কর্ণকে বধ করি।"

অর্জুন বললেন, "কৃষ্ণ, তুমি অনুমতি দাও, দেবগণ অনুমতি করুন, আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে এই উগ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলাম।"

কিন্তু এবারেও অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত হল।

অর্জুনের গাণ্ডীবের গুণ বারবার ছিন্ন হতে লাগল। অর্জুন শরাহত। শ্রীকৃষ্ণ বাণবিদ্ধ।

কর্ণ তখন তার সর্পবাণ যোজনা করল। সেই বাণে পাতাল থেকে তক্ষক নাগ যোগবলে প্রবেশ করে আছে। কর্ণ তা জানে না। সারথি শল্য দেখলেন, এই বাণ অর্জুনের মৃত্যুতুল্য, তাই কর্ণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বলল, "কর্ণ, তুমি অন্য বাণ প্রয়োগ কর। এ বাণে অর্জুনের কিছু হবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদ গুনলেন। করাল অগ্নির মত সেই সর্পবাণ আকাশ কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি পদাঘাতে অর্জুনের রথ মাটির মধ্যে এক হাত প্রথিত করে দিলেন। হেম আভরণ ভূষিত অর্জুনের শ্বেত অশ্বগুলি নতজানু হয়ে ভূমি স্পর্শ করল।

কর্ণের সর্পবাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

কিন্তু অর্জুনের মাথার সোনার মুকুটখানি ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

স্বয়ং ব্রহ্মা তপস্যা ও যত্ন নিয়ে এই মুকুটখানি গড়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র দিয়েছিলেন অর্জুনকে। কিরীটহীন অর্জুন একখণ্ড শ্বেতবস্ত্র দিয়ে কেশ বন্ধন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুইবার তাঁর সারথ্য কৌশলে অর্জুনের প্রাণ রক্ষা করলেন। একবার ভগদত্তের বৈষ্ণব অস্ত্র থেকে, আর এবার কর্ণের সর্পবাণ থেকে। শ্রীকৃষ্ণ উত্তম সারথি। সারথির নৈপুণ্যের উপরে যুদ্ধজয় অনেকখানি নির্ভর করে। সারথিকে জানতে হবে, দেশ কাল, শুভাশুভ লক্ষণ, যুদ্ধের ইঙ্গিত, উৎসাহ অনুৎসাহ, স্থান

কালের সমতা বন্ধুরতা, যুদ্ধের অবসর, শত্রুর দুর্বলতা তার ছিদ্র, অন্ধিসন্ধি যাবতীয় কিছু—

নিমিত্তানি চ ভূয়িষ্ঠং যানি প্রাদুর্ভবন্তি নঃ।
তেষু তেষ্বভিপন্নেষু লক্ষয়াম্যপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৭
দেশ-কালৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষণানীঙ্গিতানি চ।
দৈন্যং হর্ষশ্চ খেদশ্চ রথিনশ্চ মহাবলম্ ॥ ১৮
স্থলনিম্নানি ভূমেশ্চ সমানি বিষমাণি চ।
যুদ্ধকালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ পরস্যান্তরদর্শনম্ ॥ ১৯
উপযানাপযানে চ স্থানং প্রত্যপসর্পণম্।
সর্বমেতদ রথস্থেন জ্ঞেয়ং রথকুটুম্বিনা ॥ ২০

(রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১০৪ সর্গ)

তক্ষক নাগ কর্ণকে বলল, "তুমি অন্যমনস্ক ছিলে। আমাকে দেখতে পাওনি। তুমি আবার বাণ নিক্ষেপ কর। আমি তোমার বাণে প্রবেশ করে অর্জুনকে নিহত করব।"

কর্ণ জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি ভয়ঙ্কর নাগ ?"

—"আমি তক্ষকপুত্র অশ্বসেন। আমার মাতৃহন্তা অর্জুন। আমি অর্জুনের শত্রু। তুমি বাণ নিক্ষেপ কর। আমি অর্জুনকে এবার বধ করব।"

—"তক্ষক, যুদ্ধে কখনো কর্ণ অন্যের সাহায্যে জয় লাভ করে না। আর শত অর্জুনকে বধ করতে হলেও কর্ণ এক বাণ কখনো দুইবার ব্যবহার করে না। তুমি যেতে পার। ন সন্দধ্যাং দ্বি শরং চৈব যদ্যর্জুনানাং শতমেব হন্যাম্।" (কর্ণপর্ব, ৯০/৪৮)

অর্জুন যমদণ্ড তুল্য এক লৌহবাণে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। কর্ণের দেহ অবসন্ন। মুষ্টি শিথিল। হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে গেল। সে বজ্রাহত পর্বতের মত টলতে লাগল। সর্বাঙ্গে তার রক্তধারা, যেন গিরিধাতুরঞ্জিত ঝর্ণাপ্লাবিত বিদীর্ণ এক পর্বত—"গিরির্গৈরিকধাতুরক্তঃ ক্ষরন্ প্রপাতৈরিব রক্তমস্তঃ"। (কর্ণপর্ব, ৯০/৬৭)

অস্ত্রহীন আহত কর্ণকে আঘাত করতে অর্জুন ইতস্তত করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "পার্থ, প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। দুর্বল শত্রুকে অবসর দিতে নেই। বিলম্ব ক'রো না। শত্রুকে বধ কর।"

তখন কর্ণের শ্রবণে এল মহাকালের অদৃশ্য কণ্ঠের এক প্লুতস্বর—"ব্রাহ্মণের অভিশাপ, মৃত্যুকালে মেদিনী তোর রথচক্র গ্রাস করবে। গুরু জামদগ্নির অভিশাপ, সঙ্কটকালে সকল অস্ত্রবিদ্যা বিস্মৃত হবে।"

হঠাৎ কর্ণের রথ কাঁপতে-কাঁপতে মাটির তলায় বসে গেল। আর সেই সঙ্গে তার মন থেকেও সকল অস্ত্রবিদ্যা অদৃশ্য হয়ে গেল। রাগে দুঃখে কর্ণের চোখে জল এল ("ক্রোধাদশ্রূণ্যবর্তয়ৎ")। অর্জুনকে বলল, "অর্জুন, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। মেদিনী গ্রাস থেকে রথচক্র উত্তোলন করতে দাও। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ধার্মিক। বিরথীকে আক্রমণ করা অধর্ম। অতএব অর্জুন, ক্ষণকাল ক্ষমা কর।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন কর্ণকে বললেন, "রাধেয়, আজ তুমি দৈবের নিন্দা করছ। ধর্মের দোহাই দিচ্ছ। কিন্তু যেদিন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় অপমান করেছিলে সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? শকুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শঠতায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? তোমার সম্মতিতে দুর্যোধন যেদিন ভীমকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে গিয়েছিল, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? দুঃশাসন কর্তৃক নিগৃহীতা দ্রৌপদীকে তুমি নিকট থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলে আর উপহাস করছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? অভিমন্যুকে কাপুরুষের মত পিছন থেকে আক্রমণ করে নিহত করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? অতএব আজ আর 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে তালু শুষ্ক করে লাভ কি ?"

কর্ণ নিরুত্তর নতমস্তক।

অর্জুন তখন শিবের পিনাক নারায়ণের সুদর্শনচক্রতুল্য ভীষণ আঞ্জলিক বাণ ধনুতে যোজনা করে বললেন, "যদি আমি তপস্যা ও যজ্ঞ করে থাকি, সুহৃদগণের বাক্য শুনে থাকি, গুরুজনদের সেবা করে থাকি, তাহলে এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণ হরণ করুক।"

অর্জুনের বাণ কর্ণের মস্তক ছেদন করল। ছিন্নশির মাটিতে পড়ল। রক্তাক্ত সূর্য যেন অস্তাচল থেকে পতিত হল। নিহত পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করতে-করতে আকাশের সূর্যও তখন তাঁর ম্লান মন্দরশ্মি নিয়ে ধীরে-ধীরে অস্তাচলে সবিতার মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

[একত্রিশ]

সব শেষ—

—"সব শেষ। দুর্যোধন, আর কেন? কি নিয়ে আর যুদ্ধ করবে? আমাদের সৈন্যবল অস্ত্রবল নিঃশেষ। আমার অনুরোধ, তুমি সন্ধি কর। দেবগুরু বৃহস্পতির নীতি হল, বলবান্ বিপক্ষের চেয়ে শক্তিতে ক্ষীণ হয়ে পড়লে সন্ধি করে আত্মরক্ষা করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র যদি অনুরোধ করেন তাহলে যুধিষ্ঠির তোমাকে নিশ্চয়ই রাজপদ দেবেন। ভীম অর্জুনও কখনো যুধিষ্ঠিরের অবাধ্য হবে না। তাই বলছি, সন্ধি কর। এই যুদ্ধ শেষ হোক। তোমার মঙ্গল হবে। নিজের প্রাণভয়ে নয়, তোমার মঙ্গলের জন্যই একথা বলছি।"

কৃপাচার্যের কথা শুনে দুর্যোধন বলল, "বিপ্রবর, জ্ঞানি, হিতৈষীর পক্ষে যা বলা উচিত আপনি তাই বলছেন। কিন্তু মুমূর্ষুর যেমন ঔষধে রুচি হয় না, তেমনি আপনার এই হিতবাক্য আমার ভাল লাগছে না। আমি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছলনা করেছি। শ্রীকৃষ্ণ যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এলেন তখন তাঁকেও প্রতারণা করেছি। এখন তাঁরা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন? সভামধ্যে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর সেই করুণ বিলাপ শ্রীকৃষ্ণ কি কখনো ভুলতে পারেন? অভিমন্যুর হত্যা তিনি সহ্য করবেন্ কি করে? আমরা সকলেই তাঁর কাছে অপরাধী। তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন কেন? দ্রৌপদীর অপমানে পাণ্ডবদের মনে সর্বদা আগুন জ্বলছে। সেই আগুন কখনো নিভবে না। আমার বিনাশের জন্য দ্রৌপদী এতদিন দেবমন্দিরে ভূমিশয্যায় যে কঠোর তপস্যা করছে তাও কখনো শান্ত হবে না। তাছাড়া আমি সম্রাট দুর্যোধন, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, সেই আমি কেমন করে ভিক্ষুকের মত কৃতদাসের মত যুধিষ্ঠিরের কৃপাপ্রার্থী হব? আমার সকল সুহৃদ বন্ধু বীর সবাই প্রাণ দিয়েছেন, এখন আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে যদি সন্ধি করি, তাহলে লোকে আমাকে ধিক্কার দেবে। আমি যুধিষ্ঠিরের সামনে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে রাজা হতে চাই না। না, কৃপাচার্য, না। তা হয় না। এখন আর সন্ধির সময় নয়। এখন চাই যুদ্ধ। গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, আপনি বলুন, কর্ণের পরে এখন আমাদের মধ্যে কে সেনাপতি হবেন?"

—"রাজা দুর্যোধন, আমার প্রস্তাব, মদ্রাধিপতি শল্যকে আপনি সেনাপতি করুন।"

—"উত্তম। কুলগৌরবে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ, যশস্বী মহারাজ শল্য, আপনাকে আমি সেনাপতি পদে অভিষেক করলাম।"

রক্ত অশ্রু শোক হাহাকার ছাপিয়ে আবার বেজে উঠল রণবাদ্য। যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে আকাশ লাল করে সূর্য উদিত হল। সর্বলোকচক্ষু সূর্য, শুচি অশুচি ধর্ম অধর্ম জয় পরাজয় যাঁকে স্পর্শ করে না। কোন শোক কোন দুঃখ যাঁকে লিপ্ত করে না। তাঁর সেই অনাবিল সাক্ষী দৃষ্টি নিয়ে আকাশে চেয়ে রইলেন। যুদ্ধের এই শেষ দিনে যে যজ্ঞ সমাপন হবে, প্রাণের সেই শেষ আহুতি সূর্যরশ্মি বহন করে নিয়ে যাবে—"তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়োঃ"... (মুণ্ডক উপনিষদ, ১-২-৫)।

শল্য সর্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করলেন।

বামে কৃতবর্মা, দক্ষিণে কৃপাচার্য, পশ্চাতে অশ্বত্থামা, আর মদ্রসৈন্য নিয়ে শল্য দাঁড়ালেন ব্যূহের সম্মুখে। নিয়ম হল, কেউ একাকী পাণ্ডবদের সম্মুখীন হবে না। একে অপরকে রক্ষা করে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করবে।

এদিকে পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ, আমি ঋতায়নপুত্র শল্যকে ভালভাবে জানি। শল্য বলশালী বুদ্ধিমান তেজস্বী। পরাক্রমে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অপেক্ষাও অধিক। তাই আমি মনে করি, আপনি ছাড়া শল্যকে পরাস্ত করতে আর কেউ সক্ষম নয়। আপনার যে তপোবল ক্ষাত্রবল আছে তাই দিয়ে শল্যকে সংহার করুন। নিজের মাতুল বলে তাকে দয়া করবেন না। ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্মুখে রেখে আপনি শল্যকে বধ করুন।"

যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

শল্যের আক্রমনে ভীম আহত।

দুর্যোধনের হাতে নিহত হলেন যাদববীর চেকিতান। অশ্বত্থামা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। নকুলের হাতে কর্ণের তিন পুত্র নিহত হল। সহদেব বধ করলেন শল্যের পুত্রকে।

যুধিষ্ঠির শল্যকে আক্রমণ করেছেন। যুধিষ্ঠিরের সেই ক্রোধোদ্দীপ্ত দারুণ সংহার মূর্তি দেখে কৌরবেরা বিস্মিত। ইনিই কি সেই শান্ত মৃদু দয়াশীল যুধিষ্ঠির? এক একটি ভল্লের আঘাতে শত শত কৌরব সেনা বধ করছেন। শল্যের অশ্ব ও দেহরক্ষী নিহত। শল্যকে বিপদাপন্ন দেখে অশ্বত্থামা তাকে রথে তুলে নিয়ে পলায়ন করলেন।...

যুধিষ্ঠির আবার শল্যকে আক্রমণ করলেন। এবার যুধিষ্ঠিরের অশ্ব ও

সারথি নিহত হল। শল্য রথ থেকে নেমে খড়্গ হাতে তাঁর দিকে ধেয়ে আসছেন। যুধিষ্ঠির সঙ্কটাপন্ন। বিপন্ন হয়ে ভাবছেন, আমার হাতে শল্যের মৃত্যু, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য কি মিথ্যা হবে? না, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না। এই ভেবে তিনি আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তপ্তকাঞ্চনময় বৈদূর্যমণিখচিত মন্ত্রপূত শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। প্রলয় অগ্নি নিয়ে সেই শক্তি শল্যকে বিদ্ধ করল। বজ্রাহত পর্বতের মত শল্য দুই বাহু প্রসারিত করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

হতাবশিষ্ট কৌরবসেনা তখন ভয়ে পালাতে লাগল। ভীমের হাতে সমস্ত কৌরব সৈন্য নিহত হল। সহদেবের হাতে নিহত হল শকুনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার...

শূন্য রণক্ষেত্র।

যুদ্ধের কোলাহল স্তিমিত।

সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চারিদিকে ছুটে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় দুর্যোধন?

হঠাৎ তাঁরা সঞ্জয়কে দেখতে পেলেন।

—"ধৃষ্টদ্যুম্ন, শত্রুর শেষ এই যে সঞ্জয়। একে বন্দী কর।"

—"একে আর বন্দী করে কি হবে? এর বেঁচে থেকে লাভ কি?"

—"ঠিক বলেছ।" এই বলে সাত্যকি কোষমুক্ত তরবারি তুলে সঞ্জয়কে বধ করতে উদ্যত।

এমন সময় হঠাৎ এক বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ, "ন হন্তব্যঃ। মুচ্যতাম্। ছেড়ে দাও। সঞ্জয়কে মেরো না।"

দুজনে বিস্মিত হয়ে দেখেন, সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিষেধ করছেন স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

সসম্ভ্রমে তাঁরা বেদব্যাসকে প্রণাম করে সঞ্জয়কে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, "সঞ্জয়, যাও, তুমি মুক্ত।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী ক্লান্ত রক্তাক্ত দেহে সঞ্জয় হেঁটে চলেছেন হস্তিনাপুরের পথে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ। পথের দুই ধারে অরণ্য কান্তারে ম্লান পাণ্ডুর জ্যোৎস্না। সবকিছু কেমন অস্পষ্ট ছায়াময়। কেবল সেই বিজন পথে নির্জন হাওয়ার নিঃশ্বাস।

প্রায় এক ক্রোশ পথ হেঁটে এসেছেন। সামনে ধুধু মাঠ। অদূরে ওই দ্বৈপায়ন হ্রদ। তার গভীর জলে আকাশের ছায়া। আশপাশের অন্ধকার বৃক্ষশাখায় পাখির কাকলি। হঠাৎ দেখলেন, অন্ধকারে হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ও কে? আহত ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ, করুণ মুখে একাকী দাঁড়িয়ে

আছেন সম্রাট দুর্যোধন। সঞ্জয় বিস্মিত স্তম্ভিত। দুঃখে বেদনায় অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।

পরে দীন আর্ত কণ্ঠে সঞ্জয় বললেন, "সম্রাট, আপনি ?"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে দুর্যোধন বললেন. "সঞ্জয়, তুমি ? সৌভাগ্যবশত তাহলে বেঁচে আছ ?"

—"হাঁ, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বন্দী করে। সাত্যকি আমাকে বধ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মহর্ষি দ্বৈপায়নের আদেশে তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"

—"সঞ্জয়, তুমি কি জান, আমার ভ্রাতারা কে কে বেঁচে আছে ?"

—"আপনার কোন ভ্রাতাই আর জীবিত নেই, মহারাজ।"

শুনে দুর্যোধনের বুকখানা হাহাকার করে উঠল, "আমার সৈন্য রথী মহারথী ?"

"মহর্ষি দ্বৈপায়নের কাছে শুনেছি, তারা সকলেই নিহত। কেবল অশ্বত্থামা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য জীবিত আছেন।"

তখন দুর্যোধন সস্নেহে সঞ্জয়কে দুই হাত দিয়ে ধরে ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "সঞ্জয়, এই যুদ্ধে আমার আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র তুমিই বেঁচে আছ। তুমি সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রকে ব'লো, তাঁর পুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত আহত ও ক্লান্ত হয়ে এই দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করে আছে। আমার আর বেঁচে থেকে কি হবে বল ?"

এই বলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করল। এবং মায়ার দ্বারা হ্রদের জল স্তম্ভিত করে আত্মগোপন করল।

সঞ্জয় বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে।

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে গেল।

এমন সময় অন্ধকার মাঠের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তিনজন। তারা সঞ্জয়ের কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘোড়াগুলি সব শ্রান্ত ঘর্মাক্ত। তাদের মুখ থেকে তপ্ত অগ্নিনিঃশ্বাস ছুটছে।

—"কে ? সঞ্জয় ?"

সঞ্জয় চিনলেন। এঁরা অশ্বত্থামা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য।

—"সঞ্জয়, মহারাজ দুর্যোধন কি জীবিত ? তুমি কি জান তিনি কোথায় ?"

—"হাঁ, সম্রাট এখনো জীবিত। তিনি এই হ্রদের জলে আত্মগোপন করে আছেন।"

পাণ্ডব সৈন্যরা দুর্যোধনের খোঁজে কোলাহল করতে-করতে এদিকেই আসছে।

—"ওই, ওরা এদিকেই আসছে। এখানে থাকা আমাদের নিরাপদ নয়। চল, সঞ্জয়, তোমাকেও সেনা শিবিরের পথ পর্যন্ত পার করে দিই।"

তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।…

পাণ্ডবেরা অনেক অনুসন্ধান করেও দুর্যোধনকে দেখতে পেলেন না। তারা পরিশ্রান্ত হয়ে শিবিরে ফিরে গেলেন। গুপ্তচরেরা এসে খবর দিল, দুর্যোধন নিরুদ্দেশ।

শুনে সবাই চিন্তিত।

এদিকে তিন রথী গোপনে আবার এলেন হ্রদের ধারে।

—"মহারাজ দুর্যোধন, উঠে আসুন। আমরা এখনো জীবিত। আবার আমরা যুদ্ধ করব। পাণ্ডবদের বিনাশ করব।"

দুর্যোধন তাঁদের বলল, "আপনারা যে এখনও জীবিত সে আমার পরম সৌভাগ্য। আমার মত আপনারাও তো সবাই আহত এবং ক্লান্ত। অতএব আজ রাতটুকু বিশ্রাম করে আগামীকাল পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করব।"

শুনে অশ্বত্থামা বললেন, "আমার সকল পুণ্য ও তপস্যার শপথ নিয়ে বলছি, আজ এই রাত্রেই সকল পাণ্ডব সোমক ও পাঞ্চালদের বধ করব।"

তারা যখন এমন উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে তখন কয়েকজন ব্যাধ পশুমাংস বহন করে মাঠের ভিতর দিয়ে এই পথেই যাচ্ছিল। তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে হ্রদের জল পান করতে এসে আড়াল থেকে সব শুনল। তারা দুর্যোধনকেও চিনতে পারল। এই তো কিছুক্ষণ আগে পাণ্ডব সৈন্যরা তাদের জিজ্ঞাসা করছিল, "তোমরা কি জান, রাজা দুর্যোধন কোথায়? যদি বলতে পার অনেক টাকা পুরস্কার পাবে।" পুরস্কারের লোভে বন্য ব্যাধেরা তখন ছুটল পাণ্ডব শিবিরে সংবাদ দিতে।…

সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে পঞ্চপাণ্ডব হ্রদের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আসতে দেখে অশ্বত্থামা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য দূরে অন্ধকারে এক বটগাছের তলায় গিয়ে বসে আলোচনা করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ, দেখ, দুর্যোধন তার মায়াবলে জল স্তম্ভিত করে তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। কোন মানুষের সাধ্য নেই তাকে আয়ত্ত করে।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "মায়ার দ্বারাই মায়াকে বিনষ্ট করতে হয় (মায়াবী মায়য়া বধ্য)। আপনি আপনার মায়াবলে দুর্যোধনকে বধ করুন।"

আমরা আগে শুনেছিলাম দুর্যোধন মায়া যাদু কপটবিদ্যায় নিপুণ। একবার সে নিজেই সগর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিল, "আমি যাদুমন্ত্রে জল স্তম্ভিত করতে পারি। তখন সেই জলের উপর দিয়ে রথ হস্তী অশ্ব পদাতি অনায়াসে চলে যেতে পারে। হিংস্রপ্রাণী বিষাক্ত সর্প মন্ত্রবলে বশীভূত করতে পারি। যাদুবলে অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি রোধ করতে পারি। সমস্ত রকম মারণ উচাটন মন্ত্রে আমি সিদ্ধ। আমি যা বলব তাই হবে। আমার এই যাদুবিদ্যার প্রভাব সকলেই দেখেছে। তাই আমাকে লোকে মায়াবিদ্ বলে জানে। কিন্তু একথা আজ আপনাকে ছাড়া আর কাওকে বলিনি।" (উদ্যোগপর্ব, ৬১ অধ্যায়)

দুর্যোধনের কথা শুনে সেদিন কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিলাম দুর্মুখ অতিভাষী দাম্ভিকের এসব বুঝি শূন্য আস্ফালন। এখন দেখছি তা তো নয়। শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরও জানতেন দুর্যোধনের এই ক্ষমতার কথা। এবং কার্যতও দেখছি হ্রদের জল স্তম্ভিত করে মায়াবলে সে লুকিয়ে আছে। তাহলে ভীষ্ম দ্রোণের মত ধার্মিক পাণ্ডবহিতৈষী বীরগণ নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে এতদিন যে দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন সেকি তার এই মারণ উচাটন মন্ত্রের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে? এইসব ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে যারা কারবার করে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপথগামী হয়। তখন ওইসব ঘোরা পিশাচ শক্তি তাদের টেনে নিয়ে যায় ভয়ানক সব পরিণামের দিকে। দুর্যোধনের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি কি সেই জন্য? দুর্যোধনের গুরু চার্বাক, ভিক্ষুকরূপধারী রুদ্রাক্ষমালা শিখা ত্রিদণ্ডধারী প্রগল্ভ ব্রাহ্মণ, সারা রাজ্যে ছদ্মবেশে ঘুরে-ঘুরে দুর্যোধনের প্রিয়কার্য করত, তারও মৃত্যু হয় শোচনীয় ভাবে (শান্তিপর্ব, ৩৮/৩৬)। এই ঘোরকর্মা নাস্তিক চার্বাককে নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় বর্ণনা করেছেন ব্রাহ্মণবেশধারী রাক্ষস বলে— "চার্বাকো ব্রাহ্মণবেষধারী রাক্ষসঃ"। আদিপর্বে কবি নিজেও চার্বাককে ব্রাহ্মণবেশধারী রাক্ষস বলে পরিচয় দিয়েছেন—"রক্ষসো ব্রহ্মরূপিণঃ" (আদিপর্ব, ২/৭৬)।

হ্রদের মধ্যে লুকায়িত দুর্যোধনকে সম্বোধন করে যুধিষ্ঠির বললেন, "সুযোধন, জলের মধ্যে লুকিয়ে আছ কেন? উঠে এস। যুদ্ধ কর। পুত্র ভ্রাতা পিতৃগণের মৃত্যুর কারণ হয়ে শেষে নিজের প্রাণ বাঁচানর জন্য জলের ভিতরে লুকিয়ে আছ? তোমার সেই দর্প তর্জন-গর্জন কোথায় গেল? দুর্বুদ্ধি, কাপুরুষ, উঠে এস।"

দুর্যোধন তখন জলের ভিতর থেকে বলল, "আমি ভয়ে লুকিয়ে নেই। আমি নিরস্ত্র। আমি ক্লান্ত। আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। একটু অপেক্ষা কর। তারপর যুদ্ধ করব।"

—"আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি। অনেক খুঁজে তোমার সন্ধান পেয়েছি। এখন উঠে এসে যুদ্ধ কর।"

—"আজ আমার সকল ভ্রাতা নিহত। পিতামহ ভীষ্ম মৃত প্রায়, দ্রোণ ও কর্ণ হত। পৃথিবী বীরশূন্য। শ্রীহীন বৈধব্য দশায় রিক্ত এই রাজ্য নিয়ে আমি আর কি করব? আমি রাজত্ব চাই না। তোমরাই ভোগ কর। আমি বনবাসী সন্ন্যাসী হব। আমার নিজের বলে যখন কেউ নেই, তখন বেঁচে থেকেই-বা কি করব?"

—"সুযোধন, তোমার এই আর্ত প্রলাপ বন্ধ কর। তোমার কণ্ঠস্বর শকুনের রবের মত, শুনতে আমার ভাল লাগছে না। কে তোমার দান গ্রহণ করছে? দানের অধিকার আর তোমার নেই। যেদিন ছিল সেদিন তোমার কাছে পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা চেয়েছিলাম। তুমি তখন সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিও দেবে না বলেছিলে। তুমি পাপী। রাজ্য নয়, আজ তোমাকে প্রাণ দিতে হবে। উঠে এস, যুদ্ধ কর।"

উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করতে পারে না তেমনি যুধিষ্ঠিরের এই কটুবাক্যে আহত হয়ে দুর্যোধন হ্রদের জল আলোড়িত করে নাগরাজের মত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে-করতে জল থেকে উঠে এল। সর্বাঙ্গ তার ক্ষতবিক্ষত। হাতে স্বর্ণঅঙ্গদভূষিত লোহময় গদা। প্রদীপ্ত সূর্যের মত ("প্রতপন্ রশ্মিবানিব"), উন্নতশিখর পর্বতের মত ("সশৃঙ্গমিব পর্বতম্"), শূলপাণি রুদ্রের মত ("শূলহস্তং যথা হরম্") দুর্যোধন উঠে দাঁড়াল। মেঘমন্দ্রস্বরে বলল, "যুধিষ্ঠির, আমি যুদ্ধ করব। আমি একা, তোমরা তাই একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। সেটাই ধর্মসঙ্গত।"

—"সুযোধন, আজ তুমি ধর্মের কথা বলছ। কিন্তু যেদিন তোমরা সকলে মিলে একা অভিমন্যুকে বধ করেছিলে সেদিন ধর্মের কথা মনে ছিল না? মানুষ বিপদে পড়লেই ধর্মের কথা বলে। কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ দেখে। এই নাও কবচ, এই নাও বর্ম, ধারণ কর। তোমার কেশ বন্ধন করে নাও। যুদ্ধের জন্য আর কি কি অস্ত্র চাও বল? তাও দেব। আরো বলছি শোন। তোমাকে একটি বর দিচ্ছি। আমাদের সকলের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে না। পাণ্ডবদের মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নাও। তার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তাকে বধ করতে পারলেই তুমি তোমার

রাজ্য ফিরে পাবে। অথবা নিজে নিহত হয়ে স্বর্গে যাবে। নাও, প্রস্তুত হও।"

শুনে শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অন্তরালে বললেন, "এ আপনি কি করলেন? এত বড় দুঃসাহসের কথা কেন বললেন? দুর্যোধন যদি আপনাকে, অর্জুনকে, নকুল সহদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করে তাহলে কি হবে? আপনি জানেন, দুর্যোধন ভীমকে পরাস্ত করবার জন্য আজ তের বৎসর ধরে লৌহ ভীম তৈরী করে গদা যুদ্ধের অনুশীলন করেছে? শিক্ষা নিয়েছে বলরামের কাছে। গদা যুদ্ধে দুর্যোধন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভীমও তার সমকক্ষ নয়। ভীম বলবান্ বটে, কিন্তু দুর্যোধন অধিক দক্ষ, কুশলী, কৃতী। আপনি পূর্বে একবার শকুনির সঙ্গে পাশা খেলে বিষম কার্য করেছিলেন। এবার তার চেয়েও ভয়ানক বিপদ ডেকে আনলেন। আপনারা কেউই ন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারবেন না। নাঃ, মনে হয়, পাণ্ডুপুত্রদের রাজ্য-ভোগ কপালে নেই। তারা বোধহয় অনন্ত কালের জন্য বনবাস ও ভিক্ষা করার জন্যই জন্মেছে।"

ভীম বললেন, "কৃষ্ণ, আপনি নিরাশ হবেন না। আমি দুর্যোধনকে বধ করব।"

এই বলে দুর্যোধনকে বিপক্ষ নির্বাচনের সুযোগ না দিয়ে, আগেই ভীম তাকে যুদ্ধে অহ্বান করলেন। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় দুর্যোধন ভীমের সম্মুখীন হল।

ক্রুদ্ধ ভীম বললেন, "কুলাঙ্গার, পুরুষোধম, পাপী, নিজের দুষ্কৃতির কথা স্মরণ কর। আজ আমার হাতে তোর মৃত্যু।"

দুর্যোধন সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বলল, "শরতের মেঘের মত নিষ্ফল গর্জন করছ কেন? আস্ফালন না করে বীরত্ব দেখাও। ন্যায় যুদ্ধে আমাকে আজ ইন্দ্রও পরাস্ত করতে পারবে না।"

এমন সময় তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে বলরাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য দুর্যোধনের শেষ যুদ্ধ না দেখে তিনি থাকতে পারলেন না। বলরাম এসে বললেন, "এখানে নয়। যুদ্ধ হোক ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে। ঋষিরা বলেন, কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু হলে বীর ইন্দ্রলোকে গমন করে।"

সকলে তখন পদব্রজে এলেন সপ্তসরস্বতীর মাহাত্ম্যপূত উন্মুক্ত সেই পবিত্র স্থানে, যাকে বলা হয় প্রজাপতির উত্তর বেদী।

এবার ভীম দুর্যোধনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। যেন মহাকাল ও মহামৃত্যুর সংঘর্ষ। আকাশ কম্পিত ভয়ঙ্কর সব শব্দ হতে লাগল। পর্বত পৃথিবী বনভূমি কাঁপছে। বিনামেঘে বজ্র উল্কাপাত হচ্ছে।

আঘাতে-প্রত্যাঘাতে দুজনের দেহ রক্তাক্ত। দুজনের হাতের গদা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। দুর্যোধনের তেজ ও নৈপুণ্য বিস্ময়কর। তুলনায় ভীম নিষ্প্রভ।

হঠাৎ পলকের মধ্যে ক্ষিপ্র গতিতে দুর্যোধন ভীমের মস্তকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল। ভীম তবু অবিচলিত। আবার আঘাত। ভীমের হাত থেকে গদা ছিটকে পড়ে গেল। দুর্যোধন সেই সুযোগে ভীমের বুকে বারবার গদার আঘাত করতে লাগল। ভীম মূর্ছিত প্রায়। বিভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে টলতে লাগলেন এই অবস্থায় ভীমের ললাটে আবার আঘাত।...মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে...শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে...ভীম মাটিতে পড়ে গেলেন। নিরুপায় দেখে নকুল সহদেব সাত্যকি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের নিষেধ করে চোখমুখের রক্তধারা হাত দিয়ে মুছে ভীম আবার উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "ভীম যদি নিজের শক্তিতে এমনি সরল যুদ্ধ করে তাহলে তার জয় অসম্ভব। নিশ্চিত বিজয় মুহূর্তে যুধিষ্ঠির নির্বোধের মত বিপদ ডেকে এনেছেন। শুক্রাচার্য তার নীতিশাস্ত্রে বলেছেন, প্রাণভয়ে পলাতক হতাবশিষ্ট শত্রু যদি ফিরে আসে তাহলে সে অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে। তার জীবনের মায়া থাকে না। তখন তার সামনে ইন্দ্রও দাঁড়াতে পারেন না। অতএব অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে বধ করতে হবে—অন্যায়েন হনিষ্যতি।" (শল্যপর্ব, ৫৮/২০)

অর্জুন তখন ভীমকে সঙ্কেত করে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন।

ভীম প্রচণ্ডভাবে গদার আঘাত করলেন। কিন্তু দুর্যোধন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে গিয়ে ভীমের আঘাত ব্যর্থ করে দিল। চকিতে ভীমের উপরে হানল প্রচণ্ড আঘাত। ভীমের সর্বাঙ্গে রক্তের ধারা...মূর্ছিত প্রায়...দাঁড়িয়ে টলছেন...এখন মাত্র একটি আঘাতেই ভীমের পতন হয়...কিন্তু ভীম যে মুমূর্ষ দুর্যোধন তা বুঝতে পারল না। ভীমের কম্পিত ভঙ্গি দেখে সে মনে করল সে বুঝি আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাই দুর্যোধন আত্মরক্ষায় সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভীম ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এবার সবেগে ছুটে আসছেন...তার আঘাত ব্যর্থ করে দিতে দুর্যোধন লাফিয়ে উঠল...আর ঠিক সেই অবসরে ভীম দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করলেন...ভগ্ন উরু দুর্যোধন সশব্দে ভূতলশায়ী হল।...

তখন চারিদিকে ঘোরদর্শন কবন্ধ প্রেতের নৃত্য। রাক্ষস পিশাচের

কোলাহল। নদী ও কূপ থেকে রক্ত উঠছে। আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে। কাক শকুনি ভয়ে চিৎকার করছে।

ক্রুদ্ধ ভীম দুর্যোধনের মস্তক বাঁ পা দিয়ে দলিত করতে-করতে বললেন, "ওরে শঠ, তোর সকল পাপের এই প্রতিশোধ।"

যুধিষ্ঠির এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে বিচলিত হলেন, "ভীম, ক্ষান্ত হও। তুমি শুভ কিংবা অশুভ উপায়ে শত্রু বধ করে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ। তুমি ঋণমুক্ত। কিন্তু তাই বলে দুর্যোধনের মস্তকে ওইভাবে পদাঘাত ক'রো না। দুর্যোধন রাজা, সে আমাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়, তাকে অমন করে অসম্মান ক'রো না।"

পাণ্ডব পক্ষের সোমকগণ ভীমের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হলেন।

ক্রুদ্ধ বলরাম তাঁর হল উত্তোলন করে ভীমের প্রতি ধাবিত হয়ে বললেন, "ধিক্, ধিক্, ভীমসেন। তুমি অধর্ম উপায়ে দুর্যোধনের নাভির নিম্নে আঘাত করে শাস্ত্র বিরুদ্ধ যুদ্ধ করেছ। এ অন্যায়, এ অধর্ম। তোমার এই আচরণ আমার প্রতি অপমান।"

শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে আলিঙ্গন করে নিবৃত্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ধর্মের ছলনার কথা শুনে বলরাম অত্যন্ত অপ্রসন্ন হলেন। ভীমকে "কপট যোদ্ধা" বলে ধিক্কার দিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বারকার পথে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির দুঃখিত বিষণ্ণ হয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অর্জুনও ম্রিয়মাণ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীমকে ভালমন্দ কিছুই বললেন না।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ, ভীম দুর্যোধনের মাথায় পা দিয়েছে এ আমার ভাল লাগেনি। কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল, আমার মন তাই ব্যথিত। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে। সেই দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই বিবেচনা করেই ভীমের আচরণ আমি উপেক্ষা করলাম।"

রণভূমিতে মৃতপ্রায় দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করে পাণ্ডবেরা শিবিরে ফিরে যাচ্ছেন। তখন দুর্যোধন অতিকষ্টে যন্ত্রণায় দুই হাতে ভর দিয়ে বসে, ঘৃণায় ভ্রূকুটি করে শ্রীকৃষ্ণকে বলল, "কংসদাসের পুত্র, আমাকে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? মিথ্যা আর ছলনা দিয়ে তোমরা একে একে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণকে বধ করেছ। তুমি অনার্য। তুমি কুটিল।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "গান্ধারী পুত্র, পাপের পথে তুমি আজ সবংশে নিহত হয়েছ। একে-একে স্মরণ কর তোমার পাপ, ভীমকে বিষপ্রয়োগ, যতুগৃহ

দাহ, শকুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও শঠতা করে পাশা খেলা, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ, কুৎসিত অপমান, অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু বধ। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনর্থ সাধন করে যুদ্ধ করছিলেন তাই শিখণ্ডী তাঁকে নিহত করেছে। দ্রোণ ধর্মত্যাগ করে অধর্ম পথে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করছিলেন তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে নিহত করেছে। অর্জুন বীরের মতই কর্ণকে নিহত করেছে। তোমারই লোভে লিপ্সায় দুষ্কর্মে আজ এই ফল ভোগ কর।"

দুর্যোধন বলল, "আমি যথাবিধি দান অধ্যয়ন পৃথিবী শাসন করে শত্রুর মাথায় পা রেখে সদর্পে বিচরণ করেছি। এখন বীরের মৃত্যু লাভ করে স্বর্গে যাব। তোমরা থাক ভগ্ন হৃদয়ে এই নিঃস্ব শোকসন্তপ্ত জীবনে।"

আকাশ থেকে তখন দুর্যোধনের শিরে সুগন্ধী বারি ও পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ বাদ্যধ্বনিসহ স্তুতি করতে লাগল। মধুময় মন্দার বায়ু প্রবাহিত হল। বৈদূর্যমণির মত আকাশ স্বচ্ছ নীলাভ হয়ে উঠল।

দুর্যোধনের প্রতি এই দিব্য অভিষেক দেখে পাণ্ডবেরা লজ্জিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ন্যায় যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণকে জয় করা সম্ভব ছিল না। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি নানা উপায়ে মায়ার দ্বারা ("ময়ানেকৈ-রুপায়ৈস্তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ"...শল্যপর্ব, ৬১/৬৩) তাদের নিধন করেছি। প্রবল শত্রুকে কূটকৌশলে জয় করতে হয় ("মিথ্যাবধ্যাস্তথাপায়ৈর্বহবঃ শত্রবহধিকাঃ"—শল্যপর্ব্ব ৬১/৬৭)। দেবতারাও অসুর নিধনে এই সব উপায়ই অবলম্বন করেছিলেন ("দেবৈরসুরঘাতিভিঃ"—শল্যপর্ব ৬১/৬৮)।"

শ্রীকৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবদের মনের গ্লানি দূর হল। তাঁরা তখন হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন। গ্রহতারামণ্ডল প্রকম্পিত করে রাত্রির আকাশ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল...

[বত্রিশ]

কালরাত্রি

নির্জন অন্ধকার রণক্ষেত্র।

তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছট্‌ফট্ করছে দুর্যোধন। রক্তে মাটি ভিজে গেছে। কেউ কাছে নেই। কেবল অন্ধকারে ওত পেতে অপেক্ষা করছে কয়েকটি লুব্ধ শৃগাল আর শকুনি।...

দূরে পাণ্ডব শিবিরে জয়ডঙ্কা বাজছে।...

আর এখানে এই বিজন প্রান্তরে হাওয়ায় কাঁপছে শুধু দুর্যোধনের ব্যথাতুর দীর্ঘনিঃশ্বাস।

ঘোড়া ছুটিয়ে আবার এলেন তিন রথী। মুমূর্ষু দুর্যোধনের করুণ অবস্থা দেখে অশ্বত্থামা কেঁদে ফেললেন।

দুর্যোধন চোখের জলে কাতর কণ্ঠে বলল, "মরণে দুঃখ নেই। একদিন তো সবাই মরবে। আমি এই সান্ত্বনা নিয়ে মরছি, বিপদে আমি কখনো পিছপা হইনি। আমাকে ছল কপটতা করে হত্যা করা হয়েছে। যদি বেদ সত্য হয় তাহলে আমি স্বর্গলাভ করব। আপনারা আমার জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করেছেন। আপনারা জীবিত আছেন দেখে আনন্দ বোধ করছি।" অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে থেমে-থেমে বলছে দুর্যোধন।

চোখ মুছে ক্রোধে অস্থির হয়ে অশ্বত্থামা বললেন, "ওরা আমার পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সেই শোকের চেয়েও বেশি কষ্ট পাচ্ছি আজ তোমার দুর্দশা দেখে। আমি শপথ করে বলছি, শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই আমি পাণ্ডবদের বধ করব। তুমি অনুমতি দাও।"

দুর্যোধন তখন কৃপাচার্যকে বলল, "শীঘ্র আপনি একটা জলপূর্ণ কলস নিয়ে আসুন।"

কৃপাচার্য কলস নিয়ে এলে দুর্যোধন বলল, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন।"

অশ্বত্থামা অভিষিক্ত হয়ে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর প্রতিহিংসায় সিংহনাদ করে তিনজনে অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।...

আর একা দুর্যোধন মৃত্যুযন্ত্রণায় মাটিতে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।...

ভয়ঙ্কর কালরাত্রি।

আকাশে কালপুরুষ দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। দুঃসহ আতঙ্কে প্রহর কাটছে। অন্ধকার যেন মূর্তিমান গুপ্তঘাতক।

নিদ্রিত পাণ্ডব শিবিরে সকলে স্বপ্ন দেখছে, রক্তবসনা মহাকালী সংহার মূর্তিতে নৃত্য করছেন। তাঁকে ঘিরে দিগ্‌বসনা নিশাকায়া বিকট ডাকিনী সব অট্টহাস্য করছে।...

রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত।

তিন রথী ক্লান্ত হয়ে একটা বটগাছের তলায় বসলেন। কৃপ ও কৃতবর্মা ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু অশ্বত্থামার চোখে ঘুম নেই। প্রতিহিংসায় তাঁর অন্তর পুড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ দেখলেন অন্ধকার গাছের শাখায় নিদ্রিত কাকের বাসায় একটা পেঁচা এসে হানা দিল। তীক্ষ্ণ নখরচঞ্চু দিয়ে নিদ্রিত পক্ষীশাবকদের নিহত করতে লাগল।

অশ্বত্থামা ভাবলেন, "ঠিক তো, আমিও এমনি করে নিদ্রিত পাণ্ডব শিবিরে হানা দিয়ে প্রতিশোধ নেব। দুজনকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুললেন। কৃতবর্মা কিছু বললেন না। কৃপাচার্য বললেন, "তার চেয়ে চল আমরা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করি। নিদ্রিত শত্রুকে বধ করা মহাপাপ। তুমি তো কোনদিন অধর্ম করনি! মন শান্ত কর। আগামী কাল সম্মুখ যুদ্ধ করাই শ্রেয়।"

—"মাতুল, আপনার কথা ঠিক। কিন্তু পাণ্ডবেরা অন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা ধর্মের সেতু শতখণ্ডে চূর্ণ করেছে। তাদের সঙ্গে আবার ধর্ম আচরণ কি? আমি পিতৃহত্যার প্রতিহিংসায় জ্বলছি। দুর্যোধনের করুণ আর্তনাদ শুনছি। অন্যায় ভাবে প্রতিশোধ নিলে যদি আমার মহাপাপ হয়, যদি পরকালে কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয় সেও ভাল। তবু আমি নিরস্ত হব না।"

—"অশ্বত্থামা, এই রাত্রে রথ যোজিত করে কোথায় চলেছ? দাঁড়াও... শোন..."

তাঁরা অন্ধকারে অশ্বত্থামার অনুসরণ করলেন।...

কি যে ঘটতে চলেছে কেউ জানে না।

শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর। তাঁর দৃষ্টি উদাস। তিনি সব জানেন। তবু কেন যে নীরব হয়ে আছেন, এ এক দিব্য রহস্য। যা ভবিতব্য, যা কালের বিধান তাকে তিনি রোধ করেন না। তিনি যে স্বয়ং লোকক্ষয়কৃৎ কাল। তাঁর প্রিয় পাণ্ডবেরা নির্বংশ হতে চলেছেন, তিনি জানেন, তবু নিবারণ করলেন না। যেমন চোখের সামনে নিজের যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখেও তিনি নির্বিকার রইলেন।

কুরুক্ষেত্র সারথি শ্রীকৃষ্ণ সকল কর্মের নিয়ন্তা, সকল উদ্যোগের হোতা শাস্তা অনুমন্তা; তিনিই আবার এতখানি নির্লিপ্ত নিস্পৃহ উদাসীন। শুধু যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "শিবিরে না থেকে আজ রাত্রে বরং আমাদের বাইরে থাকাই মঙ্গল—অস্মাভির্মঙ্গলার্থায় বস্তব্যং শিবিরাদ্ বহিঃ।" (শল্যপর্ব, ৬২/৩৭)

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ, তোমার অনুগ্রহেই আমরা আজ বিজয়ী। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, অনেক কটুবাক্য শুনেছ। কিন্তু পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী ক্রুদ্ধা হলে আমরা ভস্ম হয়ে যাব। তুমি গিয়ে শোকার্ত গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত কর। আমাদের রক্ষা কর। মনে হয় পিতামহ মহর্ষি দ্বৈপায়নও ওখানে গিয়েছেন।"

সেই রাত্রেই দারুক শ্রীকৃষ্ণকে রথে করে হস্তিনাপুরে নিয়ে চললেন।…

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে শ্রীকৃষ্ণ কাঁদছেন। আশ্চর্য দৃশ্য! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সকল ধার্তরাষ্ট্রগণকে নিহত করলেন যিনি, তিনিই আবার তাদের জন্য অশ্রুবর্ষণ করছেন। দণ্ডিতের সাথে কাঁদে দণ্ডদাতা। ভগবান শুধু দণ্ডধারী নন, তাঁর যে দয়ার হৃদয়, তিনি যে করুণাময়। যাকে তিনি সংহার করেন তার জন্যও তাঁর অন্তর কাঁদে। তাই আমরা দেখি কংসকে বধ করে যাদবদের মধ্যে বসে তিনি ক্রন্দন করছেন। অন্যায় করেছেন বলে নয়, যথার্থ কাজই করেছেন, তবু কংসের বিধবা পত্নীদের রোদন শুনে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছিল (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৩২ অধ্যায়):—"হ্যয়মস্রাবিলেক্ষণঃ" (বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, ২১/৮)। রুক্মীকে বলরাম যখন হত্যা করলেন, তখনও সেই চিরশত্রু রুক্মীর জন্য শ্রীকৃষ্ণ অশ্রুবর্ষণ করেন—"কৃচ্ছ্রাদশ্রূণ্যবর্তয়ৎ" (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৬১/৫২)। আবার করবীপুরের রাজা শৃগালকে নিহত করার পর দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শৃগালের পত্নী পদ্মাবতীকে সাশ্রুনয়নে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, "আপনার পুত্র আমার পুত্রসম" (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৪৪/৫৫), এই বলে তিনি শৃগালের পুত্র শক্রদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই হৃদয়ের দিকটা না দেখলে তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম হবে না।

ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে শ্রীকৃষ্ণ অশ্রুপাত করছেন বটে, কিন্তু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যা বলছেন তা শান্ত কিন্তু দৃঢ় সত্য। সেখানে কোন চিত্তদৌর্বল্য বা অপলাপ নেই। দুর্বলহৃদয় আমাদের তা শিক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "মহারাজ, এই কুলক্ষয় ও যুদ্ধ নিবারণের জন্য পাণ্ডবেরা অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা সফল হয়নি। যুদ্ধের আগে আমি আপনার কাছে এসে পাণ্ডবদের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিলাম, লোভের বশে আপনি সম্মত হননি। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর বারবার আপনাকে সন্ধি করতে অনুরোধ করেছিলেন, আপনি তাও শোনেননি। অতএব পাণ্ডবেরা দোষী নয়। এই কুলক্ষয় আপনার জন্যই হয়েছে। এখন পাণ্ডবেরাই আপনার কুলরক্ষা ও পিণ্ডদানের অধিকারী। আপনি ক্রোধ অথবা শোক ত্যাগ করে তাদের গ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির আপনাকে ভক্তি করেন। তিনি আপনার দুঃখে কাতর হয়ে আছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে বললেন, "সুবলনন্দিনি, আপনি পৃথিবীর অতুলনীয়া নারী। আপনি অবাধ্য দুর্যোধনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সে তা শোনেনি। আপনি তাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। আপনার সেই অমোঘ বাক্য সফল হয়েছে। আপনি শোকার্ত হয়ে পাণ্ডবদের বিনাশ কামনা করবেন না। আপনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে পৃথিবী পুড়ে যাবে।"

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী শান্ত হলেন।...

গভীর রাত্রে অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে এসে দেখেন, শিবিরদ্বারে প্রহরা দিচ্ছেন চন্দ্রসূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান বিরাটকায় এক পুরুষ। অশ্বত্থামা তাঁকে দিব্যাস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন, কিন্তু সকল দিব্যাস্ত্র তিনি গ্রাস করে ফেললেন।

ভীত অশ্বত্থামা তখন মহাদেবের স্তব করে প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি দিতে উদ্যত হলেন। মহাদেব তুষ্ট হয়ে অশ্বত্থামার দেহে নিজের তেজ সঞ্চার করে তাঁকে খড়্গ দান করে বললেন, "শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যে আমি এতদিন পাঞ্চালদের রক্ষা করেছি। কিন্তু তাদের কাল পূর্ণ হয়েছে।"

অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করে একে-একে শিখণ্ডীসহ সকল পাঞ্চালদের এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় বধ করলেন। কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য দ্বারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলেন। যারা প্রাণভয়ে পালাতে চেষ্টা করল তাদের বধ করলেন।

অশ্বত্থামা নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পদাঘাতে জাগিয়ে তার গলায় পা দিয়ে

পিষতে লাগলেন। হঠাৎ আক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। পদভারে পীড়িত ধৃষ্টদ্যুম্ন যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "এইভাবে কষ্ট দিও না। অস্ত্রাঘাতে আমাকে বধ কর।"

—"পিতৃহন্তা গুরুঘাতী পামর, অস্ত্রাঘাতে তুই বধের যোগ্য নয়। তোকে পা দিয়ে এমনি করে দলে পিষে মারব।"

অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বুকে বারবার পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করে নিহত করলেন। তারপর শিবির থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "চলুন, শীঘ্র যাই দ্বৈপায়ন হ্রদে, যেখানে রয়েছেন সম্রাট দুর্যোধন! তাঁকে এই সুসংবাদ দিতে হবে, ঘুমন্ত পাণ্ডব সসৈন্যে নিহত হয়েছে।"…

তিন রথী রথ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটতে-ছুটতে এসে দেখেন, দুর্যোধনের তখন শেষ অবস্থা। অর্ধ অচৈতন্য। মুখ দিয়ে রক্তবমি হচ্ছে। শবদেহ মনে করে কয়েকটি শৃগাল কুকুর তাকে ঘিরে ধরেছে। অতিকষ্টে দুর্যোধন তাদের তাড়াতে চেষ্টা করছে। দেখে তাঁরা তিন জনে কাঁদতে লাগলেন।

অশ্বত্থামা বললেন, "মহারাজ, আপনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে অন্তিম কালে এই সুসংবাদ শুনে যান। আমি পাণ্ডবদের পঞ্চ পুত্রকে বধ করেছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সমস্ত পাঞ্চাল ও মৎস্য সৈন্য নিহত। পঞ্চপাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।"

মৃতপ্রায় দুর্যোধনের অল্প-অল্প চেতনা ফিরে এল, "আচার্যপুত্র, তোমরা তিনজনে যা করলে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণও তা পারেননি। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রতুল্য মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হোক। স্বর্গে আবার আমাদের দেখা হবে।"

দুর্যোধন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।…

ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি সেই রাত্রে শিবির থেকে কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সেই নৃশংস হত্যার দুঃসংবাদ জানাল।

শুনে যুধিষ্ঠির শোকে মূর্ছিত হলেন। সাত্যকি ও পাণ্ডবেরা তাঁকে ধরে তুললেন। যুধিষ্ঠির বিলাপ করে বলতে লাগলেন, "হায়, জয়ী হয়েও আমরা পরাজিত হলাম। জয়মানা বয়ং জিতাঃ। দ্রৌপদীর কি হবে? সে এমনিতেই দুঃখে শোকে শুষ্কশীর্ণা হয়ে গেছে ("শোককৃশাঙ্গযোষ্টিঃ")। দ্রৌপদী এই দুঃখ সইবে কেমন করে? নকুল, মন্দভাগিনী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে তুমি গিয়ে নিয়ে এস।"

দ্রৌপদী শোকে মূর্ছিতা হলেন। ভীম তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

সংজ্ঞা লাভ করে দ্রৌপদী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিনী ভঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "পুত্রদের যমের হাতে সমর্পণ করে আপনি জয়ী হয়েছেন। রাজত্ব পেয়েছেন। এখন মহাসুখে রাজ্য ভোগ করুন। আর তো আপনার পুত্রদের কথা মনে থাকবে না। অভিমন্যুর কথাও স্মরণ হবে না।"

তারপর অর্জুনকে বললেন, "শোন অর্জুন, আজ যদি তুমি সেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ না কর তাহলে আমি এখানেই প্রাণত্যাগ করব। শুনেছি অশ্বত্থামার মাথায় এক সহজাত উজ্জ্বল মণি আছে, তাকে বধ করে সেই মণি যুধিষ্ঠির মুকুটে ধারণ করবেন। তবেই আমি বাঁচব, নইলে আত্মঘাতী হব।" (সৌপ্তিকপর্ব, ১১/২০)

ভীম ছুটলেন পলাতক অশ্বত্থামাকে বধ করতে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অশ্বত্থামার কাছে ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র আছে। অর্জুন ছাড়া সেই অস্ত্র প্রতিরোধ করতে আর কেউ পারবে না।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমের অনুসরণ করলেন।

অশ্বত্থামা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গঙ্গার তীরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। সর্বাঙ্গে ঘৃত ও ভস্ম মেখে কুশের কৌপীন পরে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছেন।

ভীম চিনতে পেরে আক্রমণ করলেন। আত্মরক্ষার জন্য তখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ভয়ঙ্কর সে অস্ত্র। তাতে পৃথিবী ছারখার হয়ে যাবে। অর্জুনও তাঁর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র দিয়ে প্রতি-আক্রমণ করলেন।

নারদ ও বেদব্যাস দুজনকে নিষেধ করে বললেন, "তোমরা অস্ত্র প্রত্যাহার কর।" তখন অর্জুন তাঁর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা পারলেন না। ব্রহ্মতেজসঞ্জাত ওই দিব্যাস্ত্র প্রত্যাহার করা অর্জুন ছাড়া দেবরাজ ইন্দ্রও সমর্থ নন।

অশ্বত্থামা নিজের মাথার মণি দিয়ে প্রাণভিক্ষা পেলেন।

কিন্তু অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র গিয়ে উত্তরার গর্ভের শিশুকে বধ করল।

শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দিলেন, "আজ থেকে তুমি সর্বাঙ্গে দূষিত দুর্গন্ধ ক্ষত নিয়ে সর্বপ্রকার রোগে পীড়িত হয়ে একা-একা ঘুরে বেড়াবে। তোমাকে দেখে লোকে ঘৃণায় দূরে চলে যাবে। কেউ কথা বলবে না। এমনি করে জনহীন দুর্গম অরণ্যে তোমাকে একা-একা পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে হবে।"

পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর হাতে অশ্বত্থামার মাথার মণি এনে দিলেন।...

[তেত্রিশ]

ধ্বংস না সৃষ্টি ?

যুদ্ধ শেষ হল।

যেন একটা প্রলয় হয়ে গেল।

সমস্ত ভারতবর্ষ রক্তস্নান করে উঠল। দেশের আকাশ বাতাস মথিত করে কেবল শোক আর হাহাকার। ক্রন্দনে আবিল অভিশাপে জর্জর। ঘরে-ঘরে মাতার অশ্রুধারা, বিধবার বুকফাটা বিলাপ। দেশ ক্ষাত্রিয়শূন্য বীরশূন্য। কে জিতল আর কে হারল ? বিজয়ী ও বিজিত দুই পক্ষই সমান সন্তপ্ত। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ চোখে শোকের অশ্রু, আবার রক্তের সমুদ্রে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠিরের করুণ আর্তি, "আমাদের চেয়ে দুঃখী আর কেউ নেই। ন দুঃখিততরঃ কশ্চিৎ পুমানস্মাভিরস্তি হ।" (শান্তিপর্ব, ২৭৯/১)

প্রশ্ন জাগে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়ে জাতীয় জীবনে এমন এক বিপর্যয় নিয়ে এলেন কেন ? আমরা আধুনিকেরা অনেক সময় এও বলে থাকি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এই সর্বাত্মক ধ্বংস ভারতবর্ষকে নিঃস্ব ও দুর্বল করে দিয়েছিল। ষড়ৈশ্বর্যশালী দেশ সেই দিন থেকে হীন ও দরিদ্র হতে আরম্ভ করল। ক্ষাত্রবল ও ধনবল হারিয়ে পরিণামে ভারতবর্ষ পরাধীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সমাজ ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বস্তুত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ রক্ষা পেয়েছে। কেননা জাতির মহত্ত্ব কেবল গায়ের জোরে ক্ষাত্রবলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজের যে চারটি ধারা, তখনকার দিনে বলা হ'ত চাতুর্বর্ণ্য—ব্রাহ্মণ-ক্ষাত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, আজকের দিনেও ওই নামে না হোক ওই ধারাতেই জীবন চলেছে, সেই সমগ্র লোকসমাজের পারস্পরিক সংহতি ও শ্রীবৃদ্ধিতেই দেশের উন্নতি।

প্রাচীন ভারতবর্ষ জানত, জ্ঞান ও বল পরস্পরের আশ্রয়। সাত্ত্বিক ব্রহ্ম-তেজ রাজসিক ক্ষাত্রতেজকে জ্ঞানে বিদ্যায় উদারতায় সঞ্জীবিত করে রাখে। আবার ক্ষাত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। মহাভারতে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয়ের আশ্রয়, আবার ক্ষাত্রিয় ব্রাহ্মণের রক্ষক—"ব্রহ্ম বর্ধয়তি ক্ষত্রং ক্ষত্রতো ব্রহ্ম বর্ধতে" (শান্তিপর্ব, ৭৩/৩২)।

ক্ষাত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে রক্ষা না করে তাহলে ব্রহ্মতেজ তমোভাবে ডুবে যায়। ব্রাহ্মণ তখন বৈশ্য এবং শূদ্রের অধীনে নিকৃষ্ট হয়ে পড়েন। গুণ ও

বিদ্যার বেসাতি শুরু করেন। তাই বলা হয়েছে, যে দেশে ক্ষত্রিয় নেই সে দেশে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ। আবার ব্রাহ্মণ যদি ক্ষাত্রতেজকে পালন ও আশ্রয় না দেন তাহলে ক্ষত্রিয় উদ্দাম আসুরিক হয়ে ওঠে। পরিণামে সমাজের ও নিজেদের বিনাশ নিয়ে আসে। ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হলে শূদ্র রাজা হয়। ব্রাহ্মণ তখন তামসিক। অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করে শূদ্রের দাস হয়ে পড়েন। জ্ঞান ও শক্তির হ্রাস হলে সমাজে ধর্মের হানি হয়। অন্তর্বিরোধ দুর্নীতি ও অত্যাচারে দেশ ছারখার হয়।

মহাভারতের সময়ে সমাজে ঠিক এই অবস্থা এসে পড়েছিল। দেশের ক্ষত্রিয়কুল দুর্দান্ত বলে আসুরিক হয়ে উঠেছিল। এতখানি শক্তি ভারতবর্ষে আগে বা পরে কখনো হয়নি। কিন্তু যারা এই শক্তির অধিকারী তারা হয়ে পড়েছিল স্বেচ্ছাচারী দর্পিত দাম্ভিক। চার্বাকপন্থী দুর্যোধন তাদের প্রতিমূর্তি। যুদ্ধ যদি না হ'ত তাহলেও পারস্পরিক দ্বন্দ্বে দেশ অচিরেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। সমাজজীবন ঘোর তমোগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যেত। মনে রাখতে হবে কলিযুগের সঞ্চার তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল—"কলিমাসন্নমাবিষ্টং" (আশ্বমেধিকপর্ব, ১৪/২৩)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান আছেন বলে কলি তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারছিল না।

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ২৪/৩৬)

(শ্রীকৃষ্ণ যতদিন তাঁর পাদপদ্ম দিয়ে পৃথিবী স্পর্শ করে ছিলেন ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করতে পারেনি।)

শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্রতেজ কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রে নির্বাপিত করেন নাই বরং আসুরিক বল বিনাশ করিয়া ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা করিয়াছেন। আসুরিক বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃশক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহা সত্য। এইরূপ মহাবিপ্লব, অন্তর্বিরোধকে উৎকট ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা, উদ্দাম ক্ষত্রিয়কুল সংহার সর্বদা অনিষ্টকর নয়। অন্তর্বিরোধে রোমান ক্ষত্রিয়কুল নাশে ও রাজতন্ত্র স্থাপনে রোমের বিরাট সাম্রাজ্য অকাল-বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডের শ্বেত ও রক্ত গোলাপের অন্তর্বিরোধে ক্ষত্রিয়কুলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড, অষ্টম হেনরি ও রাণী এলিজাবেথ সুরক্ষিত

পরাক্রমশালী বিশ্ববিজয়ী আধুনিক ইংলণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপ রক্ষা পাইল।...

..."মনে রাখা উচিত পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছে, আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে ম্লেচ্ছদের প্রথম সফল আক্রমণ সিন্ধুনদীর অপর পার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছে। অতএব অর্জুন-প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য এতদিন ব্রহ্মতেজ-অনুপ্রাণিত ক্ষত্রতেজের প্রভাবে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। তখনও সঞ্চিত ব্রহ্মতেজ দেশে এত ছিল যে, তাহার ভগ্নাংশই দুই সহস্র বর্ষ দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ; চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রম, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, রাজসিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, ইত্যাদি মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতেজের বলে দেশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই দিন গুজরাট যুদ্ধে ও লক্ষীবাঈয়ের চিতায় তাহার শেষ স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক কার্যের সুফল পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, ভারতকে, জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল।"... ('শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলী', ১৯৬৯, পৃ. ১০৮)

শ্রীকৃষ্ণ কেবল বংশীধারী নন, তিনি কখনো-কখনো হাতে তুলে নেন ত্রিশূল ও রক্তপূর্ণ কঙ্কালকপাল—"স শূলভৃচ্ছোণিতভৃৎ করালস্তং" (অনুশাসন-পর্ব, ১৫৮/১৪)। তিনি বৃন্দাবনে, আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে।

শোকে আত্মহারা গান্ধারী যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কেশব, তুমি তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্, তবে কেন তুমি তোমার দৈব শক্তি দিয়ে কুরুবংশকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচালে না ? কেন তুমি তাদের ধ্বংস দেখেও উপেক্ষা করলে ? তাই আজ তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, এমনি করে তোমারই চোখের সামনে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাকে একা-একা বনে-বনে ঘুরে বেড়াতে হবে। শোচনীয়ভাবে তোমার মৃত্যু হবে।"

এই অভিশাপ শুনে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসলেন, "ক্ষত্রিয়ে, এমন যে হবে তা আমি জানি। ভবিতব্য বলে যা স্থির হয়ে আছে তুমি কেবল তারই বর্ণনা দিলে। দৈববশে যদুবংশ আত্মকলহে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

শুনে পাণ্ডবেরা উদ্বিগ্ন হলেন। নিজেদের সম্বন্ধেও নিরাশ হয়ে পড়লেন।

[চৌত্রিশ]

মহাভারতের মহাফল

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুধিষ্ঠির ভারতসম্রাট। দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যও সার্থক। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"—মহাভারতের এই প্রতিপাদ্যও সফল। অতএব মনে হতে পারে মহাভারত এখানেই শেষ। অনেকে তাই বলেন। এর পরে যা তা পরবর্তী কালের সংযোজন।

তা যদি হ'ত তাহলে মহাভারতে আমরা পেতাম শুধু একটা রোমাঞ্চকর জীবনধর্মী-উপন্যাস অথবা একটা সংঘাতময় নাটক। জয় পরাজয় মৃত্যু দিয়ে যার শেষ। তাতে আর যাই হোক মহাভারত হ'ত না। ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে যা চেয়েছে জীবনে তা লাভ করত না। একটা সমগ্র দেশ তার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে এমন করে ব্যক্ত করে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করে তুলত না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রামায়ণ মহাভারতের কাছে "ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।"

ভারতবর্ষ কি চেয়েছে? কি পেয়েছে?

আদিপর্বে বেদব্যাস প্রথমেই তার উত্তর দিয়েছেন। মহাভারত কেবল কাহিনী নয়। ঘটনার ইতিহাস নয়। মহাভারত জীবনবেদ। চিরকালের ইতিহাস। সমগ্র জাতির অস্তিত্বের গভীরে সর্বত্র সঞ্চারী মূল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশবিসারী শাখাপল্লবে সমুন্নত একটা বৃহৎ বনস্পতি। "ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ" (আদিপর্ব, ১/১১১)—যার ছায়ায় আমাদের প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি। বেদ ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষের মূল—"মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ" (আদিপর্ব, ১/১১১)। এই ধর্মবৃক্ষের মহিমা মহাভারতের পর্বে-পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আদিপর্ব হল এই বৃক্ষের বীজ ("সংগ্রহাধ্যায়বীজো")। পৌলোম ও আস্তিক পর্বে দেখান হয়েছে কেমন করে এই বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। সম্ভবপর্ব তার বিস্তৃত কাণ্ড। সভা ও বনপর্ব বৃক্ষের বিটঙ্ক, যেখানে পাখিরা আশ্রয় নেয়। যেখানে বিচিত্র সব কথা ও কাকলি জেগে ওঠে। বনপর্ব গভীর ভাবের ও তত্ত্বের রহস্যগ্রন্থি ("অরণীপর্বরূপাঢ্যো")। বিরাট ও উদ্যোগপর্ব বৃক্ষের সারভাগ। ভীষ্মপর্ব মহাশাখা। দ্রোণপর্ব পত্রাবলী।

কর্ণপর্ব তার শুভ্র পুষ্পসম্ভার। শল্যপর্ব ওই পুষ্পরাজির গন্ধ। স্ত্রী ও ঐষীক পর্ব তার ছায়া। শান্তিপর্ব ভারতবৃক্ষের মহাফল ("শান্তিপর্ব-মহাফলঃ")। আশ্বমেধিকপর্ব তার অমৃত রস। আশ্রমপর্ব শান্তির আশ্রয়। মৌষলপর্ব সংক্ষিপ্ত শ্রুতি। এই হল সর্বভূতের অক্ষয় ভারতবৃক্ষ—"ভূতানা-মক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ" (আদিপর্ব, ১/৯২)।

রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, "ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে" (রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১২ খণ্ড, পৃ ১০৩১-৩২)—মহাভারতই হল সেই বৃহৎ বনস্পতি। ধর্ম ও জীবনকে ভারতবর্ষ চিরকাল বৃক্ষরূপে কল্পনা করেছে। রামায়ণও অমৃতফলদায়ী এক বৃক্ষ। রামায়ণের এক একটি ভাগ তাই এক একটি কাণ্ড। বৃক্ষের গঠন ও উপাদানের সঙ্গে মানবশরীরের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখেছেন উপনিষদের ঋষিরা—বৃক্ষ যেমন মানুষও তেমনি—"যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষঃ অমৃষাঃ" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩-৯-২৮)। মানুষের ত্বক্ বৃক্ষের বাকল। মানুষের দেহের মাংস বৃক্ষের 'শকল'। তার দেহের স্নায়ু বৃক্ষের কিনাট। আর অস্থিই হল কাঠ। এইভাবে বৃক্ষ ও মানুষ মজ্জায়-মজ্জায় এক—"মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা"। এমনকি এই জগৎ সংসার কালের গতিকেও বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হয়েছে—"বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৬/৬), ঋষিদৃষ্টি দেখেছে, সর্বোত্তম পরমেশ্বর আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্তব্ধ নিশ্চল বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে আছেন—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" (ঐ, ৩/৯)।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে মহাভারত যদি শেষ হয়ে যেত তাহলে বেদব্যাসের বর্ণনা অনুসারে আমাদের বলতে হ'ত, এই বৃক্ষ তার বিশাল কাণ্ড শাখাপ্রশাখা পুষ্পে পত্রপল্লবে দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু সে নিষ্ফলা, তাতে কোন ফল ধরেনি।

যুদ্ধের পরে মহাভারতের গতি নতুন একটা বাঁক নিল। একটা অসীম উদাস হাওয়া বইতে লাগল। নীলকণ্ঠ বলেছেন, এখন থেকে মহাভারত হয়ে উঠল শান্তরসপ্রধান। আনন্দবর্ধন তার 'ধ্বন্যালোকের' চতুর্থ উদ্যোতে মহাভারতের রসবিচার করতে গিয়ে বলেছেন, "শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষা-বিষয়ত্বেন সূচিতঃ"। বেদব্যাসের হৃদয় যেন আকাশ হয়ে অসীম শান্তির মধ্যে সবকিছুকে আশ্রয় দিয়েছে। ভারতবর্ষ এখানে অমৃতময় ফলবান্ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কি সেই মহাফল ?

উত্তরে বলতে হয়, এই যাবতীয় সর্বকিছু। ব্যক্তির সমাজের রাষ্ট্রের

তার ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক সকল চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণ সিদ্ধরূপ এই মহাভারত। ঋষি উদ্দালক তাঁর পত্নী সুবর্চলাকে বলেছিলেন, লোকসিদ্ধি ও আত্মসিদ্ধির সার্থক সমন্বয় পরম তত্ত্বের লক্ষ্য—"তস্মাল্লোকস্য সিদ্ধ্যর্থং কর্তব্যং চাত্মসিদ্ধয়ে" (শান্তিপর্ব, ২২০/৪৫)। অধ্যাত্মের জ্ঞানে ঐহিকের সাধন।

জীবনকে যতভাবে যতরকম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তা দেখা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই থেকে ভিন্ন-ভিন্ন কত দর্শন ও সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মত ও পথের সে এক জটিল অরণ্য। সেখানে হঠাৎ প্রবেশ করলে দিশাহারা হতে হয়। পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। অল্পায়াসী অল্পবুদ্ধি আমরা তো তুচ্ছ, সেকালের মহাতপা ঋষিগণও জীবনের মীমাংসার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। আশ্বমেধিকপর্বে গুরু-শিষ্য সংবাদে ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "ভগবন্, ধর্মের গতি বিচিত্র। আমরা কোন্ পথে চলব ?"

বাস্তবিক কত মত ও পথ—আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়ী, লোকায়ত, সপ্তভঙ্গীনয়বাদ, তৈর্থিক, তার্কিক, সৌগত, উড়ুলোম, ইত্যাদি আরো কত কি ! কেউ বলেন, আত্মা অবিনশ্বর, কেউ বলেন, আত্মা বলে কিছু নেই। কেউ বলেন, এই দেহ এবং প্রত্যক্ষের বাইরে কিছু নেই, কেউ বলেন, সব কিছুরই অস্তিত্ব আছে। আবার কেউ বলেন, সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। শুধু বিচারে নয়, আচারেও কত পার্থক্য। কেউ শ্মশ্রুজটাধারী, কেউ আবার মুণ্ডিতমস্তক। কেউ গৈরিক অজিন অথবা কৌপীনবন্ত, আবার কেউ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কেউ আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কেউ গার্হস্থ্যকে উচ্চ আসন দেন। উপবাসকৃচ্ছ্রতা কঠোর আত্মপীড়নকে কেউ ধর্ম বলেন, কেউ আবার সহজ সুস্থ স্বাভাবিক আহার বিহারের পক্ষপাতী। অর্থ ও ভোগকে কেউ মোক্ষের আসনে বসান, আবার কেউ অকিঞ্চন সর্বত্যাগ সন্ন্যাসকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। কেউ যজ্ঞ কেউ তপস্যা কেউ জ্ঞান আবার কেউ-বা সন্ন্যাসেরই প্রশংসা করেন। জীবনবৃত্তির যতরকম গতি হতে পারে সবগুলিকে একান্ত ও চূড়ান্ত করে দেখা হয়েছে। শুধু তত্ত্বে নয়, জীবনে ও আচরণেও। (আশ্বমেধিকপর্ব, ৪৯ অধ্যায়)

এই বিভ্রান্তিকর জটিলতার ভিতর দিয়ে মহাভারত আমাদের কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যেতে চায় ?

দুদিনের তো জীবন আমাদের। তাও নানা সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। সারা জীবন ধরে সত্যের পরখ-নিরিখ করার অবসর আমাদের কোথায় ? কবি তা জানেন, শুধু আজকের দিনে কেন, সকল যুগের সাধারণ মানুষেরই অবস্থা

হল অজ্ঞানের অন্ধকারে ব্যস্ত হয়ে ছটফট করা—"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য লোকস্য তু বিচেষ্টতঃ" (আদিপর্ব, ১/৮৪)। মহাভারত সেই অন্ধকারে একটি প্রদীপ জ্বেলে ধরেছে। শুভ্র জ্যোৎস্নার কিরণ এনে আমাদের অন্ধকার গৃহকোণকে আলোকিত প্রকাশিত করে ধরেছে—

ইতিহাসপ্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সম্প্রকাশিতম্॥
(আদিপর্ব, ১/৮৭)

এক ঝলক আলোর মত প্রথমেই মহাভারতের যে মূল বক্তব্য প্রতিপাদ্য তাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের চতুষ্কোণ বেদীতেই মহাভারতের যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত। ধর্ম মহাভারতে চতুষ্পাদ—"ধর্মমেকং চতুষ্পাদং" (আশ্বমেধিকপর্ব, ৩৫/৩৭)। সকল মত ও পথের জটিলতার গ্রন্থিমোচন হয়েছে এরই ভিতরে।

জীবন সম্পর্কে যার যেরকম বিশ্বাসই থাক, আস্তিক নাস্তিক সংশয়ী যেমন মানুষই হোক, সম্রাট থেকে ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র, সকলেই জীবনের এই চতুঃসীমার মধ্যে বিচরণ করছে। এই চারটি বিষম উপাদানের মাত্রা নিরূপণ ও সমন্বয় সাধনের ভিতরেই জীবনের সুখ শান্তি সার্থকতা। ঋষি উদ্দালক যে লোকসিদ্ধি ও আত্মসিদ্ধির কথা বলেছেন তা মূলতঃ এই চতুর্বর্গ সাধনেরই কথা। ঐহিক জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মের, মনুষ্য জীবনের সঙ্গে দেবজীবনের যে সম্পর্ক ও সমন্বয়ের সমস্যা তাই মহাভারতের চতুর্বর্গ—ইহজীবনের পূর্ণতার সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "ইহৈব তৈর্জিতং সর্গঃ" (গীতা, ৫/১৯)।

আদিপর্বে ভৈরবী রাগে সুর বাঁধা হয়েছে বারবার তার উল্লেখ করে। তারপরেও পর্বে-পর্বে এর উল্লেখ। যেমন,—

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থৈঃ সমাস-ব্যাসকীর্তনৈঃ।
(আদিপর্ব, ১/৮৫)

অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥
(আদিপর্ব, ২/৩৯৫)

ধর্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ যথাবদ্ বদতাং বর।
বিভজ্য কালে ধর্মজ্ঞঃ সর্বান্ সেবেত পণ্ডিতঃ॥
(বনপর্ব, ৩৩/৪২)

যো ধর্মমর্থং কামঞ্চ যথাকালং নিষেবতে।
ধর্মার্থকামসংযোগং সোঽমুত্রেহ চ বিন্দতি ॥

(উদ্যোগপর্ব, ৩৭/৫০)

ধর্মার্থকামযুক্তাশ্চ বিচিত্রার্থপদাক্ষরাঃ।

(উদ্যোগপর্ব, ১৪/২)

ধর্মে চার্থে চ কামে চ লোকবৃত্তিঃ সমাহিতা।

(শান্তিপর্ব, ১৬৭/২)

চাতুর্বিদ্যং তথা বর্ণাশ্চাতুরাশ্রমিকান্ পৃথক্।
ধর্মমেকং চতুষ্পাদং নিত্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥

(আশ্বমেধিকপর্ব, ৩৫/৩৭)

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥

(স্বর্গারোহণপর্ব, ৫/৫০)

রামায়ণেও এই চতুর্বর্গকে মহাফল বলা হয়েছে—

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্।

(শ্রীস্কন্দপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১/২১)

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩/৮)

এই তত্ত্বই মহাভারতের বিচিত্র মণিমালাকে স্বর্ণসূত্রে গেঁথে রেখেছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন, "সূত্রিতানাং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং"।

কিন্তু জীবনের এই চারটি কিন্তু সহজ উপাদান নয়। তারা বিষম বিরুদ্ধ বিমিশ্র জটিল। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের। একটা ঊর্ধ্বপাতনের ভিতর দিয়ে এদের মধ্যে একটা সুস্থির সমন্বয় বিধান করা এক অতি দুরূহ সমস্যা। জীবনের সে এক জটিল ফলিত যৌগিক রসায়ন। তাকে আবার জটিলতর করেছে, দারুণ বিস্ফোরকে পরিণত করেছে প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তম।

এই সমস্যাকে প্রথমে যুধিষ্ঠিরের সামনে তুলে ধরেছিলেন যক্ষরূপী ধর্ম। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ধর্ম-অর্থ-কাম এরা পরস্পর বিরোধী। নিত্য বিরোধী এই তিনের একত্র অবস্থান কি সম্ভব?" (বনপর্ব, ৩১৩/১০১)

যুধিষ্ঠির কি উত্তর দিয়েছিলেন তা আমরা জানি। নিজের জীবনে তিনি এই সমস্যার সমাধান পেলেও সাধারণ সমাজজীবনে তা যথার্থ সাধিত হয়নি। এমনকি যুধিষ্ঠিরের নিজের জীবনেও এর ব্যাবহারিক প্রয়োগ

সম্পূর্ণ হয়নি। সেজন্য সারা জীবন তাঁকে অনুসন্ধান করতে হয়েছে। যেতে হয়েছে মহাপ্রস্থানের পথের শেষ পর্যন্ত।

সমাজে ও জীবনে মহাভারত এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছে। নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় বলছেন, এই তত্ত্বই সম্যগ্‌ভাবে নিরূপিত হয়েছে, "ধর্মার্থকাম-মোক্ষান্তে সম্যগত্র নিরূপিতাঃ"। জীবনের এই চারটি বর্গের শুদ্ধি পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য গোটা সমাজকে চারটি পৃথক বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। এই চাতুর্বর্ণ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। প্রত্যেক বর্ণ এক একটি পুরুষার্থকে কখনো এককভাবে কখনো-বা মিশ্রভাবে সাধনার চেষ্টা করতে লাগল। সমাজের মত ব্যক্তিজীবনও আবার বিভক্ত হয়ে গেল চারটি পৃথক আশ্রমে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। জীবনের এই চতুরাশ্রমের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি তার চতুর্বর্গ সাধনে ব্রতী হল। আবার এই চারটি বিষম উপাদানকে একত্রে একমুখী ও তীব্র করে ধরা হল সাধারণ গৃহস্থ জীবনের মধ্যে। সকল নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে তেমনি সমাজের চারটি আশ্রমই গার্হস্থ্য আশ্রমে এসে মিশেছে। এমনি করে ভারতবর্ষের প্রতিটি গৃহ হয়ে উঠেছে চতুর্বর্গের যজ্ঞবেদী—তার প্রয়োগশালা। নটরাজের নাচদুয়ার। জীবনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র—তার পরীক্ষাগার।

> চত্বার আশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ সর্বে গার্হস্থ্যমূলকাঃ।
>
> (আশ্বমেধিকপর্ব, ৪৫/১৩)
>
> যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
> এবমাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥
>
> (শান্তিপর্ব, ২৯৫/৩৯)

ভারতবর্ষের প্রতিটি গৃহ জীবন-রহস্যের একটা গভীর তত্ত্বের প্রতীক। একটা পারমার্থিক সত্যের প্রতিমূর্তি। ফলতঃ আমাদের জীবন কোন্ পথে চলবে, কি রূপ নেবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমরা এই চারটি পুরুষার্থকে কে কিভাবে নিয়েছি বা নিতে চাই তার উপরে।

বিষয়টি নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে শান্তিপর্বে (১৬৭ অধ্যায়ে)। পঞ্চপাণ্ডব নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করছেন। যেন একটা বিতর্ক সভা। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সকল উপদেশের সার নির্যাসটুকু যেন এখানে নিষিক্ত করা হচ্ছে। মহামতি বিদুর এই অধিবেশনের সভাপতি।

প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন যুধিষ্ঠির। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সকল মানুষের মধ্যেই ধর্ম-অর্থ-কাম এই তিন বৃত্তি কম-বেশি সক্রিয়। কি করে এদের তারতম্য স্থির করা যায়? কোন্‌টা উত্তম, কোন্‌টা মধ্যম,

কোনটাকেই-বা অধম বলব? কেমন করে এদের উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করা যায়?"

বিদুর প্রশ্নটির একটা সীমা টেনে লক্ষ্য নির্দেশ করে দিলেন। বললেন, "সমস্যাকে দেখতে হবে একটা পরম পদে উঠে দাঁড়িয়ে। তাহলেই তার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে। চেতনার যে পদে উঠে দাঁড়ালে তোমার মন আর টলবে না, তখন দেখবে ধর্মের অর্থের বা কামের মূল কোথায়। তারতম্যের দিক থেকে ধর্মই শ্রেষ্ঠ গুণ, অর্থ মধ্যম, আর কাম লঘু—ধর্মো গুণঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমো হ্যর্থ উচ্যতে। কামো যবীয়ানীতি…" (শান্তিপর্ব, ১৬৭/৮)

এবার যুধিষ্ঠির অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অর্জুন, তুমি কি বল?"

অর্জুনকে আমরা জানি, তিনি কেবল অদ্বিতীয় বীর নন, তিনি একজন অভিজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ ("অর্থশাস্ত্রবিশারদঃ পার্থো")। বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন কর্মী-মানুষ। ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়ে শাদা চোখে জীবনকে দেখেন। তিনি বললেন, "মহারাজ, এই পৃথিবী কর্মভূমি। এবং সকল কর্মের উদ্দেশ্য অর্থপ্রাপ্তি। অর্থ ছাড়া ধর্মই বলুন আর কাম অর্থাৎ ভোগই বলুন কিছুই চরিতার্থ হয় না। ধর্ম এবং কাম অর্থেরই দুইটি অবয়ব। অর্থের সিদ্ধিতেই ধর্ম ও কামের সিদ্ধি—অর্থস্যাবয়বাবেতৌ ধর্ম-কামাবিতি শ্রুতিঃ"। (শান্তিপর্ব, ১৬৭/১৪)

এই বলে নকুল সহদেবকে দেখিয়ে অর্জুন বললেন, "মহারাজ, দেখুন, ওরা কিছু বলার জন্য উৎসুক হয়েছে। ওরা কি বলে শোনা যাক।"

কনিষ্ঠ দুই পাণ্ডব নকুল ও সহদেবের কথা শুনে আমরা কিন্তু চমৎকৃত হই। বিষয়টি তাঁরা যে কেবল সঠিকভাবে বুঝেছেন তাই নয়, ধর্ম-অর্থ-কামের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও গুরুত্ব যথাযথ নির্ণয় করতেও পেরেছেন। পাণ্ডবদের এই দুই ছোট ভাই সারা মহাভারতে খুব কম কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা যে কত বুদ্ধিমান, ভীম অর্জুনের চেয়েও যে কত স্থিতধী তা তাঁদের কথাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

নকুল সহদেব বললেন, "মহারাজ, অর্থ যে অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং দুর্লভ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধার্মিক যদি দরিদ্র হন তাহলে তাঁর জীবন নিষ্ফল। কিন্তু তাই বলে অধার্মিক ধনী হয়ে উঠলে সে বড় ভয়াবহ। অর্থ যখন ধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়, ধর্ম যখন অর্থের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই তা অমৃত—"তদ্ধি হ্যমৃতসংবাদম্"। ধর্ম-অর্থের সংযোগে যে ভোগ তাই সফল-কাম। প্রথমে চাই ধর্ম, ধর্ম থেকে অর্থ, এই দুয়ের মিলনে যে ভোগ তাই মানুষের সার্থক ত্রিবর্গ।

এবার বলছেন ভীম।

আমরা জানি, ভীম বিলক্ষণ বিলাসী এবং ভোগী। দ্রৌপদী একবার মন্তব্য করেছিলেন, ভীম মহার্ঘ বসন পরতে এবং উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করতে ভালবাসেন (বনপর্ব, ২৭/২২)। তাঁর ভোজনপ্রিয়তাও সুবিদিত। এই অধিবেশনেও ভীমকে দেখছি, তিনি চন্দনচর্চিত বিচিত্রমাল্য আভরণে ভূষিত এক সৌখিন পুরুষ ("চন্দনসারলিপ্তো বিচিত্রমাল্যাভরণৈরুপেতঃ")।

ভীম বললেন, "মহারাজ, ত্রিবর্গের মধ্যে কামই শ্রেষ্ঠ। জগতের সবকিছু চলছে কামপ্রবৃত্তিতে। ধর্ম ও অর্থ কামের উপরই নির্ভর করে আছে—নাস্তি ভূতং কামাত্মকাৎ পরম্...ধর্মার্থাবত্র সংস্থিতৌ—অতএব কামকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত। কামো হি রাজন্ পরমো ভবেনঃ।"

যুধিষ্ঠির শুনে একটু হাসলেন। তিনি যে রসিক ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। চার ভাইয়ের বক্তব্য শুনে এবার যুধিষ্ঠির অল্প কথায় উপসংহার করছেন। তাঁর অন্তরের আকাশ যে কত ঊর্ধ্বে প্রসারিত তা তাঁর এই স্বল্প কথাতেই বোঝা যায়। তিনি বললেন, "তোমাদের সকলের কথাই শুনলাম। জীবনকে তোমরা কে কিভাবে দেখছ তা জানবার জন্যই এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তোমাদের অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মিলিয়ে যা বললে তা শুনলাম। এখন আমার যা মনে হয় তা বলছি।"

যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য ভগবদগীতারই সংক্ষিপ্তসার—জগৎ কল্যাণের গুহ্যতম তত্ত্ব—"লোকহিতায় গুহ্যম্" (শান্তিপর্ব, ১৬৭/৪৮)। বললেন, "দুঃখপীড়িত এই সংসারে মানুষ নিজের কামনার জালে নিজেই মাকড়সার মত জড়িয়ে আছে। স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন, বিষয়বাসনা থাকতে মানুষের মুক্তি নেই। শুধু যে পাপে মানুষ কষ্ট পায়, অর্থে ও কামে মানুষ অস্থির হয় তাই নয়, ধর্ম এবং পুণ্য এক ধরনের বন্ধন। শুধু পাপ ও অধর্ম থেকেই নয়, ধর্ম এবং পুণ্যেরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। ভাল এবং মন্দ উভয়ের দোষ থেকে মুক্ত হলে, মাটি আর সোনা এক হয়ে যায়—"বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ" (শান্তিপর্ব, ১৬৭/৪৪)।"

যুধিষ্ঠির আরো বলছেন, "ধর্ম অর্থ কামের ঊর্ধ্বে উঠেই (ত্রিবর্গহীনোঽপি) তাদের উপর সম্যক্ কর্তৃত্ব লাভ হয়।"

বস্তুত এখানে যুধিষ্ঠির গীতার প্রতিধ্বনি করছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন" (গীতা, ২/৪৫)। নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ নির্যোগক্ষেম অবস্থায় উঠে ত্রিবর্গের সিদ্ধির কথা বলছেন। আলোচনার শুরুতে বিদুর যে পরমপদের কথা বলেছিলেন ("ধর্মার্থাবেতদেকপদং"—শান্তিপর্ব, ১৬৭/৬) যুধিষ্ঠির উপসংহারে

২২

সেইখানেই ফিরে এলেন। ভীষ্মও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, বলেছেন, আসক্তি-শূন্য নিষ্কাম মনের দ্বারাই ত্রিবর্গ লাভ হয়। তাকেই বলেছেন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি—"শ্রেষ্ঠে বুদ্ধিস্ত্রিবর্গস্য যদয়ং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ" (শান্তিপর্ব, ১২৩/৮)।

সাধারণ মানুষ আমরাও বুঝি জীবনের চারটি পুরুষার্থের গুরুত্ব কতখানি। এর কোন একটা বাদ দিলে জীবন শ্রীহীন ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। আবার এদের পরিমাণ ও অনুপাত ঠিক না হলে জীবনের শিরায়-শিরায় বিষের মত মারাত্মক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্বভাব প্রকৃতি অনুসারে এক-এক জনের ঝোঁক এক-একটির উপরে। অর্জুন যেমন অর্থকেই প্রধান ভাবছেন। ভীম ভাবছেন কামকে। নকুল ও সহদেব ধর্মের ভিতর দিয়ে অর্থের ও কামের শোধন চাইছেন। আর যুধিষ্ঠির চাইছেন ধর্ম ও মোক্ষকে প্রথম ও পরম করে নিতে।

তাহলে এই চতুর্বর্গের পরস্পর সম্বন্ধ কি ? বেদব্যাস বলছেন, ধর্ম থেকেই অর্থ ও কামের উৎপত্তি—"ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ" (স্বর্গারোহণপর্ব, ৫/৬২)। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্থ ও কাম ধর্ম হতে পৃথক নয়—"ন হি ধর্মাদপৈত্যর্থঃ কামো বাপি কদাচন" (উদ্যোগপর্ব, ১২৪/৩৭)। বিদুরও বলছেন ধর্মের মধ্যেই অর্থ রয়েছে—"ধর্মে চার্থঃ সমাহিতঃ" (শান্তিপর্ব, ১৬৭/৭)। অতএব জীবনের এই রহস্যচতুষ্টয় আমাদের ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। বস্তুত মহাভারতে সর্বত্র নানাভাবে তারই চেষ্টা হয়েছে।

ধর্ম

ধর্ম মানুষের আত্মার নিঃশ্বাস। আমরা ইতিপূর্বে দুটি পরিচ্ছেদে তার কিছু আলোচনা করেছি। বুঝতে চেষ্টা করেছি, কোন্ পথে ধর্ম ? ধর্ম-অধর্মের সম্পর্ক কি ? এখানে শুধু দেখব, ধর্ম কেমন করে অর্থ কাম ও মোক্ষকে ধারণ করে রয়েছে। 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যেই সেই অর্থ রয়েছে। ধারণার্থক 'ধৃঞ্' ধাতুর উত্তরে 'মন্' প্রত্যয় যোগে ধর্ম—সমস্ত লোকস্থিতিকে যা ধারণ করে তাই ধর্ম—"ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ" (উদ্যোগপর্ব, ৯০/৬৭)। "ধর্মে তিষ্ঠন্তি ভূতানি" (শান্তিপর্ব, ৯০/৫)। আবার 'ধন' পূর্ব 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয় যোগেও ধর্ম হয়। যা থেকে সকল ধনের প্রাপ্তি ঘটে তাই ধর্ম—"ধনাৎ স্রবতি ধর্মো" (শান্তিপর্ব, ৯০/১৮)। তাহলে লোকস্থিতি যেমন ধর্ম তেমনি ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সকল সম্পদকেও ধর্ম বলে। ভীষ্মও বলছেন, "অর্থমিত্যাহুঃ কবয়ো ধর্মলক্ষণম্" (শান্তিপর্ব, ২৫৯/৩)।

অর্থ

অর্থকে মহাভারত কখনো হীন বা হেয় বলে ভাবে নাই। অর্থ একটি শক্তি। সকল শক্তির মত অর্থও ভগবানের শক্তি। ধর্মের মূল যেমন অর্থ, অর্থের মূলও তেমনি ধর্ম—"সর্বথা ধর্মমূলোঽর্থো ধর্মশ্চার্থপরিগ্রহঃ", মেঘ ও সমুদ্রের মত ধর্ম ও অর্থ পরস্পরকে পুষ্ট করে—"মেঘোদধী যথা" (বনপর্ব, ৩৩/২৯)। যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন, "যে ব্যক্তি দরিদ্র সে তো মৃত" (বনপর্ব, ৩১৩/৮৪)। কুন্তী বলছেন, "দারিদ্র্য আর মৃত্যু তো এক কথা" (উদ্যোগপর্ব, ১৩৪/১০)। ভীষ্ম বলছেন, "যে দরিদ্র সে অতি দুর্বল। অর্থশক্তিতে মানুষ ধর্ম ও ইহলোক পরলোকের সকল ইষ্ট লাভ করে" (শান্তিপর্ব, ১৩০/৪৯-৫০)।

মহাভারতে অর্থকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। যা-কিছু আয়ত্ত করা যায় তাই অর্থ। ধর্ম ও বিদ্যাকেও বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ অর্থ— "ধনানামুত্তমং শ্রুতম্" (বনপর্ব, ৩১৩/৭৪)।

তবে শক্তি মাত্রেই তার অপব্যবহার অপপ্রয়োগ বা অতিরেক বিকার নিয়ে আসে। অর্থ যেহেতু শক্তি, তাই অর্থেরও বিকার ঘটে। অন্যায় পথে অধর্ম উপায়ে অর্জিত অর্থের তো কথাই নেই, ধর্ম পথেও উপার্জিত অর্থ যদি অত্যধিক সঞ্চিত হয় তাহলে সৃষ্টি করে লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ভয় উদ্বেগ কার্পণ্য ইত্যাদি যত তাপজ্বালা আর নানা রকম পাপ। তাই অর্থের প্রতি উৎকট দুরাগ্রহ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, "তীব্র কামনার বশবর্তী হয়ে যে কেবল অর্থ সংগ্রহ করে, তার সদ্ব্যবহার করে না, সে ব্যক্তি ঘৃণ্য, ব্রহ্ম-ঘাতীর ন্যায় পাপী, সে বধের যোগ্য।"

অতিবেলং হি যোঽর্থার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
স বধ্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মহেব জুগুপ্সিতঃ ॥

(বনপর্ব, ৩৩/২৫)

যুধিষ্ঠির বলছেন, "এমন ব্যক্তি সাক্ষাৎ নরকে যায়—সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ" (বনপর্ব, ৩১৩/১০৬)।

অথচ ধন উপার্জন এক তপস্যা। "ধনং প্রাপ্নোতি তপসা" (অনুশাসন-পর্ব, ৫৭/১০)। ভীষ্ম বলছেন, ধর্মপথে উপার্জিত অর্থকে তিন ভাগ করে তার এক-তৃতীয়াংশ সঞ্চয়, এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে জীবনযাত্রা, আর এক-তৃতীয়াংশ ধর্ম কার্যে ব্যয় করবে (অনুশাসনপর্ব, ১৪১/৭৯)। অর্থ সঞ্চয়েরও একটা সীমা বেঁধে দিলেন। তিন বৎসর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় এই পরিমাণ

অর্থই কেবল সঞ্চয় করবে। তার বেশি নয়। তার বেশি সঞ্চিত অর্থ হল অনর্থ।

ত্রৈবার্ষিকাদ্ যদা ভক্তাদধিকং স্যাদ্ দ্বিজস্য তু।
যজ্ঞেত তেন দ্রব্যেণ ন বৃথা সাধয়েদ্ ধনম্॥
(অনুশাসনপর্ব, ৪৭/২২)

অর্থ ভগবানের শক্তি। জগৎকল্যাণ যজ্ঞের জন্য ভগবান অর্থকে সৃষ্টি করেছেন—"যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা" (শান্তিপর্ব, ২৬/২৫)। ভগবান মানুষকে যে অর্থ দেন তা জগতের কল্যাণ কার্যের জন্য—"ধাতা দদাতি মর্ত্যেভ্যো যজ্ঞার্থমিতি" (শান্তিপর্ব, ২৬/২৬)। অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দর করে বলেছেন, "অর্থ এক বিশ্বজনীন শক্তির স্থূল চিহ্ন। এই শক্তি যখন পৃথিবীর উপর প্রকাশ পায় তখন তার ক্রিয়া হয় প্রাণের ও জড়ের স্তরে; বাহ্য-জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য এ শক্তিটি অপরিহার্য। তার উৎপত্তি ও সত্যকার কর্মের দিক দিয়ে এ শক্তি ভগবানের।··· অর্থ একটি শক্তি, মায়ের জন্য তাকে পুনরায় জয় করে নিতে হবে, তার সেবায় অর্পণ করতে হবে—অর্থকে দেখবে এই দৃষ্টিতে। সকল সম্পদই ভগবানের; যাদের রয়েছে ও জিনিস তারা রক্ষক মাত্র, মালিক নয়—আজ তাদের কাছে আছে, কাল অন্যত্র চলে যেতে পারে।···সর্বদা মনে রেখ—তাঁরই সম্পত্তি তুমি ব্যবহার করছ, তোমার নিজের নয়।···অর্থদোষ হতে তুমি যখন মুক্ত অথচ তোমার নাই সন্ন্যাসের নিবৃত্তি, তখনই ভাগবত কর্মের জন্য অর্থ জয়ের অধিকতর ক্ষমতা তোমার জন্মাবে। এই মুক্তির লক্ষণ—মনের সমতা, কোন দাবি না রাখা, তোমার যা-কিছু আছে, যা-কিছু তোমার হাতে আসে, তোমার সমস্ত উপার্জনশক্তি ভাগবত শক্তির কাছে তাঁর কর্মের জন্য পূর্ণ নিবেদন করা।" (*The Mother*, Chapter, 4)

কাম

অরণি থেকে যেমন অগ্নি, ধর্ম ও অর্থ থেকে তেমনি কামের উৎপত্তি—"প্রকৃতিঃ সা হি কামস্য পাবকস্যারণির্যথা" (বনপর্ব, ৩৩/২৮)। যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরও বলছেন, "এই সংসারের হেতু হল কাম—কামঃ সংসার-হেতুশ্চ" (বনপর্ব, ৩১৩/৯৮)। বাসনা ও বাসনাপূর্তি জনিত প্রীতি উভয় অর্থেই বেদব্যাস 'কাম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ধর্মের অবিরোধী যে 'কাম' তা স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমিই সেই কাম—ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি" (গীতা, ৭/১১)।

মহাভারতে এই 'কাম' শব্দও অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোন সংকল্পরূপ মানস ইচ্ছাকেই কাম বলে, "সনাতনো হি সঙ্কল্পঃ কাম ইত্যভিধীয়তে" (অনুশাসনপর্ব, ৮৫/১১)। ভীষ্ম বলছেন, "সর্বঃ সঙ্কল্পো বিষয়াত্মকঃ" (শান্তিপর্ব, ১২৩/৪)—সবকিছুর মূলে এই সঙ্কল্প। ইন্দ্রিয় মন ও হৃদয়ে যখন প্রীতির সঞ্চার হয় তাকেই কাম বলে—

> ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
> বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে॥
>
> (বনপর্ব, ৩৩/৩৭)

বিষয়ের সংস্পর্শে চিত্তে যখন প্রীতির ভাব জাগে এবং সেই প্রীতির সুখস্পর্শ পাওয়ার জন্য মনে যখন সঙ্কল্প জাগে তাকে বলে কাম। কাম অশরীরী। কাম অনঙ্গ।

> দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিরুপজায়তে।
> স কামশ্চিত্তসংকল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যতে॥
>
> (বনপর্ব, ৩৩/৩০)

জগতে আর কোন বন্ধন নেই, এই কামের বন্ধনেই জগৎ বাঁধা—"কাম-বন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্" (শান্তিপর্ব, ২৫১/৭)।

ব্যাবহারিক জীবনের সকল রসোপলব্ধি আনন্দ ও প্রীতির মধ্যে ধর্মসঞ্জীবিত শুদ্ধ কামের একটা সূক্ষ্ম অনুলেপ ও অনুপাত থাকে। জীবন্ত দেহের উষ্ণতার মত তা প্রাণেরই লক্ষণ। দেহের তাপ যদি সুস্থ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় শরীর তখন উত্তপ্ত জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুস্বাদু ব্যঞ্জনে লবণের মত কামের একটা সূক্ষ্ম মাত্রা আছে। বেশি হলে সবটা ক্ষার বিষ হয়ে ওঠে।

কিন্তু কামের স্বভাবই হল তা আগুনের মত উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। ত্যাগে সংযমে অর্থাৎ ধর্ম দিয়ে তাকে শান্ত না করলে জীবনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ এই উচ্ছৃঙ্খল কামকে "দুষ্পূরণীয় অনল" বলেছেন (গীতা, ৩/৩৯)।

মানুষের জীবন শুরু হয় তার অশুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে। এই অশুদ্ধ প্রকৃতিই তার জীবনের মালমশলা, তার প্রতিষ্ঠা—দেহের লিপ্সা, প্রাণের ক্ষুধা, মনের অহমিকা। মানুষের অহংবোধ কামেরই অশুদ্ধ ধাতু দিয়ে গড়া ("কামশ্চিত্ত-সঙ্কল্পঃ")। অহঙ্কার থাকলে কামও আছে। এই কামকে বাদ দিতে হলে জীবনের মূলকেই কেটে বাদ দিতে হয়। জীবনশিখার ধূম ও কালিমাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে জীবনদীপকেই তাহলে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে হয়।

তাহলে জীবনের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে জীবনই আর থাকে না। সমাধানের নামে সে হয় বিনাশ। মহাভারত তা করেনি। এমনকি চেতনাতে মনে-মনেও কামকে ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে—"ন চৈতান্ মনসা ত্যজেৎ" (শান্তিপর্ব, ১২৩/৭)। একটা স্থির তপস্যা নিয়ে এই কামকে শুদ্ধ করে জীবনে তার সেবার কথাই বলা হয়েছে—"বিমুক্তস্তপসা সর্বান্ ধর্মাদীন্ কামনৈষ্ঠিকান্" (শান্তিপর্ব, ১২৩/৭)।

সব সাধনাতেই কামের এই শোধনের যে সমস্যা তার নানা রকম চেষ্টা হয়েছে। মোটামুটি তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে শুরু হয় মানুষের প্রাকৃত অশুদ্ধ প্রকৃতির ভাব নিয়ে। দ্বিতীয়, সেই প্রাকৃত ভাবের ঠিক উল্টো দিক, বিপরীত সীমায়, দেহকে বাদ দিয়ে তার আত্মার ভাব—দেবভাব ধরে সাধনা। সবশেষে এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে মানুষ ও দেবতার শুদ্ধভাব বা সিদ্ধভাবের সাধনা। "প্রথমে মানুষ, তারপর ভগবান, শেষে ভাগবত-মানুষ। প্রথমে শুধু শরীর, তারপর শুধু আত্মা, তার পর অধ্যাত্মশরীর।" (শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, 'রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮) মানুষের অহঙ্কারের যেমন শোধন হয় তেমনি কামেরও শোধন হয় এই অধ্যাত্মশরীরে। কাম তখন আর অহংসর্বস্ব লিপ্সা নয়, কাম তখন প্রেম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মোহ মোর ভক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া"। কামের বৃন্তেই প্রেমের রক্তকমল ফোটে। বৈষ্ণব সাধনায় এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত দিয়েছে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম ; কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম।

মানুষের এই শরীর, বেদব্যাস বলছেন, সে যেন এক কামবৃক্ষ। চিত্তের মধ্যে মোহ-বীজ থেকে এই বৃক্ষের উৎপত্তি। ভয় ও উৎকণ্ঠা তার অঙ্কুর। আকাঙ্ক্ষা তার সেচের জল। ক্রোধ ও অভিমান দুই স্কন্ধ। অজ্ঞান এই বৃক্ষের মূল। তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। শোক দুঃখ তার শাখা। চিন্তা উদ্বেগ তার প্রশাখা। ঈর্ষা তার পত্রপল্লব। নানা রকম তৃষ্ণার স্বর্ণলতা এই কাম-বৃক্ষকে জড়িয়ে রয়েছে। লোভী মানুষের দল তার তলায় বসে আছে। বাসনা দিয়ে তৈরী লোহার জালে মানুষগুলো জড়িয়ে রয়েছে। (শান্তিপর্ব, ২৫৪ অধ্যায়)

সংসার জীবনের বাস্তব ছবি তুলছেন কবি। তিনি আবার বলছেন, এই দেহ একটা পুর বা নগর। এই দেহপুরের রাণী হলেন বুদ্ধি। মন তার মন্ত্রী। ইন্দ্রিয়গণ প্রজা। মন্ত্রী তাদের শাসন করেন। এই নগরের দুইটি নিষিদ্ধ পথ আছে—রজঃ ও তম। বুদ্ধি দুর্বল হলে মনও উগ্র হয়ে ওঠে। তখন পুরবাসী প্রজারা ভীত হয়ে পড়ে। ক্রমে মন্ত্রী স্বৈরাচারী হয়। ওই

বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তখন কামরূপী শত্রু নগরে প্রবেশ করে। মন-মন্ত্রী তখন শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করে। শত্রুর হাতে প্রজাদের তুলে দেয়। (শান্তিপর্ব, ২৫৪ অধ্যায়)

কাম যাতে বিষবৃক্ষ হয়ে না ওঠে, দেহপুরে যাতে অরাজকতা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য শাসন চাই, শোধন চাই। মহাভারত বিষবৃক্ষকে ধর্মবৃক্ষে পরিণত করতে চেয়েছে, পরম ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের সংক্ষুব্ধ সাগর পার হয়ে যেতে চেয়েছে—"সংসার সাগরং ঘোরং তরিষ্যতি সুদুস্তরম্" (আশ্বমেধিকপর্ব, ১৮/৩২)।

মোক্ষ

হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায় যেমন হু-হু করে অসীমের হাওয়া বইতে থাকে, তেমনি মহাভারতের এই মোক্ষ তত্ত্বে এসে আকাশব্যাপী এক বিপুল বৈরাগ্যের হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে। শেষের সাতটি পর্বে জীবনের পরমার্থ যে মোক্ষপদ তাই বিশেষ করে নিরূপণ করা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলছেন, "নিরূপপ্লবণ্চ মোক্ষপদং নিরূপিতম্"।

আমরা যেন অনেক উপর থেকে সুখদুঃখকাতর ওই সংসার ভূমিকে দেখছি। যেখানে শোকে তাপে তৃষ্ণায় মানুষ ছুটে চলেছে। ঘূর্ণ্যমান চক্রের মত সুখ দুঃখে আবর্তিত হচ্ছে ("সুখ-দুঃখে মনুষ্যানাং চক্রবৎ পরিবর্ততঃ") মৃত্যু এসে অতৃপ্ত জীবনকে বালির বাঁধের মত বারবার ভেঙে দিচ্ছে ("সিদন্তে জলৈঃ সৈকতসেতবঃ")। সংসারের ঘানির চাকায় মানুষ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হচ্ছে ("সর্গচক্রে নিপীড্যতে")। বনের হাতী যেমন কাদায় পড়ে, মানুষ তেমনি সংসারের শোকে পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে ("শোকপঙ্কার্ণবে মগ্না বনগজা ইব")।

এত যে কষ্ট তবু কিন্তু চেতনা হয় না। ওরই মধ্যে দিব্বি নিশ্চিন্তে অজ্ঞানের কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে ("অবিজ্ঞানেন মহতা কম্বলেনেব সংবৃতা")। বিষয়টি বেশ নাটকীয় ভাবে উত্থাপিত করলেন ভীষ্ম।

এক পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করছে, "পিতা, মানুষের করণীয় কি ?"

পিতা বলছেন, "পুত্র, প্রথমে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বিদ্যালাভ, তারপর সংসার আশ্রমে স্ত্রীপুত্র লাভ, তারপরে গৃহত্যাগ করে বনে গিয়ে বানপ্রস্থ এবং শেষে সন্ন্যাস।"

—"কিন্তু পিতা, এই যে মানুষ সব তাড়িত হয়ে ছুটছে, চারিদেকে শত্রু

ঘিরে ফেলেছে, স্রোতের মত সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, এমন জরুরী অবস্থায় আপনি ধীরে সুস্থে এইসব কি বলছেন ?"

—"কেন, কি হয়েছে ? তুমি আমাকে এমন ভয় দেখাচ্ছ কেন ? কিং নু ভীষয়সীব মাম্ ?"

—"পিতা, মৃত্যুতাড়িত হয়ে মানুষ ছুটছে। জরা ব্যাধি শোক তাকে ঘিরে ফেলেছে। স্রোতের মত আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু তো কারো জন্য অপেক্ষা করে না। ডোবার অল্প জলের মাছ আমরা। ক্রমশ জল শুকিয়ে আসছে। জেলে যেমন মাছ ধরে তেমনি কখন নিঃশব্দে মৃত্যু এসে আমাদের ধরবে। আমরা ভেড়ার মত নিশ্চিন্তে সংসারে ঘাস খাচ্ছি ("শষ্পাণীব বৃকীবোরণমাসাদ্য"), কিন্তু হঠাৎ বাঘের মত মৃত্যু এসে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। অতএব, পিতা, আর সময় কোথায় ? কে জানে, আজ এই মুহূর্ত আমার শেষ মুহূর্ত কি না ?" (শান্তিপর্ব, ১৭৫/৬-১৬)

সুতরাং কিছুই কিছু নয়। আজ আছে তো কাল নেই। জীবন এক অস্থির সমুদ্র। তাতে সুখ দুঃখের ঢেউ উঠছে। জলের স্রোতে ভেসে-চলা কাঠের টুকরোর মত আমরা পরস্পরের কাছে আসছি আবার দূরে সরে যাচ্ছি ("যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহাদধৌ")। এর মধ্যে আবার আপন-পর কে ? আমার শরীরটাও তো আমার নয় ("আত্মাপি চায়ং ন মম")। যখনই আমার বলে কিছু ভাবতে গিয়েছি তখনই দুঃখ এসে আমাকে ধরেছে ("কিঞ্চিদেব মমত্বেন তদা ভবতি কল্পিতম্। তদেব পরিতাপার্থং সর্বং সম্পদ্যতে তথা")। (শান্তিপর্ব, ১৭৪/৪৪)

আবার ভাবতে গেলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে আমি এক অখণ্ড সত্তা। সমগ্র বিশ্ব তখন আমার—"সর্বা বা পৃথিবী মম" (শান্তিপর্ব, ১৭৪/১৪)। অতএব ক্ষুদ্র এই 'আমি'-কে যখন ছাড়িয়ে যাব তখনই পাব বৃহৎ 'আমি'-কে। অল্পের মধ্যে সুখ নেই, বৃহতের ভূমার মধ্যেই সুখ।

ভোগকে ত্যাগের দ্বারা শোধন। ত্যাগই সার্থক ভোগ। ভীষ্ম বলছেন, "জগতের এবং স্বর্গের যা-কিছু সুখ একত্রে ত্যাগের যে সুখ তার ষোল ভাগের এক ভাগও নয়।"

> যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
> তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ৪৬
>
> (শান্তিপর্ব, ১৭৪ অধ্যায়)

ওই একই কথা বলছেন সংসারে পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি মঙ্কি (শান্তিপর্ব, ১৭৭/৫১)। জনকের রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে

শুকদেব বলেছিলেন, "কে শ্রেষ্ঠ ? জীবনের সমস্ত কাম্যবস্তু যিনি লাভ করতে পারেন তিনি ? না, যিনি সেগুলিকে ত্যাগ করতে পারেন তিনি ? কামনা পূরণের চেয়ে তাদের ত্যাগই শ্রেষ্ঠ—

প্রাপনাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥"

(শান্তিপর্ব, ১৭৭/১৬ অধ্যায়)

শম্পাক নামে সেই ব্রাহ্মণ, যিনি জীবনে পাওয়ার মধ্যে পেয়েছেন কুলটা স্ত্রী কুৎসিত বস্ত্র আর করুণ দারিদ্র্য, তিনি বলছেন, নিষ্কিঞ্চনাই সুখ ("অকিঞ্চন্যং সুখম্")। তুলাদণ্ডে একদিকে রাজত্ব আর একদিকে এই নিষ্কিঞ্চনতা, দুইয়ের মধ্যে নিষ্কিঞ্চনতাই শ্রেষ্ঠ—

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্ ।
অত্যরিচ্যতে দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্ ॥

(শান্তিপর্ব, ১৭৬/১০)

মঙ্কি বলছেন, "ওরে মন, বারবার বঞ্চিত হয়েও তোর হুঁস হল না ! ওরে অর্থলোভী, বারবার অর্থনাশেও তোর তৃষ্ণা গেল না ! ওরে কামুক, প্রকৃত সুখের সন্ধান পেলি না ? অতএব, মূর্খ, নিবৃত্ত হও। শান্তি লাভ কর। শাম্য নির্বিদ্য কামুক।"

কিন্তু কিছু ছাড়তে হবে শুনলেই আমরা আকাশ থেকে পড়ি। ভয়ে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে আসে ("বিপ্রপাতং পৃথগ্বিভপন্নমিহ")। যদিও ত্যাগ না থাকলে সুখ এক দুঃসহ জ্বালা ; অর্থ একটা ব্যাধি ; কাম এক দুষ্পূরণীয় অনল।

বীজ দগ্ধ হলে তা থেকে আর কোন অঙ্কুর জন্মায় না। তেমনি ত্রিবর্গের মধ্যে যে কামনার বীজ তাকে মোক্ষের আগুনে দগ্ধ করে নিলে আর দুঃখ থাকে না, শোক থাকে না।

বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥

(বনপর্ব, ২১১/১৭)

মহাভারতের এই মোক্ষ শ্রীকৃষ্ণের যোগতত্ত্ব, গীতার সারভূত।

বিষয় সংসারে থাকলেই যে বন্ধন, এবং সংসারের সর্বকিছু পরিত্যাগ করলেই যে মোক্ষ তা নয়। ধনী ও নির্ধন, সংসারী ও সন্ন্যাসী সকলেই মোক্ষ লাভ করতে পারে। বন্ধনের মধ্যেও যিনি বন্ধনহীন, সংসারের মধ্যেও যিনি সন্ন্যাসী, তিনিই মোক্ষকে জেনেছেন।

আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্ ।
কিঞ্চন্যে চেতরে চৈব জন্তুর্জ্ঞানেন মুচ্যতে ॥ ৫০
তস্মাদ্ ধর্মার্থকামেষু তথা রাজ্য পরিগ্রহে ।
বন্ধনায়তনেষেষু বিদ্ধ্যবন্ধে পদে স্থিতম্ ॥ ৫১
(শান্তিপর্ব, ৩২০ অধ্যায়)

এমনি করে মোক্ষের পাষাণে ত্যাগের খড়্গকে শাণ দিয়ে আসক্তির বন্ধন ছেদন করা—"মোক্ষাশ্মনিশিতেনেহচ্ছিনত্ত্যাগাসিনা"...(শান্তিপর্ব, ৩২০/৫২), নইলে শুধু মস্তক মুণ্ডন, গেরুয়া ও দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ বাহিক চিহ্নমাত্র, তাতে মোক্ষলাভ হয় না ।

কাষায়ধারণং মৌণ্ডং ত্রিবিষ্টব্ধং কমণ্ডলুম্ ।
লিঙ্গান্যুৎপথভূতানি ন মোক্ষায়েতি মে মতিঃ ॥ ৪৭
(শান্তিপর্ব, ৩২০ অধ্যায়)

বরং অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য এলে বেশ্যা পিঙ্গলাও মোক্ষ লাভ করতে পারে । সে বলেছিল, "আমি এই নবদ্বার দেহপুর রুদ্ধ করে আমার ভগবান হৃদয়বল্লভকে নিয়ে একা থাকব । তিনি কান্ত আমি কান্তা মনে এই ভেদটুকুও রাখব না । আমার অন্তর জেগেছে । আমার আর কোন কামনা নেই । এখন নরকের জীব ওইসব ধূর্ত কামার্তগণ আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না ।" (শান্তিপর্ব, ১৭৪/৫৯-৬০)

অতএব জীবনে কোন্ অবস্থায় কি করা উচিত, নীতির ধর্মের পরস্পর সংঘাতে কোন্ পথ ধরে চলতে হবে, কি করতে হবে, তারই অতি সূক্ষ্ম নির্দেশ এই বিপুল মহাভারতের অন্তরতম তাৎপর্য—তার "কার্যাকার্য ব্যবস্থিতি" (গীতা, ১৬/২৪) । সমস্ত জীবনই যোগ । এই যোগের কুশলতা, জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও কর্তৃত্ব ; জীবন সমস্যার প্রত্যাখ্যান নয়, সমাধান ; সন্ন্যাস নয়, নিষ্কাম কর্মযোগ ; এই হল মহাভারতের যোগতত্ত্ব ।

অনেক সময় আমরা ভাল করছি মনে করে মন্দকেই বহন করে চলি, হীরা মনে করে কাচকে আঁচলে বাঁধি । শাস্ত্রের আদেশ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, এ অবস্থায় আমরা কোন্‌টা করব এবং কেন করব, তাই মহাভারত তথা গীতার প্রতিপাদ্য । শাস্ত্র ও মীমাংসকগণ যা বলেন, সেই স্মার্ত কর্ম, নিত্যকর্ম অথবা কাম্য কর্ম দিয়ে সমস্যার সুরাহা হয় না । গীতায় কর্মকে তাই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে । এই কর্মের গতি গহন—"গহনা কর্মণো গতিঃ" (গীতা, ৪/১৭) । শারীরিক বাচনিক মানসিক সকল ক্রিয়াই গীতার

মতে কর্ম। এমনকি বাঁচা-মরা পর্যন্ত কর্মের অন্তর্গত। কর্মের দুরন্ত স্রোত জীবনের চারটি আশ্রমের মধ্য দিয়েই বয়ে চলেছে।

তিনি সন্ন্যাসীই হন আর যোগীই হন, কর্মের এই ঘূর্ণিস্রোতের ভিতর দিয়েই তাঁর জীবনতরী বাইতে হবে। কর্মের থেকে কারো এক মুহূর্তের জন্যও অব্যাহতি নেই—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" (গীতা, ৩/৫)।

সন্ন্যাস অর্থে তো ত্যাগ করা, কিন্তু কর্মের আসক্তির বীজ যদি অন্তরে থাকে তাহলে কেবল বাইরে থেকে কর্মত্যাগ করলে তা সত্তার গভীরে আরো জটিল হয়ে ওঠে। মারাত্মক সব ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। ধর্মের দ্বারা এই সংসারে যার কিছুই সিদ্ধ হয়নি, সে কিসের জোরে কি ত্যাগ করবে? যে সংসার প্রপঞ্চে ঠিক-ঠিক ভাবে কর্ম সাধন করতে পারেনি, সেই হতভাগ্য মোক্ষের পরমার্থ কিভাবে সাধন করবে?

সংসার দুঃখ দেয়, তাই বলে শোক করব? ক্লিষ্টকর্মা হয়ে ত্যাগ করব? তাতেই কি দুঃখ কমে? না, দুঃখ বাড়ে? এ সম্বন্ধে মনু বৃহস্পতিকে যে উপদেশ দিয়েছেন, নারদ শুকদেবকে যা বলেছেন, তা মহাভারতের এক বলিষ্ঠ জীবনবাদ—

> ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি।
> অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমম্ ॥
> (শান্তিপর্ব, ২০৫/৫ : ৩৩০/১৫ অধ্যায়)

> (সংসারে দুঃখ তো সার্বজনীন। তার জন্য শোক
> করে কি হবে? দুঃখে কাঁদতে না বসে তার
> প্রতিকারের উপায় করা উচিত।)

মনু বলছেন, জ্ঞানীরা কখনো শোক করেন না। সুখ-দুঃখ এই দুটিকেই ত্যাগ করে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে যান। উত্তরণের এই নিষ্কাম যোগকে আয়ত্ত না করে শুধু সন্ন্যাস বা বাহ্যিক ত্যাগ জীবনে দুঃখ নিয়ে আসে। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলছেন, "সংন্যাসস্তু দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ" (গীতা, ৫/৬)। কিন্তু যিনি যোগযুক্ত, তিনি কর্ম করেন, কিন্তু কর্ম তাঁকে বাঁধতে পারে না ("কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে"—গীতা, ৫/৭)। ভিতর থেকে যার ত্যাগ হয়েছে, অন্তরে যার সাধনা চলছে, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী—"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি

ন কাঙ্ক্ষতি" (গীতা, ৫/৩)। যুধিষ্ঠির তাই বলছেন, "ধর্ম অর্থ কামের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের উপর সম্যক্ কর্তৃত্ব লাভ করতে হবে। বিমুক্ত দোষ সমলোষ্টকাঞ্চন বীতরাগ হয়ে প্রিয় অপ্রিয় তুল্যজ্ঞান করে, ভগবান আমাকে দিয়ে যা করান আমি তাই করব—যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" (শান্তিপর্ব ১৬৭/৪৭)। যুধিষ্ঠিরের এই চতুর্বর্গ সিদ্ধি কি ভগবদ্গীতারই বাণী নয়?

[পঁয়ত্রিশ]

বেলা যায়…

এই সংসার দুদিনের খেলাঘর। সব ছায়াবাজি। এই আছে এই নেই। কূলভাঙা স্রোতে নিরবধি কাল বয়ে চলে। কে থাকল আর কে গেল তার হিসাব কে রাখে? হাসি ফুরায়, চোখের জল শুকায়। এক আসে, এক যায়।…

হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে ধৃতরাষ্ট্রের নিঃসঙ্গ দিন কাটে। সেই রাজপ্রাসাদ আছে, রাজত্ব আছে, কিন্তু কোথায় গেল তারা? তাঁর প্রিয় পুত্র পৌত্রদের হাসি আনন্দ গান—সেই বুকভরা স্নেহ আর স্বপ্নভরা দিনগুলি কোথায় গেল? জীবনসন্ধ্যায় হঠাৎ সব ভরাডুবি হয়ে গেল! ধৃতরাষ্ট্রের বুকখানা শোকে পাথর।

বিদুর সঞ্জয় যুযুৎসু কৃপাচার্য সর্বদা তাঁর কাছে-কাছে থাকেন। আছেন নিঃশব্দচারিণী গান্ধারী ও কুন্তী। অন্ধ বৃদ্ধ রাজাকে তাঁরা সান্ত্বনা দেন। প্রত্যহ আসেন বেদব্যাস। কত ধর্ম কথা পুণ্য কথা বলে সঞ্জীবিত করেন।

প্রতিদিন প্রভাতে পঞ্চপাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসে রাজকার্যে পরামর্শ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ও নির্দেশে তাঁরা রাজ্যশাসন করেন। বিদুর মন্ত্রী। সামে দণ্ডে বিদুরের আদেশ সকলের শিরোধার্য। তিনি যদি কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকেও মুক্তি দেন তবু যুধিষ্ঠির আপত্তি করেন না। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, তাঁদের আচরণে কখনো যেন শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র মনে কোন দুঃখ না পান। তাঁর কোন ইচ্ছা বা অভিলাষ যেন অপূর্ণ না থাকে। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, সর্বদা যে ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাধীন ও অনুগত থাকবে তাকেই তিনি সুহৃদ বলে মনে করবেন; আর যে তাঁকে অশ্রদ্ধা করবে তাকে শত্রু বলে জানবেন। সকলে যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ পালন করে চলেছেন। ধর্মরাজের ভয়ে কেউ ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্যোধনের নিন্দা করে না, কোন বিরূপ আলোচনা করে না।

কিন্তু ভীম প্রকাশ্যে না হলেও মনে-মনে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বিষ্ট। অতীতের কথা ভীম কিছুতেই ভুলতে পারেন না। মন তাঁর বিমুখ। ধৃতরাষ্ট্রকে দেখলেই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন। গোপনে তাঁর অপ্রিয় কাজ করেন। অনুচরদের দিয়েও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করান।

একদিন ভীম বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বসে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগলেন, "তোমরা আমার এই দুটি হাত দেখছ? একে গন্ধে চন্দনে লিপ্ত কর। লৌহকঠিন এই দুই হাতে আমি দুরাত্মা দুর্যোধন ও তার স্বজনদের বধ করেছি।"

ভীমের এই নির্মম বাক্য ধৃতরাষ্ট্রের বুকে শেল বিদ্ধ করল। গান্ধারীও শুনে কালধর্ম মনে করে সহ্য করলেন। কিন্তু একথা যুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল সহদেব দ্রৌপদী কেউ জানতে পারলেন না।

একদিন সকল সুহৃদকে ডেকে ধৃতরাষ্ট্র চোখের জলে বলতে লাগলেন, "আপনারা তো জানেন, আমারই দোষে আজ কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল। আমি অন্ধ, পুত্রস্নেহে আরো অন্ধ। বেদব্যাস কৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর গান্ধারী কারো কথা আমি শুনিনি। পাণ্ডবদের বঞ্চিত করে আমার মূর্খ পুত্র দুর্যোধনকে রাজা করেছিলাম। অনুতাপে আজ আমার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজ পনর বছর আমি অল্পাহারে আছি। মৃগচর্ম পরে ভূমিশয্যায় কালযাপন করি। যুধিষ্ঠির শুনলে অনুতপ্ত হবে তাই একথা এতদিন কাউকে বলিনি। স্থির করেছি, আমি বনবাসে যাব। বনে গিয়ে চীরবল্কল ধারণ করে উপবাসী হয়ে তপস্যা করব। যুধিষ্ঠির, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।"

স্তম্ভিত মর্মাহত যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনি এত দুঃখভোগ করছেন, আর আমি তার কিছুই জানি না? আমাকে ধিক্। আমি রাজ্যাসক্ত, প্রমাদগ্রস্ত। আপনি অসুখী হলে আমাদের এই রাজ্যভোগে কি হবে? আপনি চলে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আমি রাজা নই, আপনিই রাজা। আমি আপনার আজ্ঞাধীন সেবক মাত্র। আমরা আপনার পুত্র। গান্ধারী আমাদের মায়ের মত। যদি মনে করেন, আপনার নিজের সন্তান যুযুৎসু, অথবা আপনার মনোনীত অন্য কেউ, অথবা আপনি স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন। আপনি জানবেন, দুর্যোধন যা করেছে তার জন্য আমার মনে কোন ক্রোধ নেই। সবই ভবিতব্য। দৈববশে আমরা সবাই মোহগ্রস্ত হয়ে ছিলাম। আপনি চলে যাবেন না। তাহলে অপযশে আমরা দগ্ধ হয়ে যাব। আপনার চরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি, আপনি প্রসন্ন হন। আপনি আগে আহার করুন। আপনি অনাহারে থাকলে আমিও উপবাস করব।"

—"বৎস যুধিষ্ঠির, অনেকদিন তোমরা আমাকে সেবা করেছ। এই শেষ জীবনে আমার মন তপস্যায় আসক্ত হয়েছে। তুমি আমাকে নিষেধ ক'রো না। অনাহারে ক্লিষ্ট শরীরে আমি আর কথা বলতে পারছি না। আমার

হাত-পা কাঁপছে। কণ্ঠ শুকিয়ে আসছে। আমি করজোড়ে তোমায় মিনতি করছি, তুমি অনুমতি দাও।"

এমন সময় বেদব্যাস এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বৎস, ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন তাতে সম্মত হও। তুমি মনে কোন দ্বিধা রেখ না। ধৃতরাষ্ট্রের তপস্যার সময় হয়েছে। তুমি বাধা দিও না। এদের বনে যেতে দাও।"

যুধিষ্ঠির তখন সম্মত হয়ে অনুমতি দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন মনে তাঁকে রাজধর্ম সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন।

সারা রাজ্যে ঘোষণা করা হল, ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থে যাবেন। প্রজাদের কাছে তিনি বিদায় নিতে চান। কুরুজাঙ্গালের অগণিত পুরবাসী জনপদ-বাসী প্রজা ও ব্রাহ্মণগণ সমবেত হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সেই জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনারা বহুকাল ধরে কৌরবকুলে একত্রে বাস করছেন। তাই আমরা পরস্পর হিতৈষী এবং বন্ধু। আপনাদের জানাচ্ছি আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছা করি। আমি বেদব্যাস ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়েছি। আপনারাও অনুমতি করুন। আমার বয়স হয়েছে। নানা শোকতাপে কাতর। এই শেষ বয়সে বনবাসী হয়ে তপস্যা করাই রাজার ধর্ম। এককালে রাজা শান্তনু আপনাদের প্রতিপালন করেছেন। তারপর ভীষ্ম পরিপালিত আমার পিতা বিচিত্রবীর্য শাসন করেছেন। আমার ভ্রাতা পাণ্ডুও যথাযথ প্রজাপালন করে গেছেন। পাণ্ডুর পরে আমি আপনাদের ভাল হোক মন্দ হোক সাধ্যমত সেবা করেছি। যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা আমাকে দয়া করে ক্ষমা করবেন। রাজমহিষী গান্ধারীও আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন আপনাদের শাসন করেছে। কিন্তু সে তো আপনাদের কাছে কোন অপরাধ করেনি। আমার দোষেই অসংখ্য মহীপতি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। তারজন্য আমি করজোড়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা সেসব কথা ভুলে যান। এই অন্ধ পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধকে আপনাদের রাজার বংশধর বলে ক্ষমা করুন। আমার অস্থিরমতি লোভী স্বেচ্ছাচারী পুত্রদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনাদের কাছে বারবার মাথা নত করে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

ধৃতরাষ্ট্রের এই করুণ আবেদনে প্রজাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সকলের চোখ ছলছল্ করতে লাগল। অনেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। তখন জনতার প্রতিনিধি হয়ে সাম্ব নামে এক সদাচারী তেজস্বী বাগ্মী ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বললেন, "মহারাজ, প্রজাদের প্রতিনিধি হয়ে আমি

কিছু বলছি। পুরুষানুক্রমে আমরা কৌরব রাজবংশে সুখে বাস করছি। আপনি যথার্থ বলেছেন, আমরা পরস্পর হিতৈষী এবং সুহৃদ। আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষগণ পিতার ন্যায় আমাদের পালন করেছেন। রাজা দুর্যোধনও আমাদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেননি। আমরা রাজা দুর্যোধনকে পিতার মত বিশ্বাস করে সুখে ছিলাম। তিনি আমাদের প্রতি কখনো কোন অন্যায় করেননি।

পিতৃবদ্ ভ্রাতৃবচ্চৈব ভবন্তঃ পালয়ন্তি নঃ।
ন চ দুর্যোধনঃ কিঞ্চিদযুক্তং কৃতবান নৃপঃ॥ ১৬
... ...
তথা দুর্যোধনেনাপি রাজ্ঞা সুপরিপালিতাঃ॥ ২০
ন স্বল্পমপি পুত্রস্তে ব্যলীকং কৃতবান নৃপঃ।"

(আশ্রমবাসিকপর্ব, দশম অধ্যায়)

ব্রাহ্মণ আরো বললেন, "মহারাজ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় ও জ্ঞাতিবধের জন্য আপনি দুর্যোধনকে দোষ দেবেন না। দুর্যোধন কর্ণ শকুনি তারা কেউই দায়ী নয়। যা ঘটেছে তা ভবিতব্য। দৈবের বিধান। পাণ্ডবেরা ধার্মিক। যুধিষ্ঠির দেবকল্প। তিনি দয়ালু দূরদর্শী হৃদয়বান্। তাঁর অধীনে আমরা নিশ্চিন্তে সুখে থাকব। আমরা অনুমতি দিচ্ছি, আপনি বনে গমন করে পুণ্যকর্মে নিরত থাকুন। সকল প্রজাদের হয়ে আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি।"...

সমবেত জনতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ব্রাহ্মণকে সাধুবাদ জানাল।...

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন করছেন। সে এক বিষাদগম্ভীর দৃশ্য।...

ভূরি-ভূরি দক্ষিণা দান ইষ্টি-যজ্ঞ করে লাজ পুষ্প ছড়িয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পুরোভাগে অগ্নিহোত্র নিয়ে বল্কল পরে সন্ন্যাসী বেশে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র চলেছেন গান্ধারীর সঙ্গে। পশ্চাতে পুরোহিত ধৌম্য, বিদুর সঞ্জয় যুযুৎসু কৃপাচার্য ও পঞ্চপাণ্ডব। সকলের চোখে জল। পুরনারীগণ ক্রন্দন করছেন। যাঁরা কোনদিন অন্তঃপুরের বাইরে আসেননি তাঁরা আজ প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। সবাই মুহ্যমান। হস্তিনাপুর নগরদ্বার পর্যন্ত তাঁরা এলেন।

এবার ধৃতরাষ্ট্র সকলকে নিবৃত্ত করলেন।

যুধিষ্ঠির বিদায় নেবেন।

পুরনারীগণ ফিরে যাচ্ছেন।

কিন্তু কুন্তী তো ফিরছেন না ?

যুধিষ্ঠির গিয়ে কুন্তীকে বললেন, "মা, চলুন, এবার আমাদের ফিরতে হবে।"

—"না বৎস, আমি আর ফিরে যাব না। গৃহবাসে আর আমার মন নেই। শেষ জীবনটা বনে গিয়ে এঁদের সেবা ও তপস্যা করে কাটাতে চাই। কুরুবংশের ভার তোমার উপর। তুমি সকলকে দেখ। দ্রৌপদীর যেন অযত্ন না হয়। সহদেবকে ভালবেস। আর তোমার ভ্রাতা কর্ণের কথা মনে রেখ। তার উদ্দেশ্যে দান দক্ষিণা ক'রো।"

—"মা, এ আপনি কি বলছেন ? আপনি গেলে আমাদের কি হবে ? আপনিই তো একদিন বিদুলার উপাখ্যান শুনিয়ে আমাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নইলে আমরা সর্বত্যাগী হব বলে স্থির করেছিলাম। এখন তবে কেন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন ?" আর্ত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির অনুনয় করছেন।

ভীমও কাতর স্বরে বললেন, "পিতৃহীন হয়ে ছোটবেলায় আমরা তো বনেই ছিলাম। বনেই থাকতাম। আপনি কেন আমাদের হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন ? আপনি বনবাসী হবেন জানলে আমাদের এই যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল ? মা, আপনি প্রসন্ন হন। আমাদের ত্যাগ করবেন না।"

পুত্রদের এই কাতর মিনতিতে কুন্তীর চোখে জল এল। কিন্তু তাঁর সঙ্কল্প টলল না। তিনি চোখের জল মুছে বললেন, "আমি তোমাদের ক্ষত্রিয়ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম, কেননা আমি চাইনি, তোমরা দেবতুল্য পরাক্রমী হয়েও চিরকাল অবজ্ঞাত নির্জিত হয়ে বেঁচে থাক। আমার স্বামীর রাজত্ব-কালে অনেক রাজসুখ ভোগ করেছি। এখন বনে গিয়ে গুরুজনদের সেবা ও তপস্যা করে আমার স্বামীর পুণ্যলোকে যেতে চাই।"

অতএব কুন্তী চলে গেলেন।

পাণ্ডবেরা অশ্রুমোচন করতে-করতে ফিরে এলেন।

কুন্তীর এই বনগমন মহাভারতের কাহিনীকে মহিমায় মণ্ডিত করেছে। বেদব্যাসের কবিপ্রতিভা ও যোগদৃষ্টির এ পরাকাষ্ঠা। কুন্তীর চরিত্র স্থির প্রদীপশিখার মত নিষ্কম্প। অথবা দেবীর হাতের অসির মত ঋজু আত্ম-প্রতিষ্ঠ এক দীপ্তি। বেহাগ রাগের মত তাঁর জীবন শুদ্ধ ত্যাগের মূর্ছনায় তীব্র।

কুন্তী যদি সঙ্গে না যেতেন তাহলে ধৃতরাষ্ট্রের এই বনে চলে যাওয়া মনে হ'ত যেন, এই গৃহহারা বৃদ্ধ অবহেলায় পরিত্যক্ত এক ব্যর্থ আবর্জনা। দুঃখ আর অসম্মান ছাড়া তাঁর কোন সান্ত্বনা বা গৌরব থাকত না। তাঁর শোক বৈরাগ্যে উত্তীর্ণ হ'ত না।

তাছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের মত কুন্তীও সমান সন্তপ্ত। কর্ণের জন্য তাঁর যে অন্তর্জ্বালা যে অনুতাপ তা নিয়ে কুন্তীর আর গৃহসুখে বাস করা সম্ভব নয়। কেউ না জানুক, তিনি তো জানেন, কর্ণ শুধু তাঁরই অনুরোধে প্রাণত্যাগ করেছে। মনে-মনে তিনি পুত্রঘাতিনী হয়ে আছেন। তাই ধৃতরাষ্ট্রের মত কুন্তীরও আর সংসারে ঠাঁই নেই।

কুন্তী চলে গেলেন।

সেই সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব, বিশেষ করে উদাস যুধিষ্ঠিরকে আরো উদাস করে দিয়ে গেলেন। সমগ্র কাহিনী গাঢ় ঘন মর্মন্তুদ হয়ে উঠল। সেই দিন থেকে উৎসবহীন হস্তিনাপুর নিরুৎসাহে নিরানন্দে বিষাদমগ্ন হল—

তদ্‌হৃষ্টমনানন্দং গতোৎসবমিবাভবৎ।
নগরং হস্তিনাপুরং সস্ত্রীবৃদ্ধকুমারকম্ ॥ ১৪
সর্বে চাসন্ নিরুৎসাহাঃ পাণ্ডবা জাতমনাবঃ।
কুন্ত্যা হীনাঃ সুদুঃখার্তা বৎসা ইব বিনাকৃতাঃ ॥ ১৫

(আশ্রমবাসিকপর্ব, ১৮ অধ্যায়)

পাণ্ডবদের মন উদাস। রাজকার্যে মন বসে না। এমনকি বেদপাঠেও উৎসাহ পান না। কিছুতেই সুখ শান্তি নেই। মনে কোন আনন্দ নেই। ভাল করে কারো সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা করে না। মনটা তাঁদের হু-হু করে। কেবল মায়ের কথা মনে পড়ে।

তাই সবাই মিলে একদিন তাঁরা চললেন বনবাসী ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীকে দেখতে। কেমন আছেন তাঁরা? কেমন আছেন বিদুর ও সঞ্জয়? গভীর অরণ্যে কঠোর তপস্যায় না জানি তাঁরা কত কষ্টে আছেন!

পাণ্ডবেরা সপরিবারে যমুনা পার হয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে পেলেন। তাঁরা নিজের-নিজের রথ ও যান থেকে নেমে বিনীতভাবে পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

কতদিন পরে দেখা! পাণ্ডবদের চোখে জল। কুন্তীর চোখে আনন্দাশ্রু। ধৃতরাষ্ট্রের মনে হল, তিনি যেন ঠিক সেই আগের মত হস্তিনাপুরে রাজভবনেই আছেন। তাঁর দেহ শীর্ণ। মাথায় জটা। ধূলিধূসর অঙ্গে বল্কল।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু বিদুর কোথায় ? তাঁকে দেখছি না কেন ?"

—"বৎস, বিদুর কুশলে আছে। গভীর অরণ্যে সে অন্নজল ত্যাগ করে কেবল বায়ুভক্ষণ করে কঠোর তপস্যা করছে। কাঁচিৎ কখনো ব্রাহ্মণেরা তাকে দেখতে পান।"

হঠাৎ যুধিষ্ঠির দেখেন, অরণ্যের ভিতরে দূর দিয়ে ওই যেন বিদুর চলে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির ছুটে যান বিদুরের কাছে। এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর ? অস্থিচর্মসার জটাধারী দিগম্বর মলপঙ্কে মলিন দেহ। মুখে এক টুকরো পাথরের বীটা, বাক্য ও আহার বর্জনের চিহ্ন।

—"মহামতি বিদুর, আমি যুধিষ্ঠির।"

বিদুর নিরুত্তর। নীরবে তাকিয়ে আছেন শুধু। স্থির একাগ্র নির্নিমেষ সেই তপস্বীর দৃষ্টি! ওই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যুধিষ্ঠিরের সর্বাঙ্গে বিদুরের প্রাণের তেজ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি যোগবলে যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করলেন।···

বিদুরের প্রাণহীন দেহ কাষ্ঠখণ্ডের মত বৃক্ষলগ্ন হয়ে স্থির হয়ে রইল।

এইভাবে পুত্রের শরীরে নিজের সত্তাকে সঞ্চারিত করে দেহত্যাগ করা প্রাচীন ভারতের এক গুহ্য সাধনা। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তার বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত্যুর আগে পিতা সন্তানকে বলেন, "তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোকসব"। পুত্র তখন মন্ত্রপাঠ করে স্বীকার করেন। তারপর পিতা তাঁর প্রাণশক্তি পুত্রের শরীরে সঞ্চারিত করে দেন। একে বলে "সম্প্রত্তি"।

> ···স যদেবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব
> প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি।···
>
> (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১-৫-১৭)

(পিতা যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তিনি তাঁর প্রাণসমূহ নিয়ে পুত্রের শরীরে প্রবেশ করেন।)

কৌষীতকি উপনিষদে (২/১৫) ঋষি এই সম্প্রত্তি বা সংপ্রদান পদ্ধতি আরো বিশদ করে বলেছেন। এমনি করে পিতার সাধনার ধারা পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বিদুর যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও তাই করে গেলেন। বিদুর তো যুধিষ্ঠিরেরই পিতা। মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে স্বয়ং ধর্ম বিদুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বেদব্যাস তাই বলেছেন, "যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর ;

যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির। যো হি ধর্মঃ স বিদুরো বিদুরো যঃ স পাণ্ডবঃ।" (আশ্রমবাসিকপর্ব, ২৮/২১)

কার বুকে যে কত ব্যথা বেদব্যাস তা জানেন। তাই শতযূপ আশ্রমে এসে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী দ্রৌপদী এবং বিধবা কৌরবপুরনারীদের হৃদয়ের শোক তিনি মুছে দিলেন। যোগবলে তিনি তাঁদের নিহত পুত্র প্রিয়জনদের সকলকে দেখিয়ে দিলেন। রাত্রিকালে গঙ্গাবক্ষে ছায়াছবির মত তারা ভেসে উঠল। যেন জাগ্রত স্বপ্ন। জীবন্ত স্মৃতিসব। কালের বিপরীত স্রোতে অতীত দুলে উঠল বর্তমানের বুকে। দিব্যগন্ধে দিব্যমাল্যে ভূষিত অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দেখা দিল ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র—দুর্যোধন দুঃশাসন আরো সকলে। কুন্তী দেখলেন কর্ণকে। সুভদ্রা অভিমন্যুকে। দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চপুত্র পিতা ভ্রাতা স্বজন মিত্রদের। চালচিত্রে আঁকা পটের মত একে-একে তারা এসে দেখা দিয়ে গেল—"আশ্চর্যভূতং দদৃশে চিত্রং পটগতং যথা" (আশ্রমবাসিকপর্ব, ৩২/২১)।

যুধিষ্ঠির ও সহদেব তাঁদের ছেড়ে আসতে চান না। শেষে বেদব্যাসের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তী অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁদের হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দিলেন।

পাণ্ডবেরা ফিরে এলেন বটে কিন্তু তাঁদের কাছে সব যেন শূন্য হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠির বলছেন, "আমার কাছে সমস্ত পৃথিবী আজ শূন্য। কিছু আর ভাল লাগে না। শূন্যেয়ন্তু মহী কৃৎস্না ন মে প্রীতিকরী শুভে।"

তবু দিন যায়, বর্ষ যায়।

একদিন নারদ এসে দিলেন এক দারুণ দুঃসংবাদ। নারদ বললেন, "তোমরা চলে এলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী সঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্নজল ত্যাগ করে মুখে বীটা নিয়ে মৌন ও বায়ুভুক হয়ে তীব্র তপস্যা করতে লাগলেন। গান্ধারী কেবল জলপান করতেন। কুন্তী মাসান্তে একবার মাত্র কিঞ্চিৎ আহার করতেন। হঠাৎ একদিন অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুর্বল, তাঁর চলার তেমন শক্তি ছিল না, তিনি বললেন, আমরা তো গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। মরণে আমাদের ভয় কি ? এই বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এবং কুন্তী পূর্বাস্য হয়ে বসে সমাধিস্থ অবস্থায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। সঞ্জয় গভীর হিমালয়ে চলে গেছেন তপস্যা করতে। যুধিষ্ঠির, তুমি শোক ক'রো না। তাঁরা সদ্‌গতি পেয়ে পুণ্যলোকে গেছেন।"

শুনে পঞ্চপাণ্ডব দুঃখ শোকে অভিভূত।

যুধিষ্ঠির বললেন, "হায়, আমরা জীবিত থাকতে সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের এমনি অসহায়ভাবে মৃত্যু হল! এমনি করে বৃথা অগ্নিতে তাঁরা দগ্ধ হলেন!"

—"বৃথা অগ্নি নয়, এ যজ্ঞাগ্নি। ধৃতরাষ্ট্র বনে প্রবেশের আগে যে যজ্ঞ করেছিলেন, যাজকগণ সেই অগ্নি নির্জন বনে নিক্ষেপ করেন। সেই অগ্নি বর্ধিত হয়ে দাবাগ্নি হয়। ধৃতরাষ্ট্র আপন যজ্ঞাগ্নিতেই জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।" নারদ বললেন।

এই হল ধৃতরাষ্ট্রের নিয়তি।

সারা জীবন তিনি নিজের আগুনে নিজে পুড়েছেন। অন্তিমেও নিজের যজ্ঞের আগুনে আত্মাহুতি দিলেন।

[ছত্রিশ]

যুগান্ত ভ্রমমান—মহাপ্রস্থান

কুরুক্ষেত্রের পর দেখতে-দেখতে ছত্রিশ বৎসর কেটে গেল।

ঘনিয়ে এল গান্ধারীর অভিশাপের কাল।

শ্রীকৃষ্ণ উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে সব দেখছেন। তাঁর চোখের সামনে উচ্ছৃঙ্খল যাদবরা আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। পাপ কর্ম করে তারা আর লজ্জিত হয় না। দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই। গুরুজনদের অবজ্ঞা করে। ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ করে। শ্রীকৃষ্ণ দেখে মর্মে-মর্মে আহত হন। তাঁর প্রিয় যাদবদের এ কি অধঃপতন! নারী পুরুষ প্রত্যেকে উৎকটভাবে কামার্ত সুরাসক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যভিচারে উন্মত্ত। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে লঙ্ঘন করে ভেসে চলেছে পাপের স্রোতে। (মৌসলপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)

বলরাম বাধ্য হয়ে দ্বারকাতে মদ তৈরী নিষিদ্ধ করে দিলেন। যে মদ তৈরী করবে তার শূলে প্রাণদণ্ড হবে। কিন্তু আইন করে কি একটা জাতির অধঃপতন ঠেকান যায়?

যাদবরা চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল। সুরা আর নারীর প্রতি ছিল তাদের অত্যধিক দুর্বলতা। শ্রীকৃষ্ণ সেকথা জানতেন, অন্তঃপুরে যাতে ব্যভিচার প্রবেশ না করে, পরস্ত্রী আসক্ত হয়ে যাদবরা যাতে ঈর্ষায় আত্মকলহে দুর্বল হয়ে না-পড়ে, সেইজন্য সমস্ত দ্বারকায় সহস্র-সহস্র বারবণিতা আমদানী করা হয়েছিল। তাদের বলা হ'ত 'রাজন্যা'। যাদবরা ইচ্ছা অনুসারে তাদের সঙ্গে যৌবনবিহার করত। জলক্রীড়া নৌবিহার আমোদ-প্রমোদে বিভোর হয়ে থাকত। মৈরেয়, মাধ্বীক, আসব, কাদম্বরী, ইত্যাদি কত রকম যে মদ ও মধু তারা পান করত তার শেষ নেই। এমনি একটা অসংযত সমাজ জীবনের ছবি আমরা পাই হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে)।

অথচ কত সাধ কত স্বপ্ন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের তো কিছুই ছিল না। সংহতিহীন বিশৃঙ্খল একটা জাতি। শত্রুনির্জিত হয়ে অসহায়ভাবে নিপীড়িত হচ্ছিল মথুরাতে। জরাসন্ধ ও কালযবন দুই প্রবল শত্রু বারবার হানা দিচ্ছে মথুরা। অপরিমিত সেই শত্রুর শক্তি। সংখ্যায় ও বলে সহস্রগুণ। তার উপরে তারা দৈব বলে যাদবদের দ্বারা অবধ্য। এমন প্রতিকূল অবস্থায় নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে

লড়াই করে ছিন্নভিন্ন জাতিকে একত্রিত করলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি আর কৌশলে নিহত করলেন জরাসন্ধ ও কালযবনকে।

কিন্তু তবু তাঁদের জন্মস্থান সেই "রাষ্ট্রমালিনী মথুরা" ছেড়ে আসতে হল। শত্রুবেষ্টিত অল্প পরিসর সেই নগরে তাঁদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। তাছাড়া সহজেই শত্রুরা সেখানে প্রবেশ করতে পারত। সুরক্ষিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তাই শেষে অনেক অনুসন্ধান করে তাঁরা এলেন সমুদ্রবেষ্টিত এই বিশাল প্রদেশে। এক কালে রাজা রেবতের বিহার ভূমি। পাশেই মন্দার পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ রৈবতক পর্বত। তিন দিকে সমুদ্রের বিশাল জলধিবিস্তার—যেন জলরূপী এক দুর্গ, "দ্বারকাণ্ড বারি দুর্গং" (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৫৭/৫)। এক সময় দ্রোণাচার্য ও একলব্য এখানে বাস করেছিলেন। প্রাকৃতিক শোভায় নয়নাভিরাম। চারিদিকে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, তাল নারিকেলের বীথি, কেতকী বকুল নাগকেশরের উদ্যান। পুষ্পিত লতা-মঞ্জুরী-ঘেরা গন্ধে মদির দ্বারাবতী যেন অমরাবতী।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করলেন এই নগর, যেন মর্ত্যের বৈকুণ্ঠধাম। দেবতাদের পক্ষেও তীর্থস্বরূপ ("সুরাণামপি সুক্ষেত্রা")। চারিদিকে পরিখা ও টিলার দ্বারা সুরক্ষিত। বস্ত্রাবৃত যেন এক সুন্দরী নারী। মধ্যে মণিরত্নখচিত যাদবদের সুধর্মা সভা। নগরের চারটি প্রবেশ পথ। প্রধান চারটি মন্দির। মাঝখানে ব্রহ্মার মন্দির। ধনে রত্নে লক্ষ্মীর আবাস-গৃহ। সেখানে কেউ উপবাসী থাকে না। ক্ষুধায় কষ্ট পায় না। কোন ভিক্ষুক নেই, ভাগ্যহীন নেই, মলিন কেউ নেই।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁর শিক্ষাগুরু কাশীর সন্দীপনি মুনি হলেন দ্বারকার পুরোহিত। উগ্রসেন হলেন রাজা। অনাধৃষ্টি হলেন সেনাপতি। বিকদ্রু প্রধানমন্ত্রী। আর বসুদেব উদ্ধব গদ বলভদ্র প্রমুখ দশজন হলেন মন্ত্রী। দ্বারকা তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধান এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রতিপত্তি যশ ও সমৃদ্ধিশালী।

কিন্তু গণরাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত যে দুর্বলতা যে ক্ষয়, ফুলের মধ্যে কীটের মত যা ভিতরে-ভিতরে নষ্ট করে দেয়, সেই পারস্পরিক হিংসা বিরোধ বিদ্বেষ আর অনৈক্য দ্বারকার কীর্তিসৌধের ভিতরে ফাটল ধরিয়েছে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সব দেখেন কিন্তু তিনি অসহায়। দশচক্রে স্বয়ং ভগবানও প্রতিকার-হীন। তাই শ্রীকৃষ্ণ এত বিষণ্ণ এত কাতর। মনের দুঃখ জানাবেন এমন কেউ তাঁর পাশে নেই।

একদিন মহর্ষি নারদকে তিনি দুঃখ করে বললেন, "নারদ, সবাই জানে

আমি যাদবাধিপতি। কিন্তু আসলে আমি যাদবদের দাসত্বই করে থাকি। আমার প্রাপ্য ভোগ্যের অর্ধেক মাত্র গ্রহণ করি। তবু আমার জ্ঞাতি-বন্ধু সকলের কাছে পাই কেবল দুর্নাম আর কটুবাক্য। অগ্নিকামী যাজ্ঞিক যেমন অরণি মন্থন করেন, এরাও তেমনি আমার হৃদয় মন্থন করে পীড়িত করে। এদের দুর্ব্যবহার দুর্বচনে নিয়ত দগ্ধ হই। বলরাম নিজের বলে মত্ত। গদের হৃদয়ে কোমলতা আছে কিন্তু সে অলস অকর্মন্য। প্রদ্যুম্ন নিজের রূপের অভিমানেই মত্ত। আহুক আর অক্রুর একে অপরকে হিংসা করে। তারা অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশের মধ্যে ভেদ নিয়ে এসেছে। দুজনেই তারা মন্ত্রী। কাকে ছেড়ে কাকে রাখব ? আমি যেন দুই নৌকায় পা দিয়ে আছি। এরা স্বপক্ষে থাকলেও দুঃখ, বিপক্ষে গেলেও দুঃখ। দুই ছেলে যখন জুয়া খেলে, তখন জুয়াড়ীর মা এক ছেলের জয় কামনা করেও অপর ছেলের পরাজয় কামনা করে না, তেমনি আমার অবস্থা—

সোঽহং কিতবমাতেব দ্বয়োরপি মহমতে।
একস্য জয়মাশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম্ ॥"

(শান্তিপর্ব, ৮১/১১)

এই বিভেদ আর অনৈক্যই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ। গণতন্ত্রের যা একমাত্র ত্রুটি। ভীষ্ম তাই বলেছিলেন, "ভেদ মূলো বিনাশো হি গণনামুপলক্ষয়ে" (শান্তিপর্ব, ১০৭/৮)। বিভেদ গণরাষ্ট্রের মূল কেটে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্লক্ষণসব দেখতে পাচ্ছেন—শত্রুতা, লোভ, কর্তৃত্বাভিমান, ক্রোধ, ঈর্ষা, আর উচ্ছৃঙ্খলতা। দ্বারকা শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। মণিরত্ন প্রভাহীন। পুষ্পে গন্ধ নেই। বায়ুতে স্নিগ্ধতা নেই। পশুপক্ষীর অশুভ চিৎকার। অশরীরী কারা যেন রাত্রে দ্বারকায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। নিদ্রিত পুরাঙ্গনাদের হাতের মঙ্গল সূত্র চুরি করছে। ভয়ঙ্কর রাক্ষসরা যাদবদের অলঙ্কার কবচ ও ধ্বজ হরণ করছে। মুণ্ডিতমস্তক ঘোরদর্শন পিশাচ রাত্রে ঘরে-ঘরে উঁকি দিয়ে ফিরছে। ...একটা প্রবল ঝড় উঠেছে। সূর্যমণ্ডলে কবন্ধ ছায়া। ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা। চতুর্দশীতে চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ লেগেছে। ছত্রিশ বৎসর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ঠিক এমন হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন ঘোর সর্বনাশ আসন্ন।...

একদিন বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ এলেন দ্বারকায়। যুবকগণ তাঁদের তাচ্ছিল্য করতে লাগল। তারা শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে ঋষিদের সামনে এনে জিজ্ঞাসা করল, "ঋষিবর, আপনারা তো ত্রিকালজ্ঞ, বলুন তো, এই গর্ভবতী নারী পুত্র না কন্যা প্রসব করবে ?"

তাদের এই উপহাসে প্রতারণায় ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, "তোমরা দুর্বৃত্ত, নৃশংস, দুরাচারী। তবে শোন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এই শাম্ব একটা লৌহমুসল প্রসব করবে। সেই মুসলে তোমরা সবংশে ধ্বংস হবে।"

শ্রীকৃষ্ণকে জানান হল।

তিনি বললেন, "ঋষিদের অভিশাপ অবশ্যই ফলবে।" এই বলে তিনি তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন। অভিশাপের প্রতিকার করতে ইচ্ছা করলেন না।

পরদিন শাম্ব একটি লৌহমুসল প্রসব করল। রাজা উগ্রসেন বললেন, "ওই মুসলকে পাষাণে চূর্ণ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও।"

সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রইল।

তারা শঙ্কিত হয়ে দেখল, শ্রীকৃষ্ণের হস্তের সুদর্শন চক্র আকাশমার্গে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অপ্সরাগণ শ্রীকৃষ্ণের গরুড়চিহ্নিত ধ্বজ নিয়ে শূন্যে বিলীন হল।

শ্রীকৃষ্ণের রথ ও অশ্ব সমুদ্রের উপর দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে দিগন্তে উধাও হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ নির্বিকার।

এমন সময় দৈববাণী হল, "তোমরা প্রভাস তীর্থে যাও।"

যাদবগণ প্রভাসে এলেন। তবে তীর্থ করতে নয়, বিলাস করতে। মদ মাংস আর নারী নিয়ে তারা ব্যভিচারে মত্ত হয়ে উঠল। বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা, বভ্রু সবাই মাতাল হয়ে মদ্য পান করতে লাগলেন। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ছোট ভাই গদ তাঁর সম্মুখেই মদ্যপান করতে শুরু করল। ব্রাহ্মণদের জন্য প্রস্তুত অন্নে সুরা মিশিয়ে তারা গাছের বানরদের খাওয়াতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে নীরবে এইসব দেখছেন। তাঁর মনে দুঃখ ঘৃণা বা ক্রোধ কিছুই হল না।

তারপর মাতাল যাদবদের মধ্যে বচসা ও ঝগড়া বেধে গেল। সাত্যকি কৃতবর্মার সঙ্গে কলহ হচ্ছে,

—"তুমি পাপাত্মা, নিদ্রিত পাণ্ডবদের হত্যা করেছ। তুমিই অক্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সত্যভামার পিতাকে হত্যা করিয়েছিলে।"

—"আর তুমি? নৃশংস নরাধম। নিরস্ত্র ভূরিশ্রবাকে বধ করেছিলে।"

উত্তেজিত সাত্যকি খড়্গ নিয়ে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করলেন। তখন ভোজ ও অন্ধকগণের হাতে সাত্যকি প্রদ্যুম্ন নিহত হলেন। ভীষণ মারামারি শুরু

হয়ে গেল। অগ্নিতে পতঙ্গের মত সবাই মরতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনে মৃত্যু হল প্রদ্যুম্ন শাম্ব চারুদেষ্ণ ও অনিরুদ্ধের।

শ্রীকৃষ্ণ তখন এক গুচ্ছ তৃণ হাতে তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন। সেই তৃণ গুচ্ছ ভয়ঙ্কর মুসল হয়ে গেল। তাই দিয়ে তারা একে অপরকে বধ করতে লাগল। আমরা ধৃতরাষ্ট্রের মুখে আগেই শুনেছি, কালপূর্ণ হলে সামান্য তৃণগুচ্ছও বজ্রের মত সংহারী হয়—"পক্কানাং হি বধে সূত বজ্রায়তে তৃণান্যুত" (দ্রোণপর্ব, ১১/৪৮)।

প্রভাস তীর্থ তখন শ্মশান।

শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বললেন, "তুমি শীঘ্র হস্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে সংবাদ দাও। অর্জুন এসে পুরনারীদের রক্ষা করে পাণ্ডবরাজ্যে নিয়ে যাবে। আমি দেখি বলভদ্র কোথায়।"

দারুক ছুটলেন হস্তিনাপুরে।...

শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে এসে দেখেন, বৃক্ষমূলে বলরাম ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখ থেকে এক শ্বেতবর্ণ সর্প নির্গত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করল। অনন্তনাগ নারায়ণ মূর্তি বলরাম দেহত্যাগ করলেন।...

শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন তাঁর কাল পূর্ণ হয়েছে। তিনি তখন ইন্দ্রিয় বাক্য মন নিরুদ্ধ করে ভূমিশয়ানে যোগমগ্ন হলেন। এমন সময় গভীর বনে জরা নামে এক ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণের রাতুল পাদপদ্ম দুখানি দেখে মৃগ মনে করে শরবিদ্ধ করল। তারপর শিকার সন্ধানে ছুটে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখে, বাণবিদ্ধ হয়েছেন যোগমগ্ন পীতাম্বর চতুর্ভুজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। অপরাধী ব্যাধ তখন তাঁর চরণে পতিত হল।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস দিয়ে আপন দিব্য মহিমায় আকাশ ব্যাপ্ত করে তাঁর পরম ধামে প্রয়াণ করলেন। ইন্দ্র আদিত্য বসু বিশ্বদেবগণ মুনি ঋষি সিদ্ধ সাধ্য গন্ধর্ব অপ্সরা তাঁর সমাগমে আকাশে স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন।...

বেদব্যাসের আশ্রম।

দীনহৃদয়ে ম্লানমুখে প্রবেশ করলেন অর্জুন। মহর্ষির চরণে প্রণাম করে বললেন, "আমি অর্জুন।"

ত্রিকালদৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে মহর্ষি বললেন, "আস্যতামিতি। এস, উপবেশন কর।"

অর্জুনের মন অশান্ত। চিত্তে গভীর বিষাদ। ম্লান মুখ। দীর্ণ হৃদয়। বারবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছেন।

—"বৎস, তোমাকে এমন অশুচি শ্রীহীন দেখছি কেন?"

—"ভগবন্, ব্রাহ্মণের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন। আমার জীবন আজ নিষ্ফল মনে হচ্ছে। পৃথিবী আমার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। এর চেয়ে সমুদ্র শুকিয়ে গেলে, পর্বত সঞ্চালিত হলে, আকাশ পতিত হলেও আমি বিস্মিত হতাম না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান আমার কাছে অকল্পনীয়। বাসুদেবের অবর্তমানে আমি বাঁচব কেমন করে? ভগবন্, আরো দুঃখের কথা শুনুন, বসুদেব অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছেন। দেবকী ভদ্রা মদিরা রোহিণী পতির চিতায় সহগামিনী হয়েছেন। দ্বারকা থেকে যখন আমি বৃদ্ধ বালক ও নারীদের নিয়ে চলে আসছিলাম, তখন পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, অকস্মাৎ সমগ্র দ্বারকাপুরী সমুদ্রের তলায় ডুবে গেল। পথে লাঠি হাতে একদল আভীর দস্যু যাদবরমণীদের প্রতি লুব্ধ হয়ে তাদের হরণ করতে লাগল। ধিক্ আমাকে! আমি গাণ্ডীবধন্বা বীর অর্জুন, কিন্তু আমার গাণ্ডীব তুলতে পারলাম না। কোন অস্ত্র আমার স্মরণে এল না। দুর্বল হাতে আমি দস্যুদের বাধা দিতেও পারলাম না। আজ আমি শক্তিহীন অসহায় দিগ্‌ভ্রান্ত। এভাবে আর বাঁচতে চাই না।"

শান্তকণ্ঠে বেদব্যাস বললেন, "বৎস, ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণি অন্ধকগণ বিনষ্ট হয়েছে। তাদের জন্য শোক ক'রো না। এ ভবিতব্য। শ্রীকৃষ্ণ সব জানতেন, তাই তিনি নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করে তাঁর আপন ধামে প্রয়াণ করেছেন। যেসব যাদবরমণীদের দস্যু হরণ করেছে, তারা পূর্বজন্মে স্বর্গের অপ্সরা ছিল। ওইসব সুন্দরী রমণী অষ্টাবক্র মুনির বিকৃত অঙ্গ দেখে উপহাস করেছিল। মুনি তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে মানবী হয়ে জন্মাবে। দস্যু কর্তৃক ধর্ষিতা হবে। তারপর তোমাদের মুক্তি।' অর্জুন, কাল অনুসারে মানুষ বলবান্ হয় আবার দুর্বল হয়। তোমার সকল অস্ত্র সার্থক ও কৃতকৃত্য হয়েছে। তাই তারা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেছে। তোমরা দেবগণের মহৎকর্ম সাধন করেছ। তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে। এখন মহাপ্রস্থান।"

অতএব আর বিলম্ব নয়।

এই খেলাঘর ছাড়তে হবে।

এই মাটির কলস ভাঙতে হবে।

যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, "দেখছ না ? কালের আগুনে সব পুড়ছে ? সব শেষ হয়ে যাচ্ছে ? তবে আর কেন ?"

তাঁরা তখন যুযুৎসুকে ডেকে বললেন, "তোমার উপর রাজ্যের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের ভার রইল। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র হবে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা, আর পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরের। তুমি তাদের রক্ষা করে ধর্মপথে চালিত করবে।"

এই বলে তাঁরা রাজ আভরণ খুলে ফেললেন। খুলে ফেললেন মাথার মুকুট। অঙ্গে ধারণ করলেন সন্ন্যাসীর বল্কল। সেই আর একদিনের মত, দ্যূত সভা থেকে যখন তাঁরা বনে গমন করেছিলেন, সেদিন তাঁদের চারিদিকে ঘিরে ছিল বিদ্রূপ আর বঞ্চনা, কিন্তু আজ তারা কোথায় ? কোথায় দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ শকুনির দল ? কোথায় সেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের খল স্বার্থপরতা ?

অগ্নিহোত্র জলে নিক্ষেপ করে পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী সন্ন্যাসী বেশে হস্তিনাপুরের পথে নামলেন।

সম্মুখে অনন্ত আকাশ। উদার অসীম দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে যেন মহাকালের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। অটল অবিকম্প অমোঘ।

তাঁরা চলেছেন...

পথের দুধারে মাটির সংসার—সুখদুঃখ হাসিকান্নায় ভরা শরতের গুচ্ছ-গুচ্ছ মেঘের মত। রামধনুর রঙ-ছড়ানো স্বপ্নের মধ্যে অস্পষ্ট গানের মত।...

কোথা থেকে তাঁদের সঙ্গে চলেছে এক পথের কুকুর। কত পথ কত প্রান্তর নদনদী বন কান্তার পার হলেন তাঁরা। পেরিয়ে গেলেন হিমালয়। দেখলেন বালুকার্ণব, মেরুপর্বত।

এ যেন তাঁদের যোগচেতনার এক ঊর্ধ্বায়ন গতি। সানুর পর সানু অতিক্রম করে চলেছেন। বাস্তবের ছবি আর অধ্যাত্মের সত্য মিলে একটা প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই মহাযাত্রা স্থান কালের ঊর্ধ্বে বিমূর্ত এক আধ্যাত্মিক সত্য। আকাশের ছায়া যেমন মাটিতে পড়ে, সূর্যের প্রতিবিম্ব যেমন জলের মধ্যে পড়ে, তেমনি এই মহাপ্রস্থানের পথে অধ্যাত্মলোকের সত্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে মহাভারতের কাহিনীপটে। আমাদের অন্ধ নয়ন হারিয়েছে যে গুপ্ত দৃষ্টি, সত্যের গভীর সব পথ বেয়ে চলে যা, অধ্যাত্মদৃষ্টির সেই বীথিশ্রেণী খুলে ধরে স্বর্গের প্রবেশপথের রহস্য-দুয়ার। আত্মা যেখানে তার আপন সামর্থ্যে উঠে চলে, পার হয়ে যায় লোকের পর লোক, কারো কাছে-বা কোন একটি স্তরে এসে হঠাৎ অর্গল রুদ্ধ হয়ে যায়। কেউ

চলে আরো এগিয়ে। পিছনে তাকায় না। অপেক্ষা করে না। যে যায় সে যায়।

বেদব্যাস এখানে কাহিনী বলছেন না। তিনি তাঁর যোগদৃষ্টি দিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের অন্তরাত্মার আধ্যাত্মিক উৎক্রমণের রহস্য বলছেন যথাসম্ভব বাস্তবের মানুষী ভাষায়। তাই তাঁর কথায় এমন ছায়া-কায়া সম্ভব-অসম্ভবে-মেশা ইশারা আর দ্যোতনা। এক-একটি শ্লোকের চরণে-চরণে তা ঝলক দিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের চমকে দিয়ে কবি হঠাৎ বললেন, "যেতে-যেতে দ্রৌপদী ভ্রষ্টযোগা হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে।" (মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ২/৩)

একি স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা ?

অন্তরাত্মার শক্তি ও পুণ্যকর্মের ঋদ্ধি ও গতি অনুসারে আত্মা তার ঊর্ধ্বপথে যেতে-যেতে একটা জায়গায় উঠে আর যেতে পারে না। তার পথ থেমে যায়। দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। আতস বাজির মত তার স্ফুলিঙ্গ নিভে যায়। এ মৃত্যু নয়, তাই এখানে শোক নেই, আক্ষেপ নেই, অপেক্ষা নেই। আছে শুধু না-থাকারই মত সামান্য কৌতূহল। দ্রৌপদীর যাত্রা এখানেই শেষ হল কেন ? ভীমের এই প্রশ্ন। মর্ত্যশরীরে প্রাণাবেগে দুর্মদ ভীম কিন্তু এমনি একটু কৌতূহল জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হতেন না। আমরা দেখতাম তার প্রবল আক্ষেপ বিক্ষেপ অশ্রুবর্ষণ।

যুধিষ্ঠির ও চারভাই এগিয়ে চলেছেন।···

অল্পক্ষণ পরে এবার পড়ে গেলেন বিদ্বান্ সহদেব। তবু কারো চাঞ্চল্য নেই।

এমনি করে নকুল গেলেন···অর্জুন গেলেন···শেষে পড়লেন ভীম নিজে। একটি একটি করে যেন শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। হাওয়ায় তার সামান্য কম্পনও জাগল না। শুধু পরপর বলে দেওয়া হল কার কোথায় সীমা।

দ্রৌপদীর প্রেমে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত। সহদেবের বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান। নকুলের রূপের অহঙ্কার। অর্জুনের বীরত্বের অহমিকা। অন্যের বল না বুঝে ভীমের আপন বলের গর্ব।···

যুধিষ্ঠির কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। একাগ্র চিত্তে এগিয়ে চলেছেন একা। নিঃসঙ্গ চিরপথিক। পশ্চাতে তাঁর সেই পথের কুকুর। পথের প্রাণী কোন্ মায়ায় কিসের টানে যে তাঁর সঙ্গে চলেছে তা তিনি জানেন না। তবু তাঁর মত সেও তো যাত্রী। সঙ্গী তাঁর সাথী তাঁর পথের বন্ধু।···

সুদূরের অদৃশ্য লোকের পথ কেটে চলেছেন তিনি এগিয়ে। মানুষের বিজয়ী আত্মার গরিমাবাহক। পার হয়ে সোনার কিরণলেখা অন্তরিক্ষ লোকসব। আনন্দভরা স্বপ্নের পুঞ্জিত বিস্ময়।...

বহুদূরে নিয়ে ওই রক্তবর্ণ কুয়াশার মত ভেসে রয়েছে মানুষের সংসার গোধূলি। কত শ্যাম গিরিমালা-বিস্তৃত ধূসর স্রোতস্বিনী। আলোকিত ছায়ারূপে ভরা একখানি চলচ্চিত্র যেন। যেখানে যুগচক্র ঘুরে চলে, ফিরে আসে আবার। অশান্ত জীবন-সাগরের উতরোল আর্ত কলরব।...

যুধিষ্ঠির চলেছেন এসব ছাড়িয়ে বহু ঊর্ধ্বে। স্ফটিকশুভ্র আগুনের স্বচ্ছতা পেরিয়ে। সম্মুখে অধ্যাত্মের প্রসার সব। মহিমাভরা স্তব্ধ সুষমা যত। স্বর্ণোজ্জ্বল পলাশপ্রভ ইন্দ্রনীল আকাশ—ফুলরাশির মত চেয়ে আছে যেন অপ্সরাদের চোখের হাসি। অমরার গভীরে শূন্যের আলিঙ্গনে ঢেলে দিয়েছে স্বর্গের দেবতাদের ঋতধারা।

আলোকের জ্যোতির ওঙ্কার ধ্বনি...

[সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট

নাম-পরিচয়

অক্রূর—শ্রীকৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।

অম্বা—কাশীরাজের প্রথম কন্যা, পরজন্মে শিখণ্ডী।

অম্বালিকা—কাশীরাজের তৃতীয় কন্যা, বিচিত্রবীর্যের পত্নী, পাণ্ডুর জননী।

অম্বিকা—কাশীরাজের দ্বিতীয় কন্যা, বিচিত্রবীর্যের পত্নী, ধৃতরাষ্ট্রের জননী।

অর্জুন—পাণ্ডুর তৃতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। ইন্দ্রের সমাগমে কুন্তীর গর্ভে জন্ম।

অলম্বুষ—কুরুপক্ষীয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসুরের পুত্র।

অশ্বত্থামা—দ্রোণ-কৃপীর পুত্র।

আস্তীক—জরৎকারু-পুত্র। বাসুকির ভাগিনেয়।

ইন্দ্রসেন—যুধিষ্ঠিরের সারথি।

ইরাবান—অর্জুন-উলূপীর পুত্র।

উগ্রসেন—কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা।

উত্তমৌজা—পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চালবীর।

উত্তর—বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র।

উত্তরা—বিরাটের কন্যা, অভিমন্যুর পত্নী, পরীক্ষিৎ-জননী।

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।

উলূক—শকুনির পুত্র।

একলব্য—দ্রোণের নিষাদ শিষ্য।

উলূপী—নাগ রাজকন্যা, অর্জুনের পত্নী।

কংস—উগ্রসেনের পুত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা।

কর্ণ—সূর্যের পুত্র, কুন্তীর গর্ভে জন্ম। অধিরথ সূত ও তার পত্নী রাধা কর্তৃক পালিত।

কীচক—বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক।

কুন্তিভোজ—শূরের পিতৃষ্বসার পুত্র, কুন্তীর পালক পিতা।

কুন্তী—অন্য নাম পৃথা। শূরের কন্যা, বসুদেবের ভগ্নী, কুন্তিভোজের পালিত কন্যা, পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী। যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের জননী।

কুরু—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতীর পুত্র।

কৃতবর্মা—ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ।

কৃপ—শরদ্বানের পুত্র, কুরু-পাণ্ডবের অন্যতম অস্ত্রশিক্ষাগুরু, দ্রোণের শ্যালক।

গদ—যাদব বীর বিশেষ।

গান্ধারী—গান্ধার রাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী, দুর্যোধনের জননী।

ঘটোৎকচ—ভীম-হিড়িম্বার পুত্র।

চিত্রাঙ্গদা—অর্জুন-পত্নী, বভ্রুবাহনের জননী।

চেকিতান—যাদব বীর বিশেষ।

জনমেজয়—পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র।

জয়দ্রথ—সৌবীররাজ, ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলার পতি।

জরাসন্ধ—মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর।

তক্ষক—নাগরাজ বিশেষ।

দারুক—শ্রীকৃষ্ণের সারথি।

দুঃশলা—ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর কন্যা, জয়দ্রথের পত্নী।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র।

দুর্যোধন—ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠপুত্র।

দ্রুপদ—পাঞ্চাল রাজ। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পিতা।

দ্রোণ—ভরদ্বাজ পুত্র। কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু, কৃপের ভগিনীপতি।

দ্রৌপদী—কৃষ্ণা, পাঞ্চালী, দ্রুপদকন্যা, পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী।

ধৃতরাষ্ট্র—বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে জন্ম।

ধৃষ্টকেতু—শিশুপালের পুত্র, চেদি দেশের রাজা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ-পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের সেনাপতি।

ধৌম্য—পঞ্চপাণ্ডবের পুরোহিত।

নকুল-সহদেব—পাণ্ডুর যমজ ক্ষেত্রজ পুত্র। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সমাগমে মাদ্রীর গর্ভে জন্ম।

নর—বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ঋষি।

পরীক্ষিৎ—অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র, অর্জুনের পৌত্র।

পাণ্ডু—বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জন্ম।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র।

বভ্রু—যাদব বীর বিশেষ।

বলরাম—বলদেব, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বৈমাত্র ভ্রাতা, বসুদেব-রোহিণীর পুত্র।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার পিতা, কুন্তীর ভ্রাতা, শূরের পুত্র।

বাসুকি—নাগরাজ, অনন্ত, কশ্যপ-কদ্রুর পুত্র।

বিকর্ণ—দুর্যোধনের ভ্রাতা।

বিচিত্রবীর্য—শান্তনু-সত্যবতীর পুত্র, ভীষ্মের বৈমাত্র ভ্রাতা।

বিদুর—ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার শূদ্রাদাসীর গর্ভে জন্ম।

বিরাট—মৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার পিতা।

বিশ্বামিত্র—কান্যকুব্জের রাজা গাধির পুত্র, কুশিকের পৌত্র।

বৃহৎক্ষত্র—নিষধরাজ।

বৃহদ্বল—কোশলরাজ।

বৈশম্পায়ন—ব্যাস-শিষ্য, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহাভারত-বক্তা।

ব্যাস—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতা, মহাভারত রচয়িতা।

ভগদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা।

ভরত—দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্র, কুরুপাণ্ডবের পূর্বপুরুষ।

ভীম—পাণ্ডুর দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র, পবনদেবের সমাগমে কুন্তীর গর্ভে জাত।

ভীষ্ম—শান্তনু-গঙ্গার পুত্র।

ভীষ্মক—রুক্মিণীর পিতা, ভোজবংশের রাজা, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর।

ময়দানব—নমুচির ভ্রাতা, ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসভা নির্মাতা।

মাদ্রী—মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী, পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল-সহদেবের জননী।

যুধামন্যু—পাঞ্চালবীর বিশেষ।

যুধিষ্ঠির—পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধর্মের সমাগমে কুন্তীর গর্ভে জাত।

যুযুৎসু—ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত।

লক্ষ্মণ—দুর্যোধনের পুত্র।

লক্ষ্মণা—দুর্যোধনের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্বের পত্নী।

শকুনি—দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধার রাজ সুবলের পুত্র।

শঙ্খ—বিরাট রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র।

শল্য—মদ্র দেশের রাজা, মাদ্রীর ভ্রাতা।

শান্তনু—প্রতীপের পুত্র, ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের পিতা।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র।

শিখণ্ডী—দ্রুপদের পুত্র, পূর্বজন্মে কাশীরাজ কন্যা অম্বা।

শিশুপাল—চেদি দেশের রাজা, দমঘোষের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই।

শ্রুতসেন—সহদেবের পুত্র।

শূর—বসুদেবের পিতা।

শ্রুতায়ু—কলিঙ্গরাজ।

শ্বেত—বিরাটের মধ্যম পুত্র।

সঞ্জয়—ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ও মন্ত্রী, [illegible]

সত্যজিৎ—দ্রুপদের ভ্রাতা।

সত্যবতী—অন্য নাম মৎস্যগন্ধা, উপরিচর বসুর কন্যা, মৎসীগর্ভে জাতা, ব্যাসের জননী। পরে শান্তনুর পত্নী। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জননী।

সহদেব—নকুল দেখ। জরাসন্ধের পুত্র। মগধের রাজা।

সাত্যকি—সত্যকের পুত্র, শিনির পৌত্র। বৃষ্ণিবংশীয় বীর।

সারণ—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর।

সুদেষ্ণা—বিরাট-মহিষী, উত্তর-উত্তরার জননী। কেকয় রাজকন্যা।

সুবল—গান্ধারী ও শকুনির পিতা।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্র ভগিনী, অর্জুনের পত্নী, অভিমন্যুর জননী।

সুশর্মা—ত্রিগর্তের রাজা।

সোমদত্ত—ভূরিশ্রবার পিতা।

সৌতি—প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জাতিতে সূত। ইনি নৈমিষারণ্যের ঋষিদের মহাভারত শুনিয়েছিলেন।

হিড়িম্বা—ভীমের পত্নী। ঘটোৎকচ জননী।

শব্দসূচী